ভূমিকা

সমগ্র 'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থের বিষয়বস্তু তিনটি পর্ব্বে 'প্রবর্ত্তক' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৩৩৬ সালের ২২-এ অগ্রহায়ণ প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা পূজনীয় সঙ্ঘগুরু শ্রীশ্রীমতিলাল রায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী লোকান্তরিতা হন। এই সালের পৌষ সংখ্যা প্রবর্ত্তকেই তিনি 'আমার জীবনসঙ্গিনী' শীর্ষক রাধারাণী দেবীর জীবন-কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৩৩৭ সালের চৈত্র সংখ্যায় উহা শেষ হয়। তাঁহার সঙ্ঘপূর্ব্ব পারিবারিক ও বিচিত্র সাধন-জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী মুখ্যতঃ এই খণ্ডে বিবৃত। ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে এই অংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং স্বল্পকাল মধ্যেই পুস্তকখানি নিঃশেষিত হইয়া যায়। পুস্তকখানির প্রারম্ভে "প্রকাশকের নিবেদন" শিরোনামায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সন্তানমণ্ডলী গ্রন্থমর্ম্ম এইভাবে ব্যক্ত করেন :

"পুণ্যময়ী সঙ্ঘজননীর পরম পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ের আলেখ্য-পটে আমাদের চিরদিন আঁকা থাকিবে—সে আলেখ্য মুছিবার নয়। সে স্মৃতি যতই ধ্যান করি, ততই মূর্ত্ত হয়। হৃদয় ভরিয়া ওঠে প্রেমে ও আনন্দে। সেই প্রেমানন্দময় মাতৃ-মূর্ত্তিই জীবনের আরাধনায় সঙ্ঘের প্রতি নারী-পুরুষের অন্তরে অলক্ষ্যে শক্তি ও প্রেরণার উৎস—উৎসর্গের সিদ্ধিলক্ষ্মী।

"মায়ের পূজা—সন্তানের শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমেরই হৃদয়ারতি। এই গ্রন্থ-প্রকাশ উপাসনারই অর্ঘ্য। ইহা বিশ্বময়ীর চরণকমলেই উপনীত হউক।"

১৩৪৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তক'-এ পূজনীয় লেখক 'জীবনসঙ্গিনী'র দ্বিতীয় পর্ব্ব লিখিতে সুরু করেন এবং ১৩৪৮ সালের মাঘ সংখ্যায় উহা শেষ করেন। ইহা তাঁহার দাম্পত্যজীবনের নিগূঢ় অধ্যায়। এখানে একান্ত পরিবারগত পতি-পত্নীর জীবন ও সম্বন্ধ সমুন্নত আধ্যাত্ম-আদর্শ-রসায়নে রূপান্তর-রঞ্জিত। একদিকে ক্রমাপসরমাণ ব্যক্তি ও পরিবার, অন্যদিকে মহতের আহ্বানে উদ্দাম গতিতে অগ্রসরমান পতিদেবতার কায়ার ছায়ার ন্যায় পত্নীর নির্ব্বাক্ অনুসরণ ও বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্বের অপূর্ব্ব চিত্র এই পর্ব্বে

লেখকের অনুপম মর্ম্মনিঙড়ানো লিপি-কুশলতায় অঙ্কিত। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ-সৃষ্টির সূচনা-পর্ব্বও ইহাই। অব্যক্ত সৃষ্টির অস্ফুট কাকলি এখানে মুখর হইয়া না উঠিলেও, অশ্রুত প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। ভাবী সৃষ্টির গর্ভবেদনা-শিহরিত এই অধ্যায়টি গ্রন্থকারের চরমতম সাহিত্যিক অবদানও বলা চলে। প্রথম পর্ব্বে গ্রন্থকারের শ্রীঅরবিন্দ-সংযোগ বিকশিত, পল্লবিত হইয়া দ্বিতীয় পর্ব্বে যে পরিণতি পাইয়াছে, তাহা সুকরুণ বিয়োগান্ত যবনিকার অন্তরালে পুনশ্চ অন্তর্হিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্ব্বের চিরবিচ্ছেদমূলক গ্রন্থকারের অরবিন্দ-বিযুক্তি অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী এবং ইহাই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মর্ম্মান্তিক পরিসমাপ্তিও। বস্তুতঃ, শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়াই এখানে দাম্পত্যজীবন আবর্ত্তিত। বাংলার বিপ্লবযুগের রাষ্ট্র-সাধনার সূচনা ও পরিণতি এই দুইটি পর্ব্বের পটভূমি বলা চলে।

১৯০৬ হইতে ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারী—এই স্বল্পস্থায়ী পাঁচটি বৎসর ব্যাপী শ্রীঅরবিন্দের প্রকাশ্য রাষ্ট্রজীবন দেশের নিকট সুবিদিত। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁর বাল্য ও কৈশোরজীবনের ইতিহাস অস্পষ্ট। ১৯১০-এর পর শ্রীঅরবিন্দের সুদীর্ঘ জীবনও রহস্যাবৃত। ১৯১০ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এই দুর্ভেদ্য রহস্যঘন অজ্ঞাত অরবিন্দ-জীবনের অজানা অধ্যায়ের উপর এই 'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থে উল্লিখিত উপাদান অবধারিত আলোকপাত করিবে। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনে এই অনাহূত অরবিন্দ-সংযোগ বাংলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, মত ও পথ এবং সাধন-বৈচিত্র্যের অন্বেষণ ও অনুসরণেরও সমাহার আনিয়া দেয়। ইহা একদিকে যেমন বাংলার আউল, বাউল, তন্ত্র, সাঁই, সহজিয়া প্রভৃতি বিচিত্র সাধনমার্গের রহস্যবাদের মর্ম্মোদ্ঘাটনের সহায়ক হইয়াছে, তেমনি অপর দিকে বাঙালীর অধ্যাত্মমানসে আত্মসমর্পণসাধ্য পূর্ণযোগমূলক জীবনসাধনার সঙ্কেত-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

'জীবনসঙ্গিনী'র প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব একত্র গ্রন্থবদ্ধ হইয়া ১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৯৫২ খৃঃ) দ্বিতীয় সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থের তৃতীয় পর্ব্ব সঙ্ঘ-সৃষ্টির যুগ। সংগঠন ইহার মূলসূত্র। অগ্নিযুগের সমাপ্তি আর মহাত্মা গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ইহার বহিরঙ্গ পটভূমি রচনা করিয়াছে। ১৯২১-এর ১১ই আগষ্ট সস্ত্রীক গ্রন্থকারের পণ্ডিচারী ত্যাগ হইতে ১৯২৯-এর ৮ই ডিসেম্বর দেবী রাধারাণীর মৃত্যু-মুহূর্ত্ত

পর্য্যন্ত ইহার কাল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমসাময়িক ইতিহাস এই পর্ব্বের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত। ১৩৫০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তক'-এ ইহার সুরু এবং ১৩৫৬ সালের আষাঢ় সংখ্যায় শেষ। আগামী কালে 'জীবনসঙ্গিনী'র এই বিপুল বৈচিত্র্যময় কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিতব্য। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব দুই পর্ব্ব 'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়, যুগসম্মত সজ্জায় নবাকারে উহারই বক্ষ্যমাণ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

'জীবনসঙ্গিনী' বস্তুতঃ 'জীবনসঙ্গিনী'-রচয়িতারই আত্মজীবনী। গ্রন্থকারের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই তাঁর জীবন, কর্ম্ম ও সাধনা সীমাবদ্ধ নয় এবং নয় বলিয়াই উহা প্রসারিত হইয়া বৃহত্তর জাতীয় জীবনের দিগঙ্গন স্পর্শ করিয়াছে। পূজনীয় গ্রন্থকারের সমগ্র জীবন-সাধনার অলক্ষ্য অন্তরালে থাকিয়া যে মহীয়সী নারী ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছেন, প্রেরণা যোগাইয়াছেন, পবিত্রতা ও সংযম এবং সমর্পণের মধ্য দিয়া সহধর্ম্মীকে সমুন্নয়ন ও সিদ্ধি দান করিয়াছেন, তাঁহাকে না জানিলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লেখকের অন্তরঙ্গ দিক্‌টাই অজানা রহিয়া যাইবে। বস্তুতঃ, পূজনীয় গ্রন্থকার শ্রীশ্রীমতিলাল রায়ের সহধর্ম্মিণীর কোন স্বতন্ত্র সত্তাই ছিল না, বলা চলে। পত্নীর আত্মনিবেদনের অপূর্ব্ব রসায়নে দাম্পত্যজীবন এখানে একাকার, অদ্বয় এবং অখণ্ড। মানবিক ও দৈহিক সংস্কার একদিনে আকস্মিক মুছিবার নয়। প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের মধ্য দিয়া দিব্য রূপান্তরের যে বিচিত্র কাহিনী, তাহাই সাধারণ সংসার, সমাজ ও দাম্পত্য-জীবনের ক্ষেত্রে উর্দ্ধমুখী প্রেরণার উৎস হইবে। রাধারাণী দেবীর বহিরঙ্গ জীবন আর দশজন সমাজ-সংসারের সতী-সাধ্বীরই মত। সংক্ষিপ্ত ছিল তাঁর আয়ুঃ—প্রায় ৪০ বৎসর।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে (৬ই আষাঢ় ১২৯৬ বঙ্গাব্দ) রাধারাণী দেবী চুঁচুড়ার এক ছেত্রী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাধারাণীর পিতামহ চৌহান ঠাকুরবংশীয় ৺বৈদ্যনাথ সিংহরায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মৈয়নপুর জেলা হইতে এদেশে আসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করেন। পিতার নাম ৺হরিলাল সিংহরায় এবং

রা ৭ বুধ ম ৫	শু ২		চ ২৬
শ ৯			
			র ১০ বৃ ২ কে

৺রাধারাণী দেবীর জন্মকুণ্ডলী

জন্ম : ১৮১১ শকাব্দ (ইং ১৮৮৯) ৬ই আষাঢ়, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ২।৫।৩৭।২৫ পল। ধনুলগ্ন। কন্যা রাশি।

মৃত্যু : ২২-এ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ। ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ খৃঃ।

মাতার নাম ৺কামিনী দেবী। পিতামাতার চারিটি পুত্র-সন্তানের পর আদরিণী কন্যা রাধারাণী ভূমিষ্ঠা হওয়ায়, তিনি এই সিংহরায় পরিবারের, বিশেষতঃ তাঁর পিতামহীর অত্যন্ত স্নেহভাগিনী হইয়াছিলেন। বালিকাবয়সে স্বভাবতঃই রাধারাণী অতিশয় সুশীলা, সরল-হৃদয়া, শান্তস্বভাবা ও লজ্জাবতী ছিলেন। সাত বৎসর বয়সে স্থানীয় ফ্রী চার্চ্চ মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া মাত্র দুই বৎসর তিনি পড়াশুনা করিয়াছিলেন। ৯ বৎসর বয়সে চন্দননগরের ৺বিহারীলাল রায়ের পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র বর্ত্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীমতিলালের সহিত রাধারাণীর বিবাহ হয়। বর ও কন্যা একই গোত্রজ হওয়ায়, মাতামহী রাধারাণীকে সম্প্রদান করিয়া দোষ খণ্ডন করেন। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যবশতঃ এই নব বধূর উপর স্বামীর বৃহৎ সংসারের সুদৃষ্টি পড়ে নাই। বস্তুতঃ, সাংসারিক সুখ-সৌভাগ্যলাভ যেন তাঁর অদৃষ্টেই বিহিত ছিল না। পতির বিচিত্র সংগ্রামময় জীবন তাঁহাকেও যেন অজ্ঞাতে এক অসামান্য জীবনের দিকেই ধীরে-ধীরে অগ্রবহ করিয়া লইয়া চলিয়াছিল। একমাত্র

কন্যার মৃত্যুর পর মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ভরা যৌবনে রাধারাণী পতি-দেবতার আহ্বানে অকুণ্ঠচিত্তে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়া, চিরদিনের মত নারীজন্ম ও জীবনের সকল বিলাস, ভোগবাসনা ও সাধ-আহ্লাদের বিসর্জ্জন দেন। রাধারাণীর জীবনে পতির আদর্শ সিদ্ধ করিতে পত্নীত্বের স্বেচ্ছামৃত্যু ও সত্যকার সহধর্ম্মিণীত্বের নবজন্ম এই পরম ক্ষণ হইতেই সুরু হয়। তাঁরই মুখের কথা ছিল : "সতীর ধর্ম্ম পতিকে বড় করা। এতেই সুখ, এতেই আনন্দ, আর কোন সাধ-আহ্লাদ রাখতে নেই।" ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর (১৩৩৬, ২২-এ অগ্রহায়ণ) তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জ্ঞানে-অজ্ঞানে জীবনের শেষ দুইটি দশক পতিদেবতার স্বরূপে আত্মলয়ের সাধনা ছাড়া তাঁর অন্য কোন প্রযত্ন ছিল না—না ছিল অস্তিত্বের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অথবা বিভিন্ন জীবনকাহিনী। রাধারাণী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনের নীরব কাহিনী তথ্যবাহুল্যে বা ঘটনার চমকপ্রদ বৈচিত্র্যে স্মরণীয় নহে ; পরন্তু তাঁর জীবনের অসাধারণ মহিমা ছিল অন্যত্র—মর্ম্মের অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রে, যাহাই তাঁহাকে দুর্লভ হিন্দু নারীর সতীত্বমহিমায় বরণীয়া করিয়াছে। এই নিবেদিত আত্মার বর্ত্তমান দেহেই দেহান্তরের যে অপরূপ প্রতিচিত্র 'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা যেমনি অ-সাধারণ আর অনবদ্য, তেমনি সিদ্ধ দাম্পত্য-জীবন লাভের পথে নারী মাত্রেরই অনুসরণযোগ্য।

'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থের তিনটি পর্ব্বে গ্রন্থকারের জীবনসঙ্গিনী রাধারাণী দেবীর তিনটি রূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম পর্ব্বে তিনি একান্ত পতি-সোহাগিনী জায়া, পত্নী, কুলবধূ। দ্বিতীয় পর্ব্বে তিনি সহধর্ম্মিণী এবং তৃতীয় পর্ব্বে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘজননী। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ প্রিয়তমের জীবনাদর্শে পত্নীর আত্মোৎসর্গ ও রূপান্তর-পর্য্যায়ক্রমেরই অশ্রুময় কাহিনী। এই উৎসর্গ এমনি পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত রাধারাণীর স্বতন্ত্র কোন জীবনকাহিনীই ছিল না। রক্ষণশীল পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সে-যুগের গোঁড়া আবহাওয়ার মাঝে শ্বশুরকুলে নিষ্পিষ্টা ও বর্দ্ধিতা হইয়া রাধারাণী নিজেও অত্যন্ত রক্ষণশীলা ও লাজুকস্বভাবা হইয়া পড়েন। দাম্পত্যজীবনের প্রারম্ভে, কৈশোরে ও যৌবনে, নারীর সহজ আশা-আকাঙ্ক্ষা-চরিতার্থতার মাঝে পতিকে একান্ত আপনার জন করিয়া পাইবার যে হৃদয়প্রবণতা, তার ব্যতিক্রম রাধারাণীর জীবনে দেখা যায় দুইটি কারণে। প্রথম পারিবারিক, দ্বিতীয় পতির

অদম্য অফুরন্ত প্রাণের বহিরঙ্গ স্ফুরণের উচ্ছলতা। তখনও অনাগত আজিকার প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বীজ এই দম্পতীর জীবন ও সম্বন্ধ-রসায়নের মাঝে জন্মের অপেক্ষায় সুপ্ত। এখানে পতি ও পত্নী : গতি ও স্থিতি—সম্বেগ আর সম্বিৎ। এক্ষেত্রে এই প্রকৃতি-বৈপরীত্য প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সৃষ্টি সম্ভবপর করিয়াছে। দেশ ও জাতিসাধনার উদগ্রতায় ছিল তাঁর স্বামীর জীবন ব্যাপৃত। অগ্নিযুগের বিপ্লবী শহীদদের অবাধ আশ্রয় ছিলেন তিনি। অবারিত ছিল তাঁর গৃহদ্বার। অপরিচিত নবাগতের সমাগমে মুখরিত ছিল তাঁর গৃহাঙ্গণ। এই অশান্ত নিত্য উপদ্রুত পরিবেশে পতিকে একান্ত একাকিত্বের মাঝে পাইয়া পত্নী-হিয়ার যে পরিতৃপ্তি, তাহা রাধারাণীর ভাগ্যে ঘটে নাই। ঘটে নাই বলিয়াই রাধারাণীকে কত নীরব নির্ম্মম তপস্যার মধ্য দিয়া বিপ্লবী স্বামী ও ভাবী সঙ্ঘ-স্রষ্টার আনুগত্যে নিজেকে উন্নীতা করিয়া ধরিতে হইয়াছে—সেই অশ্রুসিক্ত রাগ-বিরাগের দ্বন্দ্বময় চিত্র অতিশয় নিপুণতার সহিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। রাধারাণীর যৌবনের সবচেয়ে বড় সাধনা এবং কঠিনতম পরীক্ষাও এইখানে। পত্নীর এই অপূর্ব্ব আন্তর-সাধনার নির্ম্মমতার কাছে পতির বহিরঙ্গ সৃষ্টির তপস্যাও বুঝি ম্লান হইয়া পড়ে! অবশেষে জীবনের ও আয়ুর মাত্র চতুর্থ দশকে রাধারাণীর সমগ্র চিত্ত-সংবেগ একাগ্র হইয়া পতির সঙ্ঘ-সৃষ্টিকারী এষণার সহিত ওতপ্রোত সংজড়িত হইয়াছে। পরিশেষে মরণ-মূল্যেই সঙ্ঘ-মাতৃত্বের মহিমাসনে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাধারাণীর মর জীবনের গৌরব, সৌভাগ্য এবং সিদ্ধিও এইখানেই। এবং এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের জন্যই স্বজন-পরিজন ও গৃহ-সীমানার বাহিরে সঙ্ঘ তথা জাতি-সাধনার ব্যাপক ক্ষেত্রে রাধারাণী দেবীকে অখণ্ড মাতৃত্বের কল্যাণমূর্ত্তিতে পাইয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তথা দেশ ও জাতি সৌভাগ্যান্বিত।

এই মহীয়সী নারীর স্বরূপ-পরিচয় তাঁর তিরোধানের পর রচিত প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মাতৃ-স্তুতির একটি গাথায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে :

ত্বং হি ভারতীয়ভাবসিদ্ধবিগ্রহা, গরীয়সী, পতিব্রতা মহানারী,
ত্বমেব সম্যগ্ আত্মনিবেদনস্থ ভাস্বরী মহিমময়ী পুণ্যপ্রতিমা,
ত্বমেব জীবনেমরণে চ মহীয়সী, অখণ্ড ভাগবদ্ব্রতচারিণী,
হে সাধ্বীনাং ললামভূতে, তপোময়ি! তুভ্যং নমঃ॥

'জীবনসঙ্গিনী'র কাহিনী বস্তুতঃ সমসাময়িক কাল, ঘটনা ও জাতির স্বাধীনতা-সাধনার বৃহত্তর পটভূমিকায় গৃহের নিরালা কোণে একটি মহীয়সী নারী-জীবনের জন্মান্তরেরই কাহিনী। এই দেহে দেহান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনায় এ জীবন অত্যুজ্জ্বল। বৃহতের গোত্রে গোত্রান্তরিতা হইয়া তাঁর নারী-সত্তা আজ নৈর্ব্যক্তিক-মাতৃত্বের মাঝে বিগলিতা। তাই আমরা আশা করি, অখণ্ড সন্তানব্রতী বাঙালীর নিকট 'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থখানি সশ্রদ্ধ সাদর অভিনন্দনই লাভ করিবে। ইতি

১০ই আশ্বিন ১৩৭৫
২৬-এ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

জীবনসঙ্গিনী



শ্রীশ্রীরাধারাণী দেবী

নয় বৎসর বয়সে তিনি অবগুণ্ঠন মাথায় দিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমার সম্মুখেই তাঁর জীবনকোরক ফুটিল, সুবাস বিলাইয়া শুকাইল—আমি ছাড়া তাঁর জীবনপর্ব্ব আর কেহ দেখিল না, তাঁর মর্ম্মকথা শুনিবার সুযোগ পাইল না।

তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম নয় বৎসর বয়সে, আমার বয়স তখন উনষোড়শ বৎসর। এত বাল্যকালে বিবাহ করার কারণ না বলিলে, জীবনরহস্যের মর্ম্মকথা অপ্রকাশ থাকিয়া যাইবে। তাঁর পুণ্য-কথার সহিত আমার জীবনের দুর্ব্বলতা যদি প্রকাশ পায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? বরং জীবন-শিল্পের অনভিজ্ঞতায় যে উদীয়মান নবজাতি ভাব ও আদর্শে বিভোর আত্মদৃষ্টিহারা, তাহারা কিছু সচেতন হইতে পারিবে। পথের অন্তরায় হিসাবের মধ্যে গণনায় না আনিলেই যে স্বচ্ছন্দ গতি মিলে, তাহা নহে; সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জমান পাহাড় পোতাধ্যক্ষের অতর্কিতেই অতি নিষ্ঠুর ভাবে সাধের অভিযান নষ্ট করিয়া দেয়। আত্ম-স্বভাবের মধ্যে যে অসংখ্য ত্রুটি ও ভ্রান্তি পথের মাঝে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তরুণের সুমহান্ আদর্শ ও স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহার ইয়ত্তা কে রাখে? আমার জীবন-তরী এইরূপ অসংখ্য বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়াই আজ তীরে ভিড়িবার উপক্রম করিয়াছে। আমার পশ্চিম আকাশ স্বচ্ছ নীলের মতই

উজ্জ্বল—জীবনের মধ্যগগন হইতে হেলিয়া পড়িয়াছি, ইহা আর অস্বীকার করিবার নহে। কিন্তু যে আনন্দ ও গর্ব্ব আমার জীবনের স্বাস্থ্য ও আয়ুঃ তাহা লইয়াই আমি ডুব দিব, ইহাপেক্ষা জীবনের অধিক সার্থকতা চাহি না; প্রয়োজন বলিয়াও আর স্বীকার করি না।

আমার জীবনসঙ্গিনীর অন্বেষণ-স্পৃহা এত অল্প বয়সে কেন প্রবল হইয়াছিল, আগে সেই কথাই বলি।

ছয় বৎসর বয়সে কঠিন টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হই। একচল্লিশ দিন বিকার-ঘোরে অনেক স্বপ্ন দেখি; আত্মীয়-স্বজন আমার অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলেন, আমার অন্তিম কাল উপস্থিত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। যখন সচেতন হইলাম, স্নেহময়ী মাতৃদেবীর আর্ত্তনাদ ও পিতৃদেবের বক্ষে করাঘাত করার অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। আমার শেষ স্বপ্ন স্মৃতিপথ হইতে কিন্তু আর মুছিল না। সে চিত্র ক্রমেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। এক সৌম্যশান্ত, শ্মশ্রুগুম্ফবিরাজিত প্রসন্ন বদন, কাঞ্চনকায় মহাপুরুষ আমার মৃত্যুকাতর শুষ্ককণ্ঠে অমৃতবারি ঢালিয়া আমায় নতুন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার শরীর কৃশ নয়, অতি স্থূল নয়, দীর্ঘ নয়, খর্ব্ব নয়—সে মূর্ত্তি আজিও দেখিলে চিনিতে পারি। তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ সরস হইলে, শিশুসুলভ প্রশ্ন: "রোগ-নাশ হইল, পথ্য করিব কি?" উত্তর পাইলাম "অন্ন"। সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন। জিহ্বা অমৃত-স্বাদে পূর্ণ হইয়াছিল, আজিও তাহা মুছে নাই—সে আস্বাদে আমার জীবন মধুময় হইয়া গিয়াছে। আর অন্নক্ষেত্র এই মর্ত্ত্যকে সেই যে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি, বুঝি অনন্ত যুগ আর ইহা ছাড়িব না! ইহাই আমার ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। এই ধরণী ধন্য হইবে, যে দিন দুষ্কৃতি দমন করিয়া ভগবান ভারতের সিংহাসনে বসিয়া ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন —যুগযুগের প্রতীক্ষায় আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইব না।

পিতাকে এই পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম—ইনিই দেবাদি-দেব মহাদেব, স্বয়ং তারকনাথ, পিতামাতার আকুল প্রার্থনায় আমার নবজীবন দান করিয়াছেন। প্রাণদাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে শিখিলাম, প্রাণদাতা শিবের আরাধনা-মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিলাম, ধূর্জ্জটির মূর্ত্তি গড়িলাম। পূজার ব্যবস্থা হইল, পার্ব্বতীনাথের চরিত্রালোচনায় প্রবৃত্তি জন্মিল, নিরামিষ আহার করিতে লাগিলাম। বাল্যের ক্রীড়া-প্রবৃত্তি এমন করিয়াই আমায় বিভোর

করিয়াছিল। কথাটা আজ হাস্যকর হইলেও যখন বলিতে বসিয়াছি তখন তুচ্ছ হইলেও, বলি—শিবের ন্যায় ভাঙ্-ধুতুরা খাওয়ার অভ্যাসও ধরিতে ছাড়িলাম না। ভাগ্য ভাল, গাঁজা খাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। পূর্ব্বোক্ত কদর্য্য অভ্যাস কিছুদিন আমার জীবন অধিকার করিয়াছিল; সে দিন আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে আমার এইরূপ আচরণ পিতামাতার চক্ষেও নিন্দনীয় বলিয়া বোধ হয় নাই।

অলক্ষ্যে বিধাতার হস্ত আমায় এইরূপ বাঁধন দিয়া কি কঠোর পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে ভগবানকে প্রতি নিঃশ্বাসে ধন্যবাদ দিতে-দিতে আজিও উন্মাদ হইয়া পড়ি। কলিকাতার 'মাথাঘষার গলি' নামক স্থানে, 'হরি বর্দ্ধনের গলিতে' আমার পিতাঠাকুর বাসা ভাড়া করিয়াছিলেন। সে বৃহৎ বাড়ীতে বহুসংখ্যক গৃহস্থ-পরিবার বাস করিত। কলিকাতা সহরে ইহা একটী বিখ্যাত গণিকাপল্লী। বাড়ীর বাহির হইলেই বারাঙ্গনাদিগের নানাপ্রকার কুৎসিত আচরণ চক্ষে পড়িত। বাড়ীর ভিতরেও বিপদের আশঙ্কা ছিল। গৃহস্থ-মেয়েদের মধ্যেও চরিত্রহীনতার সংখ্যা একেবারেই যে না ছিল, এমন নহে। একান্ত শিশু অবস্থায় তাহা বুঝি নাই, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সকল কথা বুঝিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহা অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক বৎসর পূর্ব্বের কথা।

সে যুগে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার এতখানি চর্চ্চা ছিল না। অধিকাংশ নারীই নিরক্ষরা থাকিত। সবে তখন বিদ্যাচর্চ্চার সুর উঠিয়াছে। অনেক বর্ষীয়সী নারী আমার নিকট প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ শিক্ষা করিত; কচিৎ দুই-একজন সামান্য লেখাপড়া জানিত, "কামিনীকুমার", "গোলেবকালী", "বেতালপঞ্চবিংশতি" অনেককে পড়িতে দেখিয়াছি; বটতলার কৃত্তিবাসী-কাশীদাসী রামায়ণ-মহাভারত পড়ার বেশ ঘটা ছিল। আমি সুর করিয়া "হাটপত্তন" পড়িয়াছি, বাসার অনেক নারী বসিয়া শ্রবণ করিয়াছে। কাহারও চিঠিপত্র লিখিতে হইলে, তাহারা আমাকেই অনুরোধ করিত। আমি তাহাদের কথা লিপিতে হুবহু লিখিতে পারিতাম বলিয়া বাসাতে আমার বেশ সুনাম হইয়াছিল, সকলেই তাহারা আমায় আদর-যত্ন করিত। এই চিঠি-লেখার দায়ে অজ্ঞানে আমায় কত যে কুকার্য্যে সহায়তা করিতে হইয়াছে তাহা ভাবিয়া ভবিষ্যতে মর্ম্মাহত হইয়াছি এবং যাহাদের 'মাসী',

'পিসী' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম, স্নেহের দাবী করিতাম, তাহাদের দুশ্চরিত্রতার পরিচয় পাইয়া সমাজের মধ্যে কি মহাপাপ চলিয়াছে তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। স্বামী-পুত্রের অতর্কিতে তাহাদের গোপন প্রণয়ের অপবিত্র প্রবাহ যে সব চিঠি-পত্রের ভিতর দিয়া বহিত, তাহার আশ্রয়ক্ষেত্র আমাকেই তাহারা করিয়া লইয়াছিল। তাহারা যাহা বলিত, লিখিয়া দিতাম; আবার তাহারা যে সব চিঠি পাইত, আমায় দিয়া পড়াইয়া লইত। বালক হইলেও, মনোবৃত্তি পুষ্ট হইয়া উঠার সঙ্গে-সঙ্গে এই সকল ভাব ও ভাষার বিষয় আমায় বেশ ভাবাইত, বিচলিত করিত।

আরও বিভ্রাট ছিল—বাড়ীর বাহিরে যে দিকে চক্ষু পড়িত, রিরংসা-বৃত্তির কদাকার চিত্র মানসপটে তো আঁকিয়া উঠিতই; তাহা ব্যতীত, জানিনা কেন, কয়েকজন বর্ষীয়সী গণিকার অকারণ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে ইহারা অবস্থান করিত। "খোকা, শোন" "খোকা, ছবি নেবে?" "ফুলের মালা-তোড়া নাও না"—এইরূপ অনুরোধ প্রায়ই শুনিতাম। বাল্যজীবনে যে সংস্কার অজ্ঞাতসারে হাড়ে হাড়ে গজাইয়া উঠিতেছিল, কৈশোর-বিকাশে তাহা আমায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। স্নেহের পরিবর্ত্তে অনেকের দুষ্ট চক্ষুঃ আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিত। রক্ষা ছিল—প্রাতঃকৃত্য করিয়াই আমায় নিত্য দেবতার পূজায় বসিতে হইত: সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে "দেবি সুরেশ্বরি" স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া পবিত্র গঙ্গাপ্রবাহে অবগাহিত হইতাম। "প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্" ইত্যাদি শিবস্তোত্র সকাল-সন্ধ্যায় চিত্ত নিষ্কলুষ করিয়া দিত। এত অল্প বয়সে জগতের এত কুৎসিত বিষয় লইয়া যদি কেহ বিপন্ন হইয়া থাকেন, তবেই তিনি আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবেন; বাল্যের দুরপনেয় সংস্কার ভবিষ্যৎ জীবনে অঙ্কুরমান্ হইয়া জীবন বিষময় করিয়া দেয়। এদিকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ মূর্ত্ত-রূপে যেমন আমায় আশ্রয় দিয়াছিল, অন্যদিকে প্রাকৃত জগতের আকর্ষণ তেমনি আমার মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিষম দ্বন্দ্বময় অবস্থা আমার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

ছয় বৎসর হইতে উনষোড়শ বয়স-কাল এই আব্‌হাওয়ায় থাকিয়া, আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, লোক-চরিত্রের যে আভাস পাইয়াছি, তাহা যেমন বিচিত্র, তদ্রূপ বীভৎস; কাজেই বয়সের তুলনায় ভিতরটা একটু

অধিক পাকিয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ, কলিকাতায় 'কারাণ্টাইন বিল' (Quarantine Bill) 'পাস' হওয়ার সময়ে সহর শূন্য হওয়ার উপক্রম হয়। এই সময়ে আমাদের কলিকাতা হইতে বাস উঠাইতে হয়। শিবের মূর্ত্তি গলায় ঝুলাইয়া চন্দননগরে যখন আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে জীবনের সঙ্কোচ অনেকখানি ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম— বাংলার সমাজে চরিত্রহীন হওয়ার সুযোগ অবাধ, প্রতি পদে পদস্খলন হওয়ার আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, এত অল্প বয়সে এইরূপ বিচারের বিবেক আবাল্য ভাগবত সাধনার প্রভাবেই সম্ভবপর হইয়াছিল। হিন্দুর রীতি-নীতি পালনের মধ্যে চরিত্রগঠনের যে দুর্জ্জয় বীর্য্য আছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া আমরা ছেলেদের জীবন যে ভাবে গড়িয়া তুলিতেছি, তাহাতে অধ্যাত্মশক্তির স্ফুরণ হয় না। জীবনের প্রাকৃত সংস্কার অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া যখন বিষধর সর্পের ন্যায় সগর্জ্জনে চক্র উঠায়, তখন তরুণের রক্ষাকবচ এই অধ্যাত্ম-বল ভিন্ন আর কিছু যে কার্য্যকরী নহে, তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাই মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি।

এই অবস্থায়, আত্মরক্ষার দায়েই, একদিন মাতাঠাকুরাণীকে নির্লজ্জের মত ধরিয়া বসিলাম—'আমার বিবাহ দিতে হইবে।' অন্তর্নিহিত আন্তরিক প্রেরণার প্রভাবেই আমার এই জিদ্ প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবাসীদের মহলে বিদ্রূপ-পরিহাসের সীমা রহিল না; আমি তখন নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছি। কলিকাতায় নিমতলা ষ্ট্রীটে ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন ছিল, পরে তাহা ডাফ কলেজে পরিবর্ত্তিত হয়। অধুনা উহা স্কটিশ চার্চ্চের অন্তর্গত হইয়া অস্বতন্ত্র হইয়াছে। সে যুগের বিদ্যালয়গুলি চরিত্র-রক্ষার ক্ষেত্র ছিল না। আমি এই বিদ্যালয়ে পড়িতাম। নিষ্কলুষ চরিত্র লইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হওয়া একপ্রকার দুঃসাধ্যই ছিল; কেবল ভগবানের অনুগ্রহেই অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া আমি অক্ষত শরীরেই বাহির হইয়াছি। বিদ্যালয়ের সহতীর্থ যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট আমার জীবন একটা কৌতূহলের বিষয় ছিল। এই যে সৌভাগ্যের গর্ব্ব, যে গর্ব্ব সহাধ্যায়ীদের কাছে এবং আমার সহচরবর্গের নিকট একদিনের জন্যও মলিন হয় নাই, ইহার জন্য ভূয়ঃ-ভূয়ঃ আমার স্বপ্নদৃষ্ট দেবতাকেই চিরযুগ ধন্যবাদ দিয়া যাই। আর ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ার অব্যর্থ সঙ্কেত ধর্ম্ম-

জীবনের উপর ভিত্তি করিয়াই যে সিদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় আত্মজীবন পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই বিসর্জ্জন দিয়াছি।

অল্প বয়সে বিবাহের প্রবৃত্তি এই সকল বাহিরের ঘটনা আশ্রয় করিয়া জাগ্রৎ হইলেও, ইহার পশ্চাতে আরও সূক্ষ্ম কারণ নিহিত ছিল, তাহা সেদিন বুঝি নাই। আজ তাহা উপলব্ধি করিতেছি। জীবনের অসমাপ্ত কর্ম্ম সম্মুখে রাখিয়া আজ নিঃসঙ্গ হইয়া চলিলাম। কত দীর্ঘদিন আমায় এই পৃথিবীর বুকে নিঃসঙ্গ হইয়া চলিতে হইবে, তাহা কে জানে? আমি হিন্দু, আত্মার অমরত্বে আমার বিশ্বাস প্রত্যক্ষ, অখণ্ড জীবনের আস্বাদে অমর আমি—আমার পুনঃ অভ্যুদয়ে এই দীর্ঘ বিরহের শেষ দিনে আবার এমনই আকুল হইয়া যে তাঁহার অন্বেষণ-স্পৃহা জাগিয়া উঠিবে, তাহা তো অস্বাভাবিক নহে। যুগ-যুগ ধরিয়া চিরসঙ্গিনি আমার! এমনই লুকোচুরির মাঝে বিদ্যুল্লতার মত তোমায় পাইয়া হারাইয়া ফেলি, আবার বার-বার ধরা দিয়া আমার স্বরূপ ফুটাইয়া তোল। তোমার লীলাময়ী মূর্ত্তির অন্বেষণ-যুগে আমায় যাহা পাগল করিয়া তুলে, তাহা তোমার সহিত আমার সত্য সম্বন্ধেরই পরিচয়। এ-যুগে তোমায় কেমন করিয়া পাইলাম, সেই রহস্যের কথাই অতঃপর বলিব।

এই অল্প বয়সে একটু অধিক পাকিয়া উঠার আর একটি কারণ ছিল। ভগবান্ যাহা কিছু করেন, তাহার মধ্যে ভাল-মন্দ দুয়েরই মিশ্রণ থাকে। আমার জীবনে ভালকে বাছাই করিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, মন্দও যাহা কিছু তাহাতে হইয়াছিল, তাহা ঈশ্বরের মহিমায় রূপান্তরিত হইয়া আমার জীবনকে অধিকতর ঐশ্বর্য্যময় করিয়াছে।

কলিকাতাও তখন এমন ভাবে গড়িয়া উঠে নাই। চন্দননগরেরও গ্রাম-ভাব আজিকার মত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। কোঁচড়ে মুড়ি লইয়া, আমরা সেদিনও গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় খড়ি বুলাইয়া বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছি। সঙ্গে-সঙ্গে তালপাতায় কঞ্চির কলমে, কয়লা-ঘোটা কালিতে লিখিতে শিখিয়াছি। তারপর যথারীতি সিধা সাজাইয়া, গুরুমহাশয়ের চরণে ভক্তি-নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া কলাপাতায় দুর্গা-নাম ফাঁদিয়াছি। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। কলাবাগানের পাশে কদমতলার শিক্ষানিকেতন হইতে একেবারে কলিকাতার জনপদে রাজপ্রাসাদ সদৃশ ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউশনে যখন ভর্ত্তি হইলাম, তখন মাথা ঘুরিয়া পড়িল।

গুরুমহাশয়ের সহিত এখানকার শিক্ষকের রূপগত ও চরিত্রগত ভেদ কল্পনাতীত ছিল। ভোলা-মহাশয়ের এক-একটা হাঁকুনিতে পেটের পিলে চম্‌কাইয়া উঠিত। নাড়ুগোপাল হওয়ার ভয়ে প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া থাকিত। পাঠশালা কামাই করিলে কাঠাবাড়ীর শাস্তি মনে করিয়া সহজে পাঠশালার দিকে আর মুখ ফিরাইতে ইচ্ছা হইত না। হঠাৎ সর্দ্দার পোড়োর দল চ্যাংদোলা করিয়া ভোলা-মহাশয়ের সম্মুখে হাজির করিলে, অন্তর-পুরুষ আঁৎকাইয়া উঠিত। ইহা ব্যতীত, অনাবৃত অঙ্গে শতগ্রন্থি একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করিয়া পাঠশালায় গিয়া বসিতাম। শীতকালে বকপক্ষী, ফুল-পাতার ছাপ দেওয়া দোলাই ব্যবহার করিতাম। গুরুমহাশয় নগ্নপদে থাকিতেন। তাঁহার অনাবৃত অঙ্গ ভয়ের পাহাড় বলিয়া মনে হইত। গ্রীষ্মকালে তিনি কাঁধে গামছা, আর শীতে কাণ-ঢাকা টুপি ও সাদা চাদর ব্যবহার করিতেন —ইহা ভিন্ন জীবনধারণের অন্য প্রয়োজন মনে উদিত হইত না। ক্ষুধায় অন্ন, শীতে অঙ্গবস্ত্রই যথেষ্ট ছিল। কলিকাতায় শিক্ষকদের বেশ দেখিয়া, সেই অল্প বয়সেই আমার মাথায় টেরি ফুটিয়া উঠিল। পায়ে বার্নিশ-করা জুতা, পরিধানে কোঁচান কাপড়, কামিজ ও একখানি মিহি চাদর অঙ্গে জড়াইয়া যেদিন বেঞ্চিতে আসিয়া বসিতাম, সেদিন আত্মবৈশিষ্ট্য একটু বিশেষ করিয়াই অনুভূত হইত। কলিকাতার বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথমেই বিলাস-শিক্ষার দিকেই ঝোঁক পড়ে, এবং ইহা অনিবার্য্য।

মনটা অসময়ে পরিণত যৌবনের রঙে পাক ধরার কারণ বলিতে গিয়া, অনেক কথাই বলিতে হইল। গুরুমহাশয়কে "মশাই" বলিয়া অভিহিত করিতে হইত, এখানে আসিয়া শিখিলাম "স্যার"। "স্যার" পরীক্ষা করিলেন, শ্লেটে বড়-বড় অক্ষরে 'সেবকশ্রী' লিখিয়া ফেলিলাম। তিনি আমায় "কথামালার" বেঞ্চে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। পুস্তক কিনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। ছাপার অক্ষরে পুস্তকের সাক্ষাৎকার ইহার পূর্ব্বে পাই নাই। তালপাতার দাগা দেখিয়া 'আঙ্ক', 'আস্ক'র পরীক্ষা দিয়া 'পণকে', 'চৌকে', 'দশুকে' পর্য্যন্ত শেষ করিয়াছি; কলাপাতার পর রাঙা বালির কাগজ ভাঁজ করিয়া, কঞ্চির কলমে বড়-বড় অক্ষরে 'সেবকশ্রী' লিখিয়াছি। কিন্তু পুস্তকে কোন্ জাতীয় বর্ণমালা, তাহা আমি কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলাম না। সে আনাগোনা 'ঘ'য়ের সন্ধান মিলিল না, কাণ-মোচ্‌ড়ান 'ফ' বা

হিলিবিলি 'ল'য়ের রূপ আমায় ফাঁকি দিয়া লুকাচুরি খেলিল; পুস্তক খুলিতেই অক্ষরমালার উজ্জ্বল তরঙ্গ আমার চক্ষে ধাঁধার সৃষ্টি করিল।

প্রায় বারজন ছাত্রের পর আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কাজেই প্রথম হইতে এগার জনের পড়া মন দিয়া শুনিলাম। আমার পাঠ দিবার পালা আসিলে, শুনিয়া যতটা মাথায় ছিল তাহা হড়্-হড়্ করিয়া বলিয়া গেলাম; তারপর একেবারেই চুপ। "স্যার" ডাকিয়া বলিলেন, "প্রত্যেক লাইনে আঙ্গুল দিয়া পড়।" আমার চক্ষুঃ স্থির হইল। তত্রাপি ভরসা উপর হইতে সর্-সর্ করিয়া আঙ্গুল চালাইয়া উচ্চারণ করিলাম, "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।" 'স্যার' হাতে খড়ি দিয়া বলিলেন, "বোর্ডে লেখ"। কেবল মাত্র 'এ' অক্ষর লিখিতেই বোর্ডের এক চতুর্থাংশ ভরিয়া গেল। তবুও সেই 'এ' অক্ষরটি পুস্তকের পাতায় খুঁজিয়া পাইলাম না; অর্থাৎ কলাপাতার লেখা বৃহৎ অক্ষরগুলি যন্ত্রের চাপে যে এত ক্ষুদ্র আকার লইয়াছে, এই সহজ বুদ্ধিটুকু ঘটে আসিতে আমায় বেগ পাইতে হইয়াছিল। 'স্যার' তো দেখিয়া শুনিয়া আমায় প্রথম ভাগের বেঞ্চিতে নামাইয়া দিলেন। আমি সমস্ত ক্ষণ অপমান ও অভিমানে কাঁদিয়া সারা হইলাম।

চিরজীবন সুহৃদের সন্ধান পাইয়াছি। অকৃত্রিম সখ্যের বিমল আস্বাদ সেই শিশুজীবন হইতে সমানভাবেই মিলিয়াছে। সেই শিশুজীবনেই একজন ছাত্র আমার দুরবস্থা দেখিয়া আমার সহিত বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া বড় অক্ষরটা ছোট হইয়া আমার চক্ষুকে অনর্থক কিরূপে ঠকাইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিল। আমার নূতন চক্ষুঃ ফুটিয়া গেল। বর্ণপরিচয়ের জ্ঞান বৃথা হইল না, আমি তখন সরলভাবে পড়িতে সমর্থ হইলাম। তার পরদিন নূতন করিয়া পরীক্ষা দিলাম। বলা বাহুল্য, 'কথামালার শ্রেণী' হইতে আর আমায় নামিতে হয় নাই।

এই ঘটনায় বাংলা পড়ার দিকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এমনই ঝোঁক হইল যে, পথে হ্যাণ্ডবিল পাইলে তাহা আমার পড়ার বিষয় হইত; বাংলা অক্ষর দেখিলেই স্বভাবতঃ চক্ষুঃ সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িত। 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চরিতাবলী' শেষ করিয়া বাংলা পড়ার ক্ষুধা যেন অতৃপ্ত থাকিয়া যাইত। আমার অবস্থা দেখিয়া, একজন শুভানুধ্যায়ী ভদ্রলোক আমার নিকট হইতে চারি টাকা লইয়া "চৈতন্য লাইব্রেরী"তে আমায় সভ্য-

শ্রেণীভুক্ত করিয়া দিলেন। তখন আমার বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু আমি 'অ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ক্ষ' পর্য্যন্ত যত পাঠ্য পুস্তক ছিল, দুই-তিন বছরেই শেষ করিয়া ফেলিলাম। 'অ'-এ 'অবলাবালা', 'ঋ'-এ 'ঋগ্বেদ', 'চ'-এ 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কিছুই বাদ পড়ে নাই ; বুঝি আর নাই বুঝি, আগাগোড়া পড়িয়া যাওয়ার পাগলামি আমায় পাইয়া বসিয়াছিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও পড়িয়াছি, আবার 'উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা'ও বাদ রাখি নাই ; বীরেশ্বরবাবুর "মানবতত্ত্বের" ন্যায় গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিতে না পারিলেও, বাংলায় তখন এমন গ্রন্থকার নাই, যাঁহার গ্রন্থ আমার চক্ষের সম্মুখে দেখা দিয়া যায় নাই। উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্ম্মগ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্র—"চৈতন্য লাইব্রেরী" উজাড় করিয়া ফেলিলাম।—এই অল্প বয়সে সর্ব্ববিষয়ে দু'কথা বলার জ্ঞান বেশ জন্মিয়া গেল। আমার জ্যাঠামো অনেকের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হইত ; কিন্তু আমি নিরুপায় হইয়াছিলাম। প্রত্যেক গ্রন্থের দু' একটা কথা মনে থাকিলেও, আমার পাণ্ডিত্য সর্ব্বক্ষেত্রেই ফোড়ন দিতে ছাড়িত না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থে সুপ্রবেশ করিতে পারি নাই ; কিন্তু উপন্যাস-জগতে বেশ ঠাঁই হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের 'সংসার', 'সমাজ', 'মাধবীকঙ্কন' এক্ষণে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় ঢাকা পড়িয়াছে ; সেদিন কিন্তু বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সঙ্গে ইহাদের স্থান দিতে বাঙালী কুণ্ঠা করিত না। সে যাহা হউক, মনটা অস্বাভাবিক-রূপে পুষ্ট হওয়ার কারণটুকু বলিয়া, বিবাহ-রহস্যের কথাই বলি।

মা আমার আনন্দময়া ছিলেন। সংসারের দিকে তেমন তাঁর ঝোঁক ছিল না, জীবন তিনি উৎসবময় করিয়া রাখিতেন। সমাজ-ধর্ম্ম লইয়া বার মাসে তের পর্ব্ব ছিল। তিনি ছেলের আবদার উপেক্ষা করিলেন না, পিতাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিলেন। আমার বিবাহের সম্বন্ধ চলিতে লাগিল।

দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়—কোথাও পাকা কথা স্থির হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আমার অল্প বয়স দেখিয়া কন্যাপক্ষ পাত্রীর উপযুক্ত বলিয়া আমলে আনে না। আমার ভিতরটা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অবশেষে কলিকাতায় বাদুড়বাগান হইতে এক সম্বন্ধ আসিল। তাহারা পাত্র দেখিয়া পছন্দ করিল ; কিন্তু আমার পিতা বা ভ্রাতা পাত্রী মনের মত নয় বলিয়া

সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। আমি দেখিলাম—বছর কাবার হইয়া যায়। বিবাহের আকুলতাই তখন আমার উপভোগ্য, ভিতরের ঔপন্যাসিক ভাব যেন একটা অভিব্যক্তির ক্ষেত্র পাইলেই সার্থক হয়। আমি মাকে ধরিয়া বসিলাম—"পাত্রী অপছন্দ করার কারণ কি আছে? ফরসা কালো লইয়া কথা নাই, আমার বউ চাই।"

আজ হাসিয়া মরি, বুড়া হইলে পাগ্‌লা বলিয়া কপালে ছাপ পড়িত—বাল্যের এই প্রগল্‌ভতার কথা মনে করিয়া আজিও হাসিয়া আকুল হই! সে দিন কিন্তু আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে নাই। তখন তো জানিতাম না, কোথা হইতে আমার হৃদয়ে এই আকর্ষণের বাঁশী ধ্বনি তুলিয়াছে!

বাসায় এক কায়স্থ-কন্যা আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আমার মাকে "মা" বলিতেন। তাঁর অপরিসীম স্নেহানুরাগের কথা আজও স্মরণপথে উদিত হইলে, চক্ষে অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠে। ভবিষ্যতে কর্ম্মসূত্র স্বতন্ত্র হইলে, তিনি দূরে গিয়া পড়িলেন, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় আমার কথা স্মরণ করিয়া তিনি চিরতরে বিদায় লইয়াছেন। তিনি বলিলেন "তুমি এমন পাগল কেন, তোমার পাশে কালো মেয়ে মানাবে কেন?"

আমি বলিলাম "তোমাদের পছন্দ তো সবখানি নয়, আমার যদি কালো বউ হয়, তোমাদের তাতে কথা কি আছে!"

তিনি মনে করিলেন, চক্ষে দেখিলে হয়তো আমি এই অসঙ্গত আবদার হইতে বিরত হইব। তিনি সেই আয়োজন করিলেন।

আমি তাঁর সঙ্গে কন্যার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। কন্যাপক্ষীয় মহিলাবৃন্দের কৌতুক-দৃষ্টি আমার চক্ষু এড়াইল না। আমি একটী ঘরে গিয়া বসিলাম। উপন্যাসের যত জ্ঞান সব মাথায় আসিয়া জড় হইতেছিল। সে কেমন করিয়া আসিবে, তাহার পরিচ্ছদ কি প্রকারের হইবে, তাহার অলকাশ্রেণী কাল ভ্রমরের মত মুখপদ্ম ঘেরিয়া থাকিবে কি না—কত কি!

আমি একাই সে ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। সহসা পদালঙ্কারের গুঞ্জন শ্রবণগোচর হইল। একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া কৃশ-কায়া, উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণা, প্রশান্তনয়না এক কন্যা আমার সম্মুখে নতমুখী হইয়া দাঁড়াইল। আমি ভিতরে যত কিছু ভাঁজিয়াছিলাম, সব যেন গোলমাল

হইয়া গেল। বুকের মধ্যে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের শব্দটা যেন ঝঁাকাইয়া উঠিল। স্নায়ুগুলি বিশেষ প্রকৃতিস্থ রহিল না। পৌষ মাসের শীতও হয়তো বাদে লাগিয়াছিল। তবুও কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার নাম কি?"

সে মিহি সুরে বলিল, "মেনকাসুন্দরী দেবী।" বেশ কণ্ঠস্বর। একবার আগাগোড়া দেখিয়া লইলাম—গাত্র-বর্ণ গৌরকান্তি নহে। তাহা না হইলই বা, হৃদয়ের তো ইতর-বিশেষ হইবে না! আর কোন কথা কহিবার ছিল না। সে সহসা বাহির হইয়া একটা ডিবা করিয়া পান লইয়া আসিল, আমার হাতে তুলিয়া দিল; আমার মন মাতাল হইয়া তাহাকেই বলিয়া বসিল, "যাও, তোমাকেই আমি বিবাহ করিব।" বোধ হয়, সে একটু হাসিয়াছিল। এগার বছরের বালিকা—প্রস্থানের সময়ে একটু কৌতুক-দৃষ্টি করিতেও ছাড়ে নাই। আমি সানন্দচিত্তে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গিনী বলিলেন "পছন্দ হইল?" আমি বলিলাম "হঁা।" তিনি অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমি তখন বিবাহিত জীবনের স্বপ্নেই বিভোর ছিলাম।

ছেলের পছন্দ হইয়াছে—আর কি কথা! বিবাহের পাকা কথাবার্ত্তা চলিল। মাঘ মাসে আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল। ফাল্গুন মাসে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। এতদিন পড়াশুনায় বেশ মন ছিল। কিন্তু বিবাহের আনন্দে মন যেরূপ ওলট-পালট খাইতেছিল, তাহাতে বিদ্যালয়ের পড়া মুখস্থ করা সহজ নহে; বরং উপন্যাস-পাঠের ধুম পড়িয়া গেল। প্রতিবেশি-মহলে যে সব ঠান্‌দি, বৌদি স্নেহ করিতেন, তাঁহাদের কাছেই অধিক ক্ষণ থাকিতে ভাল লাগিত। কতদিনে নির্দ্দিষ্ট তারিখ উপস্থিত হইবে, তাহার জন্য দিনের পর দিন গণিয়া আমি এক প্রকার ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

মানুষের ভুল বিধাতা না ভাঙ্গিলে, মানুষ প্রতি পদে আত্মঘাতী হইত। সেদিন বজ্রের অপেক্ষা সংবাদ নিষ্ঠুর মনে হইয়াছিল। কন্যার পিতামহীর মৃত্যু হওয়ায়, এক বৎসর বিবাহ স্থগিত থাকিবে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের বয়স অধিক নহে; সুতরাং কন্যাপক্ষের এই অনুরোধ অসঙ্গত হয় নাই। আমার অভিভাবকমণ্ডলীও তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তাঁহারা বুঝিবেন কি প্রকারে—আমায় যে সকল সংস্কার শীঘ্র-শীঘ্র শেষ করিতে হইবে, ভবিতব্যের হস্তে ভাগ্যসূত্র যে অতি দ্রুত গুটাইয়া উঠিতেছে! আমি একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায়

হইলাম। ফাল্গুনের পর চৈত্র মাস, অতএব বৈশাখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে; কিন্তু বৈশাখে যদি বিবাহ না হয়, আমি গৃহত্যাগী হইব!

বাল্যে সকল বিষয়েই এইরূপ জিদ্ ছিল। আমার মাতাঠাকুরাণী আমায় লইয়া অন্যান্য বিষয়ে বড়ই বিরক্ত হইতেন, কিন্তু পুত্রবধূর মুখদর্শনের জন্য তাঁরও তাড়া ছিল। তিনি আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "ঐ বিবাহের চুক্তি ভাঙ্গিয়া আবার নূতন পাত্রীর অন্বেষণ করিব।"

বিধাতার একই খেলা তখন অন্য পক্ষেও চলিতেছিল। আমার ভাবী পত্নীর সহিত অন্য এক যুবকের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল। তাহারও ফাল্গুন মাসে বিবাহের দিন স্থির হয়; কিন্তু আমার মধ্যম শ্যালক, আজ যিনি পরলোকে, বিদ্যালয় হইতে আসিবার সময়ে তাঁহার ভাবী ভগ্নীপতিকে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়মের সুরে কুৎসিত সঙ্গীত গাহিতে শুনিয়া মনে এমনই বিরক্ত হন যে, বাড়ী আসিয়াই ঘোষণা করিলেন, "আমার ভগ্নীর যদি উহার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।" তাঁহার কথা কেহ উপেক্ষা করিল না, কাজেই ঐ পক্ষেও বিবাহের চুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল।

চন্দননগরের প্রান্তে ভদ্রেশ্বর নামক স্থানে যে অনাথলিঙ্গ শিবের প্রতিষ্ঠা আছে, বৈশাখ মাসে তাঁহার মাথায় জল ঢালার জন্য তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। আমার ভাবী পত্নীর আত্মীয়েরা এই পথে যাইতে-যাইতে আমাদের বাড়ী আসিয়া পাত্রের সন্ধান করিল। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম। নূতন পাত্রীর সন্ধান পাওয়া মাত্র, আমার ধাত্রী-স্বরূপা পিতার এক পালিতা কন্যা—ভিন্ন জাতি-গোত্র হইলেও, যাঁহাকে আমরা পরমাত্মীয়ার ন্যায় সম্মান করিতাম—আমার অগ্রজের সঙ্গে কন্যা-দর্শনে গমন করেন এবং পাত্রী দেখিয়া আনন্দিত হন। তিনি ফিরিয়া পূর্ব্ব-পাত্রীর অপেক্ষা এই কন্যার শ্রেষ্ঠত্ব শতগুণ অধিক বলিয়া প্রশংসা করিতে থাকেন। আমার মনও অভাবনীয় পুলকে নৃত্য করিয়া উঠে। কথাবার্ত্তা স্থির হইতে মাসের পর মাস অতিবাহিত হইলেও, আমার ভিতর আর চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। বিবাহের দিন ২২শে অগ্রহায়ণ স্থির হয় এবং আমার বেশ মনে পড়ে, ঐ দিন আমি এক প্রকার জ্ঞানহারা হইয়াছিলাম। কোথা দিয়া কখন যে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইয়াছি, তাহার হুঁস ছিল না; মাতালের মত অবস্থা হইয়াছিল। মন্ত্র

উচ্চারণ করিয়াছি, অগ্নির সম্মুখে আহুতি দিয়া কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছি—কিছুই আমার মনে নাই। মনে পড়ে আবরণী-মধ্যে যখন উজ্জ্বল দু'টি চক্ষুঃ কত দিনের পরিচিতের ন্যায় আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; আর আমি হৃদয়ের ক্ষুধা ঢালিয়া, সে অমৃত-ধারায় স্নিগ্ধ হইয়া, বিস্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছি—এই মহা-মুহূর্ত্তটির বিবাহের সংস্কার আমার জীবনে আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবেই জাগিয়া আছে। অপার্থিব দৃষ্টি-বিনিময়ের রেখা চিরোজ্জ্বল রহিয়া গেল—আজও আমার চারিদিকে সেই সজাগ দৃষ্টিরই সন্ধান পাই!

বাসর-ঘরে সারা রাত্রি কাটিয়া গেল, নব-বধূর লজ্জানম্র বদন আর দেখার অবসর মিলে নাই। নেশাখোরের মতই সে রাত্রি কাটিয়াছে। আখ চিবাইতে গিয়া ভেরাণ্ডার ডাঁটা চিবাইয়াছি, রমণী-কণ্ঠে উচ্চহাস্য শুনিয়া হুঁস হইয়াছে; ভাতের গ্রাস তুলিতে হাত বাড়াইয়া সজ্জিত অন্নচূড়ের ভিতর কাঁসার বাটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সরাইতে গিয়া অন্নপাত্রে ফেনের প্লাবন বহিয়াছে। আমি সে রাত্রি হইয়াছিলাম হাস্যরসের কেন্দ্র; কিন্তু সেদিকে তো আদৌ দৃষ্টি ছিল না—যেন চাহিতেছিলাম যাহা তাহা পাইয়া, হৃদয় শুদ্ধ আনন্দবিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহের পর একটী ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিয়াই বিবাহ-পর্ব্ব সমাপ্ত করিব।

পরদিন প্রভাতে বিবাহের ধূম যখন ম্লান হইয়া পড়িতেছে, রাত্রির বাতি বেল-লণ্ঠনের গর্ভে ধুঁকিয়া-ধুঁকিয়া নিভিবার উপক্রম করিতেছে, পর্য্যুসিত খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে সারমেয়কুল অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন মধুর সানাই বাজিয়া উঠিল। নববধূ আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া জলযোগের পর, উঠানে ঢুলীদের বাহাদুরী দেখাইবার ডাক পড়িল। তাহারা মাথায় হরিদ্রা-রঞ্জিত উষ্ণীষ বাঁধিয়া বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা নিমন্ত্রিতমণ্ডলীর কৌতূহল জাগাইয়া তুলিতেছিল। অন্তঃপুরমহিলারাও গবাক্ষে দরজার ফাঁকে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া হাস্যমুখর হইতেছিল। দিদি-শ্বাশুড়ীর সঙ্কেতে যে পথে চলিলাম, তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত দরজায় অনাবৃত মস্তকে উঠানের দিকে কৌতূহল-দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বালিকা-বধূ তন্ময়া হইয়াছিলেন।

আমি তাঁহার কৈশোর-মূর্ত্তির অনিন্দনীয় সুষমা এই সর্বপ্রথম দর্শন করিলাম। সে মূর্ত্তিটী চিরজীবন হৃদয়ে আঁকা থাকিবে।

দিদিমা ইচ্ছা করিয়াই যে আমায় এই পথে আনিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। আমাদের সাড়া পাইয়া বধূ সঙ্কুচিত হইয়া একবার ফিরিলেন। দেখিলাম—দক্ষিণ চক্ষের নিম্নে ও উর্দ্ধে মসীবর্ণ, নির্ম্মল বদন-চন্দ্রে ইহা কলঙ্করেখার ন্যায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে—এই জরুর চিহ্ন তাঁর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিরই পরিচয় দিতেছিল। চারি চক্ষে মিলন হওয়া মাত্র, বালিকার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁর ওষ্ঠপুটে উল্লাসের হাস্যচ্ছটা ভুলিবার নয়; কিন্তু লজ্জার আবেগে তিনি দ্রুত অপসৃতা হইতে গিয়া হোঁচট্ খাইয়া ভূপতিতা হইলেন। নিকটে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র, সন্ত্রস্ত হরিণীবৎ চিরপরিচিতার ন্যায় আর একবার চাহিয়া অদৃশ্যা হইলেন। বিবাহের এই স্মৃতিটুক ফুটন্ত চিত্রের ন্যায় আজও আমার চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টা পাত্রী আজ বিধবা, আমার পত্নীর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাত্রও আর ইহলোকে নাই—ঘটনার এই সৌসাদৃশ্যে উভয়ের ভাগ্য কিরূপ একই সূত্রে যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতেই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সে বয়সে তত ভাব, তত রঙ্গ আজ অভিনয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তখন তাহাই হইয়াছিল আমার জীবন। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আমার অকাল যৌবন নিমিষে শেষ হইতেই যেন উপস্থিত হইয়াছিল। ঋতুপুষ্পের মত উভয়ের জীবন শোভায়-সৌরভে দুইদিনের জন্যই আমোদিত হইয়াছিল। ঔপন্যাসিক প্রভাবের সঙ্গে কলিকাতায় থিয়েটার-দর্শনের ফলে একটু নাটুকে ভাবও চরিত্রগত হইয়াছিল। এই সকল কথা এমন করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য—অজ্ঞাত দৈবশক্তির করুণা যদি জীবনে এমন ভাবে মূর্ত্ত না হইত, আজ সমাজের কোন্ স্তরে গিয়া আমায় স্থান লইতে হইত, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

এমন কদর্য্য স্থান নাই, যেখানে গিয়া দাঁড়াইতে হয় নাই; এমন কুৎসিত চরিত্রের লোক নাই, যাহার সহিত আমায় মিশিতে না হইয়াছে। কিন্তু সত্যই আমার চরিত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; জগতে আমার এমন একটি সঙ্গী, একটি বন্ধু খুঁজিয়া বাহির হইবে না, যে আমার পদস্খলনের

একটি পঙক্তি জীবনেতিহাসে সংযোজিত করিতে পারে। বাল্য ও যৌবনের এই গর্ব্ব আত্মপ্রসাদের জন্য ঘোষণা করিতেছি না। যে কারণে আমি একদল তরুণের প্রথম যৌবন আমার বক্ষপঞ্জরে স্থান দিয়া বিশুদ্ধ অগ্নিমন্ত্র করিতে পারিয়াছি, সে কারণ আমার এই জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত হইয়াছিল। আমি জানি, হিতৈষী সমাজপুরুষগণের এবং আত্মীয়, পিতামাতা ও ভক্তিভাজন আচার্য্যগণের স্নেহ-কল্যাণ-দৃষ্টি যতই সজাগ থাক, প্রকৃতির ছলনা হইতে মুক্তির উপায় ভগবানের নাম ও শরণ ভিন্ন আর কিছু নাই। যেখানে ইহা সহজাত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেখানে অতি বাল্যকাল হইতেই বৈধ উপায়ে ছেলেদের এই ভগবদ্ভক্তি চরিত্রগত করিয়া দিতে হইবে। চরিত্রবলের মূলেই যদি ঘুণ ধরিয়া যায়, তথাকথিত জ্ঞানোপার্জ্জন অসম্ভব হইবে না, অগাধ ধনের অধীশ্বর হওয়া বিচিত্র নহে, দেশে প্রসিদ্ধ পুরুষ হওয়াও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মূলবীর্য্য বিকৃত হইলে সৃষ্টিশক্তি আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না ; দেশে সৎ ও আনন্দের প্রতিধ্বনি তোলার সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ইহার ঘনীভূত মূর্ত্তি গড়া সামর্থ্যে কুলাইবে না। ভবিষ্যতে অসংখ্য সৃষ্টিধর নারীপুরুষ যদি বিশুদ্ধবীর্য্য হইয়া না ওঠে, এ জাতি সত্যই নির্ব্বংশ হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে।

যাহা দেখিতাম, যাহা শুনিতাম, তাহা নিজের জীবনে ফলাইয়া তোলার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম, এবং বোধহয়, অতি ক্ষুদ্র আকারে হইলেও, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই আমার জীবনে মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। থিয়েটার দেখার সঙ্গেই চাদর টাঙ্গাইয়া ইহার অনুকরণবৃত্তিও চরিতার্থ করিয়াছি এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের সংসর্গেও অভিনয় করিতে কুণ্ঠা করি নাই। এইজন্য আমার বিবাহপ্রবৃত্তির মূলেও প্রথম জীবনের পারিপার্শ্বিক রিরংসা-পরিবেষ্টনীর আবহাওয়া চিত্তের সংস্কার-রূপে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমার ভস্মমুষ্টি স্বর্ণসৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমার গুণ নহে—ভগবানের দয়া। কোন মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে, এমন কিছু জানিয়া বা ভাবিয়া বিবাহ করি নাই ; প্রাকৃত ভোগের আকর্ষণ আমায় যথেষ্ট চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ভগবানের দয়া আমার মধ্যে আবাল্য প্রেরণা-রূপে দেখা দিয়াছে ; উহা তীব্র সম্বেগে আমার সবখানিকে অবশ করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করে, ইহার সুফল-কুফল-বিচারের

সুযোগ রাখে না। বিবাহ করার তীব্র স্পৃহা জাগার মুহূর্ত্তটী আমার চির-স্মরণীয় হইয়া আছে। সেদিন যদি এই প্রেরণাকে তাহার উৎসমূলে পুনঃ উৎসর্গ করার নীতি আমায় কেহ শিখাইয়া দিত, যদি আমার এই উত্তম যোগসিদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকিত, তাহা হইলে অসংখ্য ভাগবত-প্রেরণা আজ অধিকতর বিজয়-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিত।

বিবাহের পর বালিকা-বধূর সহিত প্রথম মিলনরাত্রি আমার মনে শান্তি ও আনন্দ সৃষ্টি করে নাই; সারা রাত্রি ধৈর্য্যহীন হইয়াই যাপন করিয়াছি। সে সুরভি কুসুমশয্যায় এই প্রথম রমণীসঙ্গে, আদি-রসের যত প্রসঙ্গ কেবল কল্পনায় ভাসিয়া বেড়াইয়াছে, যত কুৎসিত সম্ভোগরহস্য দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, সেদিন সব যেন প্রেতের ন্যায় আমায় ঘিরিয়া নৃত্য করিয়াছে। কিন্তু এই নিরীহ প্রাণীটি তাহার আভাসমাত্র জানিত না। লজ্জাবতী লতাটির ন্যায় বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া না জানি কত কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে সে আমার কি নূতন আচরণ পাইবে, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এই বালিকা-বধূ একা আমার নিকট নিশি-যাপন করিবেন, ইহার জন্য তিনি একবিন্দু বিচলিতা হন নাই। তিনি স্বচ্ছন্দ-চিত্তেই আমার অভিভাবকদিগের নির্দ্দেশে শয্যায় আসিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্কোচহীন আচরণ এই বয়সে অনেকে ভাল চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, প্রথম দর্শনেই তাঁর হৃদয়ে এমন এক প্রকার আনন্দ ও সুখের তরঙ্গ খেলিয়াছিল, যাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই; পিতামাতা, ভ্রাতা ও সহোদরগণের সংসর্গ ছাড়িয়া এই নূতন মানুষের সঙ্গে নিয়ত থাকিতে হইবে, এই ধারণা সমাজ-জীবন হইতে পাইলেও, ইহা যে কত তৃপ্তির হইবে তাহা ভাবিয়াই তাঁর চিত্ত বিভোর হইয়াছিল। তাই আমায় দেখিলে তাঁহার হৃদয় আশায় ও আনন্দে ভরিয়া উঠিত এবং এই বিবাহ-কাল হইতেই পাছে কখনও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে হয়, এই ভাবনায় তাঁহার চক্ষে বেদনার অশ্রুপাত হইত।

আমি তাঁর মনোভাব তো জানি নাই! প্রথম মিলনরাত্রি একান্ত পরিচয়-হীন যায় দেখিয়া, আমি অর্দ্ধরাত্রির পর একবার সাড়া লইয়াছিলাম। দেখিলাম—তিনিও জাগিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে আমার দিকে ফিরিতে বলিলাম। তিনি নিঃসঙ্কোচে ফিরিলেন। প্রদীপের প্রদীপ্ত শিখায়

তাঁর উজ্জ্বল মুখশ্রী আমায় বিমোহিত করিল। এতদিন যে সকল রমণীর মুখাবলোকন করিয়াছি, তাহা আজ মলিন বলিয়া মনে হইল। চক্ষের ঔজ্জ্বল্যে পৃথিবীর মলিনতা কোথাও আশ্রয় করে নাই; এখনও ভাল-মন্দ চিন্তারেখায় ললাট জটিল হয় নাই—সারল্যের শুভ্রতায় মুখখানি প্রভাতপদ্মের ন্যায় সুকোমল, প্রফুল্ল। আবার চারি চক্ষের মিলন হইল। আমার মধ্যে যে পরিণত-প্রবৃত্তির তরঙ্গহিল্লোল বহিতেছিল, সরলা বালিকার পবিত্র মূর্ত্তি-দর্শনে সব স্থির হইল। প্রদীপের তৈলও বোধহয় নিঃশেষ হইয়াছিল। প্রদীপ নিভিল। সেদিন তাঁহাকে উভয় বাহু দিয়া বক্ষের মধ্যে ধরিয়া যে চুম্বন করিয়াছিলাম, তাহা আমার শত জন্মের প্রজ্জ্বলিত প্রবৃত্তিকুণ্ডে যেন শান্তিবারি সেচন করিল। আমার অন্তর্য্যামী সেদিন কামমুক্তি-সাধনার যেন প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ঐ অনুভূতি পরে জন্মিয়াছে। পরিচয় যত ঘন হইয়া উঠে, ততই দেখি—কামনার লয় হয়। তাই এই পরিণয় ঈশ্বরের বিধানে আমায় মুক্তি দিতেই ঘটিয়াছিল—আজ এ বিশ্বাস ধ্রুব ও অটল হইয়া হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে।

ইহার পর এক বৎসর তাঁহার সহিত আর তেমন দেখা-সাক্ষাৎকার ঘটে নাই। কার্য্যব্যপদেশে তিনি দুই-একবার আমাদের বাড়ীতে আসিলেও, তাঁহার সহিত দূর হইতে দৃষ্টিবিনিময় করা ছাড়া নিবিড়ভাবে আলাপ করার সুযোগ ঘটে নাই। কি জানি কেন, নববধূর আগমনকাল হইতেই সংসারের সকলেই তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেন! শ্বশ্রু-মহাশয়ের তত্ত্ব-তাবাস লইয়া পরিহাসের সুর আর থামিতে চাহে না; ছোট বউয়ের নির্ল্লজ্জতার আলোচনা আর বন্ধ হয় না! আমার কাণও ভারী হইয়া উঠিল।

তখন চুঁচুড়ায় ট্রেণিং একাডেমিতে ভর্ত্তি হইয়াছি। বিবাহের পরই কলিকাতা ছাড়িয়াছি। পল্লী-জীবনের প্রশান্ত ছায়ায় দিন কাটিয়া যায়। কলিকাতায় থাকিতে পড়াশুনায় যেমন মন ছিল, এখানে আসিয়া তাহার খুবই ব্যাঘাত ঘটিল। সেখানে বাহ্যতঃ জীবনকে কোথাও ব্যাপ্ত রাখিতে হইত না; মনের জগতেই ঝড় উঠিত, সে ঝড় মনের জগৎকে নাড়া দিয়াই শুব্ধ হইত। আবার পড়াশুনায় মন দিতাম। কলিকাতায় স্কুল হইতে বাসা, আর বাসা হইতে স্কুল—ইহাই ছিল বাহিরের জগতের সহিত আমার পরিচয় ও সম্পর্ক। কলিকাতার বাসায় বসিয়া গবাক্ষের ফাঁকে দিবসের মধ্যে

একবার সূর্য্যকিরণ স্পর্শ করিতাম; আর আকাশের কোলে-কোলেই এই প্রখর জ্যোতির তরঙ্গ ফুটিত, মিলাইত। গবাক্ষের ফাঁক দিয়াই নক্ষত্ররাজি দৃষ্টিগোচর হইত। চাঁদের জ্যোৎস্না সম্মুখের খোলার চালে লুটাইয়া ফুরাইয়া যাইত; টবের গাছে ফুল ফুটিত, সুবাস বিলাইত, চক্ষের নিমিষে ঝরিয়া মাটির বুকে পড়িত—আবার নূতন শাখা বাহির হইলে কবে ফুলের কুঁড়ি দেখা দিবে, প্রতিদিন এক-ঘেয়ে দৃষ্টি লইয়া মনের অনুশীলন চলিত। এখানে মন-বস্তুটী কোথায় হারাইয়া গেল! সে নিজে আসিয়া পুনঃ দর্শন না দিলে আর বোধ হয় তাহাকে ফিরিয়া পাইতাম না।

পূর্ব্বগগনে রূপার থালার ন্যায় সূর্য্য এমন করিয়া ধীরে-ধীরে নীল আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, ইহা সেই পঞ্চম বর্ষের শিশু বয়সে দেখিয়াছিলাম —তাহা মনে ছিল না। কৈশোরে সৌন্দর্য্য দেখিতেই কতদিন কাটিয়া যায়! বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে প্রকৃতির লীলা-বিলাসের ঐশ্বর্য্য বুঝি বিশ্বসম্রাটকেও ম্লান করে! শীতের দিনে সজিনা ফুলের সৌন্দর্য্য এমন করিয়া কলিকাতায় দেখি নাই! বসন্তের সমাগমে পথে আর ড্রেণের গন্ধে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিতে হয় না; লেবু ফুলের সৌরভে চিত্ত মাতাইয়া তুলে; চতুর্দ্দিকে শ্যাম-শ্রী উপভোগের সময় রাখে না। সব চেয়ে কাল-হরণের আকর্ষণ ছিল—জাহ্নবীতটে অশ্বত্থ-বটের শ্যাম-শোভা! বিস্তৃত-কোমল যেন মরকত-মণিময় শষ্পক্ষেত্রে বসিয়া, নদীর তরঙ্গে যখন জ্যোৎস্নায় হীরক-খণ্ড জ্বলিত, আর হরিৎ-নীল বৃক্ষপত্র অমৃত-লেপনে মসৃণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, আমার আর তখন জীবনের বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ মনে থাকিত না; পড়াশুনার চেয়ে, নদীর ঢেউ যেমন নাচিয়া ছুটে, এই জীবনতরঙ্গও তেমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া বহিত।

সম্মুখে প্রবেশিকা-পরীক্ষার কাল আসিয়া উপস্থিত—আমি কেবল প্রবন্ধই লিখিতাম। কলিকাতার রুদ্ধ জীবন এখানে প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে বিকশিত হইয়া আমায় উন্মাদ করিয়াছিল; পুস্তকের নীরস পাঠ আমার আর আদৌ ভাল লাগিত না। এই উদার মুক্ত জীবনের মাঝে কেবল নববধূর আসঙ্গলিপ্সা আমায় চঞ্চল করিয়া তুলিত। সে চাঞ্চল্য পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিতে দিত না। অতি তরল লঘুজীবন যাপন করিতাম। প্রতিবেশি-মহলেই অধিক সময় অতিবাহিত হইত। এমনই করিয়া বৎসর ঘুরিয়া গেল। নববধূ

এইবার স্থায়ী ভাবে ঘর করিতে আসিলেন। আমার শয়ন-কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। সত্য কথা বলিতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার নিত্য পূজা-উপাসনাও এ সময়ে আর ভাল লাগিত না। পড়ার সময় নষ্ট হয়, এই অজুহাতে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের পূজা-ভার গ্রাম্য পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিয়া যেন একটা দায় হইতে মুক্তিলাভ করিলাম বলিয়া মনে হইয়াছিল।

আমি মাতিলাম—প্রাকৃত সম্ভোগের অনুশীলনে। বালিকা-বধূর যৌবন নিঃশব্দ চরণে অতি শীঘ্র আবির্ভূত হইল। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের বান ডাকিয়াছিল। আমি কালের আবিল আবর্ত্তে তাহা ঘুলাইয়া, তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিলাম। তাঁহার জীবন অনুগত হইয়া আমার ভোগবিলাসের অনলকুণ্ডে অধিকতর ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। পিত্রালয়ে ফেরার কথা হইলে, তিনি মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেন, "তুমি বাবাকে বলিও, তোমার পাঠাইবার ইচ্ছা নাই।" আমি তাহাই বলিতাম। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি হইলে, আমিই একপ্রকার জোর করিয়া তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতাম; বিদায়ের সময়ে চরণে মাথা রাখিয়া তিনি বলিতেন, "ভুলিও না—এক মাসের অধিক যদি থাকিতে হয়, মরিয়া যাইব।" আমিও তাঁহাকে যে প্রথম দুই এক বৎসর পিত্রালয়ে যাইতে হইয়াছিল, এক মাসের অধিক রাখি নাই।

এক মাস পিত্রালয়ে বাস করিয়া তিনি যখন ফিরিতেন, তখন দেখিতাম—তাঁহার শ্রী ফিরিয়াছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে। আর এখানে থাকিলে তিনি ক্রমেই ক্ষীণকায়া হইতেন। সংসারে গঞ্জনা দিয়া তাঁহাকে "বিষ্ণুপঞ্জর" বলিয়া অভিহিত করিত। আমি ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া বুঝিলাম—তাঁহাকে অকারণ দুঃখ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম অনুরাগ অন্যের নিকট বিসদৃশ হইয়াছিল। আমার জননী হইতে সংসারের সকল পরিজনই তাঁহাকে এইজন্যই দেখিতে পারিতেন না। সারা দিবারাত্রির মধ্যে দুই মুঠা অন্ন-ভোজনেরও সুব্যবস্থা হইত না। পিত্রালয়ে আদর-যত্নে পালিতা হইয়া অকস্মাৎ এত অনাদর-অযত্ন তাঁহার শরীর সহিবে কেন! তাঁহার বক্ষের পঞ্জর আমি গণিয়া দেখিতাম, তাঁহার মুখের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সকল দুঃখ অন্তরে চাপিয়া কেবল আমারই সংসর্গে তিনি স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেন। এই অসহ্য দুঃখের মধ্যেও মাসের পর মাস অতিবাহিত করা তিনি জীবনের সুখ বলিয়া মনে করিতেন।

একদিন সংসারের আচরণ আমার অসহ্য মনে হইল। রাত্রে ঘরে গিয়া দেখিলাম—তিনি একখানি অতি মলিন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—দুইখানি বস্ত্রের একখানি বাদলার দিনে শুকায় নাই, আর একখানি রাত্রিবাস করিলে কাল বাহির হওয়া দায় হইবে; তাই ঘরে যেমন-তেমন করিয়া তিনি রাত্রি যাপন করিবেন।

কথা শুনিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল। পরদিন আমার গলা শুনিয়া সকলেই আড়াল করিয়া হাসিয়া আকুল হইল। আমি যে কিরূপ স্ত্রৈণ হইয়া পড়িতেছি, ইহাই ছিল সকলের লক্ষ্যের বিষয় এবং চুঁচুড়ার মেয়ে গুণ-তুক্ জানে বলিয়াই আমায় ভেড়া বানাইয়া মজা দেখিতেছে, এই সকল টিপ্পনী আমার মনকে কিরূপ উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহা আর বলিবার নয়! শেষে মা যখন বলিলেই, "তুই কি রোজগার ক'রছিস্ যে, বউ জোড়া-জোড়া কাপড় পর্‌বে।" তখন আমি স্তব্ধ হইলাম। তখন আমি বিদ্যালয়ে যাই আর আসি; বস্তুতঃ পড়াশুনা কিছুই হয় না। মনের দুঃখে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম; পুস্তকগুলি টানিয়া উঠানে ছড়াইয়া দিলাম। শপথ করিলাম—উপার্জ্জন না করিলে বাড়ী ফিরিব না।

আমার ক্রোধ দেখিয়া আমার স্ত্রী ঘরের মধ্যে ভয়ে আড়ষ্টা হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য ভয় নহে—যেটুকু স্নেহ সংসারে এখনও পান, এই ঘটনার দ্বারা তাহা হইতেও বঞ্চিতা হইবেন। তাঁহার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। ইহার পর তাঁহার সহিত কেহ বড কথা কহে নাই এবং খাওয়ার সময়ে কেহ আর তাঁহাকে ডাকিতও না। উপবাস করিয়াও তাঁহার দিন কাটিয়াছে। বালিকা-বধূর উপর যে সব অত্যাচারের কথা শুনি, আমার নিজের সম্মুখে তাহার অনেকখানি ঘটিতে দেখিয়াছি এবং ইহা যে কিরূপ অশান্তিকর, তাহা মনে করিয়া এখনও আমি বিচলিত হই।

এই সময়ে আমি গুরুতর ম্যালেরিয়া-জ্বরে আক্রান্ত হই। যাহা কিছু হইত, এখন হইতে তাহা 'অপয়া' বৌয়ের জন্যই ঘটে, এইরূপ প্রসঙ্গই কাণে আসিত; আর তিনি এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহতা হইয়া আমায় বলিতেন, "সত্যই কি আমি তোমার অনিষ্টের কারণ! আমার জন্যই কি তোমার এত কষ্ট, এত লাঞ্ছনা!"

আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম—এ কেমন মানুষ, যে প্রতি মুহূর্ত্তে বাক্যশেল

বহন করিয়া, এত দেহযন্ত্রণার মধ্যেও আমার সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না! আমি কত বার তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছি; তিনি কাঁদিয়া বলিয়াছেন, "আমি এখানে না খাইয়া বাঁচিব, কিন্তু পিত্রালয়ে তোমায় ছাড়িয়া এক দণ্ড বাঁচিব না!" তিনি বিবাহের পর পিত্রালয় হইতে পা উঠাইয়া, নূতন ক্ষেত্রে সত্য-সত্যই জীবনের সবখানি ভর দিয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। সে কথা কি এতদিন বুঝিয়াছি, আজ তাঁর জীবনের সকল কথাই অর্থপূর্ণ হইয়া নূতন চক্ষু ফুটাইয়া দেয়!

তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। বাড়ীর দাসীকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। বাড়ীতে নিত্যসেবার জন্য আমার শিবলিঙ্গের সহিত পিতৃদেব সত্যনারায়ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই দেবতার কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইত। আমি তাঁর জন্যই কলিকাতায় উপার্জ্জন করিতে বাহির হইয়াছিলাম। প্রতি শনিবার আসিয়া তাঁর কদর্য্য-শ্রী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম—কোনরূপ অসুখ হইয়াছে কি না! তাঁর ম্লান মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত; তিনি সুস্থ আছেন, এই বলিয়াই উত্তর দিতেন। সোমবারে আমার কলিকাতায় যাত্রাকালে তিনি কাঁদিতেন। এই এক সপ্তাহ অনন্ত দুঃখের সমুদ্রে সাঁতার দিয়া, তিনি শনিবার আমার দেখার আনন্দেই বাঁচিয়া থাকিতেন। প্রসন্নসলিলা এই ক্ষীণা তটিনী কেবল আমার জীবনকে স্নিগ্ধ করার জন্যই মর্ত্ত্যে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—কিন্তু আমি জীবনভোর তাঁহাকে কেবল ব্যথার উপর ব্যথাই দিয়াছি!

তাঁর নির্য্যাতনের কাহিনী কেবল আমিই জানিতাম না, আমার শ্বশুরালয়েও একথা প্রকাশ পাইয়াছিল। কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য কেহ পাছে তাঁহাকে দেয়, ইহার জন্য সতর্ক-দৃষ্টি ছিল; কাজেই তাঁহারা কোন উপায় করিতে সমর্থ হইতেন না। টাকা-কড়ি দিয়া যাওয়াও বৃথা হইত; কেননা, তাহার সদ্ব্যবহার করার উপায় ছিল না। পিত্রালয়ে লইয়া যাওয়ার জিদ্ করিলে, তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

একবার আমার দিদিশাশুড়ী কোন প্রকারে সামান্য খাদ্যদ্রব্য গোপনে তাঁহাকে দিয়া যান। তিনি ইহা কি ভাবে রক্ষা করিবেন ভাবিয়া, আকুল হইলেন। আমি কলিকাতায় থাকিলে, আমার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার নিকট শয়ন করিতেন; কাজেই রাত্রিকালেও ইহার সদ্ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।

অনাহারে-অনাহারে তাঁর একপ্রকার অস্থিপঞ্জরসার হইয়াছিল। আমিও নিরুপায় হইয়াছিলাম।

শনিবারে আসিয়া হঠাৎ তোরঙ্গ খুলিবামাত্র দেখিলাম—কয়েক প্রকার ভর্জ্জিত বস্তুর সহিত মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে। তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন; সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, এ কথা কাহাকেও বলিতে আমায় নিষেধ করিলেন। এগুলি খাওয়ার তাঁর সুবিধা নাই, অথচ মা-বাপের মন বুঝে না বলিয়াই তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন; কোথাও ফেলিলে কেহ পাছে দেখিতে পায়, এই ভয়ে তিনি বিব্রতা হইয়া পড়িয়াছেন। আমি জিনিষটা যত সহজ করিয়া তুলিতে চাই, তিনি ততই বাধা দিয়া আমায় নিরস্ত করেন। অবশেষে মধ্যাহ্নে সকলে নিদ্রা যাইলে, যে সকল কলাই-ছোলা-ভাজা ছিল, সেগুলি দুটি-দুটি করিয়া পারাবতেদের খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; অবশিষ্ট সন্দেশ, লুচি প্রভৃতি গো-গ্রাসে তুলিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। সে যে কি অবস্থা, ভাষায় ব্যক্ত হয় না!

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি গর্ভবতী হইলেন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী এই সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব তুলিলেন; কিন্তু এতদিন পূর্ব্বে গিয়া তিনি সেখানে থাকিতে পারিবেন না; কাজেই আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও, তাঁরই অনুরোধে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইল—আমার পাঠাইবার ইচ্ছা নাই।

এই অল্প বয়সে গর্ভবতী হওয়ায় মাসের পর মাস তাঁর দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধিই পাইল। তিনি অম্লান মুখে সকল দুঃখ সহিয়াও তৃপ্তি পাইলেন; কেন-না, এই সময়ে আমি কলিকাতায় প্রতিদিন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছি। তিনি সকল কাজের মধ্যে আমার পরিচ্ছদাদি প্রতিদিন পরিষ্কার করিতেন। আমার বেশভূষার পারিপাট্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; কিন্তু তাহার মধ্যে কাহার পবিত্র হস্ত নিহিত ছিল, তাহা কেহ জানিত না। আমার জুতায় কাদা থাকিলে, তিনি তাহা মুছিয়া দিতেন, পরিহিত বস্ত্র মলিন হইলে, সাবান না থাকিলে জল-কাচা করিয়া দিতেন; রৌদ্রে বিছানাপত্র শুকাইয়া, ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া, সব দিক্ এমন পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন যে, অতি ক্ষুদ্র বস্তুরমধ্যেও শ্রী ও ঐশ্বর্য্য যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইত।

পূর্ণ অষ্টম মাস গর্ভ লইয়া তিনি পিত্রালয়ে গমন করিলেন। যথাকালে

এক কন্যারত্ন প্রসব করার সংবাদ আসিল। আমার মাতাঠাকুরাণী অন্যান্য পরিজনের সহিত একবাক্যে বধূ 'মাটির ঢিবি' প্রসব করিয়াছে বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। শ্বশুরবাড়ী হইতে যে লোক এই সুসংবাদ দিতে আসিয়াছিল, সে পুরস্কারপ্রাপ্তির সঙ্গে দুই কথা শুনিয়া গেল। তাঁর প্রাণে আরও আঘাত বাজিল। পরে আমার অসন্তোষ নাই দেখিয়া, তিনি সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন।

কন্যার ছয় মাস বয়স হইলে, আবার তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে আনা হয়। সে দুঃখের কথা বলিতে আজও চক্ষে অশ্রু ঝাঁপিয়া পড়ে। আমি সেদিনও নিরুপায় ছিলাম, আজও উপায়হীনের মতই তাঁর রোগকাতর দেহ কালের হস্তে ধরিয়া দিলাম! আজও আমি নিরুপায়, ঈশ্বরের বিধান বহন করা ছাড়া এই পৃথিবীতে আর বুঝি আমার অন্য ধর্ম্ম নাই!

ছয় মাসের শিশু মাটির বুকে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া নীরব হইত—তাঁর কাজের সীমা ছিল না। উদয়াস্ত পরিশ্রম না করিলে, গঞ্জনা বাড়িবে—এই ভয়ে মেয়ের যত্ন করিতেও তাঁর বাধিত। এই অযত্ন-পালিতা কন্যা দিন-দিন বড হইয়া উঠিল। তার শিশুমুখে মধুর হাস্যচ্ছটা এই ব্যথিত জীবনেও আনন্দ ঢালিয়া দিত। সকলে শিশুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিত। দশ মাস কাটিয়া গেল। শ্রাবণের বর্ষণসিক্তা পৃথিবী মাতৃক্রোড়ের অভাবে তাহার আশ্রয়ক্ষেত্র হইয়াছিল! বুঝি রক্তমাংসের শরীরে ধরিত্রীর এত স্নেহ সহ্য হইবার নহে! সে কি বীভৎস দৃশ্য! আজও আমি যে এ সংসারে কত নিরুপায়, ইহা তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

কলিকাতার কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া দেখিলাম—এক বিকটাকার দৈত্যের মত কৃষ্ণকায় পুরুষমূর্ত্তির সম্মুখে আমার স্বর্ণকান্তি কন্যাকে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সে পুরুষ মন্ত্রপূত জল লইয়া তাহার কচি মুখে ঝাপটের পর ঝাপট দিয়া, শিশুকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ঘরে গিয়া দেখিলাম—আমার স্ত্রী কাঁদিতেছেন। সংবাদ পাইলাম—মেয়েকে "ডাইনে পাইয়াছে", তাই ওঝা ডাকার ব্যবস্থা হইয়াছে!

উৎকণ্ঠায় সারা রাত্রি অতিবাহিত হইল। পিতামাতার সজাগ-দৃষ্টির উপর তার উজ্জ্বল চক্ষের স্থির-দৃষ্টি আজও জাগিয়া আছে। পরদিন তার কলকণ্ঠের অস্ফুট-ভাষা আর শোনা গেল না! সে অমল হাস্যবিন্দু ওষ্ঠপুটে আর ফুটিয়া

উঠিল না। সেদিন আর সে হামা দিয়া জুতা টানিয়া পায়ের কাছে ধরিল না, ডিবা হইতে পান লইয়া আমার মুখে গুজিয়া দিল না! উষ্ট্র নাকি কাঁটা খাইয়া রসের আস্বাদ পায়; আমার এই ক্ষুদ্র সংসারে দুঃখের প্রবাহ বহিলেও, ইহার মধ্যে জীবনের অমৃতাস্বাদ পাইতাম। পত্নীর বিমল প্রেমের অগাধ সিন্ধুসলিলে অবগাহিত হইয়া, সৃজনের শতদল-পদ্ম আমার ভবিষ্যৎ-স্বপ্নের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। তাহার দিকে যত চাহি, তত বুক ভাঙ্গিয়া পড়ে; আর এই শিশু এত অল্প বয়সে এত পরিচয় কেমন করিয়া সম্ভব করিয়াছিল কে জানে! সে আর দৃষ্টি ফিরাইল না, তাহার চক্ষের কোণে জল ভরিয়া উঠিল, দুই গণ্ডে প্রবাহ সৃষ্টি করিল। কত ক্ষণ যে স্নেহের মূর্ত্তিকে চক্ষে-চক্ষে রাখিব—সেদিন যে বৃহস্পতিবার, অফিসের "মেল্-ডে", পিতার ডাকাডাকি! কাঁদিতে-কাঁদিতে কলিকাতায় প্রস্থান করিলাম।

অফিসের কাজ শেষ হইয়াছে। কেরোসিনের ডুম সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উত্তাপ সৃষ্টি করিয়াছে। আমার চক্ষে জলের প্রবাহ। অভাবনীয় বেদনায় হৃদয় যেন মোচড দিয়ে উঠে। কল্পনা-নয়নে বার-বার আমার শিশু-কন্যার নৃত্যভঙ্গী মনোমুকুরে ফুটিয়া উঠে। ভগ্ন মনে রাত্রি এক প্রহরের পর বাড়ী ফিরিলাম।

সব নিস্তব্ধ। আকাশে শুক্ল-চন্দ্রের বিমল-জ্যোৎস্না—পৃথিবী পুলক-স্নাতা। মিটি-মিটি প্রদীপের আলোয় দেখিলাম—দালানে এক দল আত্মীয় বসিয়া আছেন। উৎকণ্ঠিত হইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—গৃহ শূন্য। বাহিরে আসিয়া কেবল প্রশ্ন করিয়াছি "কোথায় আমার পিকলু।" সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় ক্রন্দনের রোল উঠিল। উঃ। বিধাতা যেন মাথায় বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। সোপানে আছাড খাইয়া, প্রাঙ্গণে পড়িয়া চৈতন্য হারাইলাম। জীবনের চাকা ঘুরিয়া গেল। ইহা কন্যার মৃত্যু নহে, আমার প্রাকৃত জন্মের অবসান। সেদিন কি বুঝিয়াছিলাম! বোধ হয়, সাত দিন আমার মুখে কেহ অন্ন-জল দিতে সমর্থ হয় নাই। সে শোকের অনুভূতি আগুনের মত স্মৃতিতে জাগিয়া আছে, শোকাতুর জনকজননীর ব্যথার কথা আমি যে মর্ম্মে-মর্ম্মে ভোগ করিয়াছি! তখন আমার স্ত্রীর বয়স মাত্র পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

কন্যার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীর প্রতি আত্মীয়-স্বজনের আচরণ আরও নিষ্ঠুর হইয়াছিল—আজ সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া

সান্ত্বনা দিতে সাধ যায়। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে এ আগ্রহ হয় নাই; দাঁত থাকিতে সত্যই দাঁতের মর্য্যাদা তেমন করিয়া বুঝা যায় না!

পুত্র-সন্তানবতী রমণীর এইরূপ "মরুঞ্চে পোয়াতি"র মুখ দেখা নিষিদ্ধ। কাজেই আমার ভগ্নীস্থানীয়া পিতার পূর্ব্বকথিতা পালিতা বিধবা মৃত কন্যাকে বক্ষে লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হন। আমাদের শ্মশানঘাট সেদিন এমন লোকপূর্ণ ছিল না; চতুর্দ্দিকে অশ্বত্থ-বটের ঘন বনরাজী—খর্জ্জুর, বাবলা, পিটুলী গাছে দিবাভাগেও ঘাট অন্ধকার হইয়া থাকিত। আমরা বাজী রাখিয়া এক-একদিন সন্ধ্যার পর ভয়ে-ভয়ে ঘাটের বটগাছ স্পর্শ করিয়া ফিরিতাম।

কন্যার সৎকার শেষ করিয়া, আমার স্ত্রীকে ঘাটে রাখিয়া তিনি ফিরিলেন। সঙ্গে শৌচ হওয়ার দ্রব্যাদি আনা হয় নাই, সেগুলি বাড়ী হইতে পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। দূর ঘাটে বাড়ীর অন্যান্য পরিজনেরা মুখ নত করিয়া স্নান সমাপন করিয়া বাড়ী ফিরিল। তখন তৃতীয় প্রহর বেলা অতীত হইয়াছে; রৌদ্রের উত্তাপ হ্রাস পাইতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়, কন্যাশোকগ্রস্তা পঞ্চদশবর্ষীয়া আমার যুবতী পত্নী অসহায়া হইয়া শ্মশানে প্রতীক্ষা করিতেছেন। কাহারও দেখা নাই। শোকের আবেগে, ইচ্ছা হইতেছে—জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন; কিন্তু জীবনের বাঁধন তাঁর অন্যত্র ছিল—কেবল সেই চিন্তায় তিনি বুক বাঁধিয়া বসিয়া রহিলেন।

বহু ক্ষণ পরে তাঁর পিত্রালয়ের এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী দ্রব্যসামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি আশ্বস্ত হইলেন। ইঁহাকে আমরা "গয়লা ঠাকুরঝি" বলিয়া ভালবাসিতাম। শত বৎসর অধিক পরমায়ু লইয়া তিনি অনেকদিন জীবিতা ছিলেন। "রাধা"র মৃত্যু-সংবাদে তাঁর চক্ষেও জল ঝরিয়াছে।

কিন্তু দ্রব্যাদি সিদ্ধ করিবার অগ্নি চাই; কেন-না, সৎকারান্তে 'পত্তি' না করিয়া সন্তানহীনা মাকে বাড়ী ফিরিতে নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ, যে দীপশলাকা তিনি আনিয়াছিলেন, তাহাতে একটিও কাঠি ছিল না। তখন সন্ধ্যার ছায়া জলে প্রেতমূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতেছে, বৃক্ষের পত্রে-পত্রে অন্ধকার আশ্রয় করার উদ্যোগ করিতেছে। এই অবস্থায় আমার স্ত্রীকে এই জনশূন্য ঘাটে একা রাখিয়া গয়লা ঠাকুরঝি আবার বাড়ী ফিরেন কি প্রকারে? দুইজনে এক প্রকার নিরুপায় হইয়া অনেক ভাবিলেন। দুঃখের কথা এই—

বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনেরা এতখানি কাল-বিলম্ব দেখিয়াও ইহার কারণ অন্বেষণ করেন নাই; পরিশেষে, এই বৃদ্ধা পশ্চাৎ হাঁটিয়া ঘাট হইতে তীরের দিকে আসিতে লাগিলেন। এইরূপ করিবার কারণ, বালিকা-বধূকে চক্ষে-চক্ষে রাখিয়া যদি কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন। আমি আজও এই অকৃত্রিম স্নেহের জন্য ইঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

এই দুঃখের কথাও বহুদিন পরে তাঁরই মুখে শুনিয়াছি, এবং সেই চির-তপস্বিনীকে অন্তরের মাঝে রাখিয়া কেবলই ভাবি—সর্ব্ব বিষয়ে নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে দুঃখই দিয়াছি, তাঁর একটি অভিলাষও পূর্ণ করি নাই। সব কথা ক্রমে বলিতেছি।

কন্যাশোকে দুই জনেই অধীর হইয়াছিলাম। উভয়ে রাত্রে একত্র হইলে কাঁদিয়া সারা হই, এইজন্য এক সপ্তাহ আর একত্র হওয়ার অবসর ঘটে নাই; ইহাতে ব্যথার মাত্রা অধিক করিয়াই ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমি কয়-দিন একেবারেই অন্ন-জল গ্রহণ করি নাই। আমার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিতেন না, তাঁর অস্ফুট রোদন-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে আমার যন্ত্রণা আরও অধিক বৃদ্ধি পাইত। সাত দিন পরে যে রাত্রে একত্র হইলাম, সেই রাত্রিতেই আমাদের শোকানলে সান্ত্বনার সিন্ধু-বারি-সেচন হইল। কন্যার রূপের কথা, এই দশ-এগার মাসের যত তার স্মৃতি ছিল, সব সেদিন উজাড় হইয়া গেল। অন্তর হাল্কা হইল। উভয়েরই জীবনে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, ধীরে-ধীরে নবজীবনের ভাব ও ছন্দঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমার সংসার-যাত্রার পথ বিধাতার বজ্রপাতে চিরদিনের জন্য যে রুদ্ধ হইয়াছে, তাহা সেদিন বাহ্যতঃ না বুঝিলেও, জীবনের আস্বাদ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইল। কন্যার প্রতি তাঁর হৃদয় চিরিয়া যে স্নেহধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রেমের নির্ঝর আরও প্রবলবেগে বহিল—আমায় তিনি প্রতিদিন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। বাণী আমার কণ্ঠে, কিন্তু ইচ্ছারূপিণী সাধ্বীর সমর্থন আমার কোন দিক্ অপূর্ণ রাখিল না। যে ভাগবত-ধারা পূত গঙ্গোত্রীপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া আমায় অভিষিক্ত করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে আমার বাল্য ও প্রথম যৌবন শক্তিপূর্ণ ও বীর্য্যময় হইয়াছিল, যাহা কামকলুষিত চিত্তের মাঝে এতদিন আত্মগোপন করিয়াছিল, আজ এই আঘাতে তাহা উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে আমায় আবার উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল।

আমার স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া, ঠাকুর-ঘরে আসন বিছাইয়া, ফুল-চন্দন গুছাইয়া দিলেন। আবার ধূপ-দীপের গন্ধে পূর্ব্বানুভূতির পূত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী আমাদের উভয়কে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ইনি উপবীত-গ্রহণের দিন হইতে গৃহত্যাগ করেন। ত্রিশ বৎসর ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া, স্থানীয় চণ্ডীমন্দিরে আসিয়া আসন করিয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁর অযাচিত করুণার উদয় হইয়াছিল। আমার মাতৃদেবীকে একদিন আহ্বান করিয়া তিনি তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া এই উদাসীর নিকট সন্তানের দীক্ষা কিরূপে সম্ভবপর হইবে, ইহা ভাবিয়া মা বিচলিতা হইয়া পড়েন। এদিকে আমি শুনিবামাত্র মন্ত্র-গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ি। সন্ন্যাসী-বৈরাগীর প্রতি পিতার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কলিকাতার গঙ্গাতটে, সাগরসঙ্গমের মেলায় যে সব সন্ন্যাসী জমায়েৎ হইতেন, তাঁহাদের দর্শন করিতে আমায় সঙ্গে লইতেন। দেব-দ্বিজে ভক্তি, সন্ন্যাসী-বৈরাগীর সেবা, নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে তাঁর সুগভীর অনুরাগ ছিল। তিনি এই সন্ন্যাসীর নিকট আমায় দীক্ষা লইতে সম্মতি দিলেন। আমরা স্ত্রী-পুরুষে তাঁর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলাম। তিনি আমায় দীক্ষা গ্রহণের সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আমার কোন্ দেবতার প্রতি অধিক আকর্ষণ! আমি আমার উপাস্য দেবতা শিবঠাকুরের উপরেই শ্রদ্ধার বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বলিলেন, "না, শিবময় স্বভাব লাভ কর, কিন্তু তোমায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে।" আমার পিতা এ কথা শুনিয়া বলেন, "আমাদের বংশপরম্পরা বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত, শক্তিমন্ত্রে পুত্রের দীক্ষা কিরূপে সম্ভব হইবে?" তিনি বলিলেন, "আমি বৈষ্ণবমন্ত্রেই তোমার পুত্রের দীক্ষা দিব; কিন্তু বৈষ্ণবশক্তি হইবে এই সন্তানের উপাস্য দেবতা।" আমরা স্ত্রী-পুরুষে যথাসময়ে দীক্ষিত হইলাম। নিগূঢ় দীক্ষা-মন্ত্র প্রকাশ করিতে নাই, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছিল—গুরুদেব এ কথা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন।

দীক্ষার পর কিছুদিন যে ভাবে সাধন-ভজন জমিয়াছিল, ভোগপ্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। আবাল্য ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত জীবন ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিতাম না—কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পর হইতে মনের গতি এমনই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, ধর্ম্মবিষয়ক ভাব ও প্রসঙ্গ রুচিকর হইত না। কন্যার মৃত্যুর পর পূর্ব্বভাব অধিকতর প্রবল হইয়া আমার সবখানিকে অধিকার করিয়া লইল। আমার স্ত্রী যথার্থ সহকারিণী হইয়াছিলেন। আমার ছাতা-ধরা কমণ্ডলু বাহির হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া নাসাপান আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বমুখে বসিয়া নাড়ী-শোধন-ক্রিয়া চলিতে লাগিল। আবার পূরক-রেচক-কুম্ভকের সাধনা সুরু হইল। আসনশুদ্ধি, অঙ্গশুদ্ধি করিয়া, দেবতার চরণে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যখন ঠাকুর-ঘরে বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় তন্ময় হইতাম, আমার স্ত্রী সংসারের কাজে থাকিতেন—ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার দিকে চাহিয়া অন্তরে যে পরমানন্দ লাভ করিতেন, তাহা আমি অন্তর দিয়া অনুভব করিতে পারিতাম। তিনি সামান্য বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া আমার গৃহে আসিয়াছিলেন, সংসারের অসংখ্য কার্য্য তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, দিবারাত্র পরিশ্রমের মধ্যে অবসর খুব কমই পাইতেন এবং আমিও এই বিষয়ে উদাসীন ছিলাম; কাজেই শিক্ষিতা নারী বলিয়া তাঁহার গর্ব্ব ছিল না। কিন্তু দেখিয়াছি—কোন সৎকর্ম্মে আমায় উদ্যত দেখিলে তিনিও উদ্বুদ্ধা হইয়া উঠিতেন; কথায়, ভাবে আমায় উৎসাহ দিতে তিনি নিজের ক্ষতিও লক্ষ্য করিতেন না। সে সকল কথা পরে বলিতেছি।

বাহিরে ধর্ম্মসাধনার রুচি ও প্রবৃত্তি প্রবল হইল বটে; কিন্তু কদর্য্য-সম্ভোগ-প্রবৃত্তিও আমার যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবাধ ভোগে বাধা ছিল না। কিন্তু যেন ইহা আমার স্বরূপের আনন্দ নহে। এইজন্য ইহাতে আমি তৃপ্তি পাইতাম না, শুধু অভ্যাস ও সংস্কার প্রবল হইয়া আমায় যেন যন্ত্রপুত্তলিকার ন্যায় এই কার্য্যে মাতাইয়া তুলিত। সাধন-ভজনে যতই জোর দিই—ভোগের গর্ত্ত দিয়া সব উৎসাহ বাহির হইয়া যায়, অন্তরে ওজঃ ও আনন্দ স্থায়ী হয় না। এই প্রসঙ্গ লইয়া স্ত্রীর সহিত আলাপ আরম্ভ হইল। তিনি প্রথম-প্রথম এই কথায় কর্ণপাত করিতেন না; ইহার আবশ্যকতা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হইত না। এই সকল বিষয়ে নিগূঢ় জ্ঞানও তাঁহার ছিল না; স্বামীর কল্যাণ-কামনার সহিত এই সম্ভোগ-প্রবৃত্তি জীবনের ধর্ম্ম বলিয়াই হয়তো তিনি মনে করিতেন। আমিও ইহা লইয়া যতই ভাবি না কেন, যতই সতর্ক হই না, তাহা

কার্য্যকরী হইত না। চরিত্র আমার এই দিক্ দিয়া খুবই অসংযত ছিল, নিজেকে এই পথ হইতে কোনমতে বিমুখ করিতে পারিতাম না। আর রাগ হইত আমার স্ত্রীর উপর।

ধর্ম্মভাব অটল রাখার দিকে ঝোঁক যে সম্পূর্ণভাবেই ছিল, তাহাতে সংশয় নাই; অথচ সম্ভোগবৃত্তি এমন দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে কেন—তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া, নিজেকে সর্ব্বদা নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিয়া দায়িত্ব এড়াইতাম। তাঁহার সহিত ইহা লইয়া ঝগড়ার সূত্রপাত হইল। এই ঝগড়া এমনই বিচিত্র আকারের ছিল, যাহা লইয়া উভয়ের মধ্যেই এক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। বলিতে বাধে—লালসার আগুন জ্বলিয়া উঠিলে, তাঁহাকে যে ভাবে আদর ও যত্ন করিতাম, যেরূপ মিষ্টবাক্যে, নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জীবনের ধর্ম্মকে বড় করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতাম; প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলে, একেবারে বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া বসিতাম। আমার জীবনের সর্ব্বনাশ যে তাঁহার জন্যই ঘটিতেছে, এই কথা ব্যক্ত করিয়া সত্য-সত্যই ক্রোধ প্রকাশ করিতাম। তিনি বার-বার নিজের মনকে শক্ত করিয়া ভবিষ্যতে ভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিমুখতার প্রতিশ্রুতি লইতেন; কিন্তু আমার প্ররোচনায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইত। আত্মদোষ না ধরিয়া, আমি তাঁহাকেই দোষী করিতাম; ক্রমে আমার এইরূপ অন্যায় ব্যবহার এমনই বিরক্তি ও দুঃখের কারণ হইয়া উঠিত যে, এই ঘটনা লইয়া কিছুদিন উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যাইত। কে জানিত, বিধাতার সঙ্কেত এমনই তির্য্যক্ পথে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমার কন্যার মৃত্যু হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতেই সম্ভোগ-প্রবৃত্তি লইয়া দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আমার স্ত্রী তখন পূর্ণ যুবতী। এতদিন যাহা অবাধ প্রবাহে উভয়কে মাতাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা অতঃপর প্রতিপদে বাধা পাইতে লাগিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ এইভাবেই অতিবাহিত হইল। সংসারে কলহের মাত্রাও বাড়িয়া উঠিল। এমন অনেক দিন হয়, যখন তিনি অনাহারে দিন কাটাইয়া দেন; আমি সব কিছু তাঁহার কর্ম্মফল বলিয়াই নীরব হইয়া থাকি। স্ত্রীর জন্য সংসারে ভেদ সৃজন করা আমার ধাতে ছিল না। সময়ে-সময়ে মনে হইত—দুঃখের মাত্রা অতিরঞ্জিত করিয়া আমার স্ত্রীই বুঝি অশান্তি সৃষ্টি

করেন। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের কথাও যেমন নিঃসংশয়ে শুনিতাম, স্বীয় পত্নীর কথাও তেমনি আবার অবিশ্বাস করিতাম না। ইহার ফলে, যে পাল্লা যে দিন যে দিকে ভারী হইয়া উঠিত, সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতাম; সংসারের দিকে তাহাতে লাভ-ক্ষতি ছিল না। চক্ষে অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিত যাঁর, তাঁর দুঃখ সেদিন বুঝি নাই। এক-এক দিন অতিষ্ঠ হইয়া তাঁর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, অভিমানে তাঁর কণ্ঠরোধ হইয়াছে। "নিরপরাধ আমি"—এই প্রতিবাদটুকু জ্ঞাপন করিয়া, তিনি আমার চরণ ধরিয়া কেবল মিনতি জানাইয়াছেন "ওগো, এ সংসারে কেহ নাই, যার মুখ চাহিয়া এত দুঃখ সহি। তুমি আমার প্রতি বিরূপ হইও না, আমি যে তাহা হইলে চক্ষে অন্ধকার দেখি!"

তাঁর এই সরল মিনতিপূর্ণ নিবেদনে হৃদয় দ্রব হইত। চিরদিন তাঁর বিষয়ে আমি নিরুপায় ছিলাম। তাঁহাকে বুকে তুলিয়া স্নেহালিঙ্গন দিতাম—এক মুহূর্ত্তে মেঘ কাটিত, জ্যোৎস্নায় আমাদের বুক ভরিয়া যাইত। প্রতিদিন দ্বন্দ্বময় জীবন লইয়া সুখে-দুঃখে সংসারের দিন কাটিয়া যাইত।

একদিনের নয়, এমন বহুদিনের নিষ্ঠুর আচরণ আমার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ সূচি বিদ্ধ করে। বালিকা পত্নীকে লইয়া আদরে-অনাদরে আমি যে জীবন পাইয়াছি, সেখানে আদরের মাত্রার চেয়ে অনাদরের ভাবই যে বেশী হইয়া পড়ে! তাঁকে তো কোনদিনই সুখ দিই নাই। নিজের সুখের জন্য যেখানে তাঁহাকে পাইয়াছি, সেইখানে আমার সুখ দেখিয়া তাঁর আনন্দময়ী মূর্ত্তিই আমায় যে একটুকু তৃপ্তি দেয়, তা' ছাড়া তাঁর আনন্দের জন্য আমার জীবন-দান কই কোথাও তো দেখি না! আগে এ কথা এমন করিয়া ভাবিবার সুযোগও হয় নাই তো!

একদিন বাড়ী আসিয়া শুনিলাম—তিনি আমার মাতাঠাকুরাণীর মুখের উপর জবাব দেওয়ায়, তাঁহাকে সকলে মিলিয়া দুই কথা অধিক করিয়া শুনাইয়া দিয়াছে এবং এই অভিমানে তিনি আজ সারাদিন অন্নজল মুখে দেন নাই। কর্ম্মস্থল হইতে আসা মাত্র এই ভাবের কাণাঘুষা শুনিয়াই আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—তিনি শয্যার উপর নিস্পন্দভাবে শুইয়া আছেন। বাহিরে যে সকল কথা শুনিলাম, তাহার প্রতিবাদ নীরব চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া

আমার মন বিরক্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের প্রয়োজন দ্রুত শেষ করিয়া বাহির হইলাম; শয়নকালে ঘরে গিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার গ্রীবা ধরিয়া সজোরে বিছানা হইতে তুলিয়া ধরিলাম। তিনি বিস্ফারিত করুণ চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিবার চেষ্টা করিলেন "শোন, আমার কথা শোন।" কিন্তু আমার সে ধৈর্য্য ছিল না, তাঁহার মাথাটা সজোরে দেওয়ালে দুই-তিন বার ঠুকিয়া দিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া, আত্মীয়-স্বজনেরা আজ ছোট-বৌ'এর এইরূপ একটা প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার আশা পোষণ করিয়াই যেন নিস্তব্ধ হইয়া বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছিল। শব্দ শুনিয়া আমার মা বলিয়া উঠিলেন "কি হচ্ছে!" তৎক্ষণাৎ তিনি মাথার চুল সাম্‌লাইয়া, আমার পা-দুটা জড়াইয়া বলিলেন, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—বল, পাথর ভেঁজে রেখেছ!"

ব্যায়ামের জন্য এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর আমার ঘরে ছিল, তাহা যখন ঘরের মেঝেয় নামাইতাম, তখন এইরূপ শব্দ হইত। আমি তাঁর সে কাতর নিবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাঁর কথার প্রতিধ্বনিই করিলাম। দুই বাহু দিয়া বক্ষে জড়াইয়া, চুম্বনের পর চুম্বনে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলাম। তিনি দুঃখের কথা শুনাইতে চাহিলেন, আমি তাহা শুনিলাম না—কেবল বলিলাম "কর্ম্মফল ক্ষয় হউক। আমি তোমায় সর্ব্বপ্রকারের নির্দ্দোষ জানিয়াও অত্যাচার করি, সংসারেব প্রভাব এড়াইতে পারি না।"

বালিকা-বধূকে এমনই করিয়া আমি যে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, আজ নিজের হাতেই বিসর্জ্জন দিলাম—এই জীবনমরণ-রঙ্গেও তাঁর প্রার্থনা রাখি নাই, এমনই অসহায় আমি!

এইরূপ ঘটনা একদিন নয়, দুই দিন নয়, এমন বহুদিন হইয়াছে—তবুও তো তাঁর প্রেমের শতদল ম্লান হয় নাই; তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অনাদরে, ঔদাসীন্যে শুকাইয়া যায় নাই। হৃদয় চিরিয়া তিনি অপার্থিব স্নেহে ও অনুরাগে আমায় ভরাইয়া দিতেন; আমি ঋণী রহিলাম, পরিশোধের সুযোগ মিলিল না—বুঝি সে প্রেমের ঋণ জন্ম-জন্ম ধরিয়া শোধ দিতে হইবে।

কি লইয়া যে আমাদের সংসার, তাহা ভাবিয়া দেখিলে কিছুই ছিল না; একদিন এক ফুৎকারে ইহা উড়িয়া গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন একান্ত অযত্নপালিতা হইয়াও তিনি এই সংসারকেই সবখানি দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁর বিশ্রাম ছিল না; অথচ কোন কর্ম্ম অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া

থাকিতে দেখিলেই, তাঁহাকেই দশ কথা শুনিতে হইত—এমনই সংসারের বিচিত্র ব্যবস্থা!

সংসারের যখন কেহ শয্যাত্যাগ করে নাই, তিনি তখন বাড়ীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া, যেখানে যত আবর্জ্জনা কুড়াইয়া, গৃহদ্বার পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেন। বাল্যকালে লক্ষ্মীর গান শুনিয়া তাঁহার ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল—

'সকাল বেলা ছড়া-ঝাঁট, সন্ধ্যাকালে বাতি,
লক্ষ্মী বলে তার ঘরে আমার বসতি।'

সমাজ-চারণের কণ্ঠের এই গান তাঁর মধ্যে সার্থক হইয়াছিল। আমার কোন কঠিন ব্যারাম হইলে তিনি খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। তাঁর সজল চক্ষু আমার মুখের দিকে কাতর-ভাবে চাহিয়া থাকিত, কি উৎকণ্ঠায় যে তাঁহার দিন কাটিত তাহা আর বলিবার নয়! যদি পরিহাস করিয়া বলিতাম, "এইবার আমার শেষ"—তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেন, "কিছুতেই না। আমার আগে তোমার যাওয়ার যো নাই।" আমায় সবল সুস্থ দেখিলে, তিনি বড় সুখী হইতেন—বলিতেন,

"সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া,
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের গুঁড়া।"

যে বিশ্বাস তাঁর হৃদয়ে স্থান পাইত, তাহার মূল নিরসন করা বোধহয় বিধাতার সাধ্যে কুলাইত না; কিন্তু কোন বিষয়ে বিশ্বাস সহজে তাঁহার হৃদয়ে শিকড় গাড়িতে পারিত না—এমনই ছিল তাঁর চরিত্র!

এই সময়ে আমার অভিনয় করার ঝোঁক চাপিয়াছিল; এই হেতু সন্ধ্যার পর প্রায় বাহিরে থাকিতাম, বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইত। কেহ আমার চরিত্র লইয়া পরিহাস করিলে, তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। আমি যে তাঁর উপর এত অবিচার-অত্যাচার করিতাম, তাহা তিনি আমলেই আনিতেন না; আমার মর্ম্মস্থল তাঁর দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থাকে নাই। আজ ভাবি—আচরণ-বিশেষে ভালবাসার হ্রাস-বৃদ্ধি তো হয় না!

সত্যই ভালবাসা দান-প্রতিদানের সামগ্রী নয়। ইহা অক্ষয় করিবার জন্য সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহা এমনই সিদ্ধবীর্য্য যে, পৃথিবীর মলিনতায় ইহার গতিরোধ হয় না। তাঁহাকে পাইয়াই আমি এই প্রেমের আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম।

আর একদিনের কথা বলিলেই, আমি যে তাঁর প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি এবং তিনি যে আমার নিকট হইতে শত অত্যাচার পাইয়াও আত্মনিবেদন কেমন ভাবে সম্পূর্ণ করিয়া অমর হইয়াছেন, তাহা বুঝা যাইবে।

কন্যার মৃত্যুর পর, মা আমার মনস্তুষ্টির জন্য থিয়েটার-পার্টিতে অধিক-ভাবে যাহাতে আমি জড়াইয়া থাকি, তাহার চেষ্টা করেন; কিন্তু আমার মন কন্যার মৃত্যুর পরই ভিতর হইতে অন্য প্রকার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মায়ের সাহায্য-হস্ত প্রসারিত দেখিয়া, আমার শুভ ইচ্ছা সফল করার সুযোগ ইহার ভিতর দিয়া অধিক হইতে পারে ভাবিয়া আমিও খুব উদ্যত হইলাম। আমি নিজে দল বাঁধিলাম। বাহিরে যে পার্টি ছিল, সেখানে আড্ডায় বসিয়া নেশা-ভাঙ্ চলিত; কিন্তু আমি নিয়ম করিলাম—কেবল বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ ছাড়া এ ক্ষেত্রে নেশা করা চলিবে না এবং সন্ধ্যা হইতে দশটার অধিক কেহ পার্টিতে থাকিবে না। ইহাতে থিয়েটার-পার্টির সংস্কার-সাধন হইয়াছিল, অনেক দূষিত-চরিত্রের লোক চরিত্র-রক্ষার সুযোগ পাইয়াছিল—সে ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। এই পার্টি আমাব বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। সন্ধ্যার পর আর আমায় বাড়ীর বাহির হইতে হয় না; আমার স্ত্রীর তাহাতে খুব আনন্দ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন "লোকের ঠাট্টা-তামাসায় আমি টলি না; তুমি যে রকম মানুষ, পথে কি বিপদ্ ঘটাইবে—তাই ভয় হয়!" আজ এই উদাসীন মানুষের পশ্চাৎ তাঁর আর সতর্ক-দৃষ্টি নাই; এ-জীবন পদে পদে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় আজ আর কারও চিত্ত বিচলিত হইবে না।

আমি তখন অবরোধ-প্রথার পক্ষপাতী ছিলাম। হিন্দুধর্ম্মের মূল নীতি বলিয়া যে সব সংস্কার হিন্দু-সমাজে বদ্ধমূল ছিল, আমি তাহাই প্রাণপণে পালন করিতাম। আমার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাকেও কি ঘোরতর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে, আজ ভাবিয়া তাঁর আনুগত্যের শত মুখে প্রশংসা করি। কিন্তু এই প্রশংসার বাণীটুকুও দিয়া কোনদিন তাঁকে আমি আনন্দ দিতে পারি নাই; দিয়াছি দুঃখ, দিয়াছি তপস্যা, দিয়াছি ত্যাগের দীক্ষা। ইহাই স্বামীর কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করিতাম।

বাড়ীতে অভিনয় হইবে, থিয়েটার-পার্টির সকল সভ্যই সারা দিন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। আমার বন্ধু-বান্ধবের চক্ষে স্ত্রী যাহাতে না পড়েন, সেজন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। কেন-না, পিতার মুখে শুনিয়াছি—আমার মাতাঠাকুরাণীর চরণে অলঙ্কার-গুঞ্জন শুনিয়া বাহিরের এক বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "ইহা বুঝি আপনার স্ত্রীর পদশব্দ!" তিনি সেই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আমার মায়ের চরণ-যুগল হইতে রজত-অলঙ্কার বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লন। আর একবার রেশমী চুড়ি পরিয়া তিনি কাপড়ে সাবান দিতেছিলেন; বহির্ব্বাটী হইতে তাহার শব্দ শুনিয়া, তিনি ক্রোধে নোড়া লইয়া হাতের চুড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। পিতার এই আচরণ আমার বাল্যজীবনে আদর্শস্বরূপ বলিয়া মনে হইয়াছিল। বাড়ীর মেয়েদের পর্দ্দানশীন রাখার কঠোর বিধান আমি অধিক করিয়া পালন করার চেষ্টা করিতাম; বিশেষতঃ, আমার স্ত্রীকে আমি এক প্রকার অন্তঃপুর-প্রাচীর-বেষ্টিতা করিয়া বন্দিনী করিয়াছিলাম, দীর্ঘ অবগুণ্ঠন তাঁর আভরণ করিয়াছিলাম।

ষ্টেজের বাঁশে চড়িয়া এক বন্ধু সহসা বলিলেন, "আপনার স্ত্রীকে দেখিলাম, বেশ তো!" আমি নীরব ও গম্ভীর হইয়া রহিলাম। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সন্ধ্যা বহিয়া যায়, উপরের ঘরে প্রদীপ না দেখাইলে আর চলে না; এই হেতু তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া, ছাদ বাহিয়া ঘরে যাওয়ার সময়ে আমার বন্ধুর দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিলেন। আমি আহারের জন্য ঘরে যাইতেই বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি আহার্য্য দ্রব্য দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—একেবারে সপাদুকা তাঁহাকে প্রহার করিলাম। জুতার তলায় পেরেক ছিল, তাহার আঁচড় লাগিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। আমার মধ্যমা শ্যালিকা তাহা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠায়, তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন "চুপ্-চুপ্, মা-বাপ মারে-নি! হয়তো আমার কি দোষ শুনে' এসেছেন, শাসন ক'রবেন বৈ কি! ন' বছর বয়সে এসেছি, ওনার শিক্ষা-শাসনেই তো মানুষ হচ্ছি!" এ-কথাও সেদিন শুনি নাই, পরে শ্যালিকার মুখে শুনিয়াছি। এই সহিষ্ণুতার দেবীকে এমনই ভাবে আমি নির্য্যাতন করিয়াছি: আর তিনি তাহা শিক্ষা বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুনারীর আদর্শ-স্বরূপা

মহাদেবী তিনি, আর আমি—নিজের স্থান কোন্ অবর স্তরে করিব, খুঁজিয়া পাই না!

দুই জনে সংসারের যাবতীয় দুঃখ ভোগ করিয়া জীবনের দিন গুণিয়া যাইতেছিলাম। আমরা যে নিঃসন্তান, এ জ্ঞান ছিল না; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের সেবা করাই সংসার-ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই অভিনব সংসারে আমরা দুইটি প্রাণী সেদিন কেহই গণনীয় ছিলাম না, তবুও সেদিন তাহা মনে করি নাই—হৃদয়ের দরদ দিয়া, যেদিকে যাহা ভাল তাহা গুছাইয়া, সংসারের শ্রী-সম্পদ্‌বৃদ্ধির জন্য আমরা উভয়েই অক্লান্ত শ্রম দিতেছিলাম। যতটুকু ছিল আমাদের সংসারজীবনের নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ, তাহা এইরূপেই শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া গেল।

আজ দেখি—আমার স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল বা এখনও আছে, যাহা কোন কিছুকে যখন আঁকড়াইয়া ধরে, সহজে আর ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু এমন বস্তু নাই, যাহা আমায় ছাড়িতে না হইয়াছে। আজ রিক্ত, নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ হইয়া, উপরেব দিকে চাহিয়া, একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলি নিজেরই কথা—"এ মন্দিরে আব কেহ নাই, শুধু তুমি আর আমি।"

অকাতর অর্থব্যয় ও পরিশ্রম ঢালিয়া যে থিয়েটার-পার্টি গড়িয়া উঠিল, তাহা এক রাত্রির অভিনয় শেষ করিয়াই ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী আসিয়া হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত, যখন দেখিতাম—বহির্ব্বাটীতে সঙ্গিগণ মহা-কলরবে আনন্দ কবিতেছে। থিয়েটাব-পার্টি বন্ধ হওয়ায় আমি এই তৃপ্তির আশ্রয়টুকু হইতেও বঞ্চিত হইলাম। খুবই বিমর্ষ হইয়া পডিলাম। আমার স্ত্রী বলিলেন "ভাবনা কি, আর কি লোক নাই, আবার দল গড়ে' উঠ্‌বে।"

কথাটার মধ্যে শক্তি ছিল। যে দুই-একজন তখনও ছিলেন, তাঁহাদেব গুছাইয়া, এক মাসের মধ্যে আবার নূতন দল গড়িয়া উঠিল। সেদিন অন্তরে একটা গর্ব্ব অনুভব কবিয়াছিলাম; কিন্তু জিদের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা করা যায়, তাহার উত্তেজনা শেষ হইলে অবসাদই বাড়িয়া যায়। পূর্ব্বসঙ্গীদের হারাইয়া অন্তবে স্বস্তি ছিল না। আজ বুঝি—যাঁহারা সেদিন আমায় নিঃসঙ্গ করিয়া যান, তাঁহারা এ যুগের চিহ্নিত মানুষ ছিলেন না। তাঁদের সত্য আমা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র ছিল। তাঁরা আজ সকলেই গৃহ-সংসার

লইয়া আনন্দে আছেন। আমি চাহিয়াছিলাম—একদল সর্ব্বত্যাগী গোত্রান্তরিত সন্ন্যাসী; অসংখ্য ঘটনার ভিতর দিয়া, আমার সেই অন্তরের ইচ্ছাই আজ জয়যুক্ত হইয়াছে।

আমাব বিষণ্ণতাব কারণ জানিয়া, তিনি বলিলেন "যদি এদের ছাড়া তোমার দিন চ'লবে না জান্‌তে, তবে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করা কেন?" সেদিন সেই সব অকৃত্রিম বন্ধুদের হারাইয়া প্রকৃতই আমার হৃদয় শূন্য মনে হইয়াছিল। এখনও তাঁদের দিকে চাহিলে, আমার সেই অতীত যুগের হৃদয়খানির কথা মনে পড়ে। আজ কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অবস্থার ব্যবধানে তাঁহারা আজ পর হইয়াছেন; কিন্তু অন্তরে-অন্তরে সে যুগের স্মৃতি অটুট সম্বন্ধের কথাই জাগাইয়া তুলে। সেদিন তাঁহাদের জন্য এমন আকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যার পর প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া, নিজের ত্রুটি স্বীকাব করিতে কুণ্ঠা করি নাই। তাঁহারাও অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় পাইয়া স্নেহালিঙ্গন দিয়াছিলেন। আমার পূর্ব্ববন্ধুগণের সমাগমে আমার বাড়ী মুখরিত হইল; কিন্তু এইরূপ নতি স্বীকার করায়, আমার অন্তর আবর্জ্জনামুক্ত হইয়া অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। তখন স্বামী বিবেকানন্দ লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে; শ্রীম-কথিত "ঠাকুরের কথামৃত" তরুণের প্রাণে নূতন ভাব সঞ্চার করিতেছে। অন্ততঃ আমার চিত্ত দক্ষিণেশ্বরের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া পডিয়াছিল। আজকাল রাত্রে যুবতী পত্নীর সংসর্গে প্রবৃত্তির আগুনই জ্বলিয়া উঠে না; ঠাকুরের প্রসঙ্গ, দেশের কথা, পুরাণ-ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনাও হইয়া থাকে। দেখি—তিনি বেশ তন্ময় হইয়া আমার কথা শ্রবণ করেন। আমার ভিতরে নূতন আশা জাগিয়া উঠিল। আমি বলিলাম "আমার ইচ্ছা এমন একটা জীবন নিই, যেখানে ভোগের আকাঙ্ক্ষা ম্লান হইয়া যায়—তুমি যদি আমার সহায় হও, আমি ভরসা পাই।"

আমার স্ত্রী কিছু বুঝিলেন কিনা জানি না, সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। আমার ভিতরে তখন অন্য এক অপার্থিব শক্তির অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। থিয়েটার-পার্টির নিকট সহসা প্রস্তাব করিলাম—দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য আমরা কিছু করিতে পারি কি না! তখনও স্বদেশীযুগের হাওয়ায় বাংলার তরুণ প্রাণ মাতিয়া উঠে নাই। বসন্ত-সমাগমের পূর্ব্বে,

তরুবল্লরীর শীর্ণ কলেবর পাতার হিল্লোলে যেমন শিহরিয়া উঠে, সেইরূপ একান্ত অজ্ঞাতসারেই নব উত্তেজনার আভাসে তরুণের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই সমর্থন করিল। বোধহয়, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা শতাধিক যুবক সমিতি গঠনের সঙ্কল্প করি। উহাই ভবিষ্যতে "সৎ-পথাবলম্বী সম্প্রদায়" নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং এই সম্প্রদায়ের প্রথম বাৎসরিক উৎসবেই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত হইয়া আমাদের কৃতার্থ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে আমার জীবন অভিনব আকার ধারণ করিল। প্রথম-প্রথম সকলেই ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে আমরা দুই-তিন জন ব্যতীত সম্প্রদায়ের ভার-বহনে আর কেহ থাকেন নাই। আমরা প্রতি রবিবার সারা চন্দননগর ঘুরিয়া দ্বারে-দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিতাম, মাথায় এক মণ, ত্রিশ সের চাউল লইয়া বাড়ী ফিরিতাম। দুঃস্থ কাঙালকে সাহায্য করা, মৃতের সৎকার, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের সাহায্য—ইহাই ছিল সম্প্রদায়ের বাহিরের কর্ম; ভিতরে কিন্তু একটী অভিনব ভাব পুষ্ট হইতেছিল। আমরা প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলাম —ঈশ্বরানুভূতি লাভ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যকে জীবনপণে রক্ষা করিব। কোন কারণেই আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইব না। অন্তরের এই অনুশীলন ব্যাপার লইয়া অতঃপর আমায় বহির্ব্বাটীতে রাত্রির অর্দ্ধেক কাল অতিবাহিত করিতে হইত। আমার স্ত্রীর সহিত এতদিন যে গভীর সম্বন্ধ ছিল, তাহা বাহ্যতঃ যেন শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেন। সেই সময়ে আমাদের কয়-জনের মধ্যে ভাবের আতিশয্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, আমাদের অভিভাবকগণ তাহা সংসারজীবনের পক্ষে অনুকূল অবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই। আমার মাতাঠাকুরাণীও ছেলের এইরূপ ত্যাগ-তপস্যার আচার সংসারবিরোধী বলিয়া বাধা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু বেশ মনে পড়ে—আমার স্ত্রী এই নূতন অবস্থা দেখিয়া বাহ্যতঃ বিচলিতা হইলেও, অন্তরে শ্রদ্ধার মাত্রাই বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁর আচরণের মধ্যে যে লঘুতা, পরিহাসপ্রিয়তা ছিল, তাহা হ্রাস পাইয়া, বেশ ধীর ও অবিচলিত চিত্তে তিনি আমার সেবায় অধিকতর হৃদয় দান করিলেন। একটা বিষয় লক্ষ্য করিতাম—বাহিরের ধর্ম্মলাভের আগ্রহ ও উৎসাহ যত প্রকাশ পাইত, স্ত্রীর নিকট

আসিয়া অবসাদ ও উহার উল্টা দিক্‌টাই তত প্রবল হইয়া উঠিত। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম—ধর্ম্ম-সাধনায় এত অকপট হইয়াও, কেমন করিয়া এক নিমিষে ইহার বিপরীত আচরণ সম্ভবপর হয়। বিচিত্র কথা, এই সময় হইতে আমার অন্যান্য জীবনের দাবী তিনি যদিও স্বচ্ছন্দে পূরণ করিতে উদ্বুদ্ধা হইতেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তির পথ সতত রোধ করিয়া দাঁড়াইতেন। তখন ইহা তাঁহার অভিমান বলিয়া মনে হইত; কিন্তু পরে বুঝিয়াছি—আমার অবস্থান্তরের সহিত তাঁহারও ভাবান্তর সুরু হইয়াছিল।

সে যুগের যাঁহারা আমার সহকারী ছিলেন, তাঁহারা আজ আর আমার এই পথের সহযাত্রী নহেন। বোধহয়, একজন ব্যতীত অপর সকলেই বরং বিরুদ্ধপন্থী হইয়াছেন; সেই একজনও আজ আর ইহজগতে নাই। কিন্তু তাঁহাদের সেদিনের প্রীতি ও সাহচর্য্য আমার চিরস্মরণীয় হইয়াই থাকিবে।

দিবাভাগে কর্ম্মস্থলেই কাটিত, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা হইত; অধিকাংশ দিনই ঘরে গিয়া যখন শয়ন করিতাম, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই সময়ে নানা সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাগম হইতে থাকে। যাঁহারা গৃহস্থের আশ্রমে যাইতে সম্মত হইতেন না, তাঁহাদের গঙ্গাতীরের বটবৃক্ষ-তলে আশ্রয় দিতাম। আমার জননী ঠাকুরাণী এই কাজে আমায় উৎসাহ দিতেন। তাঁর ইচ্ছা—সংসার-ধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণ-অতিথির সেবায় পরম পুণ্য অর্জ্জন করি; আমার চিত্ত কিন্তু ইহাতেই সান্ত্বনা পাইত না। হৃদয়ের আকর্ষণ তখন কোন্ অজানা জগতের দিকে ছুটিয়াছে, তাহা নিজেই আমি স্থির করিতে পারিতাম না।

নিত্য পূজা ও প্রাণায়াম সাঙ্গ করিয়া আমি কর্ম্মস্থলে যাইতাম। আমার ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক-চিহ্ন দেখিয়া কত লোক আমায় ভণ্ড বলিয়াছে; কিন্তু আমি তাহাতে বিচলিত হই নাই। প্রাণে তখন আগুন জ্বলিয়াছে; এই সময়ে মাতাঠাকুরাণী পরলোকে গমন করেন। চিত্যাশয্যার উপর যখন তাঁর স্বর্ণমূর্ত্তি অগ্নিসাৎ হইতে লাগিল, তখন সত্যই মনে হইল—কোথায় মজিয়া আছি, এ বন্ধন হইতে মুক্তি চাই!

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কেবল দ্বন্দ্বের মাঝেই জীবনের দিন গণিয়াছি। দ্বন্দ্ব আর অন্য কিছু নহে, বিবেক হাতুড়ির আঘাত দিয়া দুইটি জিনিষের দিকে আমায় সচেতন করিত। এক অজস্র মিথ্যা কথা ও আচরণ হইতে যেন সতর্ক

হইয়া চলি, আর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত যেন পালন করিতে পারি। কথাপ্রসঙ্গে বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিলেই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতাম; আর ইন্দ্রিয়বৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া সম্ভোগ-লালসা চরিতার্থ হওয়ার পর কাঁদিতে বসিতাম। আমার স্ত্রীর পক্ষে ইহা যে কিরূপ ক্লেশের কথা হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নহে; কেননা, দোষের দায় তাঁহার উপর চাপাইয়া, তাঁহাকে শাসাইয়া বলিতাম "তোমায় না ছাড়িলে আমার মুক্তি নাই।" তিনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন, বলিতেন "আমায় ছাড়ার কথা কেন, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; আমি ভোগসম্পর্ক চাহি না, তোমায় চক্ষের সম্মুখে দেখেই আমার পরম আনন্দ।"

তাঁর এই কথা যে কতখানি সত্য, তাহা তাঁর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আচরণ দেখিয়া বুঝিয়াছি; কিন্তু আমি তাঁহাকে এই কালে বড় অযত্ন করিয়াছি। সংসারজীবনে তাঁর যত না দুঃখ, আমার সাধনজীবন লইয়া তাঁহাকে ততোধিক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে।

সাধনার প্রসঙ্গ লইয়া নানা জনের নিকট নানা কথা শুনিতাম। আমার মন্ত্রগুরু তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ শিষ্য-শিষ্যা তন্ত্রমতেই সাধনা করিতেন, আমায় তাঁহারা সঙ্গে লইতেন না। গুরুদেব বলিতেন 'উহাকে এ সকল কথা জানাইওনা, উহার এ পথ নহে।' কাজেই অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও সাধন-চক্রে আমায় এড়াইয়া যখন বসিতে দেখিতাম, আমার বড় কষ্ট হইত। এই রহস্যের মর্ম্মভেদ করার জন্য কিন্তু আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার ফলে, অন্যান্য তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সহায়তায় তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি করার জন্য তাঁহাদের সহিত এমন ভাবে মিশিলাম, যাহা দেখিলে বাহির হইতে সকলেরই মনে হওয়া সম্ভবপর যে, আমি ভৈরবী-চক্রে খুবই মজিয়াছি। আমার এইরূপ কলঙ্কও রটিয়াছিল। এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল। এই তান্ত্রিক সাধক বা সাধিকাগণের মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যিনি বলিতে পারেন যে, আমি পরিদর্শন ভিন্ন তাঁহাদের কর্ম্মে যোগ দিয়াছি। কিন্তু এতদিন আমার স্ত্রী যে বিশ্বাস অন্তরে স্থান দিয়াছিলেন, এই সময়ে তাহার ত্রুটি দেখিলাম। তিনি বলিতেন "তোমার সাধন-ভজনের মধ্যে সত্যই আমার সংশয় হয়, আমায় রক্ষা কর।" আমি

তখন মরিয়া! তাঁহার কোনও কথায় আর কর্ণপাত করার অবসর ছিল না। তন্ত্রসাধনার সঙ্গে সতীমা-সম্প্রদায়ের অনেক সাধক-সাধিকার সহিত আলাপ হইল, বাউল সম্প্রদায়ের দলেও মিশিয়া পড়িলাম, বৈষ্ণবের আখড়ায় যাওয়া-আসাও সুরু হইল। এই সকল প্রচ্ছন্ন সাধনার ভিতরেই যেন তত্ত্ব-বস্তু লুকাইয়া আছে, ইহাই তখন আমার বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়াছিল।

আমাব স্নেহ ও অনুরাগের স্পর্শে যিনি আমার নিষ্ঠুর আচরণ হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতেন, আজ সাধনার আকর্ষণে তাঁর প্রতি ঔদাসীন্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, আমার প্রতি একপ্রকার বিরূপভাব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করিলাম। সত্য কথা বলিতে হইলে, আমায় বলিতে হইবে যে, তন্ত্রসাধনায় আমি নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; কিন্তু সহজিয়ার রীতি অতর্কিতে আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সেখানে সত্যই একটা সম্মোহন-শক্তি ছিল। কথায়, ভাবে, চক্ষের চাহনীতে পরকীয়া রমণী যে মধু ঢালিয়া দিত, হৃদয় তাহাতে যেন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিত। কোন ক্রিয়াকলাপ না থাকিলেও, ভাবসাধনার দিকে হৃদয় এই সময়েবেশ ঝুঁকিয়া পড়িল। সাধনার ক্ষেত্রে তাহা সত্যই আমার দুঃসময় বলা যাইতে পারে; কিন্তু বাংলার সাধন-তত্ত্বে যে অভিজ্ঞতা পাইয়াছি, তাহা বড অভিনব। 'তাঁর' প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমার বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচনা, এই হেতু আত্মজীবনের দিক্‌টা সাধ্যমত বাদ দিয়াই চলিয়াছি—সময়ান্তবে সেই সকল অদ্ভুত সাধনার কথা বলিব।

এই ভাব-তরঙ্গে পড়িয়া আমার হৃদয়টা এমনই সরস হইয়া উঠিল যে, প্রেমের সন্ধানে আমার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। প্রকৃতিসাধনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম। কিন্তু পুরুষের যে ধর্ম্ম, যে আচরণ, তাহা হইতে মুক্তি পাই নাই—ইহা আমার স্ত্রী জানিতেন, বুঝিতেন। এইজন্য আমি কোনরূপ গর্হিত কর্ম্ম না করিলেও, আমাব হৃদয়ের উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার যে ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে, ইহা যেন তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এইজন্যই বিরোধ বাধিয়া যাইত। আর সত্য-সত্যই সাধনার প্রভাবে, আমার হৃদয় তাঁর দিক্ হইতে যে একটু চলকিয়া পড়িয়াছিল—ইহা আজ আর অস্বীকার করি না।

সাধনার এই মহারম্ভ-কালেই মাতৃবিয়োগ হয়। ইহা জীবনের উপর

আর এক গভীর আঘাত। এই আঘাতে আমি সাধনার ক্ষেত্র হইতে কিছুদিনের জন্য ক্ষেত্রান্তরিত হইয়াছিলাম।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মা'র মৃত্যু হয়। এই বৎসরেরই ৭ই আগষ্ট স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণাবাণীর প্রতিবাদস্বরূপ বাংলার নেতৃগণ রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন। তখন আমাদের সম্প্রদায়ও নূতন, স্বদেশীর প্রভাব আমাদের বেশ উদ্বুদ্ধ করিল। সাধনার আর অবসর রহিল না, আমি স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলাম।

কিছুদিনের জন্য উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দ্বন্দ্ব রহিত হইল। তাঁর স্বভাব ছিল—যাহা কিছু করা হইবে, সব স্পষ্ট দিনের আলোয় বিছাইয়া ধরিতে হইবে, গোপন নীতি তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। অথচ আমি এমন ক্ষেত্রে গিয়া পড়িয়াছিলাম, যেখানে সর্ব্ব বিষয় "গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ"; এবং ইহার ভিতর প্রবেশ না করিলে না জানি কি উত্তম রহস্য নিহিত আছে, যাহা হইতে পাছে বঞ্চিত হই, এইজন্য যাহা ধরিয়াছি তাহার চরম না করিয়া ছাড়ি নাই। এইভাবে বাংলার "তক্কেল-মক্কেল" সাধনার অন্ত একপ্রকার দেখিয়াই আবার আত্মসাধনার মুক্ত ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম।

স্বদেশী যুগের দক্ষিণ হাওয়ায় পাল তুলিয়া আমার জীবনের এই নূতন যাত্রা সুরু হইল। অবসরহীন জীবন, সর্ব্বদাই অগ্নিমুখী হইয়া বেড়াই—তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমার স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, সাধ্যমত তাহার ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বের মত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সরল আলাপ, তাহা বন্ধ হইয়াছে। সাধনার আবর্ত্তে পড়িয়া জ্ঞান-গর্ব্ব এমন হইয়াছিল যে, আর এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি পত্নীর সহিত অধিক কথা কহিতে প্রবৃত্তি হইত না। স্বদেশী যুগের তো কথাই নাই, তিনি সময় পাইলেই বলিতেন, "আমার আর কারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাধে—সাধনার কথাই হোক আর দেশের কথাই হোক, একটা সময় করিয়া আমায় শুনাইও।" আমি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। ভাবিতাম—এইবার যে জীবনের ক্ষেত্রে পড়িয়াছি, এখানে এই নগণ্য জীবের কোন সাহায্যই আর সম্ভবপর নহে; বরং তাঁহার প্রতি আসক্তিহীন হইতে পারিলেই আমার কার্য্য অধিকতর সিদ্ধ হইবে। তাঁর প্রতি উপেক্ষার এই সূত্রপাত। তাঁহার অপেক্ষা হীনবুদ্ধি

পুরুষ ও নারীর সম্মুখে বক্তৃতা করিয়াছি, তাহাদিগকে দেশের অবস্থা, এমন কি ধর্ম্মসাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছি, কিন্তু আমার স্ত্রী যখনই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে অবজ্ঞায় ফিরাইয়াছি যে, আজ সে কথা ভাবিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মন অনুতাপে দগ্ধ হয়। অথচ গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখি—জগতে এত ভাল তো কাহাকেও বাসি নাই। যে যন্ত্রীর হস্তে জীবন যন্ত্র সেদিনের মত আজও বাজিতেছে, তিনি তবে এত নিষ্ঠুর পরিহাস করিলেন কেন? যে উত্তর পাই, তাহাতে আমার হৃদয় সান্ত্বনায় ভরিয়া ওঠে। তাঁর ক্ষুদ্র হৃদয়কে পরিতুষ্ট করিতে আমায় ভগবান্ সামর্থ্য দেন নাই বটে; কিন্তু আজ তিনি দেবীর আসন পাইয়াছেন যে ত্যাগে ও তপস্যায়, সে আগুনে আমায় নিষ্ঠুর হইয়াই ফুৎকার দিতে হইয়াছে। এই সাধন-যুগের কয়েকটা পরিচ্ছেদ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই লিখিয়াছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তাহা হস্তগত হইল। এই হেতু স্মরণ করিয়া সব কথা বলার চেয়ে, অতঃপর সে দিনের সংরক্ষিত ইতিহাসের কথাই বলা ভাল শুনাইবে।

প্রবৃত্তির দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু সাধনা বলিয়া কিছু গৃহীত হইলে, সে মোহ সহজে দূর হয় না। "সতীমা-সম্প্রদায়ে" প্রবেশ করিয়া আমায় বহু ক্ষেত্রে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। সাধনার মূল নীতি যাহা তাহা কল্যাণময়, জীবের শ্রেয়োবিধানে অনুকূল; কিন্তু মানুষের স্বার্থ-সংযুক্ত হইয়া তাহা কোথাও-কোথাও এমন কদাকার ও বীভৎস হইয়া উঠে, যাহা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। আমি যখন যে সাধন-ক্ষেত্রে গিয়া পড়িয়াছি, অযাচিত ভাবেই তাহার দীক্ষা লাভ করিয়াছি। "সতীমা-সম্প্রদায়ে" প্রবেশ করিয়া আমায় মন্ত্র লইতে হইয়াছিল; কাজেই নিষ্ঠাসহকারে সম্প্রদায়ের নীতি পালন করিতাম। প্রতি শুক্রবার রাত্রে এই সম্প্রদায়ের যে উপাসনা-রীতি প্রবর্ত্তিত আছে, যথানিয়মে তাহাতে আমি যোগদান করিতাম। মধ্যে-মধ্যে আমার স্ত্রীও সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু তিনি ইহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করেন নাই, মনে-মনে বিরক্ত হইতেন। অবশ্য তিনি আমায় কখনও বাধা দিতেন না। আমি ধর্ম্ম বলিয়া যাহা গ্রহণ

করিতাম, তাহা তাঁর নিতান্ত অপ্রিয় ও ব্যথার বিষয় হইলেও, উহা তিনি নীরবেই সহ্য করিতেন। তিনি ছিলেন সহিষ্ণুতার দেবীমূর্ত্তি; ধরিত্রীর ন্যায় তাঁর সহিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। কিন্তু আজ বুঝিতেছি—ব্যথার ভার বহিয়া তাঁর রক্তমাংসের শরীর অবসন্ন হইয়াই পড়িতেছিল। জরামরণহীন সত্তার ধর্ম্মে তাঁর হৃদয়-মন উদ্বুদ্ধ থাকিত; কিন্তু দেহ বুঝি সে ভার আর বহন করিতে পারিতেছিল না।

আমি সব কিছুই বিশ্বাস করিতাম, তিনি সব কিছুই সংশয়ের চক্ষে দেখিতেন। অপ্রাকৃত ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও প্রলোভনের বস্তু আছে। আমি ছিলাম লুব্ধ; কাজেই মোহ আমায় মজাইত। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠা, পতিপরায়ণা সাধ্বী, জগতের আর কোন বস্তুতে তাঁর আকর্ষণ ছিল না; কাজেই কোন সম্মোহনে তিনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের মধ্যে প্রেম ও ঐক্যের তুলনা ছিল না; কিন্তু মধ্যে-মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহের সুরও বাজিত। আমার চিত্ত বহুমুখে ধাবিত হইত, তিনি তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আমার স্বভাব কোন বাধা মানিত না; কাজেই তাঁর হৃদয় আঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িত।

দুই-একটা উদাহরণ দিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। এক যুবতী ব্রাহ্মণ-কন্যা ভাববিহ্বলা হইয়া নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দশা-প্রাপ্তির অবস্থা! আমি ইহার মধ্যে নিগূঢ় অধ্যাত্ম-রহস্যের সন্ধান করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "তুমি পুরুষ, এ সবে ভুলিও না; ইহা ভণ্ডামী ভিন্ন কিছু নয়।" আমি ধমক দিয়া বলিলাম "সকল বিষয় সংশয়ের চক্ষে দেখা তোমার স্বভাব হইয়াছে। আমার জ্ঞান তোমার চেয়ে বেশী, অতএব আমায় বাধা দিও না।" কাজেই উভয়ের মধ্যে যে অনাবিল প্রেমের প্রবাহ বহিত, তাহা এই ঘটনায় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রশ্রয়ে সেই নারী অধিকারের দাবী এত বড় করিয়া লইলেন যে, আমার স্ত্রীর উপর তাহা একপ্রকার অত্যাচার হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁর মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার সাধ্য রহিল না। কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেই আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতাম। আমার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলে, তিনি বড় ভীতা হইতেন। তাঁর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান এত অধিক ছিল যে, স্বামীর কাছে তিরস্কৃতা হইয়াছেন, ইহা অপরে পাছে

জানিতে পারে, এই লজ্জার ভয়ে তিনি অনেক অন্যায় আচরণ নীরবেই সহ্য করিতেন। ধর্ম্মের দায়ে কত ব্যথাই তাঁহাকে দিয়াছি!

এক রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া দেখি—শয্যাবস্ত্র ধূলি-সমাচ্ছন্ন ও স্থানে-স্থানে অলক্তরঞ্জিত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহা সেই যুবতী ব্রাহ্মণ-কন্যার কার্য্য। তিনি ভাবমুখে মধ্যাহ্নে ঘরে আসিয়া আমার স্ত্রীকে বলেন "চুল বাঁধিয়া দে।" আদেশ পালন না করিলে পাছে আমি বিরক্ত হই, কাজেই চুল বাঁধার পর, তাঁর আদেশ-মত পায়ে আলতা পরাইয়া দেওয়া, পরিধানের জন্য নূতন বস্ত্র দান করা, আলমারীতে যত গন্ধদ্রব্য ছিল সব তাঁর অঙ্গে মাখাইয়া দেওয়া, সিকায় যে সব খাদ্যদ্রব্য ছিল তাহা নিবেদন করা, এইরূপ ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা সাঙ্গ হইলে, তিনি বিছানায় স্বেচ্ছামত বিহার করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছেন। সেদিন মনে-মনে বিরক্ত হইলেও, আমি মুখে কিছু বলিলাম না। তিনি আমার মুখ দেখিয়া, অন্তরের ভাব বুঝিয়া বলিলেন "দাসীর কথা বাসি হইলে মিষ্ট লাগিবে—আমি বলি, ও সবের মধ্যে কিছু নাই, দু'বেলা ইষ্টমন্ত্র নিয়া থাক, উহাতেই তোমার সব হইবে, আমি ঠিক বলিতেছি।" তিনি অনুকূল অবস্থা পাইলে দৃঢ়কণ্ঠে সত্যপ্রকাশ করিতেন; কিন্তু আমি কোনদিন তাহা গ্রহণ করি নাই।

আর এক দিন সন্ধ্যার পর, কলিকাতা হইতে আসিয়া শুনিলাম—উক্ত ব্রাহ্মণ-কন্যা এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধাইয়াছেন। শ্মশানে এক চণ্ডালের শব আসিয়াছিল—তিনি ভাবমুখে সেই শবদেহের দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার দাবী শবদাহকারীরা অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই। ঐ কর্ত্তিত হস্ত আম গাছের ডালে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ অমাবস্যার রাত্রে ঐ হস্ত ভর করিয়া, আউলচাঁদ যাহার যাহা অভীষ্ট, তাহাকে তাহা দান করিবেন। পাড়া-প্রতিবাসী যাহার যাহা কামনা, তাহা লইয়া দলে-দলে ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে। পাড়ার বাতাসে যেন একটা আতঙ্কের ভাব ছম্-ছম্ করিতেছে। কি এক অপ্রত্যাশিত-ঘটনার আশঙ্কায় সকলেই উৎকণ্ঠিত। আমারও ডাক পড়িয়াছিল; এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কৌতূহল আমারও বড় কম হইল না। তাড়াতাড়ি জলযোগ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিলাম। আমার স্ত্রী দরজা

আগলাইয়া বলিলেন "তুমি কি পাগল হইলে ? ঐ সবে গিয়া কাজ নাই ; আমার মাথার দিব্য !"

সহস্র-বার তাঁর কথা অমান্য করি, সহস্র-বার যাহা তাঁর কাছে শ্রেয়ঃ বোধ হয় না, তাহা লইয়া আপত্তি তুলিতে তিনি কুণ্ঠিতা হন না—ইহাই ছিল তাঁর স্বভাব। এই ক্ষেত্রেও তাঁর বারণ শুনিলাম না, অন্ধকার-রাত্রে সেই আম-কাঁঠালের বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

একটী প্রকাণ্ড আম গাছের গোড়ায় উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহার উপরে বসিয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা দুলিয়া-দুলিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কথা বলিতেছেন। চতুর্দ্দিকে পাড়ার মেয়েরা ভীড় করিয়া বসিয়া আছে—যাহার যাহা কামনা জানাইতেছে। আমার আগমন-সংবাদ পাইয়া তিনি নাম করিয়া আমায় কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। ভর ভাঙ্গিবার সময়ে তিনি আমায় ডাকিয়া নিকটে বসাইতেন; তারপর আমারই ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাইতেন। ভক্তবৃন্দ তাঁর মুখে-চক্ষে জল ছিটাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিত। তিনি সচেতন হইয়া সলজ্জ মুখখানি ঢাকিয়া, একবার আমার দিকে তাকাইয়া, উঠিয়া বসিতেন। আমি যেন কৃতার্থ হইতাম। আজও আমায় ডাকিয়া কাছে বসাইবার কারণ বুঝিলাম। উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক—পুরুষের মধ্যে এই যুবতীর এক আত্মীয়, আর একজন আমারই মত ভক্ত জনৈক ঘরামী ; কাজেই আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ-যুবতী আমার নাম করিয়া বলিলেন "দেখ, ঐ গাছের ডালে—বল দেখি কে ?"

আমি উপরে বিশেষ-ভাবে দৃষ্টিপাত করিলাম। অমাবস্যার রাত্রি। চতুর্দ্দিকে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। জোনাকির আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। শাখাপত্রে অন্ধকার কুণ্ডলী পাকাইয়া ভয়ের কারণ হইয়াছে। গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুই দেখিলাম না। তখন তিনি ঘরামী ভক্তকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "তুই দেখ্‌ছিস্ ?" সে বোধহয় দিব্য-দৃষ্টি পাইয়াছিল—উপরের দিকে চাহিয়াই বলিল "হাঁ, মা !"

যুবতী বলিলেন "কি দেখছিস্ ?"

"রাঙ্গা ছড়ি হাতে, গেরুয়া-পরা, গলায় বনফুলের মালা, খড়ম পায়ে—আহা, বাবা আউলচাঁদ "

দর্শকদের মধ্যে রোমাঞ্চ পড়িয়া গেল। ঘন-ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শ্রুত হইল। আমি বলিলাম "কৈ হে!"

"ঐ যে বাবু! ঐ-ঐ"—এমন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, অবধারিত হস্ত-সঙ্কেতে সে গাছের ডাল দেখাইয়া দিল, যেন নিশ্চয় সে ইহা লক্ষ্য করিতেছে। ব্রাহ্মণী আমায় বলিলেন, "আয়, আমার কোলে আয়।" সত্যই আমায় আকর্ষণ করিয়া তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন। চক্ষে কিছু না দেখিলেও, মনে হইল—ঘরামীর মত আমিও পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির পুনরুক্তি করি; কিন্তু বিবেকে বাধিল। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিলাম "কিছু না—বাজে!"

সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আমার কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "সব বাজে!" আবার কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিল "সকলের চক্ষে কি বাবা দেখা দেন!" ঘরামীর নাম করিয়া বলিল "অমুক মায়ের ভক্ত যে!" তারপর সিন্নী দেওয়া হইল। যথারীতি মায়ের মুখে অনর্গল-বাণী নির্গত হইল। যাহার যাহা মানসিক, পাঁচ পয়সা হইতে পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত "মকদ্দমার কড়ি" জমা দেওয়া হইল। সেদিনও 'মা' ভাবস্থা হইয়া আমার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। মুখে-হাতে জল ছিটাইয়া দেওয়ার পর, যেন সুপ্তোত্থিত হইয়া, তিনি লজ্জায় মাথার কাপড় টানিয়া সরিয়া বসিলেন। আমি প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। স্ত্রীকে বলিলাম "তোমার কথাই সত্য, আজ হইতে আর এই সংশ্রবে যাইব না।" তিনি এতক্ষণ দারুণ উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছিলেন। হয়তো মায়ের আদেশ যদি হয়, সেই রাত্রে গাছে চড়িয়া বসিতে পারি অথবা শ্মশান হইতে মড়া বহিয়া আনিতে পারি—তাঁর মনে এই সব দুর্ভাবনার সীমা ছিল না; তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এইরূপ অত্যাচার ও আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের উপদ্রবে তাঁহাকে যে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত, আজ তাহা বুঝিয়া অনুতপ্ত হই। কিন্তু যন্ত্রী আমায় যেমন নাচাইয়াছেন, আমার তদ্রূপ নাচিতে হইয়াছে। আমি তাঁর হস্তে একান্ত ক্রীড়ণক-রূপেই নিজেকে ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। তবে একটা কথা আমায় বলিতেই হইবে—বিচার করিয়া আজ ইহা ভাল কি মন্দ, তাহার নির্ণয় হইবে না। আমার অভিজ্ঞতা—সাধনার ঘূর্ণাবর্ত্তে মানুষকে যত বিপন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়, চরিত্রপতনে তাহাকে বোধ হয় তত

বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় না। এইজন্য যদি কেহ সাধন চায়, তাহার পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় সঙ্কেতহীন ধর্ম্মজীবন বড় বিপজ্জনক। বরং নৈতিক চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া জীবন গড়া ভাল; তবু সদ্‌গুরুর আশ্রয় না মিলিলে, সাধন-ভজন শ্রেয়ঃ নহে। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া এই পথে ঝাঁপাইয়া পড়া যুক্তিহীন কথা।

সাধনার কথা মহাভারত-সদৃশ, সব কথার প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে তুলিব না। যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁকে আঘাত দিয়াছি, তাহাই উল্লেখ করিব। সহজিয়া-সাধনার ক্ষেত্রে হৃদয় লইয়া বড় বিপন্ন হইয়াছিলাম। কোন এক গোপন সভায় একজন সহজিয়া গুরুর সাক্ষাৎকার পাই। সেই সভায় তাঁহাকে ঘিরিয়া অসংখ্য গৃহস্থ-মহিলা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় গ্রীষ্মকাল। ঘরের মধ্যে লোকসমাগম অনেক হইয়াছিল। যিনি গুরু, তাঁর বয়স অধিক হয় নাই—চব্বিশ-পঁচিশ হইবে। মাথার চুল কিছু বড়, বিরল শ্মশ্রু-গুম্ফ-বেষ্টনে চারু মুখশ্রী। মহিলাবৃন্দ তাঁহাকে পাখা করিতেছিলেন; কেহ ভিজা গামছা দিয়া অঙ্গের স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিতেছিলেন। তিনি মিষ্ট-মিষ্ট কথা বলিতেছিলেন, সব কথাই শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের প্রেমতত্ত্ব। কথার শেষে, মিষ্টান্ন-ভোজনের আনন্দ। তাঁর মুখে কোন এক মহিলা একটী মিষ্টান্ন দিয়া, নিজের মুখ দিয়াই প্রসাদ লইলেন। যে রমণী ইহা করিলেন, তিনি কুল-নারী। অনুভব করিলাম—ঘরের মধ্যে এমন এক অপূর্ব্ব প্রভাবের সৃষ্টি হইয়াছে যে, এই পুরুষের সহিত কোন আচরণই নিন্দা বা অপযশের কারণ বলিয়া কারও মনে দ্বিধা-বোধ হয় না; বরং এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব পুলক-সঞ্চার হইতেছিল। কেহ তাঁর মুখ হইতে প্রসাদ লইলেন; কোন-কোন অবগুণ্ঠনবতী রমণী এতখানি সাহস করিলেন না—মিষ্টান্নের ভগ্নাংশ মুখে দিয়াই ধন্যা হইলেন। তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া তিনি অনেকের মুখে দিলেন। এই আচরণে যেন বিদ্যুৎ-সঞ্চার হইতেছিল। তাঁর মুখকমল যেন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সমবেত মহিলাদের কপোল-গণ্ডও রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল; সকলের চক্ষুঃ দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। আজ বুঝি—পরনারী-স্পর্শে আত্মঘাতী হৃদয়ের লক্ষে-লক্ষে মরণ আহ্বান করার এই মৃত্যু-মদিরাই সেদিন এই সব সাধক-সাধিকার ভজনানন্দ-রূপে গৃহীত হইয়াছিল। আমার মুখেও একজন

একখণ্ড মিষ্টান্ন গুঁজিয়া দিলেন। তাঁর চর্ব্বিত তাম্বুলও গ্রহণ করিতে হইল। আমি একজন মহিলার সাথী হইয়া এই সভায় যোগদান করার অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। সেই অসংখ্য-মহিলা-পরিবেষ্টিত সাধক-পুরুষের মুখে ঈষৎ-হাস্যরেখা এবং অপরের ওষ্ঠ-সংস্পর্শে তাঁর আরক্ত মুখ-মণ্ডল কেবল অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতেছিল—ইহা ব্যতীত তাঁর অন্য কোনপ্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখি নাই।

অতর্কিত-চিন্তার একপ্রকার আবিষ্ট ভাব লইয়া আমি ঘরে ফিবিলাম। আজকাল সন্ধ্যার পব কোন-না-কোন সাধন-ভজন ব্যাপার সাঙ্গ করিয়া বাড়ী ফিরি—ইহা আমার স্ত্রী জানিতেন এবং সব কথা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন। কাহার-কাহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, এ কথা জেরা কবিয়া তিনি জানিয়া লইতেন। আমি কতক বলিতাম, কতক বলিতাম না; তিনি শেষে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পাশ ফিরিয়া নিদ্রা যাইতেন। আমার জীবনে সাধন-জগতের বিচিত্র স্বপ্ন তখন বন্যার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে; ভাবিতে লাগিলাম—কে সে হৃদয়ের রাজা, যিনি নারা-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে আনন্দের আস্বাদ দিতে অবতরণ করেন, কোথায় তাঁর মধুর বাঁশরী বাজে-রে! কোথায় তাঁর চরণ-নূপুরের ধ্বনি প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে!

গুরু-মন্ত্র তো জপিয়া যাই, শ্বাস গণিয়া প্রাণায়াম করি, কমণ্ডলু ভর্ত্তি করিয়া নাসা-পান করি, ত্রাটকাভ্যাসের জন্য চক্ষুঃ ঠিকরাইয়া পড়ে; কিন্তু হৃদয় যে তৃপ্তি পায় না! নিজে না করি, তন্ত্র ও সহজিয়ার চক্র-মধ্যে উপস্থিত হইলে, যেন প্রাণে-মনে কিসের স্পর্শ অনুভূত হয়! নিজের স্ত্রীর চক্ষের দিকে চাহিয়া হৃদয় তেমন লম্ফ দিয়া উঠে না; কিন্তু বাহিরে যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহারা যখন একদৃষ্টিতে আমার দিকে চান, তখন হৃদয় নৃত্য করে, প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার হয়, অথচ অধিক দূর আগাইতে ভয় হয়। সকলেই বলে—তীরে দাঁড়াইয়া সাঁতার-শিক্ষা কি হয়, জলে নামিতে হইবে। কিন্তু ভরসা করিয়া কোন আচার গ্রহণ করিতে পারি না; কে যেন বাধা দেয়। তখন কি বুঝিয়াছিলাম—বাহিরে যখন ঘুরিয়া মরি, অন্তরের দেবী তাঁর সবখানি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা উজাড় করিয়া আমায় এমন করিয়া রক্ষা করেন! যেদিন তাহা বুঝিলাম,

সেইদিন গাহিলাম—"ওগো দেবি, জীবনের ধ্রুবজ্যোতিঃ, জ্ঞানে-অজ্ঞানে তোমার অনুসরণ করিয়াই মুক্তি পাইয়াছি ; তুমি আমার যথার্থ সহধর্ম্মিণী।"

যেদিন হৃদয় কলুষিত করিয়া বাড়ী ফিরিতাম, সেদিন দেখিতাম—তিনি ব্যথিতা। যেদিন বাহিরের কথায় প্রাণে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত, দেখিতাম—তিনি ক্ষুব্ধা। যেদিন বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতাম, সেদিন তিনিও চঞ্চল মস্তিষ্কে যাহা-তাহা বলিয়া আমায় উদ্ব্যস্ত করিতেন। দায়ী করিতাম তাঁহাকে ; কিন্তু আত্ম-স্বরূপেরই প্রতিবিম্ব-রূপিণী তিনি যে সত্য প্রকাশ করিতেন, তাহা কেন বুঝি নাই! জীবনযাত্রার দুর্গম পথটুকুর সঙ্গিনী কেন আজ সিদ্ধজীবনযাত্রার সহচরী হইল না! তাই কাঁদি, তাই বিরহের গানে কণ্ঠে অনাহত ঝঙ্কার তুলিয়া মুখরিত মর্ম্ম-বীণাখানি সযত্নে রক্ষা করি। আমি মুক্তি-মোক্ষ চাহি না ; চাহি জ্যোতির্ম্ময়ী চেতনার স্তরে এমনই ভাস্বর জীবন—যার প্রতি পদে আলো ঠিকরাইয়া পড়িবে, প্রতি শ্বাসে শান্তি ও আনন্দের মলয় বহিবে। সে অমৃতময় জীবনের সন্ধান পাইয়াও আজ তাহা জীবনে মূর্ত্ত হইল না, কালের উদ্যত ফণা আজ তাহাকে সফল হইতে দিল না ; কিন্তু কে যেন গোপন পুরে বসিয়া মধুর মূর্চ্ছনায় গাহে—"আসিবে আবার, তুমি আসিবে আবার!"

বাহিরের আকর্ষণে আমি সেদিন আত্মহারা হইয়াছিলাম। ভগবানের পথে চলার মৃত্যু-সঙ্কল্প করিয়া জীবনের যাত্রা সুরু হইয়াছিল, তবুও আমি মোহগ্রস্ত হইলাম। হৃদয় কলুষিত হইল, সাধনার নামে সত্যই দুই হাতে পাপ-পঙ্ক অঙ্গে মাখিলাম।

এই সময়ে ঘরে আসিয়া তৃপ্তি পাইতাম না। হৃদয়হারা তবুও শান্তি চাহিত, তবুও স্নেহানুরাগের অমৃত-স্পর্শের লালসায় তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিত ; কিন্তু সে দুর্জ্জয় অভিমান কেমন করিয়া দূর হইবে! আমি যে তখন তাঁহাকে প্রতারণা করিতেছি। আমার দাবী তিনি রাখিতেন না। তাঁর মুখে আর প্রফুল্লতার হাসি ছিল না। তাঁর মুখের ভাষণ বন্ধ হইয়াছিল। আমার দিকে চাহিয়া চক্ষে তাঁর অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। ভাবিতাম—তিনি কি অন্তর্য্যামিনী!

কথা আমাদের বন্ধ হইয়াছিল। কেন তিনি আমার সহিত বাক্যালাপ করেন না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে

সম্ভবপর ছিল না। আমি বুঝিতাম—হৃদয় যে আমার হারাইয়া গিয়াছে; যে অমিয়াস্বাদ পাইয়া তিনি শত দুঃখের সংসারে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া আমায় অশেষ-তৃপ্তিতে ভরাইয়া রাখিতেন, সে উৎস-দ্বার যে আমিই রুদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু যেখানে কামনা বাসা বাঁধিয়া বসে, সেখানে ক্রোধের আগুন সহজেই জলিয়া উঠে; আত্মগ্লানির আগুনে যত পুড়িতাম, ততই তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতাম। সামান্য ছুঁতা ধরিয়া কটু তিরস্কারে তাঁকে অধিক কাঁদাইতাম। তিনি যদি প্রফুল্লমুখে আমায় বুকে তুলিয়া লইতেন, বোধ হয় আর কোন কথা থাকিত না। কিন্তু আজ আশ্চর্য্য হইয়া যাই—হৃদয় যখনই আমার চঞ্চল হইয়াছে, তখনই তাঁর কাছে পাইয়াছি অনাদব, অনাস্থা। আমার হৃদয়েব সহিত তাঁর যোগসূত্র এমন ভাবে বাঁধা ছিল যে, কল্পলোকে যদি হৃদয়েব সুর বেসুরা বাজিত, অমনিই তাঁর আচরণেব পরিবর্ত্তন দেখিতাম। তখন এতখানি অধ্যাত্ম-রহস্যের সন্ধান পাই নাই। হৃদয়সঙ্গিনী কেবল মুখের সম্বোধন-বাক্য নয়, সাধ্য-বস্তুরূপে তাহাকে পাইতে হয়। আমি যে যথার্থ সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছিলাম।

কথাটা হয় তো চাপা দিয়া যাইতেছি। না, তাঁর পবিত্র স্মৃতির সহিত কিছুই অস্পষ্ট রাখিব না—ঘটনা যেমন ঘটিয়াছিল, তাহা না বলিলে, তাঁর অসাধারণ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

ঘর ছাড়িয়া দূবে গিয়া পড়িয়াছিলাম। পরকে আপন করার প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। পরকীয়া বতিব কথা তখন আজিকার মত গভীরভাবে বুঝি নাই। চির আপনার জনকে চিনিবার জন্যই আমায় একবার কেন্দ্রচক্রের বৃত্ত প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে হইয়াছিল। আমি হৃদয় হারাইয়াছিলাম যাঁহার মধ্যে, তাঁর অপূর্ব্ব আকর্ষণ আমায় মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। উগ্র-মদিরা-সেবনে যে আত্মঘাতী হয়, সে মরণকে আলিঙ্গন করিতেও কুণ্ঠা করে না। আমি সত্যই উন্মাদ হইয়াছিলাম। বাড়ীতে আমার স্থান ছিল না; তবুও জোর করিয়া থাকিতাম। হাসি আমার সেখানেই ফুটিয়া উঠিত, তবুও অন্যত্র দেঁতো হাসি হাসিতাম। যেদিকে ঝোঁক গিয়াছে, সেই দিকে জীবন-মরণ-পণে ঝুঁকিয়া পড়ার স্বভাব আমার ভাল-মন্দ দুই-ই করিয়াছে। সেদিনের সে ঝোঁক যে সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই এবং সে ভাব যে

আমার স্ত্রীর চক্ষুঃ এড়াইয়া যায় নাই, তাহা বুঝিয়া আজ ভাবি—সতর্ক হইলে কি হইবে, ভাগবত-যাত্রীকে প্রকৃতিও আশ্রয় দেয় না, আত্মরক্ষার আনুকূল্য করে না; স্বয়ং ভগবান্‌ই দুর্গম পথে রক্ষা করেন, নতুবা আজ আমি নরকের কৃমি হইয়া থাকিতাম।

যাঁহার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া বিভোর হইয়া যাইতাম, তাঁর চক্ষেও যে বিদ্যুৎ ঠিকরাইয়া পড়িত। হৃদয় স্পন্দনে-স্পন্দনে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়া অন্তরে-বাহিরে সংযুক্ত হইতে চাহিত। সে কি আকর্ষণ! মনে হইত—ঝাঁপাইয়া পড়ি। সে রমণীয় ওষ্ঠপুটে সেদিন সুধা ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। ঠিক নেশাখোরের মত ঘরে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিতাম। আমার স্ত্রীর হৃদয় যে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আমি স্বয়ং বিষধর হইয়া দংশন করিতেছি, আর তিনি জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া মৃতপ্রায়-বিষণ্ণা, তাহা না বুঝিয়া তাঁহার নিকট প্রফুল্ল আচরণের দাবী করিতাম। তিনি উপেক্ষা করিলে, ক্রোধে চক্ষুঃ ঝাঁপিয়া আগুনের সঙ্গে জলও আসিত।

উপাসনার মন্ত্রোচ্চারণকালে কিন্তু ভিতর হইতে প্রার্থনা জাগিত "হে জীবনদেবতা, এই সম্মোহন হইতে আমায় মুক্তি দাও।" দিবারাত্রি কে যেন অন্তরে দেবাসুরের সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কাহার নীরব-প্রার্থনা, আকুল অন্তর-নিবেদন সেদিন আমায় পাপ হইতে মুক্তি দিয়াছিল, তাহা আজ বুঝিয়াছি; সেদিন বুঝিলে, আত্মস্বরূপের মহিমা বুঝি নিজের কাছে এমন অমূল্য বস্তু বলিয়া অবধারণ করা সম্ভবপর হইত না।

লালসার আগুন সেদিন ঊর্দ্ধশিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আসক্তির মদিরায় দুইজনেই মাতাল হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছিলাম; হঠাৎ কোথা হইতে দুর্জ্জয় সাহসে হৃদয় আমার লাফাইয়া উঠিল। অকস্মাৎ মুখ দিয়া বাহির হইল "দেখুন, আপনাকে আমি মায়ের মতই ভালবাসি।"

হঠাৎ বজ্রপতনের শব্দেও বুঝি মানুষ এমন করিয়া চমকিয়া উঠে না! সে মোহন কটাক্ষ কঠোর ভ্রূকুটিপূর্ণ হইয়া আমায় যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিল। বিরক্তির কুটিল কুঞ্চনে আরক্ত মুখমণ্ডল পাণ্ডুর বিকৃত বর্ণ ধারণ করিল। বোধ হয়, ক্রোধে তাঁর অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছিল। আমি চক্ষুঃ নত করিলাম। আমার বোধ হইল—তিনি আমার নিকট হইতে অপসৃতা হইয়াছেন। আমি বিক্ষুব্ধ প্রাণে সে রাত্রে বাড়ী ফিরিলাম।

মুখে আমার কথা ছিল না। যেন একটা প্রলয় কাণ্ড বাধাইয়াছি! হৃদয়ে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। অন্য দিনের মত আজ আর স্ত্রীর সহিত কথোপকথনের ছলনা করিলাম না; ভিতরে কে যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বাহিরে তাহার রোধ হইল না। এতদিন জোর করিয়া যাহা পারি নাই, আজ কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহা সিদ্ধ করিল। নারীর কোমল-প্রকৃতি আজ আর কঠোর-মূর্ত্তি লইয়া শাস্তিবিধান করিল না। কিন্তু বুঝিলাম—হৃদয়ের ধর্ম্ম সত্যের অবিকৃত-মূর্ত্তি দেখিতে দেয় না। করুণার ধারা মরুদগ্ধ প্রাণ শীতল করে, সত্য-মিথ্যা নির্ব্বাচন করে না। আমার স্ত্রী ধারণা করিয়াছিলেন—তাঁর নির্ম্মম আচরণ আমার ব্যথার কারণ হইয়াছে; তাই তাঁর স্নেহ-শীতল হৃদয় আমায় সেদিন সান্ত্বনা দিতে উদ্যত হইল। আমি লুব্ধ, তস্কর; চুরি করিয়াই সে রাত্রি বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম। আমাদের কলহের শেষ হইল। মর্ম্ম-বেদনা মর্ম্মে বহিয়াই আবার তিনি স্বচ্ছন্দ-মূর্ত্তিতে আমায় বুকে তুলিয়া লইলেন। তিনি যাহা সহিয়া লইতেন, তাহা আর ব্যথা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। অবশ্য কোন কিছু গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। যে ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা স্তব্ধ হইল। কোন কিছুর উপলব্ধি হওয়ার বহু পূর্ব্বে যেমন কারণ-জগতে তাহার অঙ্কুর দেখা দেয়, তেমনি লয়কালেও তাহাব মূলক্ষয় কারণ-জগতেই অগ্রে হইয়া থাকে—ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার স্ত্রীর এই প্রফুল্লশ্রী আমার ব্যাধি-নিবসন না হওয়ার পূর্ব্বেই কেন প্রকাশ পাইল, তাহা লইয়া আর ভবিষ্যতে দ্বন্দ্ব ছিল না।

"মা" বলিলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে জীবন নিরাময় দিব্য হওয়া সাধনসাপেক্ষ হইত না। কথা কাজ নয়, ভাষা ভাবের আভাস মাত্র। সত্যের ঘনীভূত রূপ ফুটাইতে সাধককে হৃদয় চিরিয়াই রক্ত দিতে হয়।

সেদিন নিষ্কৃতি পাইলাম—কিন্তু হৃদয়ের আকর্ষণ ঘুচিল না। বরং ব্যথা দিয়াছি বলিয়া অনুতপ্ত হইলাম। কিন্তু এবার আর চিন্তা করার অবসর রহিল না। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমার এই নূতন সাধনার তির্য্যক্ প্রবাহ বহিতেছিল, তিনি সেদিন একটী নিমেষ অবসর দিলেন না, ক্ষুধিতা শার্দ্দূলীর ন্যায় আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যদি সাধ্য

থাকিত, তবে এই কালভুজঙ্গিনীকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিতাম ; কিন্তু যুবতী রমণীর স্পর্শ বিরক্তির বস্তু বলিয়া তো বোধ হইল না ! হলাহলের তীব্র জ্বালা বোধে তাহা পরিত্যাগ করিতে তো বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিয়া উঠিল না ! আরাম ও তৃপ্তির আস্বাদই অনুভব করিলাম। এই গুরুতর অপরাধের বোঝা বহিয়া সেদিন ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস হয় নাই ; কিন্তু আশ্চর্য্য ! সে রাত্রে তো আমার স্ত্রী বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে আমার হৃদয় আঁধার করিলেন না ! তাঁর অপূর্ব্ব আচরণ, তাঁর স্নেহাদরপূর্ণ সম্ভাষণ, তাঁর সরল হৃদয়ের অমিয়-স্পর্শ আমায় অভাবনীয় সান্ত্বনা দিল। আমার ব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছিল ; তাই তিনি যেন নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু আমিই সাধ করিয়া ঘরের মট্‌কায় আগুন ধরাইয়া দিলাম। চিরদিন তাহাই করিয়াছি। জগতে একজন ছিলেন, যাঁর কাছে হৃদয় গোপন রাখি নাই। আজ সেই সাধনার শক্তিতেই জগতের হাটে জীবনের ভার নামাইয়া নিষ্কৃতি চাহিতেছি।

সব কথাই ব্যক্ত করিলাম। তিনি সঘন নিঃশ্বাসের সহিত জেরা করিয়া, সকল কথা জানিয়া লইলেন। কথা যখন শেষ হইয়াছে, তখন তাঁর বক্ষোবিদীর্ণ-করা ঘন-ঘন নিঃশ্বাস-শব্দে আমি বিচলিত হইলাম। আমার কোন সান্ত্বনাই তিনি গ্রহণ করিলেন না। যে দীর্ঘশ্বাস তাঁর জীবনের যবনিকাপাতের পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তেমনিই কাল-নিঃশ্বাস সেদিনও বহিতে দেখিয়াছি। তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। আমি তাঁর বক্ষে হস্ত রক্ষা করা মাত্র, তিনি ধীরে-ধীরে আমার হাতখানি সরাইয়া দিলেন। দৃষ্টি ঊর্দ্ধে রাখিয়া তাঁর এমনভাবে শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল যে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার একজন আত্মীয়াকে ডাকিয়া, তাঁহার শুশ্রূষা করিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন "এ যে ফিটের মত হইয়াছে !"

সারা রাত্রি তিনি একটিও কথা বলিলেন না। প্রাতঃকালেও তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন না। রাত্রিতে তাঁর অসুস্থ হওয়ার কথা সকলেই শুনিল ; কাজেই কেহ অন্য কিছু মনে করিল না। সন্ধ্যার সময়ে অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত বাড়ী ফিরিলাম। তাঁহাকে সেই অবস্থাতেই দেখিলাম। সারা দিন তিনি কিছুই আহার করেন নাই। আমি অনেক সাধিলাম—ক্ষমা চাহিলাম, মিনতি জ্ঞাপন করিলাম। তাঁর হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা

ভাবিয়া, আমিও মর্ম্মাহত হইলাম। সারা রাত্রি দুইজনেই কাঁদিয়া কাটাইলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি বলিলেন "দেখ, আমারই অদৃষ্ট! তোমার যেখানে অমঙ্গল, অকল্যাণ, তাহা আমি বুঝিতে পারি। আমায় আদর কর, ভালবাস, ইহা আমি চাই না। তোমার মন্দ যাহাতে না হয়, ইহাই আমার প্রাণ-নিঙ্ড়ান কাম্য। ভগবান্ আমার সে সাধ ভাঙ্গিয়া দিলেন, এ জীবন আর রাখিব না। তোমার চক্ষের সম্মুখে মরণে সুখ নাই —আমায় বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম "তুমি আমায় যতখানি অপরাধী মনে করিতেছ, সত্যই তত অপরাধ করি নাই। আমি যে একান্ত অসহায় হইয়াই তাহার ঐ আচরণ সহ্য করিয়াছি, তাহা কি বুঝিতেছ না!"

তিনি আবার জেরা আরম্ভ করিলেন—আমার রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ঐ সময়ে কিরূপ আস্বাদ অনুভব করিয়াছিল, তাহাও জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কে যেন তাঁর শরীর আশ্রয় করিয়া আমায় সেদিন নূতন চেতনার জগতে তুলিয়া দিতে চাহে। আমি যাহা কল্পনা করি নাই, ধারণা করি নাই, তাঁহার জেরায় তাহা বাহির হইল। পর-নারীস্পর্শ দোষের নহে; কিন্তু সুখানুভূতিই যে ব্যভিচার, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। আমায় অনুতপ্ত দেখিয়া, কাতর হইয়া, তিনি বলিলেন, "একবার অবিশ্বাসী হইয়াছ, আর তোমায় বিশ্বাস করা শক্ত হইবে; কিন্তু যদি আমায় বাঁচাইতে চাও, তবে ইহার মূল ক্ষয় কর।"

আমি আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম "তুমি আর ভাবিও না। ভগবান্ সামান্য আঘাত দিয়া আমায় চিরদিনের জন্য মুক্তি দিলেন; আর বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিব না।"

ব্যাপারটার এত সহজে শেষ হইল না। অন্যায় করিলে কথায় নিষ্পত্তি করা তাঁহার কাছে চলিত না, ইহা যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহারা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে; আমার অপরাধের বিচারও বিনা শাস্তিতে ঘটিয়া উঠিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন "এক পক্ষের কথা শুনিয়া তোমায় নিরপরাধ বলিয়া স্বীকার করিব না; অন্য পক্ষের কথাও শুনিব, নতুবা আমার মৃত্যুপণ।"

সে যে কি বিপদে পড়িলাম, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে। একজন

কুল-নারীর পক্ষে তার এই গোপন আচরণের কথা এমনভাবে প্রকাশ করা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করা গেল না। তাঁহাকে লইয়া পদে-পদে অন্যায়ের শাস্তি পাওয়ার আশঙ্কাই আমার জীবন নিরাময় করিয়াছিল।

সে এক তপস্যা—এই দায় হইতে মুক্তি না পাইলে আমার যেন প্রায়শ্চিত্ত হয় না; কাজেই সেদিন সে দুঃসাধ্য কর্ম্মও তাঁর সিদ্ধ ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছিল। অবশেষে অন্য পক্ষের কথা শুনিয়া, তিনি আমায় প্রত্যয় করিলেন। জীবন আমার রহস্যময়; প্রেমের অবদানই বহিয়াছি; অতি বড় শত্রু যিনি, তিনিও আমায় তাই পদে-পদে সাহায্য করিয়াছেন। চাহিয়া কোথাও হইতে ফিরিতে হয় নাই। সময়, পারিপার্শ্বিক ও ঘটনার আবর্ত্তে আমরা কেহ শত্রু, কেহ মিত্র, কেহ আপন, কেহ পব হইয়া থাকি। আমার সাধনপথের সে যুগযাত্রী, সত্যই মহিমময়ী; নতুবা আমাব অনুরোধ পালন করিয়া স্বেচ্ছায় কলঙ্কেব পসরা বহিবেন কেন? আমি তাঁকে আজও নমস্কার করি।

গৃহদেবীছি লেন—অমল নির্ম্মাল্য। পৃথিবীর এক কণা ধূলি পাছে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করে, এই আতঙ্কে তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন। যদি আমার কোন বন্ধুও তাঁর দিকে ফিরিয়া চাহিয়াছেন, অমনি সে কথা আমায় শুনাইয়া তবে তিনি নিশ্চিন্তা হইতেন।

একদিন বাড়ী আসিয়া, তাঁর ললাটে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁর সে বেদনাপূর্ণ অশ্রুসিক্ত নয়নের দৃষ্টি আজিও ভুলিতে পারি নাই। এইভাবে নিজেকে গড়িয়াছিলেন বলিয়াই তিনি অসংখ্য পুরুষের মাঝে আপনাকে এমন স্বতন্ত্র ও প্রচ্ছন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অথচ সেবার কোনরূপ ত্রুটি হইত না। তাঁর অকপট হৃদয়ের বিগলিত-স্নেহধারায় সকলেই সান্ত্বনা পাইত। তাঁর মাতৃত্বের অটল আসন তাই এমনভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তিনি নিজেকে কত বড় অপরাধী মনে করিয়া যে এই আঘাত পাওয়ার কারণ সেদিন করুণ কণ্ঠে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজও

বিহ্বল হই—প্রকাশের ভাষা পাই না। কোন প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে গিয়া, তাঁর একজন সঙ্গিনীকে পথপার্শ্বের বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, তিনিও কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে যেমন তাঁহাব পাশে গিয়া দাঁড়াইবেন, অমনি একজন পুরুষের অপলক-দৃষ্টি তাঁহার চক্ষেব উপব পড়িল। তিনি বজ্রাহতার ন্যায় দ্রুত ফিরিতে গিয়া, চৌকাটে পা আট্‌কাইয়া একেবারে আছাড খাইয়া পড়েন। আঘাতের জন্য তিনি ব্যথিতা নহেন, তাঁব অপরাধ ক্ষমা করিলেও, অন্তরে যে লজ্জা ও ঘৃণাব আঁচড পডিয়াছিল, সেই অনুভূতিই তাঁকে পীড়িতা করিয়া তুলিয়াছিল।

আব একবার তিনি কোন স্থানে নিমন্ত্রিতা হইয়া বিপদ্‌গ্রস্তা হন। সে কথাও অপবাধীব ন্যায় ব্যক্ত কবিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলেন—আমার সঙ্গ ছাড়া আব কোথাও যাইবেন না। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি সে প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন।

তিনি কাহাবও মুখেব দিকে চাহিয়া কথা বলিতেন না, কাহাকেও স্পর্শ কবিতেন না, অথচ তাঁহাকে আমি বন্দিনী করিয়া রাখি নাই। সকল স্থানেই তিনি স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেন এবং সকলের সম্মুখে বাহির হইতেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সতত ভূমিসংলগ্না হইয়া থাকিত। শিক্ষায়, সাধনায় তিনি ইহা অভ্যাস করেন নাই। এই স্বভাব লইয়াই তিনি জন্মিয়াছিলেন।

কাজেই আমাব পূর্ব্বোক্ত অপরাধেব মাত্রা তাঁর কাছে খুব বড় হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেব মত কবিয়াই তিনি সব কিছু দেখিতে চাহিতেন। তাঁর মনেব মত হওয়া যে আমার অধিকার-বহির্ভূত বস্তু, তাহা তিনি বুঝিতেন না। ইহা লইয়াই তো আমাদের দ্বন্দ্ব; আমাদেব মধ্যে ব্যথার আড়াল আসিয়া পডিত। এই ঘটনার পরিসমাপ্তি-হেতু সাধ্যমত যাহা করিবার, তাহা কবিয়াও যখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল না, তখন আমি উদাসীন হইলাম। তিনি নিকটে পাইলেই যাহা বলিবার নহে, তাহাও বলিতেন। সহিবারও সীমা আছে, অসহ্য হইলে, তিরস্কারের সহিত দুই-এক ঘা বসাইয়া দিতাম। জীবন আমাদের বিষময় হইয়া উঠিল। তিনি সাশ্রুনয়নে পিত্রালয়ে যাওয়ার প্রস্তাব তুলিলেন। আমিও নিরন্তর খোঁচা

খাওয়ার দায় হইতে মুক্তি চাহিতেছিলাম ; তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

হৃদয় বাঁধা পড়িয়াছিল। সেখানে তাই ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিত। কিন্তু সাধনার আকর্ষণ ছাড়িবার সামগ্রী ছিল না। তবে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম—সাধনার ক্ষেত্রে আত্মস্থ হইতে শিখিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় কোথাও আর বিচলিত-চিত্ত হই নাই। সহজিয়ার গুরু মিলিয়াছিল। নিজের সাধন-কথা—হইলই বা স্ত্রী, তিনি যতক্ষণ না উপযুক্তা হন, ততক্ষণ তাঁহার কাছেও তাহা প্রকাশ করিতে নাই—এই কথায় হৃদয় শক্ত হইয়াছিল। তাহা ব্যতীত, ঠিক পথ যখন পাইলাম, তখন গোপন করার কিছু ছিলও না। তবুও তাহা ব্যক্ত করিলে যদি তিনি ব্যথা পান, এইজন্য নীরব হইয়াই থাকিতাম। একদিন কিন্তু তাঁকে আমার সকল সাধনার রহস্য মুক্তকণ্ঠেই বলিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন "ধন্য তুমি, এত কথাও পেটে রাখিতে পার !"

আমি সে যুগের আর কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আমার এই সাধন-পর্ব্বের কথা শেষ করিব। সহজিয়ার মত তন্ত্র-সাধনার দিকেও আমার প্রবল ঝোঁক হইয়াছিল। আমার গুরুদেব মহাতান্ত্রিক। কিন্তু তিনি আমায় তন্ত্র-সাধনার সন্ধান দিতেন না। আমার বাহির দেখিয়া ভিতরের আকুলতা এখনও ধরা যায় না ; একান্ত অন্তরঙ্গ ব্যতীত, আজও আমি যাহা নহি, তাহাই অনেকে ধারণা করিয়া বসেন। এ অপরাধ আমার স্বভাবের—উপরে চিরদিনই একটা আবর্ত্ত থাকিয়া যায়। এই কারণেই তাঁর নিকট হইতে আমি তন্ত্র-সাধনার কোন সন্ধানই পাই নাই।

আমার ইষ্টদেবী—বিষ্ণুশক্তি। কিন্তু আচরণ করিতাম আমি শৈব উপাসকের মত। আবার যখন সহজিয়া সাধনায় বিভোর হইয়াছি, তখন ললাটে সিন্দুরবিন্দু, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ জড়াইয়া তান্ত্রিকের ভেক লইয়াছি। ইহা যে স্বেচ্ছায় করিয়াছি, তাহা নহে। আমায় একজন যেমন চালাইয়াছেন, বাধ্য হইয়াই তদ্রূপ চলিয়াছি ; কোথাও তাই আত্মচেষ্টা ও সাধনার আকাঙ্ক্ষা বলিতে যাহা, তাহা ঠিক প্রশ্রয় পায় নাই।

আর একটা আশ্চর্য্যকর বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। ভিতরে কোন ভাবের উদয় হইলেই, তাহা সাধিবার চেষ্টা যতই করিয়াছি, ততই ব্যর্থ হইয়াছি,

বঞ্চিত হইয়াছি। যখন নিরাশ হইয়া জীবন-তরণীর কর্ণধার যিনি, তাঁর হাতে হাল ছাড়িয়াছি, তখনই তরী তীরে ভিড়িয়াছে। আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়; অন্তর্য্যামীর জয় কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয় না।

যে কোন ভাবই ভিতরে জাগিয়া উঠুক, তাহা সিদ্ধ হওয়ার দুইটি স্তর চিরদিন দেখিতেছি। প্রথমতঃ, চেষ্টার দ্বারা একটা মিশ্র শক্তির আশ্রয়ে কতকটা নিজেকে নাস্তানাবুদ করা; তারপর ভিতরটা প্রশান্ত হইলে, কোথা হইতে অভাবনীয় ঘটনা-সংঘটনে সেই ভাব সিদ্ধ হওয়া। সাধনার যুগে এই দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহ ওতপ্রোত ভাবে আমায় কখনও ডুবাইয়াছে, কখনও ভাসাইয়া তুলিয়াছে। তবে চেষ্টার দ্বারা যাহা করিয়াছি, তাহাও ভগবানের আশীর্ব্বাদে রূপান্তরিত হইয়াছে; চেষ্টাব মূল্য আমার জীবনে তাই একান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে।

তন্ত্র-সাধনার গোড়ায় যাঁহাব সন্ধান পাইলাম, তাঁর সাধনার ভঙ্গী আমাব অনুকূল ছিল না। তিনি সর্ব্বপ্রথমেই উত্তরসাধিকাগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। এই বীরাচারী তন্ত্র-সাধকের সাধনা বড বিচিত্র ধরণের ছিল। তিনি দশমহাবিদ্যাব সাধনা করিতেন—প্রতিমার পরিবর্ত্তে,উত্তরসাধিকাকেই প্রতীকের আসনে স্থাপন করিয়া উপাসনা করিতেন। তারা, ভুবনেশ্বরী, মাতঙ্গী প্রভৃতি সকল রূপের পূজাই তিনি এই নারীমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া সমাপন করিয়াছিলেন। কালীপূজাব রাত্রিতে, কৃষ্ণাঙ্গী উলঙ্গিনী নাবীমূর্ত্তিকে বুকের উপর দাঁড কবাইয়া নিজের মধ্যে শিবত্বেব অনুভূতি অল্প চিত্তাকর্ষক নহে। এই যুগে বাংলায় প্রতিষ্ঠাহীন বহু সাধকের অমানুষিক সাধনার পরিচয় পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। সঙ্কল্প ও অভ্যাসের বলে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য কবিতাম—অতুলনীয়া সাধন-নিষ্ঠা সত্ত্বেও, ইঁহাদের ব্যবহারিক জীবনের কোন উন্নতিই দেখিতাম না। এইখানেই সবিস্ময়ে ভিতর হইতে প্রশ্ন হইত—ইহা ঐন্দ্রজালিক ক্রীডা, জীবন-দেবতার সন্ধান ইহাতে মিলে কি না। পূর্ব্বোক্ত তান্ত্রিক সাধক আমায় বলিয়াছিলেন—ছিন্নমস্তার পূজা-সমাপ্তি হইলেই তিনি সিদ্ধ হইবেন, উত্তর-সাধিকার মধ্যে দেবী আবিষ্টা হইলেই ইহা সম্পূর্ণ হয়। আমি শিহরিয়া উঠিতাম। এখনও কোথাও কোন বারাঙ্গনার কণ্ঠনালী ছিন্ন হওয়ার সংবাদ পাইলে, আমার এই ছিন্নমস্তার উপাসনার কথাই মনে পড়িয়া যায়। সেই

সাধকের সহিত যে সুযোগে পরিচয় ঘটিয়াছিল, সে সুযোগ আর না থাকায়, ইহার সন্ধান আর রাখি নাই।

দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকার বেদনা আমি এইভাবে ভুলিতে আরম্ভ করিলাম। সারা রাত্রি পথে ঘুরিয়া কাটাইতাম। এখন যেখানে প্রবর্ত্তক আশ্রম, তখন সেখানে অরণ্য ছিল। কি জানি কেন, তখন সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। একদিন নিশাযোগে এক কাপালিকের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তাহার উলঙ্গ বলিষ্ঠ শরীর দেখিলে, কোনরূপ নিশাচর প্রাণী বলিয়াই ভ্রম হয়। আমি কাপালিকের লক্ষণ জানিতাম, তাহার হস্তে নর-কপাল ছিল। কপালে কৃষ্ণবর্ণের ত্রিবলী-চিহ্ন দেখিয়া দূর হইতে প্রণাম করিলাম। সে বরাবর শ্মশানে নামিয়া গেল। আমি সভয়ে কোন কিছু সাধনার সন্ধান পাইবার জন্য তাহার অনুসরণ করিলাম। শেষে পিশাচের চেয়েও ভীষণ মুখভঙ্গী করিয়া—একটা হাঁসপাতালের মড়া পুড়িতেছিল, তাহা হইতে অর্দ্ধ-জলন্ত কাষ্ঠ উঠাইয়া—সে আমার দিকে ধাবিত হইল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করি।

সাধনা অনেক পাই; কিছুতেই অন্তর সান্ত্বনা পায় না। ইষ্ট-মন্ত্র যথারীতি জপ করিয়াও যেন কি অবশিষ্ট থাকে, কি যেন না পাইলে জীবন সফল হয় না। এইরূপ একটা আকুলতাই আমায় উন্মাদ করিয়াছিল। তিনি পিত্রালয়ে যাওয়ার ফলে, আমি এক প্রকার স্থির করিয়া লইলাম—যদি কাহারও আশ্রয় পাই, সংসার ছাড়িয়া যাইব। আমার এই ঔদাসীন্য সকলের চক্ষে পড়িয়াছিল। তাঁর কাছেও আমার অবস্থার কথা গিয়া পৌঁছিয়াছিল। তিনিও ব্যস্ত হইয়া লোকের পর লোক পাঠাইয়া, আমি যাহাতে তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আসি, এই অনুনয় জানাইতেছিলেন।

একবার মনে হইত—ছুটিয়া যাই; হৃদয় বোধ হয় তাঁর অভাবেই এমনভাবে হাহাকার করে। কিন্তু এই হাহাকার কিসের জন্য, তাহা আজ বুঝিয়াছি। বুকের মধ্যে সত্যই ঢেঁকির পাড় পড়িত। সে যে কি অসহ্য বেদনা, তাহা বুঝাইবার নহে। আর এই ব্যথার দায়েই যেদিকে দুই চক্ষুঃ গিয়াছে, ছুটিয়াছি। হৃদয় বিলাইয়া দিয়াছি—কেহই তৃপ্তি দিতে পারে নাই।

একদিন মধ্যরাত্রে হতাশ হইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার এক পরিচিত বন্ধুর সহিত দেখা হইল। সাধন-জীবনের অনেকখানি

ইতিহাস এই অকৃত্রিম সুহৃৎকে (১) জড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ; তাই ইঁহাকে বাদ দিয়া আমার জীবন-সঙ্গিনীর জীবনও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমায় একাকী মাঘ মাসের শীতে পথের ধারে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, একবার আগাইয়া, আবার তিনি ফিরিয়া আসিলেন—আমার মুখের দিকে তাকাইয়া এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন এই নিঝুম রাতে একটা সজিনা গাছের দিকে তাকাইয়া, নিজের অস্তিত্বের তুলনায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ভাবুকতার চক্ষে সন্দর্শন করিতেছিলাম। বোধ হয়, সেই কথাই বলিলাম। বন্ধু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—তারপর বলিলেন "আমার সহিত কাল সন্ধ্যায় সাক্ষাৎকার হইবে কি?" আমার আপত্তি ছিল না। যথাসময়ে দুই বন্ধু মিলিয়া নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা হইল। সাধন-ভজন সম্বন্ধে ইঁহার অভিজ্ঞতা আমার অপেক্ষা অধিক ছিল; কিন্তু সব দিল্লীর লাড্ডু—কোথাও কিছু নাই!

তন্ত্র-সাধনার সকল অনুষ্ঠানের কথাই হইল। এই বন্ধুর কোন অনুষ্ঠানই বাকী নাই, অথচ হৃদয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইল কৈ? ইঁহার সঙ্গে আর একজন অকপট সুহৃদ্ আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন। আমরা গলা-জড়াজড়ি করিয়া সারা রাত্রি কাঁদিতাম আর বলিতাম "হে ভগবান্, গুরু মিলাও"। একদিন আবেগভরে নানা কথা কহিতে-কহিতে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। সেদিন বন্ধুর পরিচর্য্যায় আবার প্রকৃতিস্থ হই। কিন্তু ইহাই আমার দিব্যানুভূতির প্রথম স্পর্শ। কোন অনুষ্ঠানই করি নাই। অথচ এ কি অপার্থিব চেতনার স্তরে আমার সবখানি উঠিয়া স্থির হইল। এইদিন হইতেই আমি আপনার ভিতর যেন এক নূতন বস্তুর সন্ধান পাইলাম। কিন্তু যখন ইচ্ছা, তখনই তাহার আস্বাদ পাই না—ইহাই হইল ক্ষোভের কারণ। এই সময় হইতেই আমার মুখে কথা ফুটিল। আমি বলিতাম, আমার বন্ধুগণ শুনিতেন—ঈশ্বর-প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিত না।

আমার স্ত্রী খুব অস্থিরা হইয়া পড়িলেন। আমার এই অকপট বন্ধুর জননী-ঠাকুরাণীও[২] একজন সাধিকা ছিলেন। তাঁর নিকট হইতে আমি বাংলার সমাজে যে সকল সহজিয়া ও তন্ত্রমার্গের রহস্যময়ী সাধনা অপ্রতিহত

(১) ৺সাগরকালী ঘোষ

২) ৺সাগরকালী ঘোষের জননী ৺নৃত্যকেশী ঘোষ

গতিতে চলিতেছে, তাহার অনেক সন্ধান পাইয়াছিলাম। তিনি আমার মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। কিন্তু কি জানি সেদিন কি প্রভাবে, তাঁর নতি আমার চরণে প্রথম উৎসর্গের অর্ঘ্য স্থাপন করিল। তিনি এই ঘটনার পর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকেন নাই; এমন-কি এক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁর মৃত্যুর দিন আমিই স্থির করিয়াছিলাম এবং তিনি আমার বাক্য সত্য করিয়া চিরযুগের বন্ধন দৃঢ় করিয়া গেলেন। তাঁরই পরামর্শে আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

'তিনি' আমায় নূতন করিয়া দেখিলেন। দুইজনে যেন অনেক দূর হইয়া পড়িয়াছি। তিনি যে অন্তরে-অন্তরে অতিশয় আকুলা হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম। তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন "তুমি নাকি আজকাল পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াও?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "কয়দিন এইরূপ অবস্থা গিয়াছে বটে; কিন্তু আর কোথাও যাই না, নিজের বাড়ীতেই থাকি।"

এই দুই মাসের অদর্শনে আমাদের মধ্যে যে ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, তাহা এক রাত্রেই কাটিয়া গেল। আমিও কোন এক অপ্রাকৃত জগতে ঠাঁই করিয়া লইয়াছি মনে করিয়া যতটা স্থির-নিশ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাও এক রাত্রির মিলনেই স্বপ্নের মত মিথ্যায় পরিণত হইল। সন্ন্যাসী-বৈরাগীর সহিত মিশিতেছি, ইহার জন্য তিনি খুবই ভাবিয়াছেন। আমার জন্ম-সময়ে পিতা-ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্কট-কাল উপস্থিত হওয়ায়, আমায় ছাইয়ের স্তূপে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ পিতৃদেবের সহসা অবস্থা-পরিবর্ত্তন হওয়ায়, আমার প্রতি পুনঃ দৃষ্টি দেওয়া হয়। জন্মমাত্র ক্রন্দন করি নাই বলিয়া এই বিপদের দিনে আমায় সকলে মৃত-শিশু-বোধেই পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু জলের ঝাপ্‌টা খাইয়া বাঁচার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জন্ম-কথা লইয়া আমার উপর বেশ একটি আরোপ পড়িয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র ভস্মলিপ্ত হওয়া ভবিষ্যতে সন্ন্যাসের সূচনাই করে। আমার স্ত্রীও এই কথা শুনিয়াছিলেন; কাজেই আমাকে নিকটে পাইয়া তিনি আশ্বস্তা হইলেন এবং আর কখনও আমায় ছাড়িয়া একদিনও থাকিবেন না—ইহাই বার-বার বলিতে লাগিলেন।

সংসারে আমাদের সুখ ছিল না। সংসারের অধিকাংশ কাজই তাঁহাকে

করিতে হইত। আমার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের সহিত মদীয় পিতৃদেব "সত্যনারায়ণের" দারুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রাতর্পূজা, মধ্যাহ্ন-ভোগ ও সন্ধ্যারতি —এই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন আমার স্ত্রীকেই একা করিতে হইত। ইহা ব্যতীত, প্রতি পূর্ণিমায় দেববিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া বাড়ীতে ক্ষুদ্র একটী উৎসবের আয়োজন হইত। নিদারুণ শ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দেহ না বহিলে, শয্যা লইতে হয়; কিন্তু কেহ সে কথা বুঝিত না। তিনি অসমর্থা হইলে, সব কাজই অসমাপ্ত থাকিত। আবার এই হেতু যার উপর কর্ম্মের ভার, সকলে তারই ত্রুটী দেখিত। মানুষের পক্ষে এত কাজ যে সম্ভবপর নহে, তাহা কেহ ভাবিত না। এই অবিচার আমরা দুইজনেই দেখিতাম; অন্যে দেখিত—আমার স্ত্রী কর্ম্মে অবহেলা করিতেছেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে বাক্যবাণ বর্ষিত হইত। সহিবার শক্তি তাঁর অসাধারণ ছিল। তবুও মাঝে-মাঝে ধৈর্য্য হারাইয়া তিনি দুই-এক কথার জবাব দিয়া বসিতেন; আর রক্ষা থাকিত না। বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বাধিত। তাঁর পক্ষ লওয়ার মানুষ আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ ছিল না; অথচ সেই সব মেয়েলী ঝগড়ায় প্রকাশ্যে তাঁর পক্ষ লইয়া আমায় দাঁড়াইতেও বাধিত। কাজেই তাঁর নীরব ক্রন্দন বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতাম, সান্ত্বনা দিয়া শুধু বলিতাম "তোমার এ দুঃখ থাকিবে না।"

সে যুগে আমার স্ত্রীকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, এ যুগে তাঁহারা অবাক্ হইয়াই তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার মুখাকৃতিরও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি তিলে-তিলে একেবারেই রূপান্তরিতা হইয়াছিলেন। তখন তাঁর শরীর শীর্ণ ছিল। তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রম ছিল অথচ যথারীতি আহার যুটিত না। সংসারের কর্ত্রী যিনি, তাঁর হাতেই সব—এই হেতু বাড়ীর বধূ যদি তাঁর অপ্রিয়া হয়, তাহা হইলে তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকে না। আমার স্ত্রীর এই অবস্থাই হইয়াছিল। জঠরাগ্নি সর্ব্বদাই জলিত, তবুও আমার কাছে তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত। সংসারের অকথ্য দুঃখ সহিয়া তিনি বেদনার মূর্ত্তি-রূপেই আমায় পূর্ণ করিতেন। আমি সবই বুঝিতাম; কিন্তু যৌথ পরিবারে আমার হাতে একটি পয়সা রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না। সে দুঃখ বলিয়া বুঝাইবার নয়। পেটে ক্ষুধা লইয়াই তাঁর দিন কাটিত।

দুর্ব্বল শরীর ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জ্বর দেখা দিল। সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের গুটী বাহির হইল। তাঁর অবস্থা দেখিয়া ভয়ে আমার হৃদয় দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। বসন্ত-চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া উহা দুষ্ট বসন্ত বলিয়া আরও ভয় বাড়াইয়া দিলেন। কেহ তাঁর কাছে আসিত না। তাঁর মুখেই বসন্তের গুটী অধিক বাহির হইয়াছিল। মুখখানি ভীষণ হইয়াছিল। আমি তাঁর বিছানায় বসিয়া থাকিতাম। পাছে ভয়ে আমিও না দেখি, এইজন্য তিনি কাতর কণ্ঠে বলিতেন "আমার বসন্ত হইয়াছে বলিয়া তুমি ভয় করিও না, তোমার অঙ্গে কাঁটার আঁচড় লাগিবে না।"

জীবনের এই দাবী বড করুণ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বাহির হইয়াছিল। তাঁর আরক্ত নয়নের কোণে-কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়াছিল। আমি তাঁহাকে আরও বুকের কাছে লইয়া বলিতাম "তোমার শরীর যদি ক্ষতবিক্ষত হয়, তবুও আমি সমস্ত হৃদয় বিছাইয়া সে দেহ ধারণ করিব।" আমি তাঁর বিছানায় শয়ন করিতাম। দারুণ যন্ত্রণায় অস্থিরা হইলে তাঁর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতাম। সেদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলাম "দয়াময়, হৃদয়ের ধর্ম্ম প্রেম, আমার আশ্রয় আর কেহ নাই ; আমাকে কাঙ্গাল করিও না।" উহা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কথা। সেদিন অন্তর্য্যামী আমার প্রার্থনা উপেক্ষা করেন নাই ; দীর্ঘ তেইশ বৎসর পরে আবার তাঁর জীবন-সঙ্কট-দিন যখন আসিল, তখন সে প্রার্থনা তো কণ্ঠে কৈ আর বাহির হইল না! কেবলই বলিয়াছি "জগদীশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" বিধাতা আমার মাথায় বজ্রাঘাত করিয়া তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, আমায় হাসি-মুখেই তাই ইহা আজ বরণ করিতে হইয়াছে।

তিনি ধীরে-ধীরে সুস্থা হইয়া উঠিলেন। আমার কর্ত্তব্য-পালনের দিকে তাঁর কিরূপ দৃষ্টি ছিল, তাহা ক্ষুদ্র কথা হইলেও বলিব। তিনি একপ্রকার অশিক্ষিতা কুলমহিলা, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয় হইতেই তাঁর পরিচয় সম্ভবপর—এইজন্যই ইহার উল্লেখ একান্ত অনাবশ্যক নহে।

আমি শবদেহ দেখিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতাম। পুরুষের চরিত্রে এরূপ দৌর্ব্বল্য শোভনীয় নহে, ইহা মনে হওয়া মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—"এক শত আট শবদাহ করিব।" ভগবান্ প্রথমেই আমায় পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন। এক শীতের রাত্রি, অমাবস্যা তিথি, শনিবার—হুগলী

ঘুটিয়াবাজার হইতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই ইহার জন্য ডাক আসিল। বুক গুড়্-গুড়্ করিয়া উঠিল। যাহা ধরি, তাহার জন্য মৃত্যুপণ করা আমার স্বভাব। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। তবু যিনি আহ্বান লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে একখানি গাড়ী ডাকিতে বলিয়া ঘরে গিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম "আজ মৃতদাহ-সংকারে দীক্ষা লইব।" তিনি আমার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন—আমার অবস্থা কিরূপ। কোথায় আমার দুর্ব্বলতা, ভীরুতা আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা তিনি আমার মুখ দেখিয়াই ধরিতে পারিতেন। তিনি বলিলেন "আগে নিজে শক্ত হও, তারপর এই সব কাজে হাত দিও।"

বিরক্ত হওয়ার কারণ ছিল না; কেননা, ভয়ে আমার অন্তর-পুরুষ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহা আমি নিজেই বুঝিতেছিলাম। কাজেই আমার মুখে-চক্ষে সে ভাব যে দেখিবে, তাহারই চক্ষে পড়িবে। কিন্তু পত্নীর নিকট আত্মদৌর্ব্বল্য ঢাকা দিবার জন্য বলিলাম "শীঘ্র পায়ে মোজা পরাইয়া দাও।" ভয়ে শীতের মাত্রা অধিক বোধ হইতেছিল—যেন হাত-পা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না! তিনি জানিতেন—যাহা ধরিব, তাহা ছাড়িব না। অতএব আমি বিছানায় চিং হইয়া শুইয়া পড়িলাম, তিনি এক জোড়া উলের মোজা পায়ে পরাইতে লাগিলেন। হৃৎপিণ্ডের উল্লম্ফনের সঙ্গে পাকস্থলীও মোচড় দিয়া উঠিল। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যখনই যে কাজ নূতন করিতে যাই, আমার এমনই স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। গাড়ী ডাকার অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্বটুকুর মধ্যে বার চারেক ভেদ হইল। তিনি বিমর্ষ চিত্তে বলিলেন "পথে যদি ভেদ হয়, কি হবে! তা' ছাড়া নিজেই যদি অসুস্থ হও, কাজ করিবে কে?"

গাড়ী আসিয়া পড়িল। কথা কহিলে, বোধ হয় বমি হইবে। মুখ বুজিয়া ধীরে-ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। তিনি কাতরদৃষ্টিতে সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বারণ মানিব না, তিনি জানিতেন। এইজন্য আমায় যেখানে অসমর্থ বুঝিতেন, সেখানে নিজের হৃদয় লইয়া তিনি যে উৎকণ্ঠার বেদনা বহিতেন, তাহা আর বলিবার নহে।

ঈশ্বরের পরীক্ষা বৈ কি! ভীষণ অন্ধকার ভেদ করিয়া একটী প্রদীপের আলো দেখা যাইতেছিল। গভীর বনের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাকা গৃহের বারান্দায় এক বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার বিধবা

কন্যা করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রতিবেশীমহলে সাড়া নাই। শব-বহনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আমার সঙ্গী হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমার শরীরে যেন সিংহ-বীর্য্য জাগিয়া উঠিল। সম্মুখে একটা লাউ গাছের মাচা ছিল; তাহা মড়্‌মড়্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া, একটা শক্ত বাঁশ বাহির করিয়া, শবদেহটাকে একখানি দশহাতি কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইলাম। তারপর দুইজন দুই দিকে কাঁধ দিয়া পথে বাহির হইলাম। আর একজন হ্যারিকেন লইয়া চলিল। অন্ধকার পথে যখনই শবের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, পথের আলোয় শব-মুণ্ডের বিকট দৃষ্টি গতির তালে-তালে আমায় যেন মাথা নাড়িয়া ডাকিয়াছে। আমার পশ্চাৎ কেহ নাই, সারা পথ যেন কার তুষার-শীতল হস্তস্পর্শ স্কন্ধে অনুভব করিয়াছি। শবদাহ-ব্রতের ইহাই আরম্ভ। তারপর প্রায় প্রতি রাত্রেই উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম। ডাকেরও বিরাম ছিল না। ক্রমে আমাকে লোকে "স্বদেশী গুলিখোর" বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল। আমার সংখ্যা পূরণ করার সুযোগ দিতেও ভগবান্ সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। এক মাতাল বন্ধু জুটিয়াছিল; সে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া মড়া যোগাড় করিত এবং একেবারে আমার দুয়ারে লইয়া উপস্থিত হইত। বাড়ীর লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না। শেষে এমন হইল, শবদাহ করার লোকাভাব না থাকিলেও, আমার ডাক পড়িত। জীবনে সেও এক অপূর্ব্ব পর্ব্ব!

পত্নী অসুস্থা হইলে কি হয়, এই সময়ে আমার সুহৃদ্ আসিয়া ডাক দিলেন। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল। আমি শুনিয়াই বলিলাম "আমার স্ত্রীর বসন্ত হইয়াছে, কেমন করিয়া যাইব!"

বন্ধু যেন একটু বিদ্রূপ করিয়াই বলিলেন "থাক্, থাক্, আসিতে হইবে না, এ সময়ে এমন ওজর অনেকেই করে!"

কথাটা 'তাঁর' কাণে গিয়াছিল। আমি কেবল বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "তুমি যাও।" আমি অসম্মত হইলাম। এই রাত্রে ঘরে কেহ নাই। বসন্ত রোগ বলিয়া সকলে যে নিঃসঙ্কোচে বিছানায় বসিবে, তাহা নহে। একা তাঁহাকে রাখিয়া যাওয়া কোন মতে যুক্তিসঙ্গতও নহে।

তিনি জিদ্ ধরিলেন—বাতিটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, যাওয়ার জন্যই

বার-বার বলিতে লাগিলেন। শেষে বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন "ইহাতেই আমি অধিক অসুস্থ হইব।" আমি দেখিয়াছি, তাঁর কোন প্রিয় কার্য্য করিতে চাহিলে, তাহা যদি তাঁহার ইচ্ছানুগত না হইত, তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া ললাট কুঞ্চন করিয়া বলিতেন "তুমি কি মনে কর—ইহা আমায় সুখী করিবে? কিন্তু ইহাতেই আমি অধিক দুঃখ পাইব।" নিজের দিক্‌টা তিনি কোন দিন সর্ব্বাগ্রে দেখিতেন না; আমার ধর্ম্ম ও সাধনার ক্ষতি, আমার কর্ম্ম ও জীবনের অন্তরায় যাহা, তাহা তিনি কখনও করিতেন না। যন্ত্রণা-কাতর শয্যাগৃহে তাঁহাকে একা রাখিয়া, আমায় সে রাত্রি শ্মশানে গিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। বন্ধু প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া আমায় জোর করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দেন।

তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু শরীরে বল পাইতে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, সংসারে অশান্তিও তত বাড়িয়া চলিল। তাঁর হাতের কাজ আর কেহই করিত না; এই হেতু দেববিগ্রহের সেবাও প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। আমি কি যে করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। অন্যায় সহিয়া-সহিয়া আমারও শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। কয় দিন জ্বর-ভোগের পর যেদিন পথ্য পাইব, সেদিন এক নূতন ঘটনায়, আমার ভবিষ্যৎ অতি দুঃখ ও বেদনার সহিত সূচিত হইয়া দেখা দিল।

বাড়ীতে আমার স্ত্রীকে লইয়া একটা গোলমাল গোড়া হইতেই ছিল। সম্প্রতি তাঁর শরীর অসুস্থ হওয়ায়, কাজের জন্যই উহা একটু বড় হইয়াই দেখা দিল। আমার ভ্রাতৃবধূঠাকুরাণী আসিয়া আমায় ডাকিলেন। আমি মনে করিলাম—অন্নপথ্যের দিন, বোধহয় ভোজনের জন্যই আহ্বান আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে গেলাম। বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি আমার মাসিক বেতনের টাকা কয়টী সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন "এই নাও ভাই, তোমার উপায়ের টাকা—নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা কর, রাত্রিদিন খ্যাঁচাখেচি ভাল নয়।"

আমি ইহার অর্থ বুঝিলাম না। শরীর সুস্থ থাকিলে হয়তো স্থিরভাবে সহ্য করিতাম। আমার মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমার স্ত্রী তখন এক কাঁড়ি বাসন লইয়া বসিয়াছিলেন; তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "শীঘ্র চল, এখানে আর এক দণ্ড থাকিব না।"

তিনি কথায় কর্ণপাত না করিয়া, ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলেন। আমি উন্মত্তবৎ তাঁর চুলের ঝুঁটি ধরিয়া বলিলাম "এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে এস।"

তিনি তবুও বলিলেন "ঠাণ্ডা হও, রাগ সাম্‌লাও। যা' ক'রতে হয়, ও-বেলা ক'রো।"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম "তবে তুমি থাক, আমায় আর চাহিও না।"

যেমন ছিলাম, তেমনই বাড়ীর বাহির হইলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি—তিনিও সেই বেশেই পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিতেছেন। একখানি গাড়ী করিয়া তাঁর পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দুই জনের মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁর পরিজনবর্গ তো অবাক্ হইয়া গেলেন। আমার স্ত্রীর মুখে সকল কথা শুনিয়া শ্বশুর মহাশয় বলিলেন "রাগের মাথায় কাজটা ভাল কর নাই, বাবা!"

মাথা ঠাণ্ডা হইলে, নিজের হঠকারিতা বুঝিয়া অপ্রস্তুত হইলাম। কিন্তু সংসার হইতে বাহির হইবার সূচনা আমার অভ্রান্ত বলিয়াই মনে হইল। সংসার-জীবনের প্রয়োজন যেন ফুরাইয়া আসিতেছিল। রাত্রে আমার স্নেহময় অগ্রজ আসিয়া আবার আমায় বাড়ী লইয়া গেলেন। তিনি অনেক অনুরোধ করিলেন—আমার স্ত্রীকেও লইয়া আসার জন্য; কিন্তু আমি বলিলাম "না, সে-ই যখন সকল অশান্তির গোড়া, তখন তাকে আর আনিয়া কাজ নাই।"

আবার জীবন উদাসীন হইয়া পড়িল। তখন আমাদের "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়"-এর কাজ খুব জোরে চলিয়াছে। প্রতি রবিবারে এক মণ, ত্রিশ সের চাউল সংগ্রহ করিয়া ফিরি; পথে অসুস্থ, কাঙ্গাল দেখিলে ঘরে তুলিয়া আনি; আর সন্ধ্যার পর কোথায় কোন্ সন্ন্যাসী আসিল, তাহার খোঁজ করি।

আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর বাড়ী হইতে এক রাত্রে ফিরিতেছি, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "বাবা! কিছু গাঁজা দিতে পার।"

দেখিলাম—সুন্দর, গৌরকান্তি, দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী—তাঁহার পশ্চাৎ গৈরিকবসনপরিহিতা, পূর্ণযৌবনা রূপসী। ঠিক যেন হরগৌরী। আমার চিত্ত উদ্বুদ্ধ হইল। আমি তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা করিলাম।

তার পরদিন পাড়ায় গুজব রটিয়া গেল যে, শিবদুর্গার আবির্ভাব হইয়াছে। প্রতি গৃহস্থ তাঁহাদের একদিন করিয়া নিমন্ত্রণ করিল। তাঁহাদের পূজার ধূম লাগিয়া গেল। ইঁহার সহিত আমার ষট্‌চক্রভেদের কথা, কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ-রহস্য, পঞ্চ-মকার, নাড়ী-শোধন প্রভৃতি যোগ ও সাধনপদ্ধতি লইয়া অনেক আলোচনা হইল। তিনি তন্ত্র-কথিত চক্র-সাধনের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং ইহা আমায় প্রত্যক্ষ করাইবেন, অতি স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন। আমি উৎসাহিত হইলাম। তবে সে বার তিনি বহু জনের আকুল আহ্বানে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, আমার সহিত নিবিড়ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলেন না।

আবার আমাব স্ত্রীর নিকট হইতে জরুরী পত্র আসিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে আমি আর একজন গোরক্ষপন্থী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার পাই। ইঁহারা কাণফোঁড়া সন্ন্যাসী—'নেতি', 'ধৌতি', 'নাড়ী-শোধনের' নীতি শিক্ষা দেন। কিন্তু আমার গুরুদেব এই সংবাদ পাইয়া এই সকল কাজ হইতে আমায় নিরস্ত হইতে বলেন। 'নেতি', 'ধৌতি' বিপজ্জনক ক্রিয়া, প্রাণ-সংশয় হইতে পারে। এক জন ঘৃতসংযুক্ত নেকড়ার ফালি উদর-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, উহা ধীরে-ধীরে বাহির করিতে গিয়া বিপন্ন হওয়ার সংবাদও তিনি পাঠাইয়াছিলেন। এই কাণফোঁড়া যোগী একদিন আমায় নূতন বিধানে নাসা-পান করাইয়া সত্যই বিপদে ফেলিয়াছিলেন। এক সের পাঁচপোয়া খাঁটি দুগ্ধে, অর্দ্ধপোয়া ছোট এলাচি-চুর্ণ ও অন্যান্য সামগ্রী একত্র করিয়া তিনি আমায় নাসা-পান করান। জল যেমন সহজে বমন হইয়া যায়, দুগ্ধ সেরূপ উঠিল না এবং উগ্র-দ্রব্য-সংযোগে ইহা শরীরকে অসুস্থ করিয়া তুলিল। মাথার ঠিক রহিল না। আমি এক প্রকার অচেতন হইয়া পড়িলাম। এই সংবাদ পাইয়া স্ত্রী দ্রুত আসিয়া আমাকে বলিলেন "তুমি পুরুষ-মানুষ হইলে কি হয়, অন্যদিকে বুদ্ধি থাকিতে পারে; কিন্তু সাধন-ভজনের নামে প্রাণ দেবে দেখিতেছি।" এই সন্ন্যাসীর নিকটেই মূত্ররোধ করার অভ্যাস-দ্বারা লিঙ্গাগ্র দিয়া জল গ্রহণ করিয়া অধোদেশ ধৌত করার ব্যবস্থা পাইয়াছিলাম। এই সকল বাহ্য শুচির উৎকট ক্রিয়া আমার অনুকূল হয় নাই। কিছু দূর গিয়া ফিরিতে হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও হইয়াছিল।

তিনি দূরে থাকিলেই আমার উৎকট জীবন প্রকাশিত হইয়া পড়ে—ইহা লক্ষ্য করিয়া পিতাঠাকুর আমার পত্নীর সহিত কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে, তাহার জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন। আমার অগ্রজ চিরদিন আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; তিনিও বাড়ীতে অশান্তি-সৃষ্টি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন সহজে হয় না। রাবণের চুল্লী পূর্ব্ববৎই জ্বলিত। তবে ঠেকিয়া শিখিয়াছিলাম—আর মাথা গরম করিয়া কিছু করিব না। তিনি ব্যথিতা হইয়া, আমার বুকে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেন। আমি বলিতাম "দুঃখ করিও না, ভগবান্ একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন।"

আমি যে তাঁহাকে কত ভালবাসিতাম—তিনি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া বুঝিতেন; কিন্তু যেমন করিয়া তিনি আমায় চাহিতেন, তেমন করিয়া কোনদিন পাইতেন না। অতিশয় আশা ও উৎসাহ লইয়া আমার দিকে ঝাঁপ দিতে গিয়া, ব্যথার আঘাত পাইয়া তিনি বিমুখী হইতেন—সে বেদনার কান্না সান্ত্বনায় তো নিবারিত হইত না।

তাঁর অকৃত্রিম প্রেমের তুলনা ছিল না; কিন্তু আমি কোনদিন তাঁর মর্য্যাদা রাখিতে পারি নাই। তিনি বার-বার আমার জীবন-গতির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন; আমি তাঁহাকে বার-বার বিদীর্ণ করিয়াই ছুটিয়াছি। তিনি ক্লান্তা-অবসন্না হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে; তবুও তিনি সব কিছু উপেক্ষা করিয়া আমার সহযাত্রী হইয়াছেন। তাঁর বাধায় আমার গতির বেগ বৃদ্ধি পাইত, জীবন অধিকতর বিশুদ্ধ হইয়াই উঠিত। তিনি শেষে আত্মবলি দিয়া আমার স্বপ্ন, আমার আদর্শের সত্যতা সপ্রমাণ করিলেন। তাঁর জীবনের কষ্টিপাথরে আমিই যাচাই হইতাম। আজ হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে—আত্মপরীক্ষার এমন কঠোর বিধান বিধাতা আমার ভাগ্যে কেন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন!

তিনি চাহিতেন—সহজ সাধারণ ভাবেই আমায় কেন্দ্র করিয়া প্রেমের সংসার গড়িয়া তুলিতে। আমি আপনাকে খুঁজিয়া পাইতাম না। তখন আজিকার এই কল্প-সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই আমায় অনির্ব্বচনীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করিত—তাহার তাল সাম্লাইতেই তিনি জীবনের দিন গণিয়া যাইতেন। তাঁর অপরিসীম অনুরাগ, অসাধারণ স্নেহ, অকৃত্রিম সেবা আমায় শক্তি দিত,

সাহস দিত, স্বাস্থ্যদান করিত। তাঁহার দিকে কিন্তু একদিনও মুখ তুলিয়া চাহিতে পারি নাই। তিনি প্রতিদানের প্রতীক্ষায় কত দিন যে আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব অশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা আজ স্মৃতিপটে স্পষ্ট হইয়া উঠে। আজই তিনি আমার নিকট অধিক জাগ্রৎ, অধিক জীবন্ত; সত্যই তাঁর আত্মবিসর্জ্জনেই আমার হৃদয়ে তাঁর নিত্যপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তাঁর অমর সম্বন্ধ কোন কারণেই টুটিবার বস্তু ছিল না; এই জন্যই কি মমতাহীন হইয়া তাঁর প্রতি আজীবন উদাসীন ছিলাম! কোন দাবীই তো তাঁর পূরণ করি নাই! তিনি অভিমান করিয়াছেন, অভিমানের গুরুত্বপ্রদর্শনের জন্য আমার সহিত কথা বন্ধ করিয়াছেন, আত্মঘাতিনী হওয়ার আশঙ্কা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—আমি ভ্রূক্ষেপ করি নাই। অটল বিশ্বাসই আমার ভরসার কারণ ছিল। আমি জানিতাম—তিনি আমার ধর্ম্মপত্নী: আমার চিরসঙ্গিনী হইবেনই, সংসারের আবর্ত্ত তাঁহাকে আবদ্ধ করিবে না। ফলে তাহাই হইয়াছে। সকল দাবী ছাড়িতে-ছাড়িতে তিনি নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর নয়নে স্বর্গের দীপ্তি ফুটিয়াছিল। ওষ্ঠপুটে যে হাসির রেখা দেখা দিত, তাহা আর উচ্ছ্বসিত, অর্থহীন, তরল হাসি ছিল না: সংযত, বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জক রূপেই তাহা আঁকিয়া উঠিত। তিনি স্ব-মহিমায় আপনাকে ধন্য করিয়াছেন।

আমার গর্ব্ব ছিলেন—তিনি। আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়াই তিনি তাঁর কাজ শেষ করেন নাই। আমার পোষাক-পরিচ্ছদের শুভ্রতার মধ্যেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকিত, পায়ের জুতাটী পর্য্যন্ত তিনি নিজের হাতেই ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেন। আমার শয্যা ধূলি-মলিন থাকিত না। আমার খাদ্যদ্রব্যে একটী মাছি বসিতে পারিত না। আমার মাথা ধরিলে, তিনি নিজের মাথায় হাত দিয়া বসিতেন। অন্তরে-বাহিরে আমার সবখানি তিনি ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সকল প্রকার দুর্গম পথে ঝাঁপ দিয়া পড়িতাম—কেবল তাঁরই ভরসায়। আজও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবি—তিনি নাই; কিন্তু যে দিকেই চাহিয়া দেখি, তাঁরই করুণা-ধারার স্পর্শ পাই। পতি-পত্নীর অমর সম্বন্ধ মরণেও যে বিচ্ছিন্ন হয় না—ইহা আমার নিকট জ্ঞান নহে, ভাষা নহে, কল্পনা নহে। সত্য প্রত্যক্ষ হইয়াই তাহা দেখা দিয়াছে।

পথে বাহির হইলে, তিনি পুনঃ প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত পথের দিকেই

চাহিয়া থাকিতেন। কাহারও সহিত কথা কহিলে, তিনি সে দিকেই কাণ রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আমার সকল কাজের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতাম। গর্ব্বে আমার মাথা উঁচু হইয়া থাকিত। জগতের দৈন্যে অবনত হইতাম না। পথের ধূলি আমায় মলিন করিত না। ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে ক্ষুণ্ণ হইতাম না। চক্ষে আমার জয়ের দীপ্তি জ্বলিত। ব্যর্থতার আঘাতে কোনদিন ম্রিয়মাণ হই নাই। কণ্ঠে বজ্র হাঁকিত। হৃদয়-তন্ত্রে মধুময়ী মূর্চ্ছনা ঝঙ্কার দিয়া উঠিত। আজ দেখি—বৈচিত্র্যময় জীবনের এই সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী ছিলেন তিনিই। আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি—পুরুষের ঐশ্বর্য্য নারী। জীবন-মরণের ব্যবধানে পত্নীর প্রসন্নদৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয় না; বরং আরও অবাধ উদার বেশেই তাহা জীবন ছাইয়া দেয়। সম্বন্ধ-তত্ত্বের অমরত্ব বুঝাইবার জন্যই কি তিনি আজ অশরীরিণী হইলেন!

তিনি ছিলেন—আমার স্বাস্থ্য; তিনি ছিলেন—আমার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের দেবী। তাঁর অন্তর্দ্ধানেও আমি নিঃসঙ্গ হই নাই; ইহা কি তাঁর অবধিহীন প্রেমের পরিচয় নয়? আমার চরিত্র, আমার বীর্য্য সবই তো তাঁর প্রেমের অবদান; নতুবা যৌবনযুগে যে সকল সাধনার আবর্ত্তে চক্ষুঃ বুজিয়া ঝাঁপ দিয়াছি, সেই সকল ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার উপলক্ষ্যস্বরূপ তাঁহাকেই তো আঁকড়িয়া ধরিয়া রক্ষা পাইয়াছি। ভগবানের দয়া স্বীকার করি, কারণ-জ্ঞান মলিন হইবার নহে; কিন্তু যোগ্যা সহধর্ম্মিণীর আকুল দৃষ্টি পুরুষকে সর্ব্বক্ষেত্রে যে সচেতন সতর্ক রাখে, ইহাও আমি অস্বীকার করি না। তাঁর মহিমার কথাই আমার সাধন-জীবনের প্রসঙ্গে অধিকতর পরিস্ফুট হইবে; এই হেতু এই বিষয় লইয়া আরও কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

রাঢ় দেশের কোন বিখ্যাত তন্ত্র-তীর্থের এক সন্ন্যাসী তন্ত্র-সাধনার মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া আমায় ইহাতে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন। তন্ত্র-সাধনার বিধান অধ্যাত্মব্যাখ্যা-সংযুক্ত হইয়া যতই বিশুদ্ধ ভাবে প্রচারিত হউক, তাহা তন্ত্রের আসল কথা নহে। সাধক খ্যাতি-সুনামের প্রার্থী নহেন, লোকের মতামত লইয়া তান্ত্রিক শাস্ত্র-রচনা করেন নাই। আত্মজীবনের সম্যক্ বিশ্লেষণই ছিল তাঁহাদের সাধনার উদ্দেশ্য। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পঞ্চ-মকারের সাধনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মদ্য অর্থে সহস্রার-ক্ষরিত সুধা, মাংস অর্থে জিহ্বা, মৎস্য অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাস, মুদ্রা অর্থে স্থিরাসন, এবং মৈথুন

অর্থে জীব ও ব্রহ্মের মিলন—এই অধ্যাত্ম-ব্যাখ্যা প্রকৃত তান্ত্রিকের নিকট উপহাসের বস্তু। বাংলায় যে সকল তান্ত্রিক দেখিয়াছি, তাঁহারা চরিত্র বলিয়া কোন বস্তুর মাহাত্ম্য ভীরুতা বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন। আমি যে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছি তাঁহার নাম করিব না; তিনি স্বীয় গুরুর শক্তিকে গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এই গুরুদেব বাঢ়ে প্রসিদ্ধ তন্ত্রমঠের অধিস্বামী ছিলেন। তিনি সুরা নর-কপালে লইয়া সুধায় পরিণত করিতে পারেন, এই কথা শুনিয়া তন্ত্র-সাধনার নিগূঢ় রহস্য বিদিত হইবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হই।

আমার স্ত্রী এই সকল হইতে আমায় প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিতেন, কিন্তু আমি নিরস্ত হইতে পারিতাম না। রহস্যের অন্ত না দেখিয়া কোন বস্তু হইতেই বিমুখ হওয়া আমার পক্ষে কোন যুগে সম্ভবপর হয় নাই। এই তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীর সহিত মিশিয়া বাংলায় লোকচক্ষের অন্তরালে তন্ত্র-সাধনার প্রবাহ কি প্রবলভাবে বহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হই।

চক্রে উপস্থিত থাকিয়া, যাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছি তাহা বীভৎস তো বটেই; অধিকন্তু আজ যাঁহারা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে এদেশেও স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র আমদানী করার পক্ষপাতী, তাঁহারা এখানে যে ইহার চরম করা হইয়া গিয়াছে বা এখনও হইতেছে, হয়তো তাহার সন্ধান রাখেন না। তন্ত্রশাস্ত্রে "মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু"—এই কথা বৃথা লিখিত হয় নাই। ভারতের বৈদিক আচারের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ-স্বরূপ ঘোরতর অনাচার ধর্ম্মাঙ্গ করিয়া, একদল লোক ইহা লোকসমাজে প্রবর্ত্তিত করেন। "অহং ভৈরবঃ, ত্বং ভৈরবী"—এই ভাব তান্ত্রিক সাধন-চক্রে মূর্ত্ত হইতে দেখিয়াছি। বাস্তবতঃ লোক-চক্ষে চরিত্রবান্ সাধু বলিয়া যে নারী-পুরুষের খ্যাতি, চক্র-মধ্যে তাহাদের অবাধ সম্ভোগ কোন বাধাই মানে নাই। কিছুদিন সারা রাত্রিই ইহাদের সংসর্গে অতিবাহিত করিয়াছি। পান-পাত্র হস্তে লইয়াছি—কোন অমানুষিক শক্তি তাহা গোপনে ভূমির উপর ঢালিয়া দিয়াছে; চক্রপতি মত্ততাবশতঃ তাহা জানিতে পারেন নাই। কোন রমণী প্রমত্তা হইয়া কণ্ঠ আবেষ্টন করিয়াছে—কি এক অব্যক্ত-ব্যথায় হৃদয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। নিজেকে সকল প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া বিস্ময়-দৃষ্টিতে দেখিয়াছি—ধর্ম্মের নামে কি পাশবিক প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার প্রয়াস! ঘরে ফিরিয়া, রুদ্ধ-প্রবৃত্তি

আর চাপিয়া রাখিতে পারি নাই। আমার উন্মত্ত আচরণ দেখিয়া তিনি বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু সে সময়ে সকল কথা ব্যক্ত করিলে তিনি অকারণ সংশয় করিয়া আবার এক নূতন অশান্তি সৃষ্টি করিবেন, এই আতঙ্কে নীরব থাকিয়াছি।

তন্ত্র-সাধনায় তবুও মানুষ প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার জন্য অস্বাভাবিক অবস্থা স্বজন করিয়া লয়, সহজিয়ায় প্রকৃতিস্থ হইয়াই সে সম্ভোগ-বৃত্তির অনুশীলন করে। আমার মনে হয়—তন্ত্রের সূক্ষ্ম সংস্করণ সহজিয়া। এ সকল তবুও সাধনার নামে বিকাইত; অধুনা স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র সামাজিক আচার মধ্যে গণ্য হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। তন্ত্রের মত সহজিয়ার বাণীরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ধৃষ্টতা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

"মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাস কহে রসের বতি॥"

পঞ্চবাণের আঘাত সহিয়া যে সাধক অটল থাকিতে পারে, সে-ই সহজ মানুষের সন্ধান পায়। এই পঞ্চবাণের আঘাত ভাবের ধুঁয়ায় কেহ সাধে না। উত্তর-সাধিকার প্রয়োজন হয়ই। তন্ত্রের অপেক্ষা সহজিয়ায় কতকটা স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ যে দেখি নাই তাহা নহে; তবে ইঁহাদের সাধনপ্রথা অবাধ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই সম্ভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই জগতের সর্ব্বপ্রধান প্রলোভন ও আকর্ষণ হইতে জীব মুক্ত ও সিদ্ধ হইল, ইহাই সপ্রমাণ হয়।

তন্ত্রের পঞ্চ-মকারের সাধনাই সূক্ষ্ম বেশে মদন, মাদন, শোষণ, মোহন ও স্তম্ভনে রূপান্তরিত হইয়াছে। এইগুলির স্থূল আচারের কথা আর উল্লেখ করিলাম না। আমার উদ্দেশ্য—সাধনার প্রথম গতি কোন্ তির্য্যক্ পথে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই কিছু পরিচয় দেওয়া। এই অবস্থার ভিতর দিয়াই আমায় সে যুগে চলিতে হইয়াছিল। আর নীরব মৌন থাকিলেও, সমস্ত

হৃদয় ঢালিয়া যিনি আমার হৃদয়-প্রার্থনায় উন্মাদিনী, তিনি হাতড়াইয়া যখন তাহা পাইতেন না, কি অব্যক্ত-বেদনায় যে ছটফট করিতেন, তাহা আজ সহজেই অনুমান করিতে পারি। ব্যথা অকারণ, অর্থহীন, ইহা সপ্রমাণ করা সে দিন শক্ত ছিল না ; কিন্তু আমি তো বুঝিতাম, তিনি সম্পূর্ণ সত্যকেই ভাষা দিতেছেন, রূপ দিতেছেন—আমার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চক্ষের অশ্রু ঢালিয়া। কিন্তু আশ্চর্য্য, তবুও যেন কি বাকী থাকিয়া যায়, কোথায় জানিবার অবশেষ রহিল, এইরূপ উৎকণ্ঠায় আমি পাগল হইতাম। কোন নূতন সাধনের কথা শুনিলেই সেদিকে অনন্যমনে ছুটিতাম। আমার অন্তরালে এক ব্যথিত হৃদয়ের ক্ষুধা যে করুণা-সিক্ত নয়নে বড় দীন ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে, তাহা যে এক মুহূর্ত্ত ভুলিতাম তাহা নহে, বরং ইহাই আমার দুঃসাহসিক কার্য্যে অধিকতর উৎসাহ দিত।

বোধ হয়, এখন আর তাঁহাদের অধিক দেখা যায় না ; সে সময়ে দেখিতাম—দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু-গুম্ফ, পথের টুকরা কাপড় সংগ্রহ করিয়া একটা আলখেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, একতারা বাজাইয়া ইঁহারা পথে-ঘাটে গান করিয়া ঘুরিতেন। সঙ্গে উত্তর-সাধিকা থাকিত। ইঁহাদের গান ছিল—

"কাঁথা নিবি, সঙ্গে যাবি,
আনন্দে, গাছতলায় র'বি,
গাঁজার কল্কেয় ফুঁ পাড়িবি"

—প্রভৃতি ধরণের। ভেক লইয়া যাহারা ভিক্ষা করে, তাহাদের কথা বলিতেছি না ; সত্যই ইঁহাদের একাগ্র-সাধনার প্রশংসা করিতে হয়। ইঁহারা বস্তুর সাধনা করিতেন। এই বস্তু সর্ব্ব দেহেই আছে। বস্তু নিরূপণ করিয়া তাঁহারা পরস্পর একত্র হইতেন। ইঁহাদের দৃষ্টি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইত না। ইঁহাদের সাধন—শৃঙ্গার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইঁহারা স্খলিত বীর্য্য পান করিতেন। নির্লজ্জ হইয়াই ইঁহারা সব কিছু করিতেন। কাহারও কথায় ইঁহাদের বিশ্বাস টলিত না। এই সকল বিচিত্র সাধনার ভিতর দিয়া বাঙালী জীবন-শিল্পের কি এক অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেই যেন উন্মত—এইরূপ ভাবের দ্যোতনাই আমার মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিত। এই সকল কথার বিশেষ আলোচনা এ ক্ষেত্রে করিব না। কেবল বলিতে চাই—যে যুগে পত্নীকে সুখী করিব, সে যুগ আমায় এমন ভাবে উন্মাদ করিয়াছিল

বলিয়াই, তাঁর প্রতি পতির সে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই। আমি কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেও, ভগবান্ কিন্তু তাঁর অব্যর্থ বিধান ষোল আনায় পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি পরমানন্দময়ী হইয়াছিলেন, ইহাই আমার পরম তৃপ্তি।

এই সকল সংসর্গে একান্ত ক্লান্ত হইয়া অন্তর্য্যামী যেন অন্য দিকে আমার মুখ ফিরাইলেন। পর-পর কয়েকটি অভাবনীয় আশ্চর্য্য ঘটনাপাতের ভিতর দিয়া জীবনের নূতন পর্ব্বারম্ভ হইল। চৈত্র মাসে, এক রাত্রে আমার পূর্ব্ব-বন্ধুর নিকট হইতে বাড়ী ফিরিতেছি। জ্যোৎস্নায় সব যেন ধুইয়া গিয়াছে। প্রবল বাতাস বহিতেছে। পথ জনশূন্য। আমাদের পল্লীদেবতার নাট্য-মন্দিরে আলো-ছায়ার মধ্যে এক ব্যক্তি করুণ কণ্ঠে বলিতেছে—"সারা দিন গেল, সবাইয়ের মুখে অন্ন তুলে দিলি, আর আমায় উপবাসী রাখ্‌লি মা!" কথাটা যে অতিশয় ব্যথাভরে বাহির হইয়াছিল, তাহা আওয়াজ শুনিয়াই বুঝিলাম। অন্নপূর্ণার রাজ্যে সত্যই তো কেহ অভুক্ত রহে না! নিজেকে কৃতার্থ মনে হইল। জগদ্ধাত্রী সে রাত্রি আমার কর্ণ দিয়াই যে একজন আর্ত্তের নিবেদন শ্রবণ করিলেন, ইহা বড় সৌভাগ্যবোধেই নাট্যমন্দিরে উঠিয়া বলিলাম "কে গো তুমি?"

সে ব্যক্তি আশান্বিত হইয়া বলিল "আমি অন্ধ। বড় ক্ষুধার জ্বালা বাবু, আজ কোথাও ভিক্ষা পাই নি!"

একজন অন্ধ সারা সহর ঘুরিয়া একমুষ্টি অন্ন সঞ্চয় করিতে পারে নাই। কথা বিচিত্র বোধ হইল; কিন্তু দেখিলাম, লোকটা প্রকৃতই অন্ধ। তাহাকে বলিলাম "আমার হাত ধর, এস আমার বাড়ী।"

অন্ধকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। রাত্রি দশটার অধিক, সকলেই শয়ন করিয়াছে। নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—আমার পত্নী তখনও ভোজন করেন নাই, খাদ্যাদি পাত্রে লইয়া ভোজনের উদ্যোগ করিতেছেন। আমি সকৌতূহলে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আজ-কাল বড় সকাল-সকাল বাড়ী ফিরছ যে!"

আমি বলিলাম "তবুও দশটা বেজে গেছে। কিন্তু তুমিও তো ক্ষুধার্ত্ত—কি বল?"

তিনি খাদ্যের পাত্র সরাইয়া উদ্‌গ্রীব আগ্রহে বলিলেন "কি বল না?"

আমি তাঁহাকে ঘটনা বলিলাম। একজন অন্ধের ভোজন-ব্যবস্থা করার আনন্দ নহে, জগজ্জননী আর্তের নিবেদন যে আমাদের মধ্য দিয়াই শ্রবণ করেন—এই উল্লাসে আমার বক্ষ লম্ফ দিয়া উঠিতেছিল। তিনি আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বড় মধুর বাক্যে বলিলেন "কোথায় অন্ধ? ভাগ্যে আগে আহার করি নাই!"

আমাকে সার্থক করার সুযোগ পাইলে, তাঁর মুখে লাবণ্যের হিল্লোল ফুটিয়া উঠিত। আমি তাঁর খাদ্যদ্রব্য অন্ধকে দিলাম। অন্ধ পরিতোষ-সহকারে ভোজন করিল। সে জয় দিতে-দিতে আমার হাত ধরিয়াই পুনরায় নাট্য-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল। সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কাহার কণ্ঠের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল—

"বল রে তরু, বল—
কে তোরে সাজায়েছে
দিয়ে পত্র-পুষ্প-ফল!"

নাট্যমন্দিরের পশ্চাদ্দিকে, প্রধান-মন্দির-বক্ষে যে প্রকোষ্ঠ, সেইখান হইতে এই সঙ্গীত-ধ্বনি কোন এক ভক্তের কণ্ঠনিঃসৃত হইয়া ঝঙ্কৃত হইতেছিল। উহা আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমি অন্ধকার-প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম—একজন সন্ন্যাসী পদ্মাসনে বসিয়া আপনার মনে গান গাহিতেছেন। যতক্ষণ গান হইল, ততক্ষণ তাঁহার সমক্ষে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। গাহিতে-গাহিতে—মনে হইল—সন্ন্যাসীর কণ্ঠ ভক্তিগদগদ হইয়া ভাষাকে বুঝি আর প্রকাশ করিতে পারে না! অনুমানে বুঝিলাম—চক্ষেও তাঁহার অশ্রু ঝরিতেছে। গান স্তব্ধ হইল। নিবিড় নীরবতার মাঝে সে যে কি শান্তি, কি আনন্দ আমায় ঘিরিয়া ধরিল, তাহা আজও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। স্মৃতির মধ্যে সে আনন্দের স্পর্শ বেশ জাগ্রত হইয়াই আছে। আমি প্রণাম করিয়া, সন্ন্যাসীর পদধূলি লইলাম। অন্ধকারে সন্ন্যাসীর চক্ষুঃ ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবুজীর বাড়ী এইখানেই?" আমি হস্ত প্রসারিত করিয়া "এই নিকটেই"—এই বলিয়া অনেক ক্ষণ পরে বিদায় লইলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন "আবার আসিও।"

একটা হ্যারিকেন হাতে করিয়া সদর-দুয়ারে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন,

আমায় দেখিয়া বলিলেন "বেশ তো! বাড়ীতে কা'রও সাড়া-শব্দ নেই। আমি একা, সদর-দোরে দাঁড়িয়ে থাকৃতেও ভয় হয়—এই মানুষটা গেল, আর ফেরে না কেন? তুমি আমায় জালিয়ে-পুড়িয়ে খাবে, দেখ্‌ছি!"

তাঁর এরূপ ললাট কুঞ্চিত করিয়া কটু তিরস্কার আমার উপভোগ্য ছিল। আমি তাঁহাকে আবার এক নূতন সাধুর কথা বলিলাম। তিনি বিরক্ত হইয়াই বলিলেন "তোমার বাই আছে। সন্ন্যাসী দেখ্‌লেই অজ্ঞান হও কেন!"

সেদিন হৃদয়টা যেন অতীত সাধনার বাঁধন-মুক্ত হইয়াছিল। তাঁর সহিত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কথা কহিলাম। কে যেন ভিতরে গুমরিয়া মরে, তাহাকে মুক্ত দেখিলেই ছুটি পাই; নতুবা আমার সান্ত্বনা নাই! এইরূপ অন্তরের ক্ষুধার কথা সেদিন তাঁর কাছে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তিনি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আমার কথা শুনিলেন, শেষে প্রণাম করিয়া বলিলেন "দেখ, তুমি আমার ভগবান্। তুমি এমন ছুটাছুটি করিও না, আমি বলিতেছি—যাহা চাও, তাহা তোমার ঘরে বসিয়াই হইবে।"

এক-এক সময়ে তাঁর কথার ভিতর দিয়া যেন কার অবধারিত কণ্ঠ শুনিতাম। এই কথাগুলি আমায় উদ্বুদ্ধ করিল। সেদিন বেশ একটী নূতন ভাব লইয়া রাত্রি-যাপন হইল।

আবার গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিতে হইল। এই সন্ন্যাসী "দশনামী"-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁর নাম রামানন্দ গিরি। তিনি সন্ধ্যা হইতে চৌষট্টি আসন করিতেন। ভোর চারটায় উঠিয়া আবার ইহা করিতেন। আসন সাধিতেই তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। রাত্রি এক প্রহরের পর, তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা হইত। ঈশ্বরদর্শনের আকুলতার কথাই ছিল আমার প্রধান কথা এবং তাহার জন্য এই সাধুর নিকট কোন নূতন সাধনপন্থা পাওয়া যায় কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি নানা উপদেশ দিতেন।

একের পর অন্য ঘটনাস্রোতঃ আসিয়া আমায় পত্নীর নিকট হইতে দূরে-দূরে রাখিত। সারা দিনের পর রাত্রিটুকুও তিনি আমার সংসর্গ হইতে বঞ্চিত হইতেন। দিবসের কঠিন পরিশ্রমের পর, তিনি অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত আমার প্রতীক্ষা করিতেন; তারপর অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িতেন। ঘুমের ঝোঁকেই

তিনি দরজা খুলিয়া দিতেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দৃষ্টি-বিনিময় ছাড়া আমাদের গভীরভাবে আলাপ-পরিচয় করার সময় খুবই কম মিলিত।

এই রামানন্দ গিরি আমায় প্রাণায়াম করার প্রণালী শিক্ষা দিতে চাহিলেন। তখন সংখ্যা রাখিয়া প্রাণায়ামের কোটা পার হইয়াছি। যদৃচ্ছা রেচক, পূরক, কুম্ভক অভ্যাস পাকা হইয়াছে। নাসা-পান, নাড়ী-শোধন-ক্রিয়াও ভাল চলিয়াছে। কিন্তু তবুও স্বস্তি ও আনন্দ পাই না। রামানন্দ গিরি ইহা জানিয়া আমায় কয়েকটি আসন অভ্যাস করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে সুবিধার মনে হইল না। আমার দীক্ষা-গুরুর নিকট যে মন্ত্র ও সাধনা পাইয়াছিলাম, তাহা যথাবিধি পালন করিতেই আমায় এক প্রহর রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিতে হইত। সাধনার ঝোঁকে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে-বাহিরে ঘুরিতাম। তারপর প্রতিদিন রেলযাত্রী হইয়া কলিকাতায় যাতায়াত করিতাম। আসন অভ্যাস করার সময় হইল না। শেষে তিনি একপ্রকার জোর করিয়াই আমায় মন্ত্র দিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম "আমি দীক্ষিত, আবার মন্ত্র লইয়া কি করিব?" তিনি কিন্তু এমনই কাতর হইয়া আমায় ইহার জন্য পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যাহাতে আমায় বাধ্য হইয়াই তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইল। এই মন্ত্র আমার ইষ্টমন্ত্রের বিরুদ্ধ হইবে না এবং ইহা জপ করিবার জন্য বিশেষ সময় দেওয়ার প্রয়োজনও হইবে না; কেন-না, শ্বাসমালার সহিত ইহা স্মরণ রাখিলেই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।

তিনি আবেগ ও অনুরাগের সহিত মন্ত্র দান করিলেন। শব্দ-মন্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্ত কম ছিল না। কেন-না, মন্ত্রার্থ ও ইহার শক্তি অবগত হওয়ার জন্য অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম। শ্রীমৎ রামানন্দ যে মন্ত্র দিলেন, তাহা আমার পরিচিত। কিন্তু মন্ত্রদানের সহিত মন্ত্র-দাতার শক্তি মিশ্রিত থাকে বলিয়াই ইহা বিশেষ কার্য্যকরী হয়, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি; আর সেই সঙ্গে মন্ত্র-গ্রহণ শ্রদ্ধা-সংযুক্ত হইলে ইহা সিদ্ধ-মূর্ত্তি লইয়া সাধককে কৃতার্থ করে, এ বিষয়েও আমি নিঃসংশয় হইয়াছি। এই মন্ত্রদান কালে আরও দুই-একজন আমার সঙ্গে ছিলেন; কিন্তু এইমন্ত্র-প্রভাব আমার জীবনেই সফল হইয়াছিল এবং ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উল্লেখ করিলে সাধননীতি ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়া ইহাতে বিরত হইলাম।

সকল কার্য্যের ভিতরে এই মন্ত্র আমার স্মরণে থাকিত। শ্বাস-প্রশ্বাস আশ্রয় করিয়া ইহা উচ্চারিত হইত ; কাজেই মন্ত্র-জপের জন্য কোন যত্ন ও চেষ্টা আমায় করিতে হইত না। এদিকে আমার ইষ্টমন্ত্র-সাধনের যে আচার ও অনুষ্ঠান ছিল, তাহাও যথারীতি পালন করিতাম। তাহার সহিত সর্ব্বক্ষণ এই মন্ত্র শ্বাস-প্রশ্বাসে চলায় কোন বিরোধ হইত না ; বরং ইহাতে বাহিরের ছুটাছুটি এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। কথাও অধিক কহিতে বাধে। নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেই মন্ত্র স্পষ্ট হইয়া উঠে। অন্তর-রাজ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। অধ্যাত্ম-সাধনার দুয়ার এই মন্ত্রের আশ্রয়ে ধীরে-ধীরে খুলিতে আরম্ভ করিল। তিনি আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি হইয়াছে? আজ-কাল তেমন কথা কও না, হাস না, চুপ করিয়া থাক—শরীর কি অসুস্থ?" তিনি এইরূপ নানা প্রশ্ন করিতেন। সর্ব্বদা চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই, এক কথা হইলে দশ কথার উত্তর দিই ; হাস্য-পরিহাসে নিজেকে হারাইয়া ফেলি—আমার এই সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবটী তিনি বোধ হয় ভালবাসিতেন। অকস্মাৎ আমার গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া তাই তিনি বিচলিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিশেষ ভাবনা—কোন দিক্ দিয়া আমার হৃদয়ে কিছু আঘাত লাগিয়াছে অথবা আমি কোনরূপ ব্যাধি-পীড়িত হইয়াছি কি না। তাঁর আকুলতা দেখিয়া আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম—এই মন্ত্রের বিশেষত্ব, ইহা জপ করিতে হয় না ; ভিতর হইতে কে যেন সর্ব্বদাই ইহা উচ্চারণ করে। কাজেই মনটা এই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে ; অন্য কিছু ভাল লাগে না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। যাহা তাঁহার সত্য মনে হইত, তাহাতে তিনি হৃদয়ের শ্রদ্ধা অকাতরে ঢালিয়া দিতেন। ইহার পর হইতে তিনি আমার সহিত সতর্ক ব্যবহার করিতেন। পাছে আমার এই অবস্থা কোনরূপে ভাঙ্গিয়া যায়, ইহার জন্য তিনিও আমার সঙ্গে যেন গভীর নীরবতায় ডুবিয়া গেলেন।

প্রায় তিন মাস এই অবস্থায় ছিলাম। শেষে এমন হইয়াছিল—বোধ হইত, যেন বাহিরের হাওয়ায় মন্ত্রের ঝঙ্কার ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিনি আমার মুখের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকিতেন, যেন তাঁর মর্ম্মেও এই শব্দ ধ্বনি তুলিতেছে।

এক রাত্রিতে আমার এক সুহৃৎ আসিয়া খবর দিলেন "গঙ্গাতীরে অনেক সাধু-সমাগম হইয়াছে, "চল দেখিয়া আসি।" আমি দ্রুত আহার শেষ করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলাম। গৃহলক্ষ্মী বলিলেন "আবার কেন? বেশ তো আছ, আবার সাধু-সন্ন্যাসীর প্রয়োজন কি?" আমি তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার মহিমা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতাম; কিন্তু আমার যে শেষ হয় না। বাহির ছাড়িয়া অন্তরের মণিকোটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়াছিল; কিন্তু তবুও যেন কাহার প্রতীক্ষায় মর্ম্ম আমার ছিঁড়িয়া যাইত। "আমি শীঘ্র আসিতেছি" বলিয়া বাহির হইলাম।

গঙ্গাতীরে চিরদিন ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্যের সীমা পাইলাম না। এখন এই পূত ভাগীরথীতীরে আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। দিবারাত্র বাস করি, চাহিয়া-চাহিয়া নয়ন গলিয়া পড়ে—তবুও দেখি রূপের সীমা নাই। উষার রক্তকিরণ ভাগীরথী-বক্ষে ছড়াইয়া পড়ে, হৃদয় আমার অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্রে রজত-ধারার ন্যায় গঙ্গাবক্ষ সমুজ্জ্বল হয়—আমার সবখানি উদ্ভাসিত করে। আর চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে কূল হইতে কূলান্তরে স্বর্ণস্তম্ভ গড়িয়া উঠে, মনে হয় মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সুষুম্নার মধ্যে আগুন ধরিয়াছে। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের এমন পবিত্র রূপ পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি এমন করিয়া ফুটিয়া উঠে না।

গ্রীষ্মের আকাশ পরিষ্কার। শুক্লপক্ষ নিশি। জোর বাতাস বহিতেছিল। অশ্বত্থ-বট-পত্রে তরঙ্গের হিল্লোল বহিয়াছে। কুলুনাদিনী নদী জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা বিশাল বটের তলে এক সৌম্যকান্তি দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী এক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা গিয়া প্রণাম করিলাম। দূরে আরও কয়েক জন সন্ন্যাসী আসন করিয়াছিলেন, ইঁহাকে প্রধান মনে হইল।

সে রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত হইত; কিন্তু হৃদয়ের তারে পুনঃ-পুনঃ আঘাত অনুভব করিয়া উঠিলাম। সন্ন্যাসীকে বলিলাম "আপনি এখানে নিশ্চয় কয়েকদিন থাকিবেন, আবার কাল আসিব।" আমি একটী ঘটনায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। সন্ন্যাসী মাত্রেই গাঁজা সেবন করেন, তিনিও তাহাতে বিরত ছিলেন না। কলিকার ধুনি হইতে একখণ্ড জলন্ত অঙ্গার লইতে গিয়া উহা তাঁহার হস্তের উপর নিপতিত হইল; তিনি একদৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। অঙ্গার ত্বক্ দগ্ধ করিয়া দেহের

রসেই ভস্মখণ্ডে পরিণত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে সেইখানে ক্ষতচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কি করিলেন!" তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভগবানের স্পর্শ, দেহের আনন্দ পুড়িয়া প্রকাশ পাইল।" আমি 'নতি'-সাধনার কথা হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করিলাম। সকল স্পর্শই তাঁর স্পর্শ, এই সাধনার প্রকট-মূর্ত্তি নয়নগোচর করিলাম। ভগবান্‌কে এমন করিয়াই বুঝি পাইতে হয়! নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার তপস্যা ভাষা হইয়া রহিল না; তাহা মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রির পর ঘরে গিয়া দ্বার ঠেলিলাম। তিনি সে রাত্রি জাগিয়াই ছিলেন, তাঁর মধ্যেও ঝড় উঠিয়াছে। দ্বার খুলিয়া তিনি আমায় যাহা-তাহা বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। শ্বাসে মন্ত্র আর প্রাণে তখন আগুন ধরিয়াছে—আমি কোন কথার উত্তর দিলাম না। তার পরবর্ত্তী রাত্রে আবার সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন "রামজী, বস।" এই সন্ন্যাসীকে আমরা "রামজী" নামেই চিনিয়াছিলাম। তিনি সকল দ্রব্যই "রামজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি আত্মপরিচয় দিতেন না; তবে তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের লোক এবং বোধ হয় উদাসী সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন।

সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরাগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। আকাশে ঝড়। মুষল-ধারে বৃষ্টি। পথ অন্ধকার। তিনি একাই সারা রাত্রি গঙ্গাতীরে কাটাইয়াছেন। আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। তিনদিন থাকিবার কথা, এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এক রাত্রে তিনি আমায় বলিলেন "রামজী, আর নয়—কাল যাইব।"

আমি বলিলাম "রামজী, আমি তোমার সঙ্গী হইব।"

রামজী হাসিলেন। প্রাণায়াম সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। মধ্য রাত্রিতে তাঁহার সমাধি হইল। ভোর রাত্রিতে সমাধি-ভঙ্গ হইল। তিনি আমায় বলিলেন "তোমার জন্মকোষ্ঠী লইয়া আসিও।"

আমি কোষ্ঠী দেখাইলাম। তিনি আমার পদতল তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিলেন; তারপর হাসিয়া বলিলেন "রামজী, তোমার কোথাও যাওয়া নাই। এইখানেই থাকিও। এইখানেই সন্ন্যাস, এইখানেই সিদ্ধি। তবে তোমায় একটী কাজ করিতে হইবে—করিবে?"

কথায় করুণার অন্ত ছিল না। যেন তিনিই দায়গ্রস্ত হইয়া আমার অনুগ্রহপ্রার্থী। আমি আগ্রহ করিয়া বলিলাম "কি!"

রামজী সহাস্য বদনে বলিলেন "তুমি বিবাহিত। তোমার যুবতী পত্নী। কিন্তু ভগবানের পথে বিনা ব্রহ্মচর্য্যে যাওয়া যায় না। আমি তোমায় এই ব্রত দিয়া যাইতে চাই।"

আমি তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইলাম। এমন দাবী কেহ তো করে নাই! পত্নীর সহিত এই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। তখনও তিনি যৌবনের সীমা ছাড়াইয়া আসেন নাই। আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিতা নহেন। আমার যাহাতে ভাল হয়, মঙ্গল হয়, তাহার জন্য প্রাণ দিতে হয় দিবেন—ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিয়া তিনি আমায় প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী 'যাই-যাই' করিয়া আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিয়াছিলেন। সে রাত্রি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ সিক্ত। বৃক্ষপত্র হইতে জল ঝরিতেছে। তখনও প্রভাতের ঊষারাগ দেখা দেয় নাই। অন্ধকারে "রামজী"র আসনের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন, পদশব্দে উঠিয়া বসিলেন—হাসিয়া বলিলেন "কি রামজী?"

আমি প্রণাম করিয়া বলিলাম "ব্রত গ্রহণ করিব।"

তিনি একটু ধ্যান করিয়া নিজের আসন গুছাইয়া লইলেন। একেবারে কম্বল ও চিম্‌টা বগলে তুলিয়া, প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া বলিলেন "কৃতার্থ হও। আমি আবার দ্বাদশ বর্ষ পরে আসিব।"

এইরূপ অকস্মাৎ বিদায় আমি আশা করি নাই। আমি বলিলাম "সে কি—এখনি?"

তিনি বলিলেন "হাঁ।"

আমি কয়েকটী টাকা দক্ষিণা দিতে চাহিলাম—তিনি হাসিয়াই তাহা ফিরাইয়া দিলেন। যত দূর দৃষ্টি যায়, তিনি ফিরিয়া-ফিরিয়া দেখিলেন। হায়, পথের বন্ধু! দুই দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইল—যিনি ব্রত লইয়া আমায় সার্থক করিলেন, তিনিও আজ আর সাথী নহেন! এই রহস্যের কথা ভাবি, আর উদ্দেশে তোমায় প্রণাম করি। ১৭ই জুন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের

রবিবার—আমরা ব্রতী হইলাম। আমার সে যুগের ডায়েরী হইতে এই সঙ্কল্পলিপির ছিন্নাংশটুকু এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

আর আমার চির-যুগের সঙ্গিনি! যুগ-যুগ তোমায় সহযাত্রী-রূপে পাইব—এই আশায় অনন্ত জীবনই চাই, আমি মুক্তি-মোক্ষ এই প্রেমের দায়েই তাই পরিত্যাগ করিয়াছি।

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত তো গ্রহণ করিলাম—কিন্তু দেহ, প্রাণ, মন সে কথা শুনিবে কেন? সে এক নূতন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া বসিলাম। যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা সত্য, তাহার সন্ধান, তাহা আয়ত্ত করার আকুলতা চিরদিনই প্রবল; কিন্তু যে তপস্যা ইহার জন্য করিতে হয়, যে ত্যাগ ও সংযমের প্রয়োজন হয়, তাহার হিসাব করিয়া কোনদিন এই সকল কাজে ঝাঁপ দিই নাই। তবে একবার লক্ষ্য স্থির হইলে, যে কোন প্রকারেই হউক, অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পালনের পথেও আমি সহজে চলিতে পারি নাই।

প্রথম দুই-একদিন নূতন ভাবে কাটিল; কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় আমার মন স্থির করিয়া লইল—ইহা একটা অস্বাভাবিক, অসদৃশ আচরণ; নিয়মিত ভাবে ইন্দ্রিয়-সেবাই বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য্য। ইহার সমর্থন-বাক্য তন্ত্রে-মনুসংহিতায় যখন পাওয়া যায়, তখন শাস্ত্র-নির্দ্দেশিত পথ ছাড়িয়া, একটা উদাসী সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করিতে যাই কেন?

কিন্তু বিপদ্ হইল—'তাঁহাকে' এ কথা বুঝাইতে পারিলাম না। চিরদিন তাঁহার যে দোষটা বড় করিয়া দেখিতাম, যাহার জন্য তাঁহাকে কত অনাদর করিয়াছি, কত যন্ত্রণা দিয়াছি, এখন দেখি—তাহাই ছিল আমার জীবনের শক্তি ও বীর্য্য। আমার একটী সঙ্কল্প ব্যতীত কোন সঙ্কল্প পালন করার সম্ভব হয় নাই; আর তিনি আমার দায়ে যে কোন সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন,

আজীবন তাহা পালন করিয়া তাঁর দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন। আমি সঙ্কল্প লইতাম কথায়-কথায়, আর ভাঙ্গিতে চাহিতাম পদে-পদে; তিনি ইহা গ্রহণ করিতেন আমার সহিত ঘোরতর সংগ্রামের পর; কিন্তু একবার যাহা ধরিতেন, শেষে বুঝিয়াছিলাম—তিনি আর জীবনে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। কেবল একটী স্থানে তিনি সব ছাড়িতে প্রস্তুত হইতেন; যেখানে তিনি দেখিতেন আমার জিদ্ কোনরূপে ভাঙ্গিবে না, সেইখানে নিজেকে নত করিয়া দিতেন। সে কি তাঁর পরাজয়! এই গুণেই তিনি আমায় চিরদিনের জন্য জয় করিয়া লইয়াছেন।

যখন নানা যুক্তি, তর্ক, শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না, তখন জোর আরম্ভ করিলাম। একটা চমৎকার অনুভূতি এই লাভ করিয়াছি যে, পশুবৃত্তির উত্তেজনা অতিশয় উৎকট হইলেও, ইহা সত্যই স্থায়ী হয় না। ইহার প্রথম বেগ যে কোন কারণে প্রশমিত হইলে, প্রকৃতির মধ্যে একেবারে বিপরীত প্রভাব জাগিয়া উঠে, সঙ্কল্পপূরণের শক্তিলাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পালনের কৃতিত্ব আমার আদৌ ছিল না। তিনিই ইহা পালন করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আমার প্রণয়-সম্ভাষণের ভিতরেও ছলনা দেখিয়া তিনি সাবধানে চলিতেন, ক্রুদ্ধ হইলে সান্ত্বনা দিতেন; এমন কি, উঞ্ছপ্রবৃত্তির কপট আচরণকে তিনি এমনই সংশয়ের চক্ষে দেখিতেন যে, রাত্রে ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতেন না। তাঁর নিদ্রিতাবস্থায় পাশব-বৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগটুকুও ছাড়িয়া দিতাম না; কাজেই এইরূপ সতর্কতা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল।

এক-এক সময়ে তাঁহাকে বড় বাধা বলিয়া মনে হইত। ভাবিতাম—আমি ব্রত লইয়াছি—সমর্থ হই, পালন করিব; না হয়, যাহা পারি না, তাহা জোর করিয়া করার প্রয়োজন কি? বুঝাইয়া যখন পারিতাম না, তখন সাময়িক ভাবে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইতাম। তিনি মিটি-মিটি হাসিতেন —গ্রাম্য প্রবাদ-কথা শুনাইয়াই পরিহাস করিতেন; আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইত।

নিয়মিত ইন্দ্রিয়ভোগে যে স্বাস্থ্য ছিল, এই কৃচ্ছ্রতায় তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত হইয়া বস্তুতঃ শরীরের ক্ষতিই

অধিক হইতে লাগিল। যৌবনে প্রথম যুগেই বিবাহ হওয়ায়, অবৈধ বীর্য্যপতনের অবস্থা খুব কমই হইয়াছিল ; কিন্তু স্বেচ্ছায় এই অস্বাভাবিক জীবন লইয়া আমি নূতন ভাবে বিপন্ন হইলাম।

সে যুগের ডায়েরী হইতে এই নূতন চরিত্রগঠনের পথে যে অন্তরায়চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়াছি, তাহা হইতেই বেশ স্মরণ হয় যে, নিদ্রিত অবস্থায় বীর্য্যস্খলন হওয়ায় আমি অতিশয় ভীত হইয়া, তাঁর কাছে কাতরভাবে মিনতি জ্ঞাপন করি ; তাঁহাকে চিকিৎসকদিগের পরামর্শ-মত বুঝাইয়া দিই যে, ইহাতে আমার ভাল না হইয়া ক্ষতিই অধিক হইবে। কেননা, ১৭ই জুন ব্রত গ্রহণ করি—যে দুই-তিনদিন নূতন ভাবের উত্তাপ ছিল, সে কয়দিন বাদে স্বভাব বিদ্রোহী হইয়া উঠে ; প্রতি তিন-চারিদিন অন্তর নিদ্রিতাবস্থায় স্খলিতবীর্য্য হইয়া, দারুণ অবসাদে আমি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু তিনি আমার কোন কথাই শুনিলেন না—কেবল বলিলেন "অন্তুতঃ এক বৎসর আমি তোমার ব্রত রক্ষা করিব, সারা জীবনের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।" আমি তাহাতে আশ্বস্ত হইলাম ; কিন্তু এক বৎসর এক যুগের চেয়েও দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল।

যখন একান্ত নিরুপায় হইলাম, তখন আত্মরক্ষার পথ নিজের ভিতর হইতেই সন্ধান করার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। দেখিলাম—একত্র শয়ন করা হেতু, কাম-প্রবৃত্তির উদয়ে, যেরূপ একটা উত্তেজনাময় স্নায়ুতরঙ্গে সর্ব্বশরীর আলোড়িত হয়, তাহাতেই ভিতরে-ভিতরে এমন একটা কিছু ঘটিয়া যায়, যাহাতে শরীর-মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া যায়। আমি একত্র শয়ন ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প করিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার এই বীরত্ব ! মন চাঙ্গা তো কাটেঙ্গা গঙ্গা।" তিনি এই কথাটা প্রায়ই বলিতেন। কি জানি কি ধাতু দিয়া ভগবান্ তাঁহাকে গড়িয়াছিলেন। আজ আমি সর্ব্বস্বহারা। বিপদে চক্ষুঃ বুজিয়া ঝাঁপ দিতাম, কার শক্তি ও সাধনের সাহায্যেই সর্ব্বক্ষেত্রে জয় আয়ত্ত করিয়াছি ! আজও দেখি—তিনি অশরীরিণী হইয়া যেন আমায় অধিক সাহায্য করিতেছেন।

শয়নকালে ঘরে মেঝের উপর দুইটা শয্যা রচনা কবা হইল। একখানি

কম্বলের উপর চাদর বিছাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি নির্ব্বিকার। শয্যা পৃথক্ হইলে কি হয়, আমি ব্যস্ত হইয়া গিয়া তাঁর বক্ষের উপর আছাড় খাইয়া পড়ি; তিনি তাঁর কোমল করপল্লব সঞ্চালন করিয়া আমায় সান্ত্বনা দেন, আশা দেন, উৎসাহ দিয়া বলেন "পুরুষ তুমি, সন্ন্যাসীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছ—এক বৎসর অন্ততঃ শপথ পালন কর।"

ভিতরে শ্রদ্ধার প্রবাহ বহিল—ভাবিলাম এই পশুটাকে মুক্তি দিতে, হে জগদ্ধাত্রি! তুমি আমায় বুকে লইয়াছ। এই সময় হইতে একদিক্ দিয়া তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইল; অন্যদিকে সেবিকা, সহকারিণী, একান্ত অনুগতা দাসীর মত তিনি আমার সেবা করিতেন। ধীরে-ধীরে পতি-পত্নীর মধ্যে পূর্ব্ব-সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন দেখা দিল। তাঁব অনুরাগের মধ্যে যখন সম্ভোগের কিছু রহিল না, তখন অমৃতের মতই ইহা আমায় বিভোর করিল। পৃথক্ শয্যা পড়িয়া রহিল। তাঁর সুগোল বাহু-লতা উপাধান করিয়া রাত্রি কাটিত, তাঁর বাহু-বন্ধনে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত। দেখিতে-দেখিতে স্বভাব-সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইল। উপর্য্যুপরি সাত-আট বার নিদ্রিতা-বস্থায় বীর্য্যস্খলনের পর তাঁর বাহুবন্ধনের ভিতরেই একটা পবিত্র প্রভাব অনুভব করিলাম। পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিলে যে ভাব জাগিত, তাঁকে স্পর্শ করিলে মন যেমন নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত—আর তেমন হয় না; তাঁর চক্ষুঃ দেখিলেই বুঝিতাম—চাহনিতে আমার সঙ্কল্পের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তিনি উভয় বাহু বিস্তাব করিয়া বক্ষে ধারণ করিলে, সে অমিয়-পরশ বুঝাইয়া দিত—এখানে ভোগ নাই, এখানে কামনার স্থান নাই। সে যে কি অপার্থিব মিলনের মধুময় আস্বাদ, তাহা ভাষায় বুঝান যায় না। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পালনের অনেক কঠোর বিধান আছে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি—বিশুদ্ধ-কায়ার যোটনে মনোবহা নাড়ীতে বিশুদ্ধ রতিই আশ্রয় পায়; কাজেই শিরায়-শিরায় সম্ভোগলালসার বান ডাকে না। প্রকৃতির চাওয়া যখন সুনির্দ্দিষ্ট হয়, তখনই মুক্তি। আমার পত্নীর কটাক্ষে বিষ ছিল না, স্পর্শে মাদকতা ছিল না। আমাব প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য তিনি দেবীর আসন পরিগ্রহ করিলেন। দুর্ভাগ্য আমার—বড় অসময়ে তাঁহাকে হারাইলাম। আমার নিজের জন্য নহে;

যখন অনেক পুরুষ ও নারী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া একটা দিব্য জীবনের জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইল, সেই সময়েই তিনি প্রস্থান্ করিলেন। কিন্তু তাঁর আশ্বাসবাক্য বোধ হয় ব্যর্থ হইবে না—একদল মানুষের মধ্যে নবজীবনের প্রতিষ্ঠা কোন বাধায় বুঝি আর প্রতিহত হইবার নহে।

আমি যদি তাঁহার উপর সবখানি নির্ভরতা রাখিয়া চলিতাম, তাহা হইলে অনেক দুর্গ্রহের হাত হইতে মুক্তি পাইতাম। তাঁর ঐশী শক্তি সম্বন্ধে অপ্রত্যয় ছিল না; কিন্তু আমি আত্মবিস্মৃত হইতাম, তাঁর প্রতি মহিমা-বোধের লাঘব হইত। ফলে, পুরাতন বিকৃত সাধনপথই আবার আশ্রয় করিয়া বসিতাম। তাহাতে ক্ষতির মাত্রা দেখিয়া আবার পিছাইতাম। অভিজ্ঞতার্জ্জনের দিক্ দিয়া সফল হইয়াছি; কিন্তু জীবনের হানি করিয়াছি অনেক, তাঁহাকেও অকারণ উৎকণ্ঠিতা করিয়া তুলিয়াছি।

স্বতন্ত্র বিছানার চেয়ে, তাঁর বুকের কাছে রাত্রিযাপনের নীতি আমায় অধিক সাহায্য করিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত রক্ষা করার অহঙ্কার আড়ম্বর সৃষ্টি করিত। কপালে ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরিতাম। বোধহয় সকলেই শুনিয়াছিল—আমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমার পত্নীর সন্তান-সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে এই জন্য মাদুলী গ্রহণ করিতে হয় নাই, কোন দেবতার দুয়ারে ধন্না দিতেও কেহ বলে নাই। কিন্তু তিনি এই সাধনার বাহ্যাচার একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন "যদি ইহার ভিতর সুফল কিছু থাকে, তাহা তো লাভ করিবে, তখন লোকে তো জানিবেই; কিন্তু পারি আর নাই পারি, সে কথা কি বলা যায়! কোন্‌দিন ভগবান্ কি মতি দিবেন কে জানে, পূর্ব্ব হইতে এমন লোক-জানাজানির প্রয়োজন কি?"

কোনরূপ বাহ্যাচার দেখিলেই তিনি কাতর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন "রক্ষা কর, ইহা করিলেই লোকে জানিবে—আমরা কি করিতেছি!" কিন্তু আমি ভাবিতাম—বাহিরে একটা প্রচার চাই; চারিদিক্ হইতে বাঁধন দেওয়ার প্রয়োজন এই যে, মনটা সহজে ছোট হইতে চাহিবে না। সুখ্যাতির প্রচার হইলে, সুনামের দায়েই অনেক সময়ে মন্দ কর্ম্ম করিতে বাধে। তদ্রূপ আমার ব্রতটা চারিদিকের চেতনায় ছড়াইয়া থাকুক, লোকলজ্জা-ভয়েও ঠিক থাকিতে পারিব। কিন্তু ইহা যে ভাবের ঘরে চুরি করার

পক্ষে আদৌ বাধার কারণ নহে এবং ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় লোকচক্ষের অন্তরালে স্বভাবসংস্কার আরও দুরাচার করিয়া তুলে, তাহা তখন এমন করিয়া বুঝি নাই।

দুই-তিন মাসেই আচার-আচরণ অন্যরূপ হইল। আমি মুক্তকচ্ছ হইলাম। আহার সম্বন্ধে নানারূপ নিয়ম ও ভেদ ঘটিল। তিনি কিন্তু এক চালেই চলিলেন। বাহির হইতে বুঝিবার উপায় ছিল না যে, এই তরুণী এত বড় একটা কৃচ্ছ্রসাধনের ভার মাথায় বহিতেছেন। তাঁর প্রফুল্ল মুখে মুক্ত হাস্য—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বসনে সারা অঙ্গ ঢাকিয়া, তিনি সহজ-ভাবেই সংসারের সকল কার্য্য সারিয়া যাইতেন, পূর্ব্বের মতই লোকের সহিত আলাপ করিতেন। হাস্য-পরিহাসের ত্রুটি ছিল না। আর আমি ক্রমেই উৎকট হইলাম। আজ ফলাহার করিব, কাল অলবণ অন্ন ভোজন করিব, অনশন, হবিষ্যান্ন—সে যে কত প্রকার বায়নাক্কা, তাহার ইয়ত্তা ছিল না; আর তিনি সব কিছুর ব্যবস্থা করিয়া কেবল বলিতেন "দেখ, যা' সয়, তাই কর। এরূপ করিলে শরীর-মন যে ভাল থাকে, তা' নয়। তুমি একটা কিছু করিতেছ, ইহার মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ পায়।" আমি বলিতাম "তুমি কি বুঝিবে? এই সব না করিলে ঠিক থাকা যায় না।" তিনি হাসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিতেন—সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া আমি বড় ছোট হইয়া পড়িতাম। ভাবিতাম—সত্যই তো আহারে-আচরণে দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তির রোধ হয় না। এই সংযমের বাঁধ অতিশয় শ্রদ্ধায় তিনি যদি রক্ষা না করেন, আমি কোথায় ভাসিয়া যাই, তাহার ঠিকানা নাই।

এমন করিয়া দিন চলিল। ভিতরে সঙ্কল্প-পালনের জন্যই হউক অথবা ব্রহ্মচর্য্যপালনের কোন শক্তি-বশতঃই হউক, একটী নূতন প্রভাব অনুভব করিলাম। যে কাম সহজ স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ-রত ছিল, সে কাম এক্ষণে অন্যদিকে মোড় ফিরিয়া রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। তখন স্বদেশী যুগ আমার সম্মুখে। অন্য কোন সাধনপ্রসঙ্গে আর নিজেকে জড়াইয়া চলার সাধ শেষ হইয়াছিল। কাজেই এই যুগের হাওয়ায় জীবনের পাল তুলিয়া ভাসিয়া পড়িলাম। আমার যাহা কিছু সবই নিজের সবখানি দিয়া না করিলে তৃপ্তি পাই না; কাজেই এই স্বদেশী যুগটাকে মাথায় বহিয়া নিজের চন্দননগরের গৃহেই আহ্বান করিয়া আনিলাম। চন্দননগরে ৭ই আগষ্টের যুগ-শঙ্খ 'তাঁহার'

ফুৎকারেই ধ্বনিত হইল। পল্লীতে-পল্লীতে, প্রতি গৃহ-দ্বারে কদলী-তরু জাতির মঙ্গল সূচনা করিল। পল্লী-দেবতার মন্দির দীপালোকে উজ্জ্বল হইল। হাজার প্রদীপে তৈল-সলিতা দেওয়ার ভার তাঁরই উপরে ন্যস্ত হইয়াছিল। রাখী-বন্ধনের উৎসবও আমার গৃহাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইল। সে দিনের শতাধিক স্বদেশসেবকের ফলাহারের ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। সংসারের সকল কাজের ভিতর আমার এই নূতন যুগের অতিথিকেও তিনি হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া লইলেন। তাঁর সাহচর্য্যেই আমি স্বদেশী যুগের মানুষ বলিয়া পরিচয় দিলাম। হরিদ্রা-বর্ণের উষ্ণীষ মাথায় পরিয়া তরুণের দল আমার উঠানে সমবেত হইত, তিনি সলজ্জনেত্রে দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতেন। শোভাযাত্রা করিয়া বাড়ী ফিরিলে, তাঁর স্নেহ-হস্তের দান নবযুগের সন্তানেরা মাথায় করিয়া লইত। ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল তিনি এই সময় হইতেই সাধ্যমত বিতরণ করিতেন। বাহিরে সকলে আমার হৃদয়েরই স্পর্শ পাইত; কিন্তু অন্তরালে কি বিশাল মাতৃ-হৃদয় এই নবযুগের ঋত্বিক্‌দের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কে তাহার সন্ধান রাখিয়াছিল!

এই সময়ে চন্দননগরে কানাইলাল লাঠিখেলার সমিতি গঠন করে। আমি সেইখানে গিয়া আজিকার এই ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির অঙ্কুর দর্শন করি। হৃদয়ের সেবা ও সহানুভূতি ঢালিয়া আমি এই সমিতির কল্যাণকামী হইয়াছিলাম। অর্দ্ধোদয় যোগে স্বেচ্ছাবাহিনীর সৃষ্টি, বিলাতী কাপড় পিকেট করা, স্বদেশীমন্ত্রের প্রচার—সবেরই কেন্দ্র ছিল এইখানে। তারপর কানাইলাল ধৃত হইলে, সমিতির জন্য স্থান কেহ দিল না—স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া, আমারই গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া তাহা স্থির হইল। যাহারা যাইবার, তাহারা একে-একে প্রস্থান করিল; যাহারা চিরদিন তাঁর স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় আশ্রয় লইবার, তাহারা রহিয়া গেল। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" বীজকেন্দ্র এই যুগের হাওয়ায় তিলে-তিলে গড়িয়া উঠিল। অকৃত্রিম হৃদয় ঢালিয়া আমি এই সৃষ্টির বেদীরক্ষায় আত্মনিবেদন করিলাম, পশ্চাৎ মহালক্ষ্মী আমার সহকারিণী হইলেন।

আমার দুয়ার দিবারাত্রি খোলা থাকিত—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার রিক্ত হইত না। দ্বিপ্রহরে স্বদেশসেবী আসিয়া আশ্রয়ের সহিত ক্ষুন্নিবৃত্তি-লাভে

চরিতার্থ হইত ; কিন্তু কেহ কোনদিন সন্ধান রাখে নাই—এমন অকাতর সেবাময় কাহার হৃদয় ছানিয়া, এই স্নেহোৎস মানুষের দেহ-মন স্নিগ্ধ করে !

স্বদেশসেবার জয়ডঙ্কা বাজিয়াছে। আমরা এক বৎসর ব্রতধারী হইয়া থাকিলাম। এই এক বৎসরের তপস্যায় ভিতরটায় পূর্ব্বের তরল ও লঘু ভাব আর নাই। আমি বলিলাম "ইহা আমাদের চিরব্রত হউক। আমি পথ পাইয়াছি। এখানে প্রাণ দেওয়ার খেলা—তুমি আমায় সাহায্য করিও।"

তাঁর উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। স্বদেশী-যুগের হাওয়া ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তে পরিণত হইল। মাথার উপর বজ্র হাঁকিয়া উঠিল। অন্ধকার পথে পা বাড়াইলাম। শঙ্কিত হৃদয়খানি লইয়া তিনিও আমার সহযাত্রী হইলেন। সে যাত্রা আজও তো আমার শেষ হয় নাই—কিন্তু আজ তুমি কোথায় !

স্বাধীন-ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করার প্রবৃত্তি বাল্যকাল হইতেই আমায় পাইয়া বসিয়াছিল। কলিকাতার স্কুলে যখন পড়িতাম, তখন পিতাঠাকুর মহাশয় একখানি হাঁড়ীর দোকান করিয়াছিলেন। তাহার পার্শ্বেই একটী ছোট্ট দইয়ের দোকানও ছিল। আমি সেইখানে বসিয়া এক পয়সায় শালপাতার ঠোঙায় আড়াই চামচ দধি বিক্রয় করিতাম। সারা দিনের পর আট-দশ আনা দধি বিক্রয় করিয়া, তহবিল গণিয়া বড় তৃপ্তি পাইতাম। ফরেসডাঙ্গার হাঁড়ী, ঘাটালের হাঁড়ী হাতের তেলোয় রাখিয়া বাজাইয়া খরিদ্দারের হাতে দিতাম। সে যে কত মজা লাগিত, তাহা আজিও মনে করিয়া সুখ পাই। স্বাধীন স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইবার প্রেরণাই আমায় এই সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করিত।

আমার ব্যবসার দিকে ঝোঁক দেখিয়া নিমতলায় আমার পিতাঠাকুর একখানি পুরাতন থলিয়ার দোকান করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে, আমি সেইখানেই থাকিতাম। একজন কর্ম্মচারী পুরাতন থলিয়া গস্ত করিত। তাহা মেরামত করিয়া, পঁচিশখানি করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিয়া বিক্রয় করা হইত। গুন্ সূঁচ ও সূতালি লইয়া তাহাদের সঙ্গে আমিও থলিয়া সেলাই করিতে বসিতাম। বড় খরিদ্দার আসিলে, মাথায় করিয়া বাণ্ডিল-বাঁধা থলিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিতাম। কিন্তু অল্প বয়সে লেখাপড়া ছাড়াইয়া একেবারে ব্যবসার ক্ষেত্রে নামিয়া পড়ার সুযোগ পিতা-ঠাকুর আমায় দেন নাই। তিনি নিজে কেরাণীগিরি করিতেন; পরের হাতে ব্যবসা সফল হওয়া সর্ব্বত্রই দুরাশা, তাঁরও প্রচেষ্টা এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছিল। আমাকেও ব্যবসা ছাড়িয়া চাকুরী ধরিতে হইয়াছিল। আমার কিন্তু আপশোষ হইত।

স্বদেশী যুগের আরম্ভ হওয়া মাত্র চন্দননগরের বাজারে একখানি স্বদেশী দ্রব্যের দোকান লইয়া, চাকুরী করার অবস্থাতেই স্বদেশি-দ্রব্য-প্রচারের সঙ্গে স্বাধীন-ভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের একবার চেষ্টা করি। কিন্তু

সারাদিন দোকানে মাছি তাড়াইয়াও এক-একদিন এমন হইত যে, 'বহুনি' পর্য্যন্ত করিতে পারিতাম না; অনেকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া শেষে কেরাণীগিরিতেই মন দিয়াছিলাম।

কিন্তু বাল্যপ্রেরণা সহজে যাইবার নহে। স্বদেশী চিনির খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিলে খরিদ্দারের অভাব হইবে না ভাবিয়া, স্বদেশী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার খুলিয়া বসিলাম। স্বদেশী চিনির মিছরি, খৈ ভাজিয়া গুড় মিশ্রিত করিয়া মুড়কী এবং নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া পাকা দোকানদার হইয়া বসিলাম। স্বহস্তে মিছরি, মুড়কী প্রভৃতি পাক করিয়াছি এবং বাজারের শাকসব্জী-বিক্রেতৃগণ যখন বেচা বেচিয়া ঘরে ফিরিত, তখন তাহারা এক পয়সার মুড়ি, মুড়কী, ফুট-কড়াই চাহিয়া বসিলে, প্রথমে আমায় বড় বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত; পরিশেষে হাত বেশ চলিত। দোকানে বিক্রয় হইত মন্দ নয়; শেষে মহা-সমস্যায় পড়িয়া দোকান তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

কারিকরদের হাতেই লাভ-ক্ষতির হিসাব—দোকানে বিক্রয় বাড়িলে কি হইবে, অধিক বিক্রয়ে অধিক ক্ষতিই হইতেছিল। একদিন চারি আনায় আধ সের গজা ওজন করিতে গিয়া মাত্র চৌদ্দখানি গজা ওজনে চড়িল। খরিদ্দার বলিল "ওজনে চাহি না—আমায় চারি আনায় ষোলখানা গজা গণিয়া দেওয়া হউক।" এই ঘটনায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলাম —কারিকরগণ শ্রম কমাইতে গিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। যে কাজ আদ্যন্ত জানা নাই, সে কাজে সর্ব্বপ্রথম অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইলে বেশ ক্ষতিই স্বীকার করিতে হয়। কারিকরদের সহিত কথা-কাটাকাটি হইল। তাহারা বুঝিল—ফাঁকি দেওয়া ক্রমেই অসম্ভব হইবে। তাহারা বেশ মোচড় দিতে আরম্ভ করিল। একদিন রাত্রিতে কোন কারিকরই দোকানে ছিল না। আকাশে মুষলধারে বৃষ্টি। একাই দোকান বন্ধ করিতেছিলাম। সে যে কি নাকাল, তাহা আর বলিবার নহে। এক-একখানা কাটা তক্তা গুছাইয়া দোকান বন্ধ করিতে হয়। তক্তার নম্বরগুলি অস্পষ্ট ছিল। ঝড়ে-জলে কোনখানির পর কোনখানি বসাইব, তাহার ঠিক ছিল না। একখানা তক্তা আমার মাথার উপর সোপাট আসিয়া পড়িল। পিতাঠাকুর আমার এই দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, তিনি আর নীরব থাকিলেন না। এই সঙ্গে ছাতার বাড়ি দু'চার ঘা আমার উপর বসাইয়া, তিনি চীৎকার করিয়া

বলিলেন "আয় বল্‌ছি। ব্যাটা ব্যবসা কর্‌ছে—ছোট লোকের কারবার!" এইখানেই ব্যবসায় ইস্তফা দিয়া কেরাণীগিরিই সার করিয়াছিলাম। এই কাজে ইংরাজ সওদাগর অফিসে সাহেবদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম। চাকুরীর পক্ষে উন্নতির পথও যে না ছিল তাহা নহে; কিন্তু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের রাখী-বন্ধনোৎসব প্রাণে যে আগুন জ্বালাইয়া তুলিল, তাহাতে চাকুরী করা আর পোষাইল না।

এক সন্ধ্যায় সখের কেরাণীগিরি ছাড়িয়া আমার স্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি ইহা ভাল বুঝিলেন না—আমার দিকে তাকাইয়া একবার বলিলেন "লোকে চাকুরী করিয়াও কি স্বদেশী করিতেছে না?" আমি তখন তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারি নাই। কিন্তু যখন তিনি বলিলেন "চাকুরী ছাড়িও না। তোমার ব্যবসার কথা তো জানা আছে, যেমন-তেমন চাকুরী—ঘি-ভাত!" তখন বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আমি অনেক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলাম। যখন বকিতাম, তখন হৃদয়ে সূঁচ বিঁধিয়া দিতাম। তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ক্ষমা না চাহিয়া নিস্তার পাইতেন না। একবার মনে পড়ে—নিজের ভবিষ্যচ্চিন্তার দায়ে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন "দেখ, আমার তো আর কেহ নাই—ভগবান্ করুন, তেমন দিন যেন না হয়; কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে তো জানি না! আমার জন্য একটা ব্যবস্থা করিও।" আমি এরূপ কথা তাঁর নিকট হইতে আসিতে পারে, এরূপ কল্পনাও করি নাই। যদিও স্বাভাবিক সংসার-জীবনে এরূপ কথা যে তেমন দোষের নহে, তাহা জানিতাম; তবুও তাঁর কথা শুনিয়া আমার সমস্ত হৃদয়খানি মোচড় দিয়া উঠিল। আমি ব্যথিত হইয়াই বলিলাম "আমার বিশ্বাস—এ কথা তোমার নিজের কথা নহে। কেহ তোমায় শিখাইয়া দিয়াছে। ইহার উত্তর হইতেছে—যে নারী স্বামীর অবিদ্যমানতা কল্পনা করিয়া নিজের অবস্থা গুছাইয়া লওয়ার সুযোগ খুঁজে, সে পাতিব্রত্যধর্ম্মের মহিমা জানে না। আমার মৃত্যুর পরও তুমি সুখে-স্বচ্ছন্দে বাঁচিতে চাহ, এইরূপ চিন্তা কেমন করিয়া করিলে—আমি ভাবিয়া পাই না!"

উত্তর এমন নিষ্ঠুর ভাবে পাইতে হইবে, এতখানি ভাবিয়া তিনি কথাটা বলেন নাই। সংসারে এই ভাবের কথা হইয়া থাকে; তা'ছাড়া তাঁর পিতৃকুলের দিক্ হইতেই কথাটা উঠিয়াছিল এবং আমার মনে হয়, অনেকেই

যেমন অসময়ের জন্য কিছু সংস্থান করিয়া রাখে, তাঁকেও সেইরূপ সদুপদেশ দেওয়ার ফলেই তিনি ইহা আমার নিকট উত্থাপন করিয়াছিলেন। আমার কথা শুনিয়া, তিনি লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যেন হুঁস হইল—কি সর্ব্বনাশের কথাই বলিয়াছেন! তিনি সজল নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সেদিন করুণ কণ্ঠে যে বাণী কয়টী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমাব বুকে আঁকা আছে এবং সেই কথা স্মরণে আনিতেও তিনি ভবিষ্যতে শিহরিয়া উঠিতেন। তিনি বলিলেন "আমি অত ভাবি নাই, বুঝি নাই—অমুক আমায় যাহা শিখাইয়া দিয়াছিল, আমি তাহাই বলিয়াছি। তোমায় ছাড়িয়া আমায় আবার প্রাণ ধারণ করিতে হইবে, এ কথা এমন করিয়া আমার মনে হয় নাই। আর বলিও না—তেমন দুর্দ্দিন যদি সত্যই হয়, এ প্রাণ তখনই বাহির হইবে।"

তাঁর সেই চিন্তাই শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। আমার সামান্য অসুখ হইলে, তিনি যার পর নাই চঞ্চলা হইতেন। আমি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম—সত্যই যদি আমার মৃত্যু ঘটে, ইনি তৎক্ষণাৎ আছাড় খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সমস্ত প্রাণটা উজাড় করিয়াই তিনি আমার মুখ চাহিয়া থাকিতেন। আজ তো আর সে করুণ সতর্ক চাহনী নয়নপথে পড়ে না। আজ জিজ্ঞাসা করি—সে দরদ জীবনের সঙ্গেই কি শেষ হইল? অথবা তাঁহার অধ্যাত্ম-সন্তানদের অপরিসীম স্নেহানুরাগের মধ্যেই কি তিনি আপনার প্রাণের দরদ মিশাইয়া সান্ত্বনা পাইলেন?

আমার যদি কোন অসুখ হইয়াছে তো তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেন না। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিতেন, কাহারও কথা শুনিতেন না। নিজের ভিতরে যেন হঠাৎ তিনি আশ্বাসের বাণী পাইতেন, তখন হাসিমুখে বলিতেন "কোন ভয় নাই।" আমি হয়তো তখনও রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে সংসারের কাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। আমায় ধমক দিয়া বলিতেন "তুমি অল্পেই অস্থির হইয়া পড়। একটু স্থির হও। রোগ হইলে, তার একটা তো যন্ত্রণা আছেই!" কি জানি কেমন করিয়া, এক দিন অথবা এক রাত্রির মনঃসংযোগে তিনি আমার অবস্থা বুঝিয়া লইয়া এমন নিশ্চিন্তা হইতেন। আমার নানাপ্রকার ব্যাধি হইয়াছে, প্রাণনাশের আশঙ্কাও হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার মনের অবস্থা দেখিয়া আমিও

ভরসা পাইয়াছি। ক্রমে এমনই নিশ্চয় হইয়াছিলাম যে, যতদিন তিনি জীবিতা থাকিবেন, ততদিন আমার মৃত্যু হইবে না। তাই যখন তিনি কোন পর্ব্বদিনে পায়ে মাথা রাখিয়া কেবল প্রার্থনা জানাইতেন "যেন তোমার কোলে মরিতে পারি"—আমি নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাকে সেই আশীর্ব্বাদ করিতাম; একদিনের জন্যও মনে হইত না যে, তিনি আমার দেহান্তের পরেও জীবিতা থাকিবেন। এ দৃষ্টি তিনিই দিয়াছিলেন। আমার মুখ দিয়া তিনি নিজের অদৃষ্ট-কথা বলাইয়া লইতেন।

আজ মনে পড়ে—তিনি সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় যখন ছিলেন, তখন একটী মন্দির আঁকিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম। যে স্থানে তাঁর স্মৃতিমন্দির গড়িয়া উঠিয়াছে, ঐ স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম "এইখানে তোমার স্মরণ-চিহ্ন রক্ষা করিব।" তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন "এমন অদৃষ্ট আবার আমার হইবে?" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার সে কল্পনা মিথ্যা হয় নাই। সেই স্থানেই তাঁর নশ্বর দেহ পুড়িয়া ছাই হইল। সেই ক্ষেত্রেই তাঁর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইল। এ দর্শন তাঁর তপস্যায় আমার ভিতর প্রতিফলিত হইয়াছিল মাত্র। ধন্য তুমি—হে দেবি! আজ আমি তোমায় হারাইয়াও এখনও বাঁচিয়া আছি, ইহা আমার স্বার্থপরতা বলিয়াই মনে হয়। যদি অন্য রূপ ঘটিত, তুমি যে প্রাণধারণ করিতে না, ইহা অবধারিত।

আজ একান্তে বসিয়া কেবল তাঁর মনের কথাগুলিই ভাষায় বাহির হয়। ঘটনা ভুলিয়া যাই, এক অব্যক্ত ভাব আমায় তন্ময় করিয়া দেয়। জীবনের ঘটনারাজি অন্ধকারে তলাইয়া যায়, সেগুলি যেন খুঁজিয়া-খুঁজিয়া সম্মুখে ধরিতে হইতেছে।

কেরাণীগিরি ছাড়িয়া ব্যবসা সুরু করিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে সংসারের উপর যে আসন্ন বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা তো জানা ছিল না! এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই আমার অগ্রজ ও পিতাঠাকুর গুরুতর অভিযোগে পতিত হন। পিতাঠাকুর সহজে পরিত্রাণ পাইলেন; কিন্তু অগ্রজকে সে দায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল। সেদিন 'তাঁর' অঙ্গ হইতে এক-একখানি অলঙ্কার খুলিয়া লইয়াছি, তিনি হাসিমুখে তাহা আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। নিরলঙ্কারা হইয়াই তাঁর পবিত্র-মূর্ত্তি যেন অধিক

শোভাময়ী হইয়াছিল। সে রূপের তুলনা দিতে গিয়া ধ্যানঘনা দেবীকে ক্ষুণ্ণ করিব না।

জীবনের সত্য সংগ্রাম এই সময় হইতেই সুরু হইল। সংসারের সকল ভারই আমার উপর পড়িল। উপায়ের ক্ষেত্র—একটী কাঠের ব্যবসা। অভিজ্ঞতা না থাকায়, লাভ-ক্ষতি-জ্ঞান ছিল না। সংসারের অনিবার্য্য খরচ আয় হইতে হইতেছে কি মূলধন ক্ষয় করিয়া চলিতেছে, তাহা বুঝিতে-বুঝিতেই এক প্রকার দেউলিয়া হইয়া পড়িলাম। অবস্থা সাম্‌লাইতে গিয়া, গাড়ীঘোড়া বিক্রয় করিলাম। বসত-বাটী ছাড়া যাহা ছিল, সবই হস্তান্তরিত হইল। ব্যয় কমাইতে পারি না, আয়ের দিক্ শূন্য। চিন্তায়-চিন্তায় ললাট-চর্ম্ম শ্লথ হইল, কালি-মূর্ত্তি ধারণ করিল। যুক্তি-পরামর্শ দেওয়ার লোক নাই। পিতাঠাকুর বৃদ্ধ বয়সে চাকুরীহীন হওয়ায় সতত ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিতেন; তাঁর দাবী-পূরণ না হইলে গালি দিতেন। অগ্রজ যিনি, তিনি ভাইয়ের উপর সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। সারা দিন পরিশ্রমের পর স্ত্রীর সহিত যুক্তি করিতাম। তিনি হতাশ হইয়া বলিতেন "তুমি একা করিবে কি? এতটা যে দুরবস্থার দিন আসিয়াছে, সংসারে তোমার মত আর কে বুঝিতেছে বল! খাটিয়া-খাটিয়া তোমার হাড় কালি হইল—আমার তো কথাই নাই!"

যতটা পারি, দুইজনে পরামর্শ করিয়া সংসারটা চালাইবার চেষ্টা করিতাম। সে যে কি দুর্দ্দিন, তাহা ভাষায় বলিবার নহে। অন্য দিকে স্বদেশীর ধুম চলিয়াছে। সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ দান করিতে হয়। অন্তরের ঝটিকাবর্ত্ত মনের জোরে চাপিয়াই মুক্ত কণ্ঠে স্বদেশপ্রীতির ঝঙ্কার তুলি। এক দল তরুণ আমার খুব অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কানাইলালের ফাঁসির পর, পাড়ার তরুণ দলটি লইয়া আমিই হৃদয়ের সহিত পরিচালনা করিতাম। প্রতি রবিবার আমার বাড়ীতেই সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইত। স্বদেশ-প্রেমের বাণীর সহিত ভারতের ইতিহাস-পুরাণ লইয়া আলোচনা করিতাম। সারা সপ্তাহ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া, রবিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা হইতে রাত্রি এক প্রহরকাল সংসারের দুঃখের কথা মনে থাকিত না। কণ্ঠে নিরন্তর ধ্বনি উঠিত, এক দল ছেলে অবাক্ হইয়া শুনিত। যাহাদের আত্মাভিমান ছিল, তাহারা আসা বন্ধ করিল। যাহারা এই রবিবারের সাহিত্য-সভা ছাড়িল না, তাহারা অধিকাংশই

বিদ্যালয়ের ছাত্র। ক্রমে এমন হইল—আমি বলিয়া যাই, তাহারা শুনিয়া যায়; বক্তা ও শ্রোতার হৃদয় কোন এক মুহূর্ত্তে এক হইয়া যায়; হুঁষ থাকে না। মধ্যের দরজা ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠে, চমকিয়া উঠি! আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি—সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। তিনি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া, কপাল কুঞ্চিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন "মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইবে যে, এত বকা সহিবে কেন?" তখন বুঝি—তিন-চার ঘণ্টা বকিতে-বকিতেই কোথা দিয়া কাটিয়াছে; মাথা ভোঁ-ভোঁ করিতেছে। কিন্তু বলিতে এত আনন্দ হয় কেন? শরীরে যেন অলৌকিক-শক্তি নামিয়া আসে। যাহা বলি, তাহা তো আমার জানা বিষয় নহে; বলার সঙ্গে-সঙ্গে আমার শ্রুতিও তাহা ধারণ করে। একাধারে বক্তা ও শ্রোতা হইয়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। যে সকল তরুণ শ্রোতা সম্মুখে তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদেরও যে বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সংসারের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এইটুকুই ছিল আনন্দের ক্ষণ। সারা সপ্তাহ এই রবিবারটির প্রতীক্ষায় আগ্রহে-আকুলতায় কাটিত—শুধু আমার একার নহে, আমার তরুণ বন্ধুগুলিরও। তারাই তো আজ "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ"।

রবিবার রাত্রিতে আমি বেহুঁষ হইয়া পড়িতাম। কোন অশরীরিণী শক্তি যেন আমায় পাইয়া বসিত। আমার কণ্ঠে শিবের বিষাণ বাজিত। সমস্ত স্নায়ুপেশী উত্তেজিত হইয়া উঠিত। এই অপূর্ব্ব আনন্দের প্রবাহে ভিতরটা পুলকিত হইত। ইহার দ্যোতনার প্রবল বেগ দেহ-যন্ত্র ধরিত বটে; কিন্তু পরিশেষে সব যেন অবসন্ন হইয়া পড়িত। মনে হইত—মস্তিষ্ক-যন্ত্র হইতে হৃদয়-যন্ত্র পর্য্যন্ত একটা মহাঝড বহিয়া গিয়াছে। আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিতেন "অত করিয়া কি বল—একটু খাটো করিয়া বলিলে হয় না? সমস্ত পাড়া যে মাথায় করিয়া তোল—কষ্ট হয় না!"

আহা, সে কি দরদ-ভরা ব্যথিত কণ্ঠে আমায় সতর্ক করার সঙ্গীত! একদিন, দুইদিন নয়, বিশ বৎসর ধরিয়া কেবলই তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। ইদানীং তিনি ছেলেদের সম্মুখে বাহির হইতেন। এমন অবস্থাও হইয়াছে, তিনি কাছে আসিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁর সজাগ-দৃষ্টির আকর্ষণে আমি স্তব্ধ হইয়াছি।

কি কথা বলিতে আসিয়াছি, কি কথা বলিয়া যাই, কিসের এই আকুলতা-সর্ব্বস্ব হারার হৃদয়-সঙ্গীত কেহ কি কাণ পাতিয়া শুনিবে?

সংসারের গুরুভার মাথায় লইয়া দিন চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন যে আসন্ন, তাহা অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম। কেন-না, সংসারে যে ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছিলাম, তাহা হইতে মুক্তির উপায় না হইলে, সংসারও রক্ষা পায় না, নিজের জীবনের স্পষ্টতাও ফুটিয়া উঠে না। দেশের কাজে খানিকটা দিয়া তৃপ্তি হইত না। মনে হইত—সবখানি ঢালিয়া দিই; কিন্তু সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য আমাকে বাধা দিত। গোঁজামিল দিয়া দিন চলে না। এই বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য আমায় কিছু করিতে হয় নাই; বিধাতা অদৃশ্য হস্তেই যখন যাহা করিবার, অব্যর্থ ভাবেই তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

জীবনের উপর দিয়া সে যুগের সকল প্লাবনই বহিয়া যাইতেছিল। ব্যবসার ক্ষেত্রে কিরূপ নিবিড় আত্মদান করিলে তাহা সুসিদ্ধ হয়, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। আমার তাহাতে ব্যাঘাত হইত। আজ অর্দ্ধোদয়-যোগ, কাল পূজার পিকেটিং, এখানে সভা, সেখানে শিবাজী-উৎসব—এইরূপ চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেই হইত। সুতরাং দেশের কাজে যখন ঝুঁকিয়া পড়িতাম, তখন ব্যবসার যথেষ্ট ক্ষতি হইত এবং যে ক্ষতি হইত, তাহা পূরণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-না-করিতে আবার নূতন কর্ম্মপ্রেরণায় প্রমত্ত হইতাম। কাজেই বুঝিয়াছিলাম—আমার দ্বারা ব্যবসার উন্নতি হইবে না, বরং ইহা নষ্ট হইবে।

অন্যদিকে আমার অগ্রজ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে কার্য্যে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত করিয়া যে আশ্বস্ত হইব, সে বিষয়েও নানা কারণে নিরাশ হইয়াছিলাম। চিন্তায়, দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া 'তাঁহার' সহিত পরামর্শ করিতে বসিতাম। সংসারে সান্ত্বনা নাই; সকলে একযোগে অনন্যমন হইয়া যে সংসারটাকে রক্ষা করিবে, এমন ভাব কাহারও ছিল না। এই দিকে তিনিও নিরাশ হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি কোন স্পষ্টতা দিতে

পারিতেন না, কেবল বলিতেন "এ সংসার যে চলিবে, আমার তো এরূপ মনে হয় না। তোমার পরিশ্রমই সার হইবে।"

আমি বলিতাম "আমিই বা সবখানি শ্রম সংসারে ঢালিতে পারি কৈ? নানা কাজে ছুটাছুটি করিয়া মরি; তাহাতে ক্ষতিই বাড়ে, তাহার আর পূরণ হয় না—ব্যবসায় নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইতেছে।" তিনি সহানুভূতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতেন "তবুও তুমি যেটুকু কর, অন্য সংসার হইলে ভাসিয়া যাইত; আর কেহ কুটাটী নাড়িতে চাহে না।"

আমি ভাবিতাম—সত্যই তো! যতখানি শ্রম দিলে ব্যবসা-রক্ষা হয়, তাহা দিবার আরও তো লোক আছে; আমি না হয় দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ হইয়া সংসারের কাজে সব শক্তি দিই না, আর সকলে করে কি? তাহারা আমার উপর নির্ভর করিয়া, হাসিয়া-খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়, অথচ সে নির্ভরতার গুরুভার-বহনের যোগ্যতা আমার নাই—এ সংসার যে রক্ষা পায় না!

মায়া সহজে ছাড়া যায় না। কোনরূপ অভাব দেখিলে, বুকের ভিতর মোচড় দিয়া উঠিত; সংসারের সকল অভাব পূরণ করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিতাম। কিন্তু স্বদেশী-যুগের এক-একটী হিড়িকে আমার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইত। আমি যেন দু'কূল-হারা—অকূল পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতাম!

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী চন্দননগরে সরস্বতীপূজার এক বৃহৎ উৎসবানুষ্ঠান হয়। তখন আমার এমনই অবস্থা যে, এইরূপ অছিলা পাইয়া, সংসারের ভার হইতে মাথাটি সরাইতে পারিলেই যেন বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচি! কিন্তু বেশ জানিতাম—ইহার পর আবার চতুর্গুণ শ্রম ও চিন্তায় আমার দেহ-মন অবসন্ন হইবে। তবুও আপাত সুযোগ এই অবস্থায় বড় কেহ ছাড়ে না। স্বদেশীযুগের অধিকাংশ কর্ম্মীই আমার মত না হউক, অন্যভাবে এইরূপ লক্ষ্মীছাড়াই ছিল। নেতাদের বিশিষ্ট কর্ম্ম, বিশেষ অবস্থা ছিল। সবখানি দিয়া কাজে আগাইতে হইলে পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যায় যাহাদের, তাহারাই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইত। তখন স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা দলে-দলে বাহির হইয়া দেশের কাজে আসিত না; এক দল ভবঘুরে লক্ষ্মীছাড়ার দলই স্বদেশীর আগুন জ্বালিয়া তুলিয়াছিল।

তিন-চারিদিন উৎসবে মাতিয়া পুনরায় সংসারে যখন ফিরিলাম, তখন সব দিক্ দেখিয়া মনে হইল—এইবার সরিয়া পড়ি। কিন্তু বন্ধনস্বরূপ তাঁহাকে ছাড়িয়া যে কোথাও যাওয়া হইবে না, তাহা বুঝিতাম। তাঁর মুখেই শুনিলাম—সংসারের অভাবের কথা। বাজার-হাট বন্ধ, কাঠের গোলায় কারিকরগণ 'হপ্তা' পায় নাই বলিয়া কাজে আসে নাই—এই চারি-পাঁচ দিনেই প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। ঘটনা নূতন নহে; ইহার সম্ভাবনা দেখিয়াই আমি মাথাটা ফাঁকে বাহির করিয়া দিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল—ঝড়টা আর কাহারও মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইবে। কিন্তু আমিই অধিক বিব্রত হইলাম। তিনি বলিলেন "দেখ, এক কাজ কর। যদি সংসারে মন না থাকে, একেবারে ছাড়িয়া দাও। যাহাদের সংসার, তাহারা বুঝিয়া ব্যবস্থা করুক। তোমার ষোল আনা ভার, অথচ তুমি মাঝে-মাঝে সরিয়া পড়িবে, ইহাতে কষ্টের কশুর হয় না—তোমার যে কি বুদ্ধি, বুঝি না।"

আমি বলিলাম "দেখ, এ বড অত্যাচার! আমার কি বল দেখি! শুধু তুমি আর আমি—এ ভার অনায়াসেই বহিতে পারি। এত বড় সংসারটা আমার ঘাডে চাপাইয়া সকলের নিশ্চিন্ত হওয়া কি উচিত!"

তিনি উৎসাহ দিয়া বলিলেন "স্পষ্ট কথা বল না। তুমিও চাপিয়া থাকিবে, তোমার দাদাও জানিবেন—সংসারের দরদ ষোল আনা তুমি লইয়াছ। এ অবস্থায় গোলমাল তো হইবেই। ব্যাটাছেলেগুলো যে কি, তা' ভাবিয়া পাই না।"

বিদ্রূপচ্ছলে তাঁর ওষ্ঠপুট বিচিত্রভাবে কুঞ্চিত হইল। আমি হতভম্ব হইয়া পড়িলাম। দুই জনে অনেক পরামর্শ করার পর স্থির হইল—একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। খরচ কমাইবার হিসাব করিতে বসিলাম। কোন্‌টা কমাইতে হইবে, কোন্‌টা কমান যায় না—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া দুই জনে পরামর্শ করিলাম। শেষে যাহা স্থির হইল, তাহার উপর তিনি বলিলেন "আমরা তো লঙ্কাভাগ করিলাম! সবাই কি তোমার সঙ্গে এক-মত হইবে। তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি?"

ফলে, তাহাই সত্য হইল। ঝি রাখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কেহ তাহা মানিয়া লইল না। রন্ধন-কার্য্য নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করিলে সুবিধা হয়—কিন্তু ছোট-বউ পরামর্শ দিয়াছে; সুতরাং সেই সব করিবে—

ইহাই সকলে স্থির করিয়া, আমাদের মতলব হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাঁহার কিন্তু জিদ বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন "দেখ, তুমি যদি সংসারটা গুছাইয়া তুলিতে একান্ত ইচ্ছা করিয়া থাক, আমি সমস্ত ভার গ্রহণ করিব—মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তোমাকে ঠিক থাকিতে হইবে।"

আমি তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া আশ্বাস পাইলাম, হৃদয়েও শক্তি অনুভব করিলাম। তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সংসারে উদ্বুদ্ধ হইলাম।

সম্মুখে চৈত্র মাস আসিতেছে। জোরে কাজ করিতে হইলে, কাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাতে পুঁজি নাই ; স্বর্ণালঙ্কার যাহা ছিল, অগ্রজের মকদ্দমায় সমস্ত নিঃশেষ হইয়াছে। কাজেই তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল—বাড়ীর কিয়দংশ বাঁধা দিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ করি ; চৈত্র-শেষে বাজারে যে টাকা পাওনা পড়িয়া আছে, তাহা আদায় করিয়া শোধ করিব। তিনি পাওনার হিসাব লইলেন, আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন "ঠিক তো—মতলব আবার ঘুরিয়া যাইবে না?" আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম "না।" বাড়ী বন্ধক রাখিয়া, সালিমার হইতে কাঠ খরিদ করিলাম। গোলা জাঁকিয়া উঠিল। অতিশয় উৎসাহের সহিত সংসার-ধর্ম্মে মাতিয়া উঠিলাম। কেবল স্থির করিলাম—রবিবার অবসর থাকিবে ; কেন-না ঐদিন আমার বাড়ীতে যে সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা যাহাতে বন্ধ না হয়, ইহাই আমার লক্ষ্য ছিল।

তিনি সংসারের সকল ভার মাথায় তুলিয়া লইলেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার শরীরও ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। আমরা উভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু এবার হয় প্রাণ দিব, না হয় সংসারের শ্রী ও উন্নতি বিধান করিব। এদিকে কিন্তু আমাদের এই সাধু প্রচেষ্টার মধ্যে যে স্বার্থ আছে, এ কথা কাণাঘুষা হইতে লাগিল ; কিন্তু আমরা তাহা ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। এইভাবে আমাদের দিন চলিতেছিল।

একদিন প্রাতঃকালে—মাঘ মাসের শেষাশেষি হইবে, জলযোগ করিয়া কর্ম্মস্থানে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে আমার এক বন্ধু [১] তাড়াতাড়ি আমায় আড়ালে ডাকিয়া বলিল "শুনেছ—এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।" আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম—তখন 'কাণ্ড' অর্থে বৈপ্লবিক ভয়ঙ্কর কোন ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া, সম্প্রতি কলিকাতার উচ্চ আদালতে সামসুল হুদা নামক জনৈক উচ্চতম পুলিস কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছিলেন; আবার যে কি কাণ্ড বাধিল, জানিবার জন্য উৎকণ্ঠ হইলাম। বন্ধু বলিল "অরবিন্দবাবু চন্দননগরে আসিয়াছেন, এতক্ষণ হয় তো চলিয়া গিয়াছেন—বড় খারাপ হইল!"

আমি রহস্য বুঝিলাম না, ভাবিলাম—কোন উদ্দেশ্য লইয়া তিনি হয় তো আসিয়া থাকিবেন, পুনরায় চলিয়া যাওয়ায় মন্দ হইবার কারণ কি? কিন্তু বন্ধু এক নিঃশ্বাসে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম—অরবিন্দবাবু কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন; তিনি যাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁর পক্ষে আশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর না হওয়ায়, হয় তো ফিরিয়া গিয়া থাকিবেন।

শুনিলাম—ভোর চারটায় তিনি উক্ত স্থানে সংবাদ প্রেরণ করেন। এখন প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমার সহিত শ্রীঅরবিন্দের কোনরূপ পরিচয় ছিল না; তবে তাঁর নাম শুনিয়াছিলাম এবং হুগলীর প্রাদেশিক সভায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষও করিয়াছিলাম। আলিপুর বোমার মকদ্দমার সময়ে তাঁর কথা হৃদয়ের দরদ দিয়া শুনিতাম ও পড়িতাম। 'বন্দেমাতরম্' কাগজে তাঁর লেখা বাহির হয়, এইজন্য আগ্রহসহকারে উহার গ্রাহক হইয়াছিলাম। অরবিন্দের ত্যাগ ও তপস্যার কথা সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছিল। আলিপুর জেল হইতে ফিরিয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অভিনব বস্তু ছিল। ভারতের

১। বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

প্রাণের কথা যেন তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। বিশেষতঃ মকদ্দমার জেরায় তিনি তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীকে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্বদেশ-প্রেমের অমৃতধারা ঝরিয়াছিল, তাহা হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়াছিল। দেশকে এমন করিয়া কেহ বুঝি ভালবাসিতে পারে না; দেশের মুক্তি এই মহাপুরুষের তপস্যাবলেই যে আসিবে—এ ধারণাও বদ্ধমূল হইয়াছিল। সে অনেক কথা, ইহার পরও এই বিষয় লইয়া অনেক লিখিতে হইবে—উপস্থিত তাঁর খ্যাতি ও চরিত্র-কথার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ঘটনার কথাই বলি।

আমি বলিলাম "এতক্ষণ যে থাকিবেন মনে হয় না। তবে তিনি কি ভাবে আসিয়াছিলেন?" বন্ধুর মুখে শুনিলাম "নৌকা করিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন; একজন যুবকের ভিতর দিয়া কথাটা পাঠাইয়াছিলেন—আমি প্রতিদিন সেখানে চা খাইতে যাই, তাই শুনিলাম।"

আমি বিদ্যুদ্বেগে গঙ্গার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বসন্তের প্রথম পদসঞ্চারে, শীতের কুহেলিকা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষীণধারা তরঙ্গিণী প্রভাতসমীরে দুলিয়া-দুলিয়া নৃত্য করিতেছে। তখনও পূর্ব্বগগনের মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া সূর্য্যপ্রকাশ হয় নাই। অশ্বত্থ-বটবৃক্ষতল দিয়া আমি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলাম।

স্নানার্থীরা সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিল। এইভাবে উধাও হইয়া কোথায় ছুটিতেছি, এই প্রশ্নই অনেক পরিচিতদের মনে বোধ হয় জাগিয়াছিল। কিন্তু কাহারও দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না—যেন কি এক মহাকর্ষণে আমায় নাচাইয়া লইয়া চলিতেছিল।

ষ্ট্র্যাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে—রাণীর ঘাট হইতে। সেই ঘাটে একখানি কলিকাতার পান্সী তরঙ্গহিল্লোলে নৃত্য করিতেছিল। পাল গুটাইয়া রাখা হইয়াছে; তবুও বাতাসে তার খানিকটা উড়িতেছে। উহা যেন পতাকার শোভা। নৌকার ছইয়ের উপর একজন যুবক বসিয়াছিল। আমি সংশয়-চক্ষে এই নৌকাখানির দিকে চাহিতে-চাহিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গেলাম। সেও কোন কথা বলিল না, আমিও কোন কথা বলিতে ভরসা করিলাম না। আবার পিছাইয়া আসিলাম। সেই যুবকের দিকে কোন কিছু শ্রবণের প্রত্যাশায় মুখ ফিরাইয়া, আবার কিছু দূর অগ্রসর হইলাম—

দেখিলাম যুবকের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। এবার ফিরিয়া ভরসা করিয়া বলিলাম "আপনারা কি কলিকাতা হইতে আসিতেছেন?" যুবক বলিল "হাঁ, কেন বলুন দেখি?"

আমি সাহসে ভর করিয়া বলিলাম "এই নৌকায় অরবিন্দবাবু আছেন?"

যুবক আমায় কাছে ডাকিলেন, বলিলেন "নৌকায় আসুন।"

আমি এক লম্ফে নৌকার উপর উঠিয়া পড়িলাম। যুবক আমায় ভিতরে লইয়া যাইতেই দেখিলাম—অন্য এক তরুণের কোলে মাথা রাখিয়া, চুঁচুড়া প্রাদেশিক সভায় যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সেই তপোমূর্ত্তি অরবিন্দই শয়ান রহিয়াছেন। আমায় দেখিয়া তিনি বলিলেন "আপনি আমার খবর পাইলেন কোথা?"

আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন "এখন কি করিতে পারেন—আমায় আশ্রয় দেওয়ার সুবিধা হইবে কি?"

গর্ব্বে আমার বুক দুর-দুর করিতেছিল। মনে হইল—সে কি! আপনাকে আশ্রয় দেওয়ার সুবিধা? প্রাণ চাহিলে যে প্রাণ দিতে বাধে না! আবেগোন্মত্ত হৃদয়—সেদিন বুঝি ইহাই ছিল ভাল। যাক্ সে কথা। আমি উৎসাহসহকারে বলিলাম "আপনাকে তো লইতেই আসিয়াছি!" তিনি আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন "কত দূর আপনার বাড়ী?"

"কিছু দূরে। আপনি নিশ্চিন্ত হউন—আমি সব ব্যবস্থা করিতেছি।" এই বলিয়া আমি মাঝিকে নোঙর উঠাইতে বলিলাম। বাতাস বহিতেছিল দক্ষিণ দিক্ হইতেই। আমার গতিও তখন উত্তর দিকে। কিন্তু দাঁড় টানিয়া-টানিয়াই—এখন যে স্থানে আশ্রমের ঘাট, সেইখানে আসিয়া নৌকা ভিড়াইলাম। ঘাটে স্নানার্থীরা পাছে দেখিতে পায়, এই ভয়ে অঘাটেই তাঁহাকে অবতরণ করাইলাম। তখন ইহাই ছিল শ্মশান। এইখানেই 'তিনি' মৃতা কন্যা লইয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, আর এইখানেই সঙ্ঘের প্রথম শহীদ মুরারজী ভাই প্যাটেলের নামে "মুরারি-তীর্থ" হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ ঐ আশ্রমের কোল দিয়া আমার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিয়া বাড়ীতে উঠিলেন। কেহ লক্ষ্য করিল, কেহ করিল না। আমি বৈঠকখানায় তাঁহাকে আরাম-কেদারায় উপবেশন করাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গী দুই জন বিদায় লইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন নলিনীকান্ত[১] অথবা বিজয়[২] হইবে ; অন্য জন সুরেশ[৩] ওরেফ মণি। ইঁহাদের সহিত পরে আলাপ হইয়াছিল। অরবিন্দবাবুর ভার আমার উপর দিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইবেন, এরূপ আমার মনে হয় নাই। আমার মত একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের হাতে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া যাওয়ার ভরসা তাঁহারা সেদিন বোধহয় ঘটনার দায়েই করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার ইহাই ছিল অব্যর্থ বিধান। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এই ঘটনায় সম্পূর্ণরূপে অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিল। আজ এরূপ না হইলে, আমার অবস্থা কিরূপ হইত—সে কথা নির্ণয় করিয়া বলা খুবই শক্ত। যাহাই হউক, ঘটনা অকল্পিত হইলেও, ভাগবত বিধান এমন অকাট্য হইয়াই বুঝি উপস্থিত হয়!

তিনি আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁর আয়ত লোচনের প্রশান্ত দৃষ্টি আমার শরীর-মন স্নিগ্ধ করিয়া দিল। সেদিন সংসার-যাত্রার জটিল রহস্যের মধ্যে আমি গতিহীন হইয়া পড়িতেছিলাম ; শ্রীঅরবিন্দের আগমনে অকস্মাৎ যেন দক্ষিণ দুয়ার খুলিয়া ঝলকে-ঝলকে বসন্তের বাতাস আমার অন্তর-বাহির পুলকিত করিয়া তুলিল। প্রকৃতির বুকেও সেদিন প্রত্যক্ষ বসন্তের প্রথম পদসঞ্চার লক্ষিত হইতেছিল। আমার হৃদয়কুঞ্জের শুষ্ক সহকার-শাখা মুকুলিত হইয়া উঠিল ; আর হাজার পিকের কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠিয়া আমায় যেন উন্মাদ করিয়া দিল। সহজেই আমি ভাবপ্রবণ ছিলাম ; মাত্রাধিক্যে আমার মাথা যেন টলিয়া পড়িল। বিভোর চক্ষে আমি তাঁহার চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে স্মৃতি আমার মুছে নাই। এই দৃষ্টি-বিনিময়েই আমাদের মধ্যে যে অকৃত্রিম সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহা বাহিরের যোগাযোগ নিরপেক্ষ হইয়া অনন্ত চেতনার বুকে চিরাঙ্কিত হইয়াই থাকিবে।

শ্রীঅরবিন্দ জানাইলেন—তিনি এখানে গোপন জীবন যাপন করিবেন, কেহ যেন তাঁর আগমন-সংবাদ জানিতে না পারে। সতর্কতার অবধি রহিল না। একেবারেই অভিনব কর্ম্ম। বৈঠকখানায় তাঁহাকে বসাইয়া রাখা নিরাপদ মনে হইল না। এমন কত ভদ্রলোক আসেন, আলাপ করেন ;

১। নলিনীকান্ত গুপ্ত ২। বিজয়কুমার নাগ ৩। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দুই-চারদিন থাকেন, আবার চলিয়া যান। এই সহজ নীতি অবলম্বন করার কোনই গণ্ডগোল ছিল না ; কিন্তু ভাবপ্রবণ চরিত্র স্বভাবতঃই চঞ্চল, একটা কাণ্ড না বাধাইয়া ইহার রঙ্গ চরম হয় না। আমি বাড়ীর অব্যবহার্য্য ঘরগুলির ভিতর দিয়া যে অংশে চেয়ারের গুদাম, তাহার মধ্যে দ্বিতলের একটি অন্ধকার কক্ষে তাঁহাকে লইয়া আসিলাম। তিনিও চোরের মত পা টিপিয়া-টিপিয়া আমার অনুসরণ করিলেন। বাড়ীর ভিতরে বাসন মাজার শব্দ, মেয়েদের কোলাহল ; গোয়ালের গরুগুলা ফোঁস-ফোঁস করিতেছে ; দুই জনে পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া ইঙ্গিতেই জানান হইল "এইখানে কেহ সন্ধান পাইবে না—কেমন !"

ঘরের মেঝেয় একপুরু ধূলা জমিয়াছিল। কড়ি-কাঠে চামচিকা, আরশুলা, মাকড়সা প্রভৃতি জীব-জন্তুরা এতদিন স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিল, আজ সে জগতে চাঞ্চল্য-সৃষ্টি করার ভরসা হইল না—কেন-না, তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিলে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত হইবে। মেঝেটার কিয়দংশ ঝাঁট দিয়া একখানি শতরঞ্চির উপর ফরাস পাতিয়া দিলাম ; তিনি যন্ত্র-পুত্তলিকার মত নীরবে উপবেশন করিলেন। আমি ইঙ্গিতে বলিলাম "একটু পরে আসিতেছি, খোঁজ পড়িলে বিপদ হইবে।"

আমার সর্ব্বদা মনে হইতে লাগিল—বুঝি কেহ সংশয় করিতেছে। উঠানে আসিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র আমার স্ত্রী মুখপানে চাহিলেন। আমি ভাবিলাম—সর্ব্বনাশ ! বুঝি তিনি টের পাইয়াছেন। তিনি একটু হাসিলেন, আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া ভাবিলাম—একান্ত যদি ব্যাপারটা দেখিয়া থাকেন, নিষেধ করিয়া দিই, যেন কথাটা প্রচারিত না হয়। অন্যদিনও বোধ হয়, সকলেই ঘুরিতে-ফিরিতে মানুষের দিকে এমন করিয়াই চাহে ; কিন্তু আমার কেবল মনে হয়, আমার গোপন কাজটা বোধ হয় ফাঁস হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী নিকটে আসিলে, তাঁর স্নেহ-হস্তখানি মাথার উপর সঞ্চালিত হইল। তিনি বলিলেন "কাজ, কাজ, আর কাজ, সকালে উঠেই গুদামে ঢুকেছিলে বুঝি ! হয়েছে কি—মাথায় যে মাকড়সার জাল বুনে দিয়েছে !" বুক ধড়াস্-ধড়াস্ করিতেছিল ; হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মাকড়সার জালে ও ঝুলে মাথাটা ভরিয়া গিয়াছিল, তিনি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

জলখাবারের রেকাবী সম্মুখে আসিল। আমি ছল করিয়া বলিলাম, আমি "বৈঠকখানায় খাইব।" তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ মুখভঙ্গী সহকারে বলিলেন "কেন, দু'দণ্ড কি স্থির হ'য়ে ব'সতে নেই, ভাল চঞ্চল লোক বটে!" তিনিও কর্ম্মচঞ্চলা; বিশেষতঃ, ঘর পরিষ্কার করা লোকে তাঁর এক প্রকার বাতিক রোগ বলিয়া ধরিয়া লইত। ঘরের মেঝে তিনি এমন করিয়া পরিষ্কার করিতেন যে, মুখের প্রতিবিম্ব না পড়িলে মনঃপূত হইত না। গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য তিনি ঝাড়ন দিয়া ঝাড়িতেন; তারপর বস্ত্রাঞ্চলে যদি অবশেষ ধূলা থাকে, তাহা মুছিতেন; তারপর ফুৎকার দিয়া, তাহা অমলিন হইল—এই প্রত্যয়ে যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গৃহের অসংখ্য দ্রব্যই প্রতিদিন তাঁর পূত হস্ত-স্পর্শ হইতে বঞ্চিত থাকিত না। প্রত্যেক কাপড়খানি উভয় হস্ত বিস্তারিত করিয়া তিনি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঝাড়িয়া আবার উহাকে উল্টাইয়া ধরিতেন, পুনরায় পূর্ব্ব প্রকারে ঝাড়া দিয়া যথাস্থানে পাট করিয়া তুলিয়া রাখিতেন। একটা বড় টুলের উপর উঠিয়া কড়িকাঠের ফাঁকে মাকড়সার জাল, ধূলা, কীট-পতঙ্গের বিষ্ঠা যাহা জমিয়া থাকিত, তাহা পরিষ্কার করিতেন। আমি হাসিতাম—তিনি বলিতেন "তোমরা যেমন নোংরা থাকিতে ভালবাসো, আমি এসব দেখিতে পারি না।"

আমি তামাসা করিয়া বলিতাম "বাহির লইয়া অত ব্যস্ত থাকিলে অন্তরে যে ময়লা থাকিয়া যায়!"

তিনি গ্রীবা উন্নত করিয়া উত্তর দিতেন "সে দিকেও নজর আছে। যে পরিষ্কার, তার অন্তর-বাহির দুইই পরিষ্কার। ঘর-সংসারে যে ওঁচ্লা জমিয়ে-জমিয়ে রাখে, সে মুখে যতই বলুক, ভিতর তার শুদ্ধ নয়; অন্তর-বাহির এক হইবে, তবে সে পবিত্র বিশুদ্ধ মানুষ।"

আমি জানিতাম—মানুষটী খাঁটি। তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করা তাঁকে একটু রাগাইয়া দেওয়া মাত্র; কিন্তু সে সময় সেদিন ছিল না। কেবল মনে-মনে বলিলাম—চেয়ারের গুদামগুলো যদি তোমার হাতে থাকিত, ভদ্রলোককে এতখানি দুঃখ পাইতে হইত না!

বৈঠকখানায় গিয়া উঁকি মারিয়া এদিক্-ওদিক্ দেখিলাম—কাহারও দৃষ্টি আমার উপর আছে কিনা! বিশেষ ভাবনা—আমার স্ত্রীকে লইয়া; তিনি ঘুরিতে-ফিরিতে আমার উপর নজর রাখিতেন। ইহা একত্র থাকার

ফলে স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন যে কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন; সে কাজ সারা হইলে, একবার চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতেন—আমি কি করিতেছি। এমনই অতি দীর্ঘদিন তাঁর দৃষ্টির বাহির হই নাই। আজও সে অপলক-চক্ষুঃ কি অলক্ষ্যে সেইরূপ আমার এই কঠিন জীবনভার-লাঘবের জন্য তেমনই করুণা বর্ষণ করিতেছে ?

অতি সন্তর্পণে দালানের অলিন্দ অতিক্রম করিয়া গুদামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর নিঃশব্দে দ্বিতল কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম—তিনি নীরবে উর্দ্ধ-দৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছেন। কি অপার্থিব প্রসন্ন দর্শন। শ্রীঅরবিন্দ ভাব-মুখ অবস্থায় আমার গৃহে উপস্থিত হন। তিনি নিজেকে ভগবানের হাতে সর্ব্বতোভাবে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কথা কহিলে, মনে হইত—যেন আর কেহ কথা কহাইলে, তবেই তাঁর বাক্য-স্ফুরণ হয়। হস্তখানির সঞ্চালনেও বোধ হয়, কোন তৃতীয়শক্তি কর্ত্তৃক তাঁর হস্ত যেন চালিত হইতেছে। তাঁহার সম্মুখে খাদ্যের রেকাবীখানি ধরিলাম, তিনি সরলভাবে আমার দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম "বাড়ীতে কিছু জানাইবার উপায় নাই; কাজেই আমার জলখাবার আনিয়াছি—আপনি গ্রহণ করুন।" বিষয়টা এতখানি করিয়া লওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তাঁহাকে গোপন রাখার গুরুত্বে তাঁর সমস্ত সুবিধার পথই বন্ধ হইল। তিনি যন্ত্রচালিতের মতই কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলেন।

মধ্যাহ্নে সকলের আহারাদি শেষ হইল। আবার বহির্ব্বাটীর বৈঠক-খানায় তাঁহাকে আনিয়া বসাইলাম। অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীর সন্ধিস্থলে যে প্রবেশদ্বার, তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম; সদর-দরজাও বন্ধ করিয়া দিলাম; অতিশয় সতর্ক হইয়া, কূয়া হইতে দুই টব জল আনিয়া, ঘরের মেঝের উপর তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া স্নান করাইয়া দিলাম। আশ্চর্য্য, তিনি কিছুতেই আপত্তি করিলেন না। তখনও শীতের শিহরণ ঘুচে নাই। কূয়ার তুষারশীতল জল মাথায় ঢালিয়া দেওয়ার পরও তাঁর শরীরে কোন চাঞ্চল্য হইল না; অবশ্য শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বুঝিলাম—শৈত্য বোধ হইতেছে; কিন্তু তিনি অবিচল থাকার জন্য দৃঢ়চিত্ত হইয়াছেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। কেন-না, নিজের ভোজনপাত্র ধরিয়া বহির্ব্বাটীতে আনা যুক্তিসঙ্গত নহে; তাহা হইলে লোকে

জানিবে—কেহ আসিয়াছে। দোকানের খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই তিনি উদর পূরণ করিলেন। আজিও মনে পড়ে দোকানের অবিশুদ্ধ ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিলেন। আহারের পর, অনেক কথা হইল। আমার সহিত তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধেই কথা কহিলেন। ভগবানের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কিরূপে ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহারই সঙ্কেত দিতে তাঁর সেদিন যে কি আগ্রহ দেখিয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।

মধ্যাহ্নে পায়খানা যাওয়া লইয়া বিপদে পড়িলাম ; এখনকার মত হইলে কোন কষ্ট হইত না, কিন্তু তখন সেই অবস্থাই ছিল বোধ হয় আনন্দের—নতুবা তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এতখানি ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

পায়খানা বাড়ীর বাহিরে। গলি-পথ দিয়া যাইতে হয়। বাহির হইলে পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে একবার বাড়ীর ভিতর দেখিয়া আসিলাম, আর একবার গলির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম—উপস্থিত কাহারও আসিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে নিরাপদে শৌচ-কার্য্যাদি সমাপ্ত করাইবার যে সতর্কতা, তাহার ভিতর দিয়া ভগবান্ ভবিষ্যতে আরও অধিকতর রহস্যময় জীবনের জন্যই বুঝি সেদিন আমায় প্রস্তুত করিতেছিলেন! সন্ধ্যার পর, বিষম সমস্যায় পড়িলাম। তাঁহাকে সেই অন্ধকার কক্ষে একা রাখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। অথচ বৈঠকখানায় শয়ন করার ব্যবস্থা হইলে, বাড়ীর লোক জানিতে পারিবে। সন্ধ্যার পর পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া আমার সে যুগের এক অকৃত্রিম সুহৃদকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। সে সবিস্ময়ে এই কথা শুনিয়া, তাহারই বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে, বলিল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

রাত্রি দশটার পর, শ্রীঅরবিন্দকে সঙ্গে লইয়া সেই বন্ধুর বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিলাম। রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল—কি জানি, তিনি কি ভাবে রাত্রি যাপন করিতেছেন। পরদিন উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পর উক্ত বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম। তিনি আমায় বলিলেন "এখান হইতে আমায় লইয়া চল, কাল রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই···।" আমার বন্ধুও রাজী হইল, আমি তাঁহাকে আবার আমার বাড়ী লইয়া আসিলাম।

সমস্ত ঘর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—কোথায় তাঁহাকে গোপন রাখা যায়। ঠাকুরদালানের যে ছোট ঘরখানিতে ইহার পর ছেলেরা উপাসনা করিত, তখন উহা বে-মেরামতে পড়িয়াছিল। এ ক্ষুদ্র ঘরখানিও চেয়ারেই বোঝাই ছিল। আমি তাহার এক পার্শ্বে শয্যা রচনা করিলাম। রাত্রে সকলে শয়ন করিলে পর, তাঁহাকে সতর্ক হইয়া আমার অনুসরণ করিতে বলিলাম। তিনি অতি ধীরে আমার সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র গৃহে উপস্থিত হইলেন। শয্যা গ্রহণ কবিয়া তিনি বলিলেন "তুমি যাও, এইখানে স্থবিধায় থাকিব।" বুঝিলাম—তিনি নির্জ্জনতাই ভালবাসেন; গত রাত্রে গৃহ-মধ্যে অন্যে থাকায়, তাঁর সাধনার ব্যাঘাত হইয়াছে। একটি ছোট মশারি টাঙ্গাইয়া, তার চারিদিকে চেয়ারের স্তূপ আরও নিবিড়ভাবে সাজাইয়া আমি নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলাম।

রাত্রিতে কি ঘুম হয়! ভদ্রলোকের যদি কিছু প্রয়োজন হয়, এক ঘটি জলও যে দিয়া আসি নাই। আমি প্রত্যুষে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন। যথাসময়ে প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে গেলাম। আমার ব্যস্ততা যদি কেহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে আমার ভাবান্তর গোপন থাকিত না; কিন্তু সকলেই নিজ-নিজ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত, আমার অবস্থা কে আর লক্ষ্য করিবে?

মধ্যাহ্নে যথাসময়ে বাড়ী আসিতেই আমার স্ত্রী সঙ্কেতে আমায় ঘরে ডাকিলেন, বিস্ময়বিহ্বল অথচ উৎফুল্ল মুখে বলিলেন "বলি, তোমার কাণ্ডটা কি?"

আমি অবাক্ হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন "আমাকেও লুকাইয়া কাজ করা! ভগবান্ সহিবেন কেন!" আমি ভাবিলাম—যাঃ, সর্ব্বনাশ হইল; শ্রীঅরবিন্দের কথা তো পালন করিতে পারিলাম না! তাঁহাকে যে গোপন রাখার আদেশ দিয়াছেন! তখন ভিতর হইতে তাঁর একটী কথা পালন করিতে যে সঙ্কল্পের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

আমি তবুও মনে করিলাম—চেয়ারের প্রাচীর ঘিরিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছে; হয়ত তাঁহাকে তিনি না দেখিয়া থাকিতেও পারেন! জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি?"

তিনি এইবার হাসিয়া বলিলেন "উঃ, কি কপট ! যেন কিছুই জানে না ! তাই বলি, উঠানে অত জল কেন, বৈঠকখানার মেঝে কেন স্যাঁৎসেঁতে, একখানা ভিজা কাপড়ও শুকাইতেছিল—কিন্তু কাণ্ডটা কি বল দেখি ?"

আমি এইবার নিশ্চয় বুঝিলাম—সব ফাঁস হইয়া গিয়াছে। তাঁর বাকি কথাটা শুনিবার জন্য 'হাঁ' করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন "আমার রোগ—চারিদিক্ দেখিয়া বেড়ান। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ ! এমন বেহিসাবী বেটাছেলে তুমি, কি ভাগ্যি দু'খানা গামছা পরিয়া ঠাকুর-ঘর করিতে গিয়াছিলাম, তাই রক্ষে ! ওমা, কি লজ্জার কথা !"

তিনি অর্দ্ধ হস্ত জিহ্বা বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন "আমি কেমন করিয়া জানিব, ঐ কয়েদের ভিতর একজন ভদ্রলোককে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ ? আমি চেয়ারগুলি সরাইয়া ঘরের কোথাও আবর্জ্জনা জমিয়া আছে কিনা দেখিতেছি, হঠাৎ দেখি এক মনুষ্য-মূর্ত্তি, আমার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। প্রথম মনে হইল—চক্ষের ভুল, এমন অবস্থায় হঠাৎ মানুষ আসিবে কেমন করিয়া ? ওমা সত্যি ! ভূত নয়, প্রেত নয়, একটা আস্ত মানুষ জল-জল করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। আচ্ছা, যদি গায়ে আমার আর একখানা গামছা না জড়ান থাকিত, আজ কি অবস্থা হইত বল-তো !"

এই বলিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন "কে বল তো ! কোন খুনে না ফাঁসুড়ে, এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ—তোমার কাণ্ডখানা কি ?"

আমি নম্র স্বরে বলিলাম "তোমাকে কিছু গোপন করিতে পারি নাই, আজও ইহার প্রকাশ হইল। তুমি নাম শুনিয়াছ—অরবিন্দবাবু !"

তিনি বলিলেন, "স্বদেশী দলের ! সুরেনবাবুর মত !"

তখন স্বদেশী-যুগের নেতৃস্বরূপ সুরেনবাবুর নামই আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাই তিনি বলিলেন "সুরেনবাবুর মত, যাঁর নাম প্রচার হয় তিনি ?" আমি বললাম "হাঁ, অরবিন্দই খাঁটি নেতা, দেশের মাথার মণি। পুলিসে তাঁকে ধরিবে বলিয়া তিনি গোপনে আসিয়াছেন, গোপনে থাকিবেন—তাই এই অবস্থায়।"

এই দুই দিন ধরিয়া দিবারাত্রি আমার হাতে তাঁর নির্য্যাতনের কথাটা শুনিয়া বলিলেন "খুব লোকের কাছেই উনি আশ্রয় নিয়াছেন! এমন করিয়া রাখিলে কয় দিন টিকিবেন!"

আর আমায় কিছু ভাবিতে হইল না। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। প্রাতঃকালে যথারীতি জলযোগের ব্যবস্থা হইল। মধ্যাহ্নে তিনি নিজের অন্নের থালাখানি ধরিয়া দিলেন, রাত্রের ব্যবস্থাও করিলেন। তাঁর আহারাদি যে বন্ধ হইল, সে দিকে আমার লক্ষ্য রহিল না। এ খবর কোন-দিনই আমি রাখিতাম না। এই বিষয় লইয়া একবার চেষ্টা করিতে গিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছিলাম। তাঁর ভার ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিয়াই আমি নিজের কাজ করিয়া যাইতাম।

মধ্যাহ্নে বৈঠকখানায় বসাইয়া, পূর্ব্বদিনের মত শ্রীঅরবিন্দকে স্নান করাইয়া দিলাম। আহারাদির পর কথাবার্ত্তা কহিলাম। তিনিও হাসিয়া বলিলেন "তোমার স্ত্রী বুঝি!" আমি বলিলাম "হাঁ।" তিনি যে তাঁকে দিব্য লক্ষণা মাতৃমূর্ত্তি বলিয়া সেদিন উল্লেখ করিয়াছেন—সে কথা বেশ স্মরণে আছে।

সারা মধ্যাহ্ন তিনি যোগ-সম্বন্ধে আমায় শিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে চতুর্ব্ব্যূহ ভাগবত-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইয়াছিল, মনে আছে। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি আবেগভরে বলিয়া যাইতেন, আমি তন্ময় হইয়া শুনিতাম। অবতার সম্বন্ধে তিনি প্রাজ্ঞ ও বিরাট্ প্রকাশের উদাহরণ দিতেন, ব্যাসকে প্রাজ্ঞ ও শ্রীকৃষ্ণকে বিরাট্ পুরুষ বলিয়া আমায় কত কথা বুঝাইতেন। উপনিষদের তত্ত্ব তিনি মুক্ত-কণ্ঠে বিবৃত করিতেন। সারা মধ্যাহ্ন যে কি আনন্দে অতিবাহিত হইত, তাহা আর বলিবার নয়।

রাত্রিকালে আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধু আসিয়া রাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিত। আমার উহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হইত না, চেয়ারে ঠেস্ দিয়া ঘুমাইতাম। যুক্তিতর্কে মধ্যরাত্রি হইত। তারপর শ্রীঅরবিন্দ নিদ্রা যাইতেন।

আমার যত প্রবন্ধ ছিল, তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। এই সময়ে "উদ্বোধন" নাটকখানি লিখিয়া আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম। সেখানি

আগাগোড়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন "তোমার বাংলা লেখা বেশ। পার তো 'ধর্ম্মে' কিছু-কিছু লিখ্‌তে চেষ্টা কর।"

যে সাহিত্য কল্পক্ষেত্র হইতে মুক্তি খুঁজিতেছিল, তাহা তাঁহারই নির্দ্দেশে গোমুখীধারার ন্যায় নিঃসৃত হইল। 'ধর্ম্মে' আমার কয়েকটা ক্ষুদ্র সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর আজিও 'প্রবর্ত্তকে' সে অজস্র প্রবাহ ছুটিয়া চলে; শিথিল হস্ত, তবুও লেখনী স্তব্ধ হয় না! কি জানি, আমার সবখানি যেন তাঁর পরশ-প্রতীক্ষায় এতদিন স্তম্ভিত ছিল, জীবনে সকল দুয়ার একে-একে তাঁর ছোঁয়ায় খুলিতে আরম্ভ করিল। "উদ্বোধনে" আত্মসমর্পণের কথাই বলিতে চাহিয়াছি; কিন্তু তেমন স্পষ্ট বিশদ-রূপে তাহা বোধ হয় ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি সমর্পণের রহস্য বলিলেন। আমারও যেন সব পরিষ্কার হইয়া লক্ষ্যে পড়িল। তাঁর বন্দিজীবনে যে সব অপূর্ব্ব রহস্যের অনুভূতি হইয়াছিল, তিনি তাহা একে-একে বলিতেন। আমি শুনিয়া বিভোর হইতাম। কেমন করিয়া ধ্যান করিতে-করিতে তিনি শূন্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, কারাগৃহের কঠিন লৌহদণ্ড তাঁর হস্তস্পর্শে কেমন করিয়া নবনীত-তুল্য কোমল বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, জেলের উঠানে পিশাচমূর্ত্তি দস্যুতস্কর তাঁর চক্ষে কেমন অপরূপ বাসুদেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, সর্ব্বভূতে দিব্য বিভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—অনর্গল এই সকল কথা তিনি বলিয়া যাইতেন।

গ্রে ষ্ট্রীট হইতে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, একখানা ঠিকা গাড়ী করিয়া তাঁহাকে যখন লালবাজার পুলিস কোর্টে আনা হইতেছিল, তাঁর সম্মুখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারাক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা-ভরসা দিয়াছিলেন—তাঁর মুখে এ সকল কথাও শুনিয়াছি। আদালত-গৃহে বিচারক, উকীল, ব্যারিষ্টার, সকলকে নারায়ণ দর্শন করিয়া তিনি নিজের ভিতর হইতে এমন আনন্দ ও উল্লাস অনুভব করিতেন যে, তাঁর বন্ধন-দশা যে দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে, তাহা তিনি মনের কোণেও স্থান দিতে পারিতেন না। সে যে কত কথা, আজ তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে হইলে মহাভারত রচনা করিতে হয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা কথোপকথন করিতাম, কিছু বলিতে বাকী থাকিত না। তিনি কৌতুক করিয়া কত রহস্যও যে করিতেন, তাহা মনে হইলে আজিও হাসি বারণ মানে না। আমাদের এই অবাধ পরিচয় গভীরে

উভয়ের হৃদয়ে এমন রেখাপাত করিয়াছিল, যাহা মুছিতে হইলে অন্ততঃ আমার পক্ষে তাহা মরণের চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক। সে স্মৃতি মুছিবার নহে।

এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে, লোক-জানাজানি হওয়ার আশঙ্কায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করার কথা হইল। আমার কোন বিষয়েই আপত্তি করিবার ছিল না। তিনি আসিয়াছিলেন একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে; সেইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবেই যদি চলিয়া যান, তাহাতে যে আমার হৃদয় কোনরূপে ব্যথিত হইবে, ইহা আমার আদৌ মনে হয় নাই। তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা জানিবারও আমার ইচ্ছা ছিল না। তবে রাত্রিতে সহরের দক্ষিণ প্রান্তে একখানা গাড়ী করিয়া তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার ভার আমার উপর পড়িল। 'ধর্ম্মে' ও 'কর্ম্মযোগিনে', তাঁর নিরুদ্দেশের কথা বাহির হইয়াছিল : তিনি সাধনার জন্য হিমালয়ে তিব্বতীয় যোগী কৌথুমীর আহ্বানে প্রস্থান করিয়াছেন—এই কথাই লোকে জানিয়াছিল। কিন্তু দেশের লোকের চেয়ে পুলিসের লোক অধিক সন্ধান রাখিত। অরবিন্দবাবুর অনুসন্ধান তাহারা তখন কলিকাতায় করিতেছিল।

একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইলে যে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত, তখন সে চিন্তা আমার ছিল না। মধ্যরাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে, আমি তাঁহাকে লইয়া বাড়ীর অনতিদূরে আমাদেরই আস্তাবলে লইয়া গেলাম। দেখিলাম—সহিসটা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অতি সতর্কতার সহিত ঘোড়া দুইটাকে বাহির করিয়া, অন্ধকারে হাতড়াইয়া কোন রকমে গাড়ীতে যুতিয়া লইলাম। তাঁহাকে ও আমার আর এক বন্ধুকে গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে বলিয়া, ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়া দিলাম। উহার মধ্যে একটা ঘোড়া নূতন ছিল; সে ক্রমাগত গাড়ীকে নর্দ্দমার দিকে টানিয়া লইয়া যাইত। খুব জোরে রাশ ধরিয়া কি উৎকণ্ঠার সহিত যে যথাস্থানে পৌঁছিয়াছিলাম, তাহা আজও ভাবিয়া হাসি! নিশীথ রাত্রি, পথে লোক ছিল না, তাই রক্ষা! নতুবা মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়াই গাড়ী ছুটিত, সন্দেহ নাই। পথের এক স্থানে পুলিস প্রহরী গাড়ী রুখিতে বলিল—তখন চৈতন্য হইল যে লণ্ঠনে বাতি জ্বালি নাই। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটাইলাম—পুলিস-ব্যাচারী মুখবিকৃতি করিয়া গালি বর্ষণ করিল।

সহরের দক্ষিণ প্রান্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে অরবিন্দবাবুকে সুস্থ শরীরে সমর্পণ করিয়া, গাড়ী হাঁকাইয়া পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। আস্তাবলে ঘোড়া দুটাকে তুলিয়া—গাড়ী পথের উপরই পড়িয়া রহিল—ঘরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার স্ত্রীকে সবই বলিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সহিসটা কিছু জানিতে পারিল না ?" আমি বলিলাম "না।" তিনি বিষম চিন্তার সহিত বলিলেন "সর্ব্বনাশ, কোনদিন চোরে তো গাড়ী-ঘোড়া লইয়া যাইতে পারে !" আমি হাসিয়া বলিলাম "আমি তো আর চোর নয় !" আমার মনটি তখন অরবিন্দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই এ কথাও বলিলাম "সবই অরবিন্দের মহিমা ! পথেও তো বিপদ হইতে পারিত !" তিনি আর অধিক কথা কহিলেন না—বলিলেন, "তোমাদের সবই একটা কাণ্ড, এখন ঘুমাও !"

ঘাড় হইতে দায়িত্বের গুরু-বোঝা নামিয়া গেল। নিজেকে স্বচ্ছন্দ মনে করিলাম। একটা আস্ত মানুষকে সতত গোপন রাখার প্রচেষ্টা যে কি সাংঘাতিক, তাহা একাধিক বার অনুভব করিয়াছি ; শ্রীঅরবিন্দকে লইয়াই তাহার সূত্রপাত।

সংসারে অসচ্ছলতা বাড়িয়াই চলিতেছিল। পারিবারিক জীবনের মধ্যে যদি সকলে একযোগে একাত্ম হইয়া না উঠে, তাহা হইলে টানাটানি শুধু বাহিরেই ঘটে না, অন্তরেও বিপ্লব বাধিয়া যায়। আমার সংসার-জীবন ক্রমেই বিষময় হইয়া উঠিতেছিল।

দায়িত্ব একা আমার ঘাড়েই চাপিয়া বসিয়াছিল—অথচ এক-একটা ঘটনার আবর্ত্তনে আমার অন্তরের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, তাহাতে পারিপার্শ্বিকতার সহিত আর সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই খাপ্ছাড়া জীবনকে সুসঙ্গত করিয়া তুলিতেন যিনি, তাঁহাকে ইহার জন্য বেশ বেগ পাইতে হইত। আমার ঘন-ঘন পরিবর্ত্তনশীল জীবনকে ছন্দোময় করার তপঃক্লান্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দিবারাত্র তাঁহার মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিত, তাহাতে তিনি খুবই অবসন্না হইয়া পড়িতেন।

আমি করিতাম এক, ভাবিতাম অন্য; কিন্তু কৃত কর্ম্মটাকে ব্যবহারে আনার শিল্প তাঁহার ছিল; নতুবা আমার সবখানিই আজ ব্যর্থ হইত। কেবল শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই তিনি নিশ্চিন্তা ছিলেন না; তাঁহাকে নিরন্তর মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিতে হইত এবং নানা দিক্ দিয়া তিনি আঘাত পাইতেন—কোন্ দিক্ সামলাইবেন, তাহা যেন স্থির করিতে পারিতেন না।

সংসারের সকলেই উদাসীন। আস্তাবলে ঘোড়ার ছোলা নাই, গোয়ালে একপাল গরু, তাহাদের বিচালী নাই; মালী, বাড়ীর ঝি কয়েক মাসের মাহিনা বাকি বলিয়া বকাবকি আরম্ভ করিয়াছে, সহিস-কোচম্যান আসিয়া তলবের তাগাদা করে; এই অবস্থায় যাহাদের দ্বারা যে কাজ, তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করাও যায় না। মনিবের দুরবস্থা বুঝিলে ঝি-চাকর অবাধ্য হয়। মাহিনার এক কড়াও ছাড়িবে না কিন্তু কাজে ফাঁকি দেয়—দশ বাড়ীর কাজ লইয়া মনিবকে জ্বালাতন করে। এই সব নানা দিকের চিন্তায় তিনি তখন বিব্রতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার চেয়েও বেশী দুর্ভাবনা হইত আমায় লইয়া। আমি যে কখন কি করিয়া বসিব, তাহার জন্য তিনি সতত উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন এবং এক-একটা কাণ্ডও আমি এমন বাধাইয়া তুলিতাম, যাহার জন্য তাঁহার দুর্ভাবনার পরিসীমা থাকিত না।

তাঁহার সব-চেয়ে চিন্তার কারণ ছিল আমার জীবন লইয়া। তিনি তো তাহাতে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া প্রস্থান করিলেন—সেই চিন্তার ধারাবাহিকতা রক্ষার ভার কাহাদের উপর দিয়া গেলেন, আমি তাহাই আজ লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু তিনি যে তিলে-তিলে আপনার প্রাণ বিলাইয়া আমাকে রক্ষা করিতেন—আমি স্বার্থপর, বিনিময়ে তাঁহাকে রক্ষা করার সামর্থ্য আমার হইল না তো!

একবার সংসারের সমস্যা সমাধানের জন্য সঙ্কল্প লইলাম—সাত দিন উপবাসী থাকিব। তিনি তখন পিত্রালয়ে। ঘরে খিল দিয়া তিন দিন অতিবাহিত করিলাম। বাহির হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার অনুযোগ যে না হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু চতুর্থ দিন প্রভাতে ঘরের দ্বারে যে মমতার আঘাত কর্ণপুট স্পর্শ করিল, তাহা আমার সবখানিকে অস্থির করিয়া তুলিল। ঘরের দুয়ার খুলিয়া প্রত্যাশিতা প্রসন্নময়ী মূর্ত্তিই লক্ষ্য করিলাম; তাঁর

করুণা-দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাজা প্রাণ-রশ্মি বাহির হইয়া আমায় যেন আশা ও আনন্দে ভরাইয়া তুলিল। তিনি একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়াই আলমারী হইতে তেলের শিশি বাহির করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে আমার মস্তকে, সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ-শীতল-হস্ত প্রসারিত করিয়া, তৈল মাখাইয়া দিলেন, বিনা বাক্যেই ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়া আমায় অভিষিক্ত করিলেন। আমার মুখেও বাক্য-স্ফুরণ হইল না। তিনি আমায় উপবাসী থাকিতে দিলেন না। এই স্নেহ, এই অপার্থিব ভোগেরই লালসায়, স্বার্থ-কলুষিত অহঙ্কার কি তখন বার-বার এই ভঙ্গীর আচরণে তাঁহাকে তরঙ্গায়িতা করিয়া তুলিত! আজ কৈ সেই প্রকার উদ্ভট খেয়াল তো জীবনকে প্রবুদ্ধ করে না—দেহ ভোগহারা, অন্তরাত্মা সে অনিন্দ্য আনন্দসম্ভোগেই কি স্বকামনা চরিতার্থ করিত!

যত বার বৈরাগ্য আসিয়াছে, তত বার ঘর ছাড়িয়া বাহির হওয়ার উদ্যম করিয়াছি—সে উদ্যম, সে বৈরাগ্য আজ বুঝিতেছি তাঁর সরল প্রাণ লইয়া, অকপট হৃদয় লইয়া খেলার ছলনা। এমন করিয়া তাঁহাকে ব্যথা দেওয়ার কি অধিকার আমার ছিল? তখন যদি বুঝিতাম—ইহা নিছক কপটতা, সত্যই সতর্ক হইতাম; কিন্তু কি মোহ আমায় সেদিন ঘিরিয়া ধরিয়াছিল—জীবন-ভোর একজনকে কাঁদাইয়াই বিদায় দিলাম!

তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যুর পর, তিনি একবার পিতৃগৃহেই কঠিন রোগশয্যা-শায়িনী হন। চন্দননগর হইতে চুঁচূড়া অধিক দূর নহে, হৃদয় আকুল হইত একবার গিয়া তাঁকে দেখিয়া আসিবার জন্য; কিন্তু কে যে আমায় বাধা দিত তাহা জানি না, 'যাই-যাই' করিয়া যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিত না। শেষে রোগ সঙ্কটজনক, এইরূপ সংবাদ আসিলে, আমি ছুটিয়া তাঁর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। তাঁর চক্ষে বিগলিত অশ্রু উথলিয়া উঠিল, সে করুণ-দৃষ্টি আমায় ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি!"

তাঁর স্বর রুদ্ধ, তিনি উত্থানশক্তি-রহিতা। মরণের অন্ধকারে রূপের ডালি বুঝি ঢাকা পড়িয়া যায়! আমি শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিলাম। তাঁর বিষণ্ন মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিন দিন আর তাঁহাকে ছাড়িয়া উঠিতে পারি নাই। জীবনের স্রোতঃ কোথায় যেন রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতেছিল, সুযোগ পাইয়া সর্ব্বশরীর প্লাবিত করিল। তিনি আবার নূতন জীবন লইয়া আমায় আলিঙ্গন দিলেন। কি জানি, তাঁহার কাছে কেন আমি কুণ্ঠিত

হইতাম, শিহরিয়া উঠিতাম—আজিকার এই দীর্ঘ বিরহের কথা বুঝি বিধাতা এই সঙ্কেতে আমায় জানাইয়া সতর্ক করিতেন! সে স্বর্ণপ্রতিমা হইতে আমি দূরে-দূরেই থাকিতে চাহিতাম; কিন্তু তিনি তাঁর হৃদয়ের পরিপূর্ণ অর্ঘ্য লইয়া আমার অনুসরণ করিতেন। তাঁরই অন্তরের কামনা আমায় নিকটে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; নতুবা ভবিষ্যতের এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই আমার অন্তর-পুরুষ অভিমানে বহু বার চিরবিদায় লইতে চরণ বাড়াইয়াছে কিন্তু বাধ্য হইয়াই আমি ফিরিয়াছি। তিনি বাহু-বন্ধনে তাঁর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমায় বাঁধিয়া রাখিযাছিলেন; আমি হতভাগ্য, তাঁর এই মহাযাত্রা রোধ করিতে প্রাণপণ করিলাম না, ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মৃত্যুর করে স্বহস্তেই তাঁহাকে অর্ঘ্য-স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যু-বিরহে তিনি ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ নিদারুণ শোক তিনি এই প্রথম পাইয়াছিলেন, তাঁর তরুণ হৃদয়খানি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। দেহ-ভঙ্গের ইহাই ছিল কারণ। তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলাম "যদি সবখানি হৃদয় আমায় দিয়া থাক, তবে সে হৃদয়ে আত্মীয়-স্বজন যেই হোক, কাহারও মমতা ঠাঁই পায় কেন?" তিনি যে কথাটা এমন গুরুতর করিয়া লইবেন, তাহা ভাবি নাই। চক্ষের উপর দিয়া শোকপ্রবাহ বহিয়া গেল, জনকের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে তিনি প্রস্তর-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিমেষহারা নেত্রে তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। এক বিন্দু অশ্রু বুঝি গণ্ডে বহিয়া পড়ে; কিন্তু হুকুমে তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। জগতের যত কিছু ভাব, প্রবৃত্তি, সংস্কার—তিনি বুকে চাপিয়া নিষ্পেষিত করিতেন। কি এক অপূর্ব্ব দীপ্তি তাঁর চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! তাঁর কমনীয় মুখশ্রীতে বজ্রসঙ্কল্পের কঠোরতাও স্থান পাইয়াছিল। তিনি যখন ওষ্ঠপুট বদ্ধ রাখিতেন, কেহই তাঁর দিকে চাহিতে ভরসা করিত না। তাঁর কুন্দ-দন্তের অস্ফুট বিকাশে সংসারে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িত। তিনি এক মুহূর্ত্তে সৃষ্টির আনন্দ দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতেন; আবার যখন মুঠা খুলিতেন, উৎসবের আনন্দে সারা দিক্ ভরিয়া উঠিত। অনেকেই দেখিয়াছে—এক-একটা উৎসবকালে তিনি যে কোন কারণেই হউক, গম্ভীর-বিষাদ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যখন বসিতেন, যেন প্রলয়ের আতঙ্কে সব দিক্ ছাইয়া যাইত; পরে সহসা তাঁর

সমস্যা দূর হওয়া মাত্র মেঘমুক্ত সূর্য্যকিরণে যেমন দশদিক্ উদ্ভাসিত হয়, সকলের জীবন তেমনই খর-করোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিত। আজ হাতড়াইয়া আমার এই অন্ধকার-যাত্রা কি ব্যথাময়, তাহা কি বুঝাইবার বস্তু!

আবেগের কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। তাঁর জীবন-কথা ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত হওয়ার নহে। তিনি একটী দিনের জন্যও আপনাকে কাহারও সম্মুখে স্বেচ্ছায় বাহির করেন নাই, নিজেকে জাহির করিবার জন্য একটী কথাও কাহাকেও কখনও বলেন নাই; তাঁর স্বতন্ত্র জীবন বলিয়া কিছুই ছিল না—তবুও তাঁর অসাধারণ চরিত্র আছে, পুণ্যময়ী কাহিনী আছে, তাঁর মর্ম্মকথা কিছু ব্যক্ত হয়, আমাকে আমি যদি বিবৃত করিতে পারি। তাই তাঁহাকে আঁকিতে গিয়া নিজেকেই অনেকটা প্রকাশ করিয়া তুলিতে হইতেছে—আমার এ ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

শ্রীঅরবিন্দ বিদায় লইলে, দায়-মুক্ত হইলাম বটে; কিন্তু আমার জীবনে যেন আমূল ওলটপালট হইয়া গেল। তিনি ষোল আনা ভগবানে দেওয়ার কথা বলিয়া গেলেন; এমন কি হাতখানি নাড়িতে-চাড়িতেও কোন এক অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাহা পরিচালিত হয়, ইহা বুঝাইতে নিজের হাত উপরে তুলিয়া যেন আমায় দেখাইয়া দিলেন "দেখ, ইহা আমি উঠাই নাই, অন্য শক্তি হাতখানি ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিল।" বিশ্বাস করিলে বিস্ময়ের কথা, নতুবা অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করিলাম।

আমার এখনও মনে পড়ে—এই কথার পর তাঁর গতিবিধি অতিশয় আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। অন্যের চক্ষে ইহা না সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম—তিনি যখন মাটির উপর দিয়া চলিতেন, যেন ভূমির উপর তাঁহার পা পড়িত না, কেমন আল্‌গা-আল্‌গা ভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তিনি দাঁড়াইতেন। পদশব্দ হয় কি না, কাণ পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চার বলিয়া শ্রুতিও ইহা অকপটে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

তিনি যখন ভোজন করিতেন, আমার মনে হইত—এই ভোজনব্যাপারেও তাঁর কোন চেষ্টা নাই। তিনি অনন্যমনে আহার করিয়া যাইতেন; আমি যে অনিমেষ-দৃষ্টিতে দেখিতেছি, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতেন না। আমার

মনে হইত—সত্যই তাঁহার মুখ দিয়া অন্য এক তৃতীয় শক্তি আহার করিতেছে। আমার বেশ মনে পড়িতেছে—আমার কর্ণে ভোজনের শব্দ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই ; এই ভোজন-ব্যাপারও নিঃশব্দে সাধিত হইত।

আর একটা আচরণ স্পষ্ট দিনের মত মনে পড়ে। তাঁর চক্ষের দৃষ্টি কোন মানুষের চাহনি বলিয়া আমার মনে হয় নাই, কে যেন তাঁর চক্ষুর ভিতর দিয়া আমায় স্পর্শ করিতেছে! অবশ্য এই সবই আমার নিজের অনুভূতি মাত্র। তাঁর চন্দননগরে অবস্থানকালে আরও দুই-চারিজনের সহিত তিনি আমার চেয়ে অধিক ক্ষণ ছিলেন, এই সকল কথা প্রমাণ-সিদ্ধ হইবে কি না জানি না। এমন কি, আমার স্ত্রীকেও শ্রীঅরবিন্দের কথা অতিশয় বিস্ময়ের সহিত, আনন্দের সহিত বলিয়াছি ; তিনিও বলিয়াছেন "তুমি যখন যাহা করিবে, বলিবে, সবই বাড়াবাড়ি!" আমি রাগিয়া গিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন "ইহাতে রাগিবার কথা কি আছে! তুমি যাহা দেখ, কর, তাহা তোমার চেয়ে অন্যে ভাল করিয়া দেখিবে বা বুঝিবে, তাহা আশা কর কেন! অন্যের কাছে একটু বাড়াবাড়ি বোধ হয় বৈ কি!"

এ কলঙ্ক আজও আমার আছে ; কিন্তু আমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—এইজন্য এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

শ্রীঅরবিন্দ প্রায় উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে থাকিতেন। যখন তিনি কথা বলিতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি "আপনি ঐরূপ এক দৃষ্টিতে কি দেখেন?" তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমার বুকে আজও তেমনি উজ্জ্বল-ভাবেই আঁকা আছে। তিনি বলিলেন "কতকগুলা লিপি ভাসিয়া আসে, উহাদের অর্থ বাহির করার চেষ্টা করি।" আবার এ কথাও তিনি বলিয়াছিলেন "অলক্ষ্য জগতে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের আকার ফুটিয়া উঠে। অক্ষরের মত এই সব মূর্ত্তিও অর্থময়ী—কিছু জানাইতে চাহে, সেগুলিও আবিষ্কার করিতে যত্ন করি।"

তখন প্রভাবের মূল্য বুঝি নাই। আরোপের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি নাই। "ময্যেব মন আধৎস্ব"—এই মন স্বভাবতঃই তাঁহার উপর পড়িয়া থাকিত ; এবং অন্যে অনুকরণ বলিবে, আমি কিন্তু বুঝিতাম—তাঁর ভিতর দিয়া একটা পরমা শক্তি আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমার পাদুকা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এক বন্ধু শ্রীঅরবিন্দের আগমন-সংবাদ

জানিতেন। তিনি মুখ ফুটিয়া বলিয়া বসিলেন "তোমার ভক্তি যে বাহির হইয়া যায়!" আমার স্ত্রীও আমায় সেই কথাই বলিলেন; কিন্তু সে কথা আমায় লঘু করিল না। তাঁর কথা—"তোমার আচরণ দেখিয়া কেহ সন্দেহ করিতে পারে একটা কিছুর—যাহা হইবে, মনে-মনে রাখাই ভাল।"

আমার জীবন সফেন সমুদ্রতরঙ্গের মত উচ্ছ্বাসময়; কিন্তু তিনি ছিলেন অন্তঃপ্রবাহিনী ফল্গুধারা—পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আমাদের মিলন। তাঁকে কোনদিন উচ্চ কণ্ঠে আলাপ করিতে দেখি নাই; সুখে-দুঃখে তিনি অচঞ্চলা থাকিতেন, ক্রোধ হইলে গম্ভীর ভাবে তাহা অন্তরেই ঢাকিয়া রাখিতেন—আর আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয় সব কিছু প্রকাশ করিয়া ফেলিত। কিন্তু পরিণাম দেখিয়া মনে হয়—এই প্রকাশ-ছলের তলে-তলে নিগূঢ় জীবনের কথাই তলাইয়া থাকিত। আমাব আচরণটাই মানুষকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। যেখানে আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি, সেইখানেই কিন্তু করুণার ধারা ঝরিয়াছে; যেখানে ভালবাসিয়াছি, সেইখানেই বিরোধ মাথা তুলিয়াছে। একজন আমায় বুঝিয়াছিলেন, তাঁর ব্যথার সুরে জীবন মিলাইয়া আজ অনেকেই আমায় ধরিয়া ফেলিয়াছে—প্রেমের বস্তুতে এমন অনাস্থা আমার মত আর কেহ করিবে না।

শ্রীঅরবিন্দের মত আমার চক্ষুও স্থির হইয়া পড়িত। আমি চিরদিন নিরামিষাশী। ধর্ম্মপ্রেরণা পাইলে, তাহা যতখানি ধরিবার মত আমার সামর্থ্য, তাহার অধিক আয়ত্ত করার উদ্বুদ্ধতা আমায় পাইয়া বসিত; এই হেতু শ্রীঅরবিন্দ প্রস্থান করিলে, আমি একপ্রকার সমাহিত হইয়া পড়িলাম। খাদ্যাদি সম্বন্ধেও অধিক সংযত হইতে গিয়া আমি স্ত্রীকে অধিকতর জ্বালাতন করিলাম। তিনি শ্রমকাতরা ছিলেন না; কিন্তু তিনি দেখিতেন—আমার দেহখানি কতখানি সহিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ রুক্ষ স্নান করিতেন, আমিও তৈলবর্জ্জিত স্নান আরম্ভ করিলাম। অধিকন্তু আহার্য্যে লবণ পরিত্যাগ করিলাম। এই নূতন অভ্যাস আমার শরীরকে কিছু কৃশ করিল। তিনি বলিতেন "ইহাতেই কি ধর্ম্ম হইবে? বাহিরে নাই কিছু করিলাম; ভিতর দিয়া যাহা ধরিব, তাহা হইতে আমায় ছাড়ায় কে?" বলে—'মন চাঙ্গা তো কাটেঙ্গে গঙ্গা'—আমার বাপু এই সব আড়ম্বর ভাল লাগে না!" তাঁর এই প্রকারের কথা কিসের দরদে আসিত, তাহা জানিতাম; কিন্তু

আমি তখন শ্রীঅরবিন্দের মত ঐ তৃতীয় শক্তিটার সন্ধানেই যত্নপর হইয়াছি। সংসারের কাজে যথেষ্ট ত্রুটি হইতে লাগিল।

শ্রীঅরবিন্দ টাট্‌কা রাষ্ট্র-ক্ষেত্র হইতে চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার মুখে রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি ও কর্ম্মধারার কথাও অজস্রধারে বাহির হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু সে সব উক্তি আমায় লক্ষ্য করিয়া কোন দিনই বাহির হয় নাই। তিনি আমায় অধ্যাত্ম-সাধনারই সঙ্কেত দিয়াছিলেন। ইহার নিগূঢ় কারণ আর যাহাই থাকুক, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমার জীবনের একটা অভিনব দিক্ ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

ঠাকুর-দালানের পার্শ্বেই তিনি থাকিতেন। প্রতিদিনের পূজা, জপ, মন্ত্রের আবৃত্তি তিনি পার্শ্বের ঘরে বসিয়া নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবেন। তাহা ব্যতীত, রবিবার প্রাতঃকালে পাড়ার এক দল তরুণ আমার পথানুসরণের প্রবৃত্তি লইয়া অনুরাগী হইয়াছিল। তাহাদিগকে পূজা শিখাইতাম, মন্ত্র আবৃত্তি করাইতাম। রবিবারের মধ্যাহ্নে যে আলোচনা-সভা হইত, তাহাতে তখন ততখানি যোগ্য হই আর না হই, এই সব ছেলেদের গীতা, উপনিষদ পড়াইতাম। ইহার জন্য উপহাস, বিদ্রূপ আমার সমবয়সীদিগের নিকট হইতে অজস্র ধারায় আমার উপর বর্ষিত হইত। এই সব বালখিল্যদের লইয়া আমার এই উদ্যমটাকে ধাত্রীবিদ্যানুশীলন বলিয়া কেহ-কেহ ঠাট্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্ঘের অব্যর্থ বীর্য্য-স্বরূপ এই সব তরুণই আজ এই প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড। আমি জানিতাম না—এখন দেখি সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা এই অন্ধ যন্ত্রটাকে ব্যর্থ কর্ম্ম করান নাই। শ্রীঅরবিন্দ এই সব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ইহাপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্দর্শনও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নহে। তিনি আমায় গীতার এই কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।" আমার মনে যখনই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত, এই মন্ত্র স্মরণ করিতাম; শেষে এমন হইয়াছিল যে, এই মন্ত্রটা মস্তিষ্কবৃত্তির সহিত একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল এবং তাহা হইতে মুক্তি পাইতে আমায় বেশ যত্ন স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আর একটা মন্ত্র আমার বুকে তিনি আঁকিয়া দিয়াছিলেন:

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এই মন্ত্রও সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতাম—মন্ত্রের সাধন লইয়া যে কিরূপ বিব্রত হইয়াছি, তাহা পরে বলিব। আমার এই ভাবান্তর দেখিয়া স্ত্রী সংসার সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন। আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন নিশ্চয়ভাবে কিছু বুঝিয়া লওয়ার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার মতলবটা কি বল তো।" আমি হাসিয়া বলিতাম—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

তিনিও হাসিতেন, যেন মনে-মনে বলিতেন "কোথায় যাবে—আমায় ছাড়িয়া এক পা যাওয়া হইবে না।" তাঁর এই অব্যর্থ ধারণা তো ভ্রম নহে!

আমি আপন ভাবেই ভরিয়া থাকিতাম, শ্রীঅরবিন্দের কি হইল, তাহা খেয়াল রাখার প্রয়োজন মনে হইত না। সংবাদ পাইতাম, কোথা হইতে তাঁহাকে কোথায় স্থানান্তরিত করা হইতেছে; কাহাকে তাঁহার সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা হইতেছে প্রভৃতি। আমি জানিতাম—ঐ মন্ত্র

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

রবিবারে ছেলেরা আসিলে, তাহাদের কণ্ঠে নূতন সঙ্গীত ঝঙ্কার তুলিল। সঙ্গীত রচনা করিলাম আমি:

"হৃদয়ের স্তরে জ্বলন্ত অক্ষরে
লেখা রবে হরি, অনুজ্ঞা তোমারি।..."

"আমার জীবন তোমার তরে
এই কথাটী মনে রাখ...।"

"কারু কথা আর কি শুনি,
আমার প্রাণের ঠাকুর জেগেছে।..." —প্রভৃতি

এই সকল গান প্রাতঃকালে পূজার পরে আরম্ভ হইত, রাত্রে অভিভাবকেরা লণ্ঠন হাতে ছেলেদের সন্ধানে আসিলে নিস্তব্ধ হইত। আমি এক প্রকার উন্মাদ হইয়াছিলাম।

"আজ সংসারে বাজার হয় নাই, সুতরাং খুব গোলমাল বাধিয়াছে।" "আজ গরু বিচালী পায় নাই, ঘোড়া দানা পায় নাই, এই সব ঝঞ্ঝাট যদি বহিতে না পার, সব ছাড়িয়া দাও না!" এই সকল অনুযোগ ও তিরস্কারে আমি হাসিয়া ঐ একই উত্তর দিতাম "ত্বয়া হৃষীকেশ—"

তিনি যে কোথা দিয়া এই সময়ে প্রাণপণে সংসারটা বজায় রাখিতেন, তাহার খবর লইতাম না; পরে জানিয়াছি—অবশিষ্ট অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়াই তিনি ভদ্রতা রক্ষা করিতেন। গুরুতর আঘাত আসিলে, আমার চমক হইত; তখন আমি কাজে মন দিতাম। ব্যবসার ক্ষেত্র একান্ত অচল ছিল না; কিন্তু কেহ না দেখিলে, তাহা রক্ষা পাইবে কেন? তিনি রাগিয়া বলিতেন "বাড়ীর ব্যাটাছেলেরা যদি এক-এক রকমের হয়, বল তো আমিই গদীতে গিয়ে বসি!"

আমার তখন স্থির-দৃষ্টি—অন্তর-পুরুষের নির্দ্দেশে। কখন কাজ করি, কখন হঠাৎ কাজ হইতে উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াই—যে প্রেরণা আসে, তাহা করিয়া বসি। গলা ছাড়িয়া গান গাই :

"জানি না-ক ধর্ম্ম জানি না অধর্ম্ম,
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদয়ে বিরাজ।
আমায় চালাচ্ছ যে পথে, চলি সেই পথে,
তোমারি আনন্দ জীবন আমারি।..."

—সত্য কথা বলিতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন? এই সময়ে এমন যে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত, তাহাও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল। তিনি আমার উন্মাদনা দেখিয়া মুখ পানে চাহিয়া বলিতেন "তোমার হইল কি?" আমি বলিতাম "আমার তো আর কিছু দায়িত্ব নাই, ভগবান্ সব ভার লইয়াছেন, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম তাহা জানি না!"

কিন্তু যে দর্প আমার মাথা উঁচু করিয়া ধরিয়াছিল, তাহা আহত হওয়ায় আমি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। অন্তরে অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করিলাম; কিন্তু তখনই কে যেন বজ্র-কণ্ঠে ভিতরে গর্জ্জন তুলিল, "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।" নিজের সাধনকাহিনী নিখিল ভুবন ভরিয়া গেলেও শেষ হইবার নহে; কেবল অবস্থার কথাটা জানাইয়া যাঁর জীবনকথা শেষ করিতে চাই, সেই প্রসঙ্গই এইবার বলিয়া যাই।

যখন অন্তরের ছাড়-পাওয়া পশু-বৃত্তি অবাধ রঙ্গ ঘুড়িয়া আমায় দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, যখন সুশীলা পত্নীর মানা কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিয়াছি, কারও দিকে মাথা তুলিয়া কথা কহি না; নিঃশব্দে জপিয়া যাই—'মচ্চিত্তঃ' মন্ত্র, আর 'হৃষীকেশকে' হৃদয়ে রাখিয়া বলি, "প্রভু, আমার ধর্ম্ম, অধর্ম্ম সব ভাসিয়া যায়; শিশুকাল হইতে চেষ্টা করিয়া, বার-ব্রত পালন করিয়া যে প্রবৃত্তির নাশ হইল না, যত্ন ও অধ্যবসায়ে কেবল মূর্চ্ছিতা হইয়া রহিল, তাহার দায় হইতে মুক্তির প্রয়োজন হইলে তুমিই তাহার বিধান করিও। আমার মৃত্যুপণ—যে সঙ্কেত পাইব, তাহাই করিয়া বসিব।"

সত্যই দুর্দ্ধর্ষ হইলাম এবং এই প্রেরণার বশে তাঁহাকে কত কাঁদাইয়াছি, তাহা যেন নিঃশঙ্কায় লেখনী ব্যক্ত করিতে পারে—এই ভরসাটুকু আজ অন্তর্য্যামীর নিকট প্রার্থনা করি।

তিনি যাহা বলেন—'না, না', আমি যদি বুঝি তাহা 'হাঁ, হাঁ'—আর কোন কথা নাই, সে কি জানি পতিপত্নীর সম্পর্কে, কি জানি সংসার, লোকাচার বিষয়ে; সে মহা-দ্বন্দ্বকালে তিনি যে কেমন করিয়া স্থির অবিচলিত হৃদয়ে সব কিছু মানিয়া লইয়া আমায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পথে ধ্রুব-তারার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আলোয়-আলোয় পার করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আমি কেবল আমার একতারা লইয়া তাঁহার স্তুতি গাহিতাম:

"দেবি আমার, সাধনা আমার,
ধ্রুবজ্যোতিঃ মম জীবনে।"

এই ভাবে দিন চলিয়াছে, সহসা বন্ধু আসিয়া বলিলেন "অরবিন্দবাবু তোমায় ডাকিয়াছেন।" চমক হইল। প্রায় এক মাস অতিবাহিত হয়, তাঁহার সহিত তো সাক্ষাৎকার করি নাই! সংবাদ সবই রাখি, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটিয়া উঠে না। নিজের কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা ছাড়াইয়া কোথাও যাওয়া আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ—সেদিনও যেমন ছিল, আজও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। ইহার জন্য আমার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা চলিয়াছে; কিন্তু যাহা আমার স্বভাবে নাই, তাহা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে আমার বাড়ীর অতি নিকটে রাখা

হইয়াছিল। সহরের উত্তরাঞ্চলে সুবিধা না হওয়ায়, কয়েক দিন সহরের মধ্যস্থানের একটা বাগানবাড়ীতে[১] তাঁহাকে রাখার ব্যবস্থা হয় কিন্তু স্থানটি একান্ত প্রকাশ্য বলিয়া মনে হওয়ায়, পুনরায় তিনি সহরের উত্তরাঞ্চলে[২] আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ব্যবস্থার ভিতর আমিও ছিলাম। সেদিন তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার যিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আজ পরলোকে[৩]। তাঁর নিকট হইতে প্রতিদিন সংবাদ পাইতাম। তাঁহাকে গোপন রাখার জন্য এই ভদ্রলোক কলে চাকুরী করেন বলিয়া, বেলা নয়টায় সদর দরজায় চাবি দিয়া বাহির হইতেন, আবার সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিতেন। শ্রীঅরবিন্দের জন্য খাদ্যাদি রাখিয়া দেওয়া হইত। তিনি সারা দিন একা বসিয়া থাকিতেন।

আমি সন্ধ্যাব পর তাঁর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সহাস্যে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "আর একেবারেই দেখা নাই, খুব কাজে থাক বুঝি!" সত্য উত্তর দিতে হইলে, অনেক কথাই বলিতে হয়; আমি 'হাঁ-না' করিয়া অন্য কথা পাড়িলাম। এই সময়ে তাঁর খাদ্যাদি ফলমূল ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। ভোজনের এই ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। একটা বাটিতে পেস্তা ভিজিতেছিল, আমি খোসা ছাড়াইতে আরম্ভ করিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করিলেন "সাধন কেমন চলিতেছে!"

আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। জীবনে সহজের প্রভাব যে ভাবে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিতে বাধিল। এমন কি, মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেও আমার লজ্জা করিতেছিল। ভগবানের নাম করিয়া ভোগপ্রবৃত্তির অবাধ-দাবী আমায় যে অতিশয় হীন ও তুচ্ছ করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিলাম। যখন তিনি আসেন, তখন কত গর্ব্বোন্নত হৃদয়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম—আজ যেন নিজের কাছে নিজেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলাম! তাঁর মত যোগী, তপস্বী, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর

১। চন্দননগর, বাগবাজারস্থিত করের বাগানবাড়ী ২। রথের জগন্নাথবাটী সংলগ্ন "গুলির" আড্ডা। ৩। সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়।

সংসর্গে থাকিতেও আমার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তিনি কিন্তু কি যে করুণা-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "লজ্জা কি! অবস্থা যেমনই হোক, আমায় বল—আমি তোমায় সাধনার আরও নূতন সঙ্কেত দিব।"

কেন জানি না—সেদিন তাঁর এমন অযাচিত প্রেমের যাচ্ঞা আমায় উন্মাদ করিয়াছিল! আমি তখন অকপটে আমার ভাবান্তরের কথা বলিলাম। আমার আবাল্য জীবনসাধনার ভিত্তি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল বলিয়া চক্ষে বোধহয় অশ্রু গড়াইয়াছিল; তিনিও যেন সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া গদগদ ভাষায় বলিলেন "আধার শক্তির হাতে ছাড়িয়া দিয়াছ, ভালই হইয়াছে; আধারের সঙ্গে তোমার চেতনা জড়াইয়া আছে, উহা উপরে তুলিয়া ধরিতে হইবে। তুমি সবখানি যেমন মেলিয়া দিয়াছ, তাহা আর গুটাইও না; কিন্তু সাক্ষি-স্বরূপ দেখিয়া যাওয়ার চেতনাকে স্বতন্ত্র করিয়া ধর। তুমি দ্রষ্টৃ-স্বরূপ কেবল দেখিয়া যাও, আধারের অহঙ্কার ও চেষ্টার সহিত নিজেকে জড়াইও না।"

সাধনার এই সঙ্কেত এমন নিবিড়-ভাবে আমার হৃদয়ে আঁকিয়া গিয়াছিল যে, তাহার রেখাঙ্কনগুলি আজও মিলাইয়া যায় নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার চক্ষে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "ভয় কি? বহুদিনের রুদ্ধ গৃহ আবর্জ্জনাময় হইয়া থাকে, যখন শুদ্ধির আরম্ভ হয়, তখন সব প্রকাশিত হইয়া দম বন্ধ করিয়া দেওয়ার উপক্রম করে; কিন্তু ইহাতে আধার বিশুদ্ধ হইয়াই উঠিবে। বিশেষতঃ তোমার ইহাতে কোন অন্যায় হইতেছে না; তোমাব স্ত্রীর সাহায্য পাইতেছ। হবে, তোমার হবে।"

যেন অব্যর্থ ভবিষ্যদ্দর্শন তাঁর কণ্ঠের শব্দে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তাঁর এই "হবে", এই দৃঢ় প্রত্যয়মূলক কথাটী আরও কয়েকবার তাঁর মুখে শুনিয়াছি—ইহা বেদমন্ত্রেরই মত আমায় চির উদ্বুদ্ধ করিয়াছে ও করিবে।

অনেক রাত্রি হইল, বাড়ী ফিরিব—এমন সময়ে তিনি বলিলেন "কাল পার তো এস, আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।" আমি বিস্মিত হইয়া চাহিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় যাইবেন!" তিনি হাসিয়া বলিলেন "কোন স্বাধীন রাজ্যে।" আমি আরও আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহা হইলে ভারতের বাহিরে যাইবেন, দেখিতেছি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "না,

ভারতের মধ্যেই।" তিনি কথাটা যখন গোপন করিতেছেন, তখন ইহা লইয়া আর পীড়াপীড়ি করিলাম না। তবে কথায়-কথায় শুনিয়াছিলাম, তিনি এইরূপ আত্মগোপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ভগ্নী নিবেদিতার একান্ত আগ্রহাতিশয্যে তিনি এই পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং শেষে ইহা ভগবানের নির্দ্দেশ-রূপেই গ্রহণ করিয়া এই পথে পা বাড়াইয়াছিলেন।

আমি আবার নূতন অবস্থান্তরে পড়িলাম। দেহটাকে ছাড়িয়া দিই, যেন হারাইয়া যায়; আবার দেহ চেতনার সহিত দ্রষ্টৃত্বের চেতনা এক হইয়া যায়। আমার স্ত্রী এই নূতন ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমার কত রকম ভাবই যে হবে, এ আবার কি ভাব এল!"

আমি তাঁহাকে সাধনার অবস্থাটা বুঝাইয়া দিলাম। তিনি কতক বুঝিলেন, কতক বুঝিলেন না। কেবল হাসিয়া বলিলেন "এত মাথা ঘামাবার দরকার আমার নেই, যাতে তোমার ভাল হয়, তাই কর। তুমি যে মানুষ, সাধন-ভজন নিয়ে কি ক'রবে—এই জন্যই ভাবি!"

এইভাবে এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আর সাক্ষাৎকার করি নাই। হঠাৎ তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তাঁর পণ্ডিচারী যাওয়ার কথাই স্থির হইয়াছিল; কেমন করিয়া যাইবেন, সে আয়োজনের মধ্যেও আমার প্রয়োজন ছিল। লোকজনের ব্যবস্থা করিয়াও, কেন যে আমি বিদায়কালেও তাঁর নিকট গেলাম না, তাহা জানি না। দেহটা এক দিকে, চেতনা অন্য দিকে। জীবনের সামঞ্জস্য রাখা শক্ত হইয়াছিল। কখনও কাজে খুব ঝোঁক দিই, কখনও বা স্থির হইয়া বসিয়া থাকি। যে রাত্রি তিনি চন্দননগর ছাড়িয়া যাইবেন, সেই রাত্রিতে আমি যাহা-যাহা প্রয়োজন সব সারিয়া, যথাসময়ে আহারাদির পর শয্যাগ্রহণ করিলাম।

অর্দ্ধ-রাত্রির পর ডাক শুনিলাম। আমার স্ত্রী ডাক শুনিলেই সাড়া দিতে নিষেধ করিতেন, জাগিয়া থাকিলে মুখ চাপিয়া ধরিতেন। কিন্তু রাত্রে ডাকাডাকির ব্যাপার আমার অনেক দিক্ দিয়াই ঘটিত; কাজেই তাঁর এই আকুলতার মূল্য রাখা সম্ভব হইত না। আমি উঠিয়া বসিতেই তিনি বলিলেন "কোথায় যাবে!"

আমি বলিলাম, "অরবিন্দবাবু আজ যাচ্ছেন, বোধ হয় দেখা করতে হবে।"

তিনি বলিলেন "তুমি তো আচ্ছা লোক—এত করা হ'ল, যাবার সময়ে সাম্‌নে গিয়ে তো একবার দাঁড়াতে হয়! তুমি বাবু এত কর, কিন্তু শেষ রাখতে পার না—এইজন্য তোমার শত্রুবৃদ্ধি হয়।"

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হওয়া মাত্র, আমার পরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি ব্যাপার!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করে' যেতে চান।"

আমি কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়াই চলিলাম। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সন্ধিক্ষণ মাত্র। চারিদিক্ নিস্তব্ধ—কেবল রাত্রিচর প্রাণীর অস্পষ্ট শব্দ শুনা যাইতেছিল। আকাশে আধখানা চাঁদ ভাসিতেছে। ধরণী জ্যোৎস্না-প্লাবিতা। তখনও দারুণ গ্রীষ্মের আরম্ভ হয় নাই; বসন্তপবন দেহ শীতল করিয়া দিল। শ্যাম তৃণদলে শিশির পড়িয়াছে; চন্দ্রকিরণে যেন তাহা নক্ষত্রখচিত বলিয়া মনে হইতেছিল। সম্মুখে প্রবাহিনী ভাগীরথী চূর্ণ হীরক-খনির মত চক্ষু ঝলসিয়া দিল। দেখিলাম—শ্রীঅরবিন্দ নদীতটে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আকুল হইয়া চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিলাম। সেদিন আর শেষ বিদায়ের দিন, একই ভাবে তিনি বুকে ধরিয়াছিলেন। একদিন প্রতিষ্ঠার মিলন, অন্যদিন বিসর্জ্জনের চিরবিরহ; স্পর্শের আস্বাদে কিন্তু আমার পার্থক্য বোধ হয় নাই।

"আমি চলিলাম—আবার দেখা হবে।"

আমি অবাক্ হইয়া, তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "সে আশা আর রাখলেন কৈ? মনে রাখিবেন।"

তাঁর চক্ষুঃ যেন ছল-ছল করিতেছিল; মাথার উপর কর অর্পণ করিয়া তিনি বলিলেন "তোমার হবে। সাধনা ঠিক রেখো—কোন ভাবনা নেই। কিছু হয়েছে, আরও হবে।"

আমি আর কি বলিব—নির্ব্বাক্ রহিলাম।

তীরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমার অন্তান্ত বন্ধুদের সহিত তরণীতে আরোহণ করিলেন। ক্ষেপণীর শব্দ হইল—ছপাৎ—ছপাৎ, দূরে

আরও দূরে তরণী ভাসিয়া যায়। অনিমেষ চাহনি লইয়া চারি আঁখি সেদিন কেন যে এমন করিয়া এক হইয়াছিল! দৃষ্টি তখন উভয় পক্ষেই আর চলে না, মাঝে কুয়াসাচ্ছন্ন আলো-ছায়ার যবনিকাপট ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আমি বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইলাম। সেদিন বুঝিলাম—দেখা-শুনা করি আর নাই করি, বুকটা যেন কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা শূন্য হইয়া গেল! সজল নয়নে শয্যায় আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলাম; স্নেহবিগলিত পবিত্র কর-সঞ্চালনে বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া নূতন সূর্য্য সন্দর্শন করিলাম।

শ্রীঅরবিন্দ প্রস্থান করিলেন। আমি কিন্তু আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইলাম না। সংসার-সংগ্রাম হইতে বিরত হওয়ার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার ঔদাসীন্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অভাবের প্রতিকার চুলায় যাক, অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহা দেখার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলাম—"হৃষীকেশের" সঙ্কেতে আমি পূর্ব্ব সংসার হইতে বিমুখ হইলাম।

সকল দায়িত্ব আমার মাথায় ছিল। অভাব ও অভিযোগ বিকট রূপে যখন আমায় নাকাল করিবার উপক্রম করিত, মনে-মনে শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র স্মরণ করিতাম—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি"। এই সময়ে একটু-আধটু বিপদের কাজেও জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম। গোলযোগের সম্ভাবনা বুঝিলে, প্রাণে-প্রাণে স্মরণ করিতাম—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" অন্তরে পাপের উদয় হইলে, তাহা হইতে মুক্তির জন্য ভাবিতাম—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

মন্ত্রগুলি আমার নিকট নূতন ছিল না। প্রতি রবিবার ছেলেদের লইয়া যে সভার আয়োজন হইয়াছিল, তাহা পরিচালন করার সকল ভারই আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি নিতান্ত অযোগ্য এবং ছাত্রগণ একান্ত অনধিকারী হইলেও, আলোচনার বিষয়নির্ব্বাচন খুব উঁচু করিয়াই করা হইয়াছিল। ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, গীতা, পাতঞ্জল, সাংখ্য প্রভৃতি লইয়াই

সাধ্যমত আলোচনা হইত। একদিন, একটী তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ঈশোপনিষদের মন্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিল। আমার একজন শিক্ষকবন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, শেষে একটু বিদ্রূপ করিয়াও বলিয়াছিলেন "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি বাহির করিতে চান্ নাকি!" কিন্তু আশ্চর্য্য, এই শিক্ষাই 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের' শিক্ষানীতির অটল বেদী গড়িয়া তুলিয়াছে।

গীতার মন্ত্রগুলি জানিতাম; কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করার সন্ধান শ্রীঅরবিন্দের নিকট পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। শুনিয়াছি—সেই সময়ে তিনি এইরূপ অযাচিত-ভাবে অনেককেই মন্ত্রদান করিতেন। অন্যের কথা জানি না, আমি তাঁর বাণীমন্ত্রে যথার্থই বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী যুগে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার আয়োজন হইবার খবর পাইয়াও, আমার অন্তর-বীণায় ঘন-ঘন মন্ত্রধ্বনি উঠিত—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" গুরুতর পাপের কথা স্মরণ হইলেও, কে যেন ভিতর হইতে গুঞ্জন তুলিত—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" মন্ত্রগুলি নিরন্তর স্মরণ রাখার ফলে, বোধ হয় অহোরাত্রের মধ্যে প্রতি দণ্ডেই একটা-না-একটা মন্ত্র আমার জীবনের দায়ে ব্যবহৃত হইত। আজও অনেক দায় আসে এবং সে দায় হইতে উদ্ধার পাই, কখনও বা নাস্তানাবুদ হই; কিন্তু মন্ত্রের আর প্রয়োজন হয় না। সেদিন ইহা না হইলে, যেন সর্ব্বনাশ হইবে, এমনই মনে হইত। তাই আজ ভাবি —ইহা মন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস, না মন্ত্রদাতার প্রতি অন্তরের সুনিবিড় অনুরাগ—মন্ত্রদাতাকে মন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে স্মরণ রাখারই সঙ্কেত?

যিনি অঞ্চল পাতিয়া আমার এই পাগল মনটাকে ধরিয়া একটা গিরা দিবার জন্ত চরণতলে লুটাইয়া থাকিতেন, তাঁহাকে আমি চিরযুগ বঞ্চিতা করিয়াছি। তিনি ধরিতে চাহিতেন বলিয়াই বুঝি মন বস্তুটাকে এমন করিয়া দূরে ছুড়িয়া তাঁহার দুষ্প্রাপ্য করিতাম; তিনি নিরাশ হইয়া মুখের পানে চাহিতেন। তাঁর সেই ক্লান্তিপূর্ণ সুকরুণ নয়নের দৃষ্টি আজও আমার হৃদয়ে যেন ছুঁচি বিধাইয়া দেয়। উঃ! প্রকৃতি আমায় কতই না ছলনা করিয়াছে!

কিন্তু তিনি সান্ত্বনা পাইতেন যখন বুঝিতেন—আমি শ্রেয়ঃ-পথই অবলম্বন করিয়াছি। তন্ত্র ও সহজিয়ার পথে যে সংস্কার ও অভ্যাস আমার

মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা কার্য্যতঃ সর্ব্বক্ষেত্রে পালন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও, ভাবতঃ উহা চিত্তের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিত ; আমার মনটা কোথায় যে উধাও হইয়া থাকিত, তাহার নাগাল তিনি পাইতেন না। এইজন্য তাঁর অস্থিরতার সীমা ছিল না। এক্ষণে শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় আমার সবখানি ধীরে-ধীরে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁর যেন আর কোন ক্ষোভ রহিল না। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়াই আমার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সংসারের অভাব আসে, তাহা মিটে না, একটা সমস্যা হইয়া উঠে। আমি ভগবানের হাতেই তাহার সমাধানের ভার দিয়া আগাইয়া চলি ; দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু অনটনের গ্রন্থি জটিল হইয়া উঠিতেছিল। যখনই ফিরিয়া চাহিয়াছি, ভয়ে বুক শুখাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিলে, তিনি স্বয়ং দুর্গতি দূর করেন—এই প্রত্যয় বুকে ভরিয়া না উঠিলে, চেষ্টা করিয়া আমি তাহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিতাম না। সে সাধ্য আমার ছিল না। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাই।

ঘোড়ার দানা নাই, হাতেও পয়সা নাই। দুই জনে ভাবিলাম—উপস্থিত ধারে দানা খরিদ করিয়া, সেদিন কাটাইয়া দিবার পরামর্শ স্থির হইল। দোকানে ধার বাড়ে, গাড়ী-ঘোড়াও চলে, সহিস-কোচম্যানের মাহিনা বাকী পড়িয়া যায়। চিন্তার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। তিনি পরামর্শ দিলেন, "গাড়ী-ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ঋণশোধ কর, তবুও কিছু টাকা হাতে পাওয়া যাইবে।" পূর্ব্বে হইলে, এ পরামর্শমত কাজ হইত ; কিন্তু এখন ভগবানের হাতে সব ছাড়িয়া দিলাম। সহিস-কোচম্যান কয়দিন হাঁকাহাঁকি করিয়া বিদায় লইল। বহুদিনের চাকর, সে আদালতের আশ্রয় লইল না। একটা দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। ঘোড়া দুইটা পথে চড়িয়া বেড়ায়। যে পায়, কখনও ঘাড়ে চড়ে—কখনও বা ছিপ্‌টি মারিয়া তাহাদের ছুট করায়। কিছুদিন পরে সে দুইটা ভবলীলা সাঙ্গ করিল। উপযাচক হইয়া একজন গাড়ীখানা আধা দরে খরিদ করিল। ভগবানের কাজ তো বন্ধ হইল না ; বেমালুম গাড়ী-ঘোড়ার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। তিনি বলিলেন "এইরূপে বাড়ী-ঘরও যে মাটির দরে বিকাইয়া যাইবে!" ভগবানের ইচ্ছা হইলে হইবে, আমার কি! মনের ভাব তখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধি বলিয়া বস্তুটী তিনি ছাড়িতে পারেন নাই, কাজেই আমার ভবিষ্য দুর্দ্দশার সঙ্গে

তাঁকেও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু আমার মুখ চাহিয়া তাঁর ভিতরটাও অন্যদিক্ দিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। পরিশেষে আত্মসমর্পণ যোগ তিনিই সিদ্ধ করিলেন—আমি বোকা হইয়া রহিলাম!

আমার যখন এই অবস্থা, সেই সময়ে বন্ধু আসিয়া অতিশয় ব্যাকুলভাবে বলিলেন "ওহে ব্যাপার কি! অরবিন্দবাবুর যে আর কোনও খবর নাই। সেখানে পৌঁছেই যে চিঠি দেওয়ার কথা ছিল—কিন্তু প্রায় এক মাস যায়, কোনই যে পাত্তা নাই!"

আমার তখন হুঁস হইল। সংসারের কাজে খুবই উদাসীন হইয়াছি। দুই ছত্র গান বাঁধিয়াছিলাম, গানটা দিবারাত্রি গাহিতাম। ছেলের দল যুটিলে পাড়া মাথায় করিতাম। গানটির মধ্যে বড় রস পাইতাম; কিন্তু অন্যের নিকট ইহার গূঢ়ার্থ বড় বেশী ছিল না। আমি শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায় ভোর হইয়া গাহিতাম:

"ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, গোবিন্দ আমার প্রাণ রে,
ঐ হরিনাম যে করে—সেই আমার প্রাণ রে।"

—আমি গাহিতাম, আর বিশ-পঁচিশ জন তরুণ তাহার পুনরাবৃত্তি করিত। এই গোবিন্দ-মূর্ত্তি আমার চিত্তে শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত তখন আর কিছু ছিল না। কিন্তু সে ভাব গোপন থাকিত। গাহিতে-গাহিতে চক্ষে জলও ঝরিয়াছে। আজ যে কি হইলাম, ভাবিয়া পাই না; সে প্রেম, সে পুলক, সে অশ্রু কোথায় হারাইলাম!

কেহ কিছু বলিলে সে দিকে মন দিই, মনে করি—ইহা হৃষীকেশের সঙ্কেত; নতুবা চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, আর গান গাই, বিভোর হইয়া সমাগত ছাত্রদের কত কথা বলি! আড়ালে বসিয়া তিনিও শ্রবণ করেন, কাছে পাইলে অঞ্চল দিয়া চক্ষুঃ মুছাইয়া দেন। সেবার ত্রুটি ছিল না; প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিন্তু পূরিত না। এমন নিঃস্ব, নিঃস্বার্থচিত্তে পৃথিবীতে কেহ কাহাকেও বুঝি ভালবাসে না! কৈ কোনদিন তো তাঁর আকাঙ্ক্ষা চিত্তকে ক্ষিপ্ত করিয়া আমার প্রতি অনাচার করায় নাই! আমার চরণ-তলে পিপীলিকা দংশন করিলেও, তাঁর বুকে অনুভূতি জাগিত—আমায় বিষণ্ণ দেখিলে তিনি তার হেতু অনুসন্ধান করিতেন, সান্ত্বনা দিতেন। আজ ভাবি—কে কাহাকে বঞ্চনা করিল, আমি না তিনি!

যাক্, সে কথা। শ্রীঅরবিন্দের জন্য ভাবিতে বসিলাম। শেষে স্থির হইল—যে ভদ্রলোক[১] শেষাশেষি তাঁর সেবার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া দেওয়া হউক। সহর খুব বড় নয়, নিশ্চয় সন্ধান পাওয়া যাইবে। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না।

বৈশাখ মাস। সেদিন বাড়ীতে কলসোৎসর্গের একটা উৎসব ছিল। এইজন্য মনে আছে যে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই পণ্ডিচারী হইতে বন্ধুটী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সকল সংবাদ দিলেন। আমরা আশ্বস্ত হইলাম। শুনিলাম—শ্রীঅরবিন্দের আগমনোপলক্ষে পণ্ডিচারীর ষ্টীমার-ঘাটে শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম্মী পণ্ডিচারীতে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন ভি. ভি. এস. আয়ার, অপর জন শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, এবং তৃতীয় তামিল-কবি ভারতী ছিলেন। তাঁহারা মহাসমারোহে শ্রীঅরবিন্দের অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইলে, তিনি সেখানে একান্ত অজ্ঞাতবাসের জন্যই গিয়াছেন বলায়, তবে নিষ্কৃতি লাভ করেন। সেই হইতে একটি সামান্য বাড়ী ভাড়া লইয়া তিনি গোপনে থাকেন—কেহ বড় তাঁর সন্ধান পায় নাই। তাঁর চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের ব্যবস্থাদির জন্যই সংবাদ পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে। অপরিচিত স্থান—নূতন লোকের সহিত পরিচয় সহজ নহে। পুরাতন বন্ধুদের দ্বারা এই কার্য্য সারিতে হইলে, শীঘ্রই তাঁর সম্বন্ধে জানাজানি হইয়া পড়িবে। তিনি চিরদিনই খুব সতর্ক ছিলেন; পণ্ডিচারীতেও আত্মগোপনের ব্যবস্থা এমনভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, বহুদিন তাঁর সংবাদ দেশবাসী পায় নাই।

যোগাযোগ-রক্ষার ভার আমারই উপর পড়িয়াছে। বন্ধুটী জানাইলেন—শ্রীঅরবিন্দই স্থির করিয়াছেন—তাঁর সকল চিঠিপত্র চন্দননগরে আমার নামেই আসিবে। আর পণ্ডিচারীর একজন অধিবাসীর ঠিকানাও তিনি পাঠাইয়াছিলেন। সেই ঠিকানায় তাঁর নামে চিঠি পাঠাইলেই তিনি পাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। কথা শেষ হইলে, একখানি মোড়া খাম আমার হাতে দিয়া বন্ধুটী বলিলেন "ইহার মধ্যে আপনাকে তিনি

১। সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়

নির্দ্দেশ দিয়াছেন—ইহা একান্তই ব্যক্তিগত, কাহাকে বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহা লইয়া ভিতরটা দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তখনও বন্ধুর মুখে সকল কাহিনী ফুরায় নাই—শ্রীঅরবিন্দ কেমন করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন, কেমন করিয়া ঠিকা গাড়ীতে "সঞ্জীবনী" অফিস হইতে তাঁর জিনিষপত্র পাইবার জন্য ডাক্তার সাহেবকে বোকা বানাইয়া ষ্টীমারে উঠিলেন, তাঁর মুখে চোস্ত ইংরাজী কথা শুনিয়া সাহেব কিরূপ বিস্মিত হইয়া জানাইয়াছিলেন যে, বাঙালীর মুখে এমন ইংরাজী তিনি কখনও শুনেন নাই; কিভাবে তিনি ঠাকুরগোষ্ঠীর একজন, এই পরিচয় দিয়া তবে ছাড়পত্র পান—এই সকল কথার আলোচনা হইতে লাগিল। আমি কিন্তু কথা কখন সাঙ্গ হইবে, তাহারই প্রতীক্ষায় অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িলাম। শেষে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সম্পর্ক রাখার সূত্রটা আমাকে কেন্দ্র করিয়া নিরূপিত হওয়ায়, কতখানি গুরুতর দায়িত্ব আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল, এই বিষয়ে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া আমার বন্ধুদ্বয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি ছুটিয়া নিজের ঘরে আসিয়া খাম ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। হরি! হরি! চিঠি কোথা! একখণ্ড কাগজে উড্‌পেন্সিলে পর-পর তিনটি মন্ত্র, আর নীচে লেখা—"প্রতিদিন তিন বেলা প্রত্যেকটী হাজার বার করিয়া জপিবে।"

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গুরু-মন্ত্র তখনও জপিয়া থাকি—যথারীতি প্রাণায়ামের সঙ্গে মন্ত্র-জপ তখনও ছাড়ি নাই। আচার-শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হইয়াছিল এবং তাহা ছাড়িবার কোনও কারণ ঘটে নাই। নাসাপান, প্রাণায়াম, সন্ধ্যাহ্নিক, হিন্দুত্বের যত কিছু আচার-ক্রিয়া সবই ছিল। তাহার উপর চাপিয়াছিল শ্রীঅরবিন্দের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা, যাহা সত্যই প্রাণে নূতন উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছিল। স্মৃতির মাঝে তাঁর কয়েকটা কথা পালন করার ভিতর দিয়া তাঁর শ্রীমূর্ত্তিই ফুটিয়া উঠিতেছিল। সংসারের আর সব যেন সে বিগ্রহের মধ্যে লোপ পাওয়ার উপক্রম করিতেছিল। আমার সে মহালয়ের পথে—আজ আর জীবনমরণের সাথী তাঁহাকে বলি না—সেদিন হৃদয়ময়ী 'তিনি' কেবল আমায় শেষ পর্য্যন্ত জড়াইয়া থাকিবার

চেষ্টা করিতেছিলেন। হাতে কাগজখানি লইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম।

তিনি আড়-চোখে আমার দিকে কয়েক বার চাহিয়া, শেষে বলিলেন, "আবার কি কাণ্ড বাধ্‌ল! চুপ্‌ করে' বসে' যে!"

আমি তাঁকে সমস্ত কথা বলিলাম। শেষে বিপদের কথাটা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "বল দেখি কি করি! অরবিন্দ বোধ হয় ভুলে' গেছেন যে, আমার দীক্ষা হয়েছে, গুরু-মন্ত্রের উপর তাঁর এই মন্ত্র কি করে' চালাই?" তিনি হাসিয়া বলিলেন "বোঝার উপর শাকের আঁটি খুব চলে। এমন দু'-দশ গণ্ডা মন্ত্র তো তোমার আছেই; আরও কয়েকটা পেলে—ভাবনা কিসের!"

কথা মিথ্যা নয়। মন্ত্রলাভ সর্ব্বত্রই হইয়াছে; কিন্তু সেখানে এমন করিয়া ভাবনার উদয় হয় নাই। অরবিন্দ যেন আমায় একেবারে গ্রাস করিতে চাহেন। আমার বলিতে সব কিছুকে বিসর্জ্জন দেওয়ার আনন্দ যেন এই মন্ত্র কয়টার মধ্যে ছিল। আমি বার-বার এই মন্ত্রত্রয়ের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া, প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম, ভাবিলাম—গুরু-মন্ত্র-জপের পর এই মন্ত্র জপিব। স্ত্রীকেও জানাইলাম। তিনি ইহার ভাল-মন্দ বিষয়ে কোন কথাই বলিলেন না; বরং নিজের কথা উত্থাপন করিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন "দেখ, আমার মনে হয়, আমি যে মন্ত্রটা জপি, সেটা ছেড়ে' দিই—তুমি কি বল?"

দীক্ষাকালে, স্ত্রী-পুরুষে দীক্ষা লইতে হয়। উভয়ে গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলাম। তিনিও গুরু-মন্ত্র গোপন রাখিতেন, আমিও তাহা বলিতাম না। এই লইয়া দুই জনে রঙ্গযুদ্ধ করিতাম। আমার কাছে তাঁর গোপন রাখার বিষয় আছে বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতাম। তিনি আমার মন্ত্র শুনিতে চাহিতেন না। বিশ্বাস ছিল—বীজ মাটির তলেই থাকে, তাহাকে প্রকাশ করিতে নাই; ইহা হইলে অঙ্কুরশক্তি বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাঁর আবার স্বতন্ত্র মন্ত্রের প্রয়োজন কি? এই দ্বন্দ্ব তিনি ভিতরে-ভিতরে অনেক দিন করিয়াছেন; শেষে আজ তাহা বিসর্জ্জন দিবার জন্য যেন একান্ত আগ্রহে আমায় বলিলেন "আমার সব কিছু তুমি, আমার আবার মন্ত্র-তন্ত্র কি? হাব্‌লা, ফুল দিই খ্যাব্‌লা খ্যাব্‌লা, ঠাকুর, তুমি আমায় পার

করে' দিও।" এই বলিয়া তিনি আমার গলা ধরিয়া, মন্ত্র প্রকাশ করিয়া বলিলেন "এ-টুকুও গোপান রাখায় যেন তোমার সঙ্গে আমার দূর বোধটাই বুকে খচ্ খচ্ করে; আজ থেকে আমায় মুক্তি দাও।" এই দিন হইতে তিনি আহ্নিক-পূজা ছাড়িলেন—আর আমি মন্ত্র জপিতে বসিয়া গেলাম। তিনি খোঁজ লইতেন 'মন্ত্র জপিয়াছ?' আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতাম। তাঁর জীবন একান্তভাবে আমার উপর ছাড়িয়া দিয়া, সত্যই তিনি আমাতে তন্ময়া হইয়া যাইলেন। সেই অক্ষয়-তৃতীয়া হইতেই আমার যেন নবজন্ম-লাভ হইল! শ্রীঅরবিন্দের 'ত্রি'-মন্ত্রের সঙ্গে পত্নীর আত্ম-নিবেদন—সমর্পণ-যজ্ঞের পবিত্র লক্ষণ-স্বরূপ আমায় আরও উন্মাদ করিল। সে সাধনার বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশযোগ্য নয়। কিন্তু জীবন-মরণ-খেলায় প্রমত্ত উন্মাদ আমি, কেমন করিয়া তাঁহাকে আমার মধ্যে জানিয়া-শুনিয়া লয় করিয়া লইলাম—সেই করুণ কাহিনীই তাঁর পবিত্র জীবন-রহস্য। সে কথা কি যথার্থ-রূপে প্রকাশ করিতে পারিব?

মন্ত্রের লড়াই বাধিল—গুরু-মন্ত্রে ও শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রে। গুরু-মন্ত্র হুঙ্কার দিয়া বলে—যদি অন্য মন্ত্র জপ, আমায় বিদায় দাও, ঘোরতর অভিশাপ দিব। শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র সে কথা শুনে না, যথারীতি আমাকে জপাইয়া লয়। শেষে এমন হইল যে, তিন বেলা তিন হাজার নয়, সর্ব্বক্ষণই মন্ত্র তিনটা যেন লাফাইয়া-লাফাইয়া হৃৎপিণ্ডে টোকা মারিতে থাকে। গুরু মন্ত্র লয় পাইল, শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রই জয়ী হইল।

কেবল মন্ত্র লয় পাইল না, জন্মাবধি যে আচার আমার সর্ব্ব শরীর জড়াইয়া ধরিয়াছিল, তাহাও একে-একে খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। শেষে এমন হইল যে, প্রাতঃকালে আসনে উপবেশন করা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্র-জপ সর্ব্বাবস্থায় চলে, তাহার জন্য কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। আসন গেল, প্রাণায়াম গেল, বিগ্রহ-সেবা গেল; রাত্রি-দিন কেবল মন্ত্র জপি, না জপিলে মন্ত্র যেন ছাড়ে না—সে এক অপূর্ব্ব রহস্য!

মানুষের চরিত্রে যে ত্রিশক্তির প্রকাশ, তাহা বোধ হয় এই মন্ত্রের আশ্রয়েই আমি বস্তুতন্ত্র করিয়া সাধিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মন্ত্র আমায় কল্পনার ভিতর দিয়া অনুভূতি দেয় নাই, জাগ্রৎ জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মন্ত্র হৃদয়-কন্দর হইতে হুঙ্কার দিতে-দিতে সেদিন সারা

বাংলার সঙ্ঘকেন্দ্রে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। বিপুল গর্জ্জনে সেই মন্ত্র-শব্দ পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের এক দল তরুণ প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা সেদিনের মানুষ যারা, স্মরণ করিলে তাঁদের এখনও মনে পড়িতে পারে।

অন্যের কণ্ঠে মন্ত্রের কেবল গর্জ্জনধ্বনি উঠিলেও, আমার জীবনে এই মন্ত্র-শক্তির সঙ্কেতেই অভিনব সমষ্টি-সাধনা ত্রিধারায় বিগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষের স্বভাবে যে ঘোরতর তামসিকতা পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, শক্তিমন্ত্রের জপে ও শ্রবণে আমি সে তমোঘোর কাটাইয়া এমন প্রচণ্ড রজোগুণ লাভ করিয়াছিলাম যে, তাহাই আমাকে বিপ্লবপথের রুদ্র কাপালিক-রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ পাইতাম প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে—আমার অনুভূতির সমর্থন পাইতাম তাঁহার প্রেরিত পত্রের ছত্রে-ছত্রে। সে সকল পত্র এখনও আমার কাছে আছে। এটী প্রমাণের তো প্রয়োজন নাই, সাধনার বীর্য্য যে অসাধারণ, এই কথাটাই জোর করিয়া আমার বলিবার বিষয়।

সেদিনের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই রুদ্র ভৈরবই তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিল—ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করিয়া নহে, অনির্ব্বচনীয় মন্ত্রশক্তি ঘোরতর অবসাদ দূর করিয়া সেদিন দেশের বুকে আগুন জ্বালাইয়াছিল। সমগ্র ভারতের মুক্তি-সাধনায় অগ্নিহোতা তরুণের দল এই অধ্যাত্মশক্তির অনুপ্রেরণায় উন্মাদের ন্যায় মহাহবে ছুটিয়াছিল; কিন্তু দরদীর সেই সঙ্গীতই যেন এ ক্ষেত্রেও সত্য হইল :

"না হইতে মাগো বোধন তোমার,
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল-ঘট!"

ভারতের বিধাতা কোন্ পথ দিয়া কোথায় দেশের ভবিষ্যৎ সিদ্ধ করিবেন, তাহা তিনিই জানেন; তবে মধ্য-পথে একটা অখণ্ড স্রোতঃ যেন রুদ্ধ হইয়া পড়িল—যেন কোথায় কার পূর্ত্তির দায়ে, ঈশ্বরের অপূর্ব্ব করুণা-ধারা স্তম্ভিত হইল। যেদিন এই ভয়ঙ্কর অশুদ্ধ রাজসিক কর্ম্মপ্রবাহ আবিলতাশূন্য হইয়া স্বচ্ছ সত্ত্বগুণযুক্ত হইল, সেদিন দেখিলাম—মন্ত্র-শক্তির প্রভাব শেষ হইয়াছে। জীবনের অগ্নিময় সত্যের তিলকে ললাট উজ্জ্বল, কিন্তু দেবতার বিসর্জ্জন হইয়াছে। মৃত্যুর পর যেমন অতি বড় আপনার জনেরও সাক্ষাৎকার দুর্লভ, ইহা তদপেক্ষা আরও অধিক দূর, অধিক ব্যবধান—সে কথা এখন থাক।

মন্ত্র নিজে জপিয়া সুখ হয় নাই, শত-শত নারীপুরুষের কণ্ঠে ইহার উদাত্ত ঝঙ্কার শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি পাইয়াছি। শক্তি-সাধনায় রক্ততিলক ললাটে আঁকিয়া যেমন অভিনব তন্ত্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তেমনি ভক্তির প্লাবনে অভিস্নাত হইয়া সম্বন্ধের নব রসায়নে প্রেম ও ঐক্যের বিগ্রহ-রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। আজ এই সকল কথা যখন অন্তর দিয়া অনুধাবন করি, তখন গীতার বাণী মর্ম্মময়ী হইয়া হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলে :

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

সাধি নাই কিছু; কিন্তু পূর্ব্বে হাতড়াইয়া যাহা করিয়াছি, তাহা জ্ঞানের প্রদীপ সম্মুখে ধরিয়া সাধাইলেন—মহাকালী স্বয়ং। শাস্ত্র তাই আজ অনুভূতি-যুক্ত। অন্তর দিয়াই বুঝিয়াছি—জীবের জীবন লইয়া শ্রীভগবানেরই খেলা, জানা-অজানা ক্ষেত্রভেদে সত্যভেদ নাই, সবই উপলক্ষ, সনাতন শুধু তুমি আর আমি—বেদান্তের সেই 'ইদং' আর 'অহম্'।

আমার এই অবস্থার সঙ্গে সংসারের আর সামঞ্জস্য চলে না। আমার প্রকৃতিও ফাঁক খুঁজিয়া বেড়ায়। কাজকর্ম্ম ভাল লাগে না। ক্ষতি হইতেছিল যাহা, তাহার পূরণ হওয়া যে দুঃসাধ্য, সে জ্ঞান ছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার কিছুই যেন করিবার শক্তি নাই! আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারি না, সংসারের দায়ও আমায় আর নাড়ায় না, অথচ স্থবির-স্থাণু হইয়া বসিয়াও থাকি না। কে যেন তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমার সবখানি নাচাইয়া লয়। সারাদিনই ব্যস্ত, কাজের যন্ত্র, কাজ করি; কিন্তু সে কাজের হিসাব দাখিল করিতে গিয়া দেখি—তাহার ফল আমার ভাগ্যেও যেমন শূন্য, সংসারের পক্ষেও তাই; অথচ বিশ্রাম তো নাই, রাত্রে নিদ্রাটুকুরও অবসর ছিল না।

কাজের নির্দ্দেশ যখন যেখান হইতে পাই, সেই দিকেই চাহিয়া থাকি; আর সে কাজ খুবই দুঃসাধ্য, বিশেষতঃ আমার মত প্রকৃতির মানুষের পক্ষে—কিন্তু কিছুই বাধে না, শরীর-মন বরং উৎসাহে আগুন হইয়া উঠে। তখন নিজের বলিতে দেহটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। অসংখ্য কাজের মাঝে মন্ত্রের সঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখিতে হইত—"অহঙ্কার ছাড়, বাসনা ও চেষ্টা রাখিও না।" অহঙ্কার আছে কি নাই—ইহা বুঝা কত কঠিন, তাহা

আজও হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করি। সেদিন এই চিন্তায় মাথা ঠিকরাইয়া পড়িত; আর কেবলই কয়জন মিলিয়া যুক্তিতর্কে নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতাম—কোন্‌খানে বাসনা, আর কোন্‌খানেই বা চেষ্টা প্রকাশ পাইল।

এই সব আলোচনায় যেন একটা নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। যাহারা নিত্য সঙ্গী, কথা তাহারাই বুঝিত। কোন নবাগত পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেবল দেখিত—এক দল লোক কথা কাটাকাটিচ্ছলে তুমুল কলহ করিতেছে। আজ যারা 'প্রবর্ত্তকে'র অনুগত শিষ্য, তারা আমার যথেষ্ট বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, আমি তুল্যবোধেই তাদের সাধনার পথে টানিয়া আনিয়াছিলাম। তর্কাতর্কি-ঝগড়ার উচ্চকণ্ঠ দিবারাত্র সমানভাবে চলিত রবিবারে। সেদিন স্কুল, কলেজ, কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সকলে অবকাশ পাইয়া একত্র মিলিত। ভোর হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত ইহাদের কলরবে পাড়া মুখরিত হইত। পান-ভোজন-স্নানের অবকাশ হইত না। এমন দিন গিয়াছে—সূর্য্য অস্তমান, মাঝের দরজায় মৌনমূর্ত্তি অবগুণ্ঠনবতী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কপাটের শিকল নাড়িয়া জানাইয়াছেন—'ওগো ক্ষমা কর, কষ্ট তো কেবল আমার নয়, তোমাদের শরীরগুলির যে দরকার আছে!' আমরা অপ্রতিভ হইয়া দল বাঁধিয়া স্নানঘাটে গিয়াছি; সেখানেও অহঙ্কার, বাসনা আর চেষ্টার কথা। এমন করিয়া অরবিন্দের এক-একটা কথা লইয়া জীবন নাচিয়াছে কোথায়, তাহা জানি না; কিন্তু আমাদের সে যে কি তন্ময়-সাধনার যুগ, তাহা বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না।

সংসারে অনাটন। আমি একরূপ কর্ম্মবিমুখ। তাহার উপর এই ছাত্রমণ্ডলী লইয়া সংসারের উপরেই ভোজনাদির দাবী। মুখে কিছু কাহারও বলিবার না থাকিলেও, ভিতরে-ভিতরে অনেকের অপ্রসন্ন ভাব দেখা দিত। সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না, কিছু অনুভবও করিতাম না। সহিতে হইত সবই তাঁহাকে—অথচ আমায় কিছু বলিতে তিনি সাহস করিতেন না। অনেক সময়ে তিনি নিজে অনাহারে থাকিয়া আমার উপদ্রব সহ্য করিতেন। সমস্ত জীবনটাই তাঁহাকে যেন সংগ্রাম করিয়া কাটাইতে হইয়াছে।

পূর্ব্বে সাংসারিক অসচ্ছলতা এবং আমার কখন কি খেয়াল হয়, এই লইয়াই তিনি বিব্রতা থাকিতেন; এই সময় হইতে নূতন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। অধ্যাত্মসাধনার রসে আমি যতই অন্তর্ম্মুখী হইয়া পড়ি,

ততই তিনি যে সব আনুষ্ঠানিক আচার লইয়া থাকিতেন, তাহার সহিত আমার জীবনের কোনরূপ সামঞ্জস্য অথবা সহানুভূতি দেখিতে না পাওয়ায় তাঁর পক্ষেও সেইগুলি অতঃপর মানিয়া চলা দায়ের মতই হইয়া উঠিল। আমি যেমন ইচ্ছামাত্র শ্রীঅরবিন্দের "No need of Asan or Pranayam" আদেশ শুনিয়া ঐ সকল হইতে একেবারে বিমুখ হইলাম, তাঁর পক্ষে ইহা তদ্রূপ সহজ ছিল না। হিন্দু-সংসারের আনুষ্ঠানিক সকল পর্ব্ব ও অনুষ্ঠান রক্ষা করা তাঁরই উপর নির্ভর করিত। ভাদ্রমাসে ও পৌষমাসে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন তিনিই করিতেন; নিত্য দেবসেবার ভারও তাঁর উপরই ছিল। তিনি এই সকলের মধ্যে অশেষ তৃপ্তি পাইতেন। কি নিষ্ঠাসহকারে যে তিনি সংসারের সকল পর্ব্ব ও উৎসব সম্পন্ন করিতেন, আবার তাহাই রূপান্তরিত হইয়া পরে সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক উৎসবাদিতে যে আনন্দ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সঙ্ঘের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমি আজ তার চরিত্র অনুধাবন করিয়া দেখি—লোকে শাস্ত্র ও আচার রক্ষা করিবার জন্য যেন একটা মহাকাণ্ড বাধাইয়া তুলে, কিন্তু শাস্ত্র ও আচার তাঁর জীবন অনুসরণ করিত। তিনি সত্যই ছিলেন তপস্যার সিদ্ধমূর্ত্তি। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত তিনি এক কথায় গ্রহণ করিলেন—কোনদিন আর তাঁর মনে দ্বিধা দেখি নাই। সত্যানুরাগে তাঁর বদনমণ্ডলে অমলশ্রী ফুটিয়া থাকিত। মিথ্যার প্রতি তাঁর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে স্বভাব-মৌন চরিত্রে কি ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইত, তাহাতে আমিও স্তম্ভিত হইতাম। তাঁর কাছে চালাকি করিয়া পার পাওয়ার উপায় ছিল না। তাঁর সত্য-দৃষ্টি হৃদয় ভেদ করিত। তিনি আমার কথায় উঠিতেন, আমার কথায় বসিতেন, সে কেবল শ্রদ্ধা ও প্রত্যয়ের মহিমায়; কিন্তু আমিই সতত শঙ্কিত হইতাম, অনেক মিথ্যাকে যে আমি আশ্রয় দিতে বাধ্য হইতাম!

ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁর সুকুমার-রসবৃত্তি ঠাকুর-ঘর হইতে তুলসীতলা, শয়নগৃহ, রন্ধনশালা, সর্ব্বত্রই পবিত্র আলিপনা লেপন করিয়া রাখিত। আজ মন্দিরে, আশ্রমে, সঙ্ঘ তীর্থে যে মহিমা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহার মধ্যে আমি দেখি তাঁর হৃদয়-বৃত্তিই যেন ধূর্জ্জটির জটাভার বিদীর্ণ করিয়া প্লাবিত হইয়াছে। দারুণ শীতে তিনি সর্ব্বাঙ্গে অঞ্চল ঢাকিয়াই দিবারাত্রি কাটাইয়া দিতেন। নিদারুণ গ্রীষ্মে রন্ধনশালায় অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিতে প্রহরের পর প্রহর

তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। অটল ধরিত্রীর ন্যায় সর্ব্বাবস্থায় তিনি চিরশান্তিময়ী ছিলেন। দ্বন্দ্ব বাধিত কেবল আমায় লইয়া; সে অপরাধ আমারই—তাঁর অমৃতময় হৃদয়খানিতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করার অধিকার আমারই ছিল, তাই বুঝি অত্যাচারের কষ্টিপাথরে তাঁর নির্দ্দম্বতা পরীক্ষা করিতে বিধাতা আমায় যন্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁর বাক্যও যেমন ছিল পরিমিত, হাসিটুকুও তদ্রূপ ওষ্ঠের বাহিরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িত না। কোনরূপ প্রগল্‌ভতা তাঁর দিব্য চরিত্রে স্থান পায় নাই। তিনি যে কখন ভোজন করিতেন, কখন চরণপ্রান্তে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন, তাহা আমার লক্ষ্যে পড়িত না; যেন মনে হইত—দেহটুকুর রক্ষার্থে তপস্বিনী হাতের মুঠায় যাহা ধরে তাহাই ভোজন করেন, আর শ্রামক্লান্ত শরীরের শ্রান্তি দূর করার জন্যই একবার আমার কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়েন। এমন মিতাহার, এমন সংযম কোথাও আমার চক্ষে পড়ে নাই। এই সকল গুণ তিনি সাধিয়া অর্জ্জন করেন নাই; ইহাই ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তাই আজ সন্ধ্যতীর্থে তাঁর অধ্যাত্ম-সন্তানদের নতজানু স্তুতি শুনিয়া আমার আশীর্ব্বাদই আমার মুখ দিয়া বাহির হয়—"হে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তোমরা মহাতপস্বিনীর অমৃত-প্রসূ তপস্যারই উত্তরাধিকারী। তোমাদের বন্দনা ব্যর্থ হইবার নয়।"

প্রাতঃকাল হইতে শয়ন-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে যত কাজ করিতে হইত, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক কাজই ছিল—দেব-বিগ্রহের সেবা। ইহা ব্যতীত পর্ব্বদিনে তাঁর মুখে জলটুকু দিবার আর অবকাশ থাকিত না; ইচ্ছা করিয়াই তিনি উপবাস থাকিতেন। প্রতি পূর্ণিমায় আমাদের বাটীতে সত্যনারায়ণ বিগ্রহের সমারোহে পূজা হইত। পাড়ায় সিন্নী বিলান হইত; তাহা নাকি এমন উপাদেয় ছিল যে, কোথাও তার তুলনা মিলিত না! এই জন্যই আমাদের সত্যনারায়ণ-বিগ্রহ বড় জাগ্রৎ বলিয়া প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। হায় মায়া! আজ সেই দেব-মূর্ত্তি উপাসনা-মন্দিরে উপাসিকার অন্যান্য পবিত্র স্মৃতি-সামগ্রীর সহিত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন; প্রতিমার আড়ালে জাগ্রৎ দেবতার সন্ধান এখন কে করিবে?

বার মাসে তের পার্ব্বণের সঙ্গে, হিন্দুর কোন উৎসব বাড়ীতে বাদ পড়িত না। দুর্গাপ্রতিমার চরণতলে, উজ্জ্বল-লাল-পেড়ে গরদের শাড়ীখানি

পরিয়া, ছলছল নেত্রে বসিয়া তিনি খুনুচীতে পাখা করিতেন। তাঁর নিপুণ হস্তের সেবা সকলের মনোহরণ করিত। সেদিনও তো কেহ দেখে নাই— এমন আড়ালে আত্মগোপন করিয়া কে লুকোচুরি খেলিতেছে!

নিঃসন্তান বলিয়া তাঁর সাধ হইয়াছিল যে, কার্ত্তিক-পূজার ব্রত গ্রহণ করিবেন। প্রস্তাবমাত্র আমি হাসিয়া উঠিলাম—"কুমারী মেরীর মত স্বর্গ হইতে কোন দেবতাকে গর্ভে ধারণ করার কল্পনা আছে না কি? তুমি যে ব্রহ্মচারিণী!" তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "আমি সন্তানপ্রার্থী নই। যা' পেয়েছি, তা' যেন রেখে মরতে পারি—এই আশীর্ব্বাদ কর। কিন্তু কি জানি কেন, এই ব্রত নিতে আমার বড় সাধ!"

কে জানিত দেবি, তোমার হৃদয়ে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মত শত মানস-সন্তান-সৃষ্টির আকুলতাই সেদিন ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ব্রত-গ্রহণের ছলে! তোমার সাধ পূর্ণ করিতেই আমি সম্মতি দিলাম। চারি বৎসর ধরিয়া তুমি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত চিরকুমার ষড়াননের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলে; আমায়ও ছাড় নাই, তোমার সঙ্গে অহোরাত্র উপবাস করিয়া আমিও চারি বৎসর যুক্ত-করে এই বীর-দেবতার চরণে অঞ্জলী প্রদান করিয়াছি। শ্রীঅরবিন্দের যোগ আমায় সব ছাড়াইয়াছিল; কিন্তু সাধ্বীর মহাপ্রেরণা কোনদিন আমি অবজ্ঞা করিতে পারি নাই। মনে পড়ে—ব্রত পূর্ণ হওয়ার রাত্রিতে, চতুর্দ্দিকে বারোয়ারী পূজার ধূম। ঢাকের বাদ্যে কানে তালা ধরিয়া যায়। প্রহরের পর প্রহর অনন্যমনে তাঁর সেই আরাধনার ধারা —সম্মুখের বৈঠকখানায় সেদিন তাঁর ভাবী সন্তানগণও নীরবে তাঁর পূজা দেখিয়াছিল। শেষ প্রহর রাত্রি। হেমন্তের হিমজাল ছিঁড়িয়া আলোর ঝরণা তখনও ঝরে নাই। ব্রত সাঙ্গ হইল। তিনি সজল নয়নে আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁর বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। আমি সকল বাহ্যানুষ্ঠান ছাড়িয়া দিতেছি, তাঁর আশঙ্কা ছিল—ব্রত যদি অসমাপ্ত রহিয়া যায়! তাঁর চরিত্রই ছিল—কোন কিছু আরম্ভ করিলে, তাহা সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না—তা' সে ধর্ম্ম-কাজেও যেমনি, সংসারের খুঁটিনাটি কাজেও তাঁর এই একই নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত।

তিনি স্বহস্তে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। পুরোহিত-যুগল স্তুত পান

করিয়া নৈবেদ্য-ভোজনে উপবাস-ক্লান্তি দূর করিলেন। তিনি আমার মুখে প্রসাদ দিয়া পুনঃ-পুনঃ পায়ে মাথা খুঁড়িয়া বলিলেন "আমার সন্তান-কামনা নাই—তবে নিঃসন্তান, এ অপবাদ থেকে মুক্তি চাই।"

হায় নারি! আজ বুঝিতেছি—নারীর সন্তান-কামনাই মহাধর্ম্ম। তোমার ব্রত আজ সার্থক বলিয়াই মনে হয়। প্রাকৃত জন্মক্ষেত্র হইতে তোমার স্থান বহু উর্দ্ধে। দেবমাতা! আজ তোমার শ্রাদ্ধ-বাসরে মুণ্ডিত-মস্তক শোক-কাতর এ কাহাদের দেখিলাম! তোমায় "মা" বলিয়া অসংখ্য কণ্ঠে এ কাহাদের কলধ্বনি! ভারতের ধর্ম্মকে এমন সিদ্ধ-রূপে কে কোথায় অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা আমি জানি না; কিন্তু তোমার প্রত্যেক কার্য্যটী আজ গভীর অর্থযুক্ত হইয়া আমায় মুগ্ধ করে।

দোলের দিনে ফাগ লইয়া নরনারীর উন্মাদের ন্যায় হাস্যপরিহাসের কলধ্বনিতে বিরক্ত হইয়া, কি প্রশান্ত, গম্ভীর, সৌম্য আননে বিগ্রহের প্রসাদী ফাগুয়া লইয়া, স্নেহ-বিগলিত হৃদয়ে, অতি ধীরে সন্তর্পণে সকলের ললাটে একটী মাত্র ফোঁটার আঁকর টানিয়া তুমি উৎসব-বাটী নিস্তব্ধ করিতে! তাহা আজ মনে পড়িলে, সাধ যায়—পুণ্যময়ি, তোমার সেই পবিত্রতা-মাখা শ্রীমূর্ত্তিখানি আর একবার প্রত্যক্ষ করি। তোমার দিব্যাচারের অধিকার এমন করিয়াই ভবিষ্যৎকে দিয়া গিয়াছ; তাই হিন্দুর যথার্থ আচারই আজ তোমার আশীর্ব্বাদে সঙ্ঘে দিন-দিন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে।

তোমার ব্রত, তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যর্থ তো হয় নাই, বরং নব-রূপে নূতন জাতির জন্য তোমার অব্যক্ত আচরণ আজ নূতন আলো ফুটাইয়া তোলে। আজও দশভুজার আরাধনায় শত-শত কণ্ঠ উদাত্ত সঙ্গীত তুলে। দেবি! তুমি কি তাহা শ্রবণ কর না? আজিও ফাগুয়া উৎসবে রঙ্গচাঞ্চল্য, তরল আমোদপ্রমোদ, মত্ততা বর্জ্জন করিয়া তোমার পবিত্র স্মৃতির মর্য্যাদা রাখিতে, তোমার সন্তানেরা ফাগুয়ার টিপ্ পরিয়াই স্তব্ধ হয়, হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের যমুনা হিল্লোল অনুভব করে।

তাঁর আর একটী ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলিয়া এই পূজা-পর্ব্ব শেষ করিব। আমার শ্বশুরালয়ে অন্নপূর্ণা-পূজা হইত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক পূজা শেষ হওয়ার পরই শ্বশুর মহাশয় কঠিন রোগাক্রান্ত হন। অবস্থা সঙ্কটজনক হইলে, তিনি পিত্রালয়ে গমন করেন। দুই-তিন দিন পরেই আমারও ডাক পড়ে।

আমি গিয়া দেখি—তাঁর আসন্নকাল। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে আমার মধ্যম শ্যালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, সংসার যেরূপ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল, আজ আবার এই আঘাত কতখানি গুরুতর হইবে, তাহা অনুমান করিয়া কাতর হইলাম। মুখে ভরসা দিলাম; তিনি বিস্ফারিত নয়নে মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল!"

তাঁর এমনই বিশ্বাস—যদি আমি ভাল বলি, তবে যেন তিনি নিশ্চিন্তা হন। আমি ভালই বলিলাম। তিনি প্রফুল্ল মনে পিতৃ-সেবা করিতে বসিলেন। কিন্তু সে রাত্রি আর কাটিল না। সব শেষ হইল। একবার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "মিথ্যা প্রবোধ দিয়েছিলে!" চক্ষে অশ্রুসাগর উথলিয়া আসিয়াছিল, কণ্ঠে সাগর গর্জ্জিয়া উঠিল; কিন্তু সে একটী মুহূর্ত্ত মাত্র। তাঁব মাথায় হাত দিয়া বলিলাম "কেঁদো না, তুমি কাঁদলে এ সংসারে সান্ত্বনা দেবে কে!" মন্ত্রমুগ্ধা তখনই প্রকৃতিস্থা হইলেন। আজ সে চিত্র বড় স্পষ্ট হইয়া বুকে ফুটিয়া উঠে।

সেই বৎসরেই অন্নপূর্ণা-পূজা-ব্রতের উদ্‌যাপন ছিল। তিনি সেদিন কি উৎসাহে যে সে ব্রত সমাপন করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অন্যান্য বৎসরে তিনি নিমন্ত্রিতার ন্যায় পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু এবার তাঁহাকে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিলাম। প্রতিমা দেখিব, কি তাঁহাকে দেখিব—এমনই চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল। চরণতলে ঘোরবর্ণ অলক্ত, পরিধানে পট্টবস্ত্র, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিন্দুর, হস্তে অন্নপাত্র, মৃন্ময়ী যেন সজীব বিগ্রহে প্রাঙ্গণে ছুটাছুটী করিতেছেন!

হিন্দুর পালপার্ব্বণ, উৎসব-পূজা এমন করিয়া মর্ম্ম দিয়া পাইতাম—তাঁর অনুষ্ঠান ও আচারনিষ্ঠা দেখিয়া। পৌষের পিঠা-পার্ব্বণে তাঁর হাস্যময়ী মূর্ত্তি-খানি বোধ হয় ভুলিবার নয়। অগ্রহায়ণে নূতন খাওয়ার পর্ব্ব তাঁর হৃদয়-রসে মহোৎসব সৃষ্টি করিত। তাই আজ সঙ্ঘের অন্নক্ষেত্র অখণ্ড। অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিটী বোধহয় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াই সঙ্ঘ-জীবনকে অমৃত-রসাভিষিক্ত করিয়াছে। কোন অন্তরায় এই জাগ্রৎ তপস্যা ব্যর্থ করিতে পারে না।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সবই প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তাঁর চরিত্র সত্যপূর্ণ, এইজন্য একপ্রকার নিঃস্ব হইয়াও তাঁর স্পর্দ্ধার অন্ত ছিল না। তিনি কিছু ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, কেবল দেখিতেন—কোথায় আমার কুণ্ঠা;

সেখানেই তিনি সঙ্কুচিতা হইতেন। প্রতিদিন ছিল তাঁর পর্ব্ব, তাই দিবারাত্র বাড়ীতে উৎসব লাগিয়াই থাকিত; কিন্তু আমার এই সকল বিষয়ে বিমুখভাব ভাব প্রকাশ পাওয়ায়, তিনি সভয়ে সকুণ্ঠা হইয়া এই সকল সমাপন করিতেন।

যখন তিনি সঙ্কুচিত নয়নে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই বুঝিতাম—প্রার্থনা আছে; নতুবা তাঁর নয়নে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইত, ওষ্ঠপুট নিয়ত সদর্পে পাথরের মত নিস্পন্দ ও কঠিন হইয়া থাকিত; তাই তাঁর হাসির মূল্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইত।

ধর্ম্মানুষ্ঠান তাঁর স্বভাবে অবিভাজ্য-রূপে জড়াইয়া ছিল; তাই আবার নতুন অনুরোধ শুনিলাম—"আর একটা ব্রত ক'র্‌ব?"

কিছু যখন তিনি চাহিতেন, তখন দীনতা এমন করুণমূর্ত্তিতে দেখা দিত, যাহা উপেক্ষা করা সম্ভব হইত না। আমি বলিলাম "কি।"

"আমি অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রত গ্রহণ ক'র্‌ব।"

"তা' নিয়ে আবার কি হবে।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "কিছু হওয়ার জন্যই যেন করা! ভাল লাগে করি। আমার আর কি?—কিছু যদি হয়, সে তোমারই কাজে লাগে যেন!"

বুঝিলাম—কেহ বলিয়াছে অক্ষয়-সিন্দুর-রক্ষার পক্ষে এই ব্রত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। আমি আর কি বলিব, তাঁর কোন চাওয়া তো আমায় ভাবিয়া, সামর্থ্য বুঝিয়া পূরণ করিতে হয় নাই! বিবাহ করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আশ্চর্য্য, তাঁকে একখানা কাপড় বা একটা স্বর্ণালঙ্কার দিবার সুযোগ পাই নাই এবং ইহা লইয়া কোনদিন তাঁর আব্‌দারও শুনি নাই। কয়েকটা ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবৃত্তি তাঁর যেন কত বহুমূল্য চাওয়া ছিল, এবং সেগুলি তিনি আড়ম্বর-সহকারে করারও পক্ষপাতী ছিলেন না; গোলমাল, আওয়াজ, একটা হৈ-চৈ ব্যাপারকে তিনি ভাল চক্ষে দেখিতেন না। এই দিক্ দিয়া আমায় একপ্রকার তাঁর শাসনে থাকিতে হইত। আমি ঠিক ইহার বিপরীত চরিত্রের লোক। যাই হোক্, তিনি অক্ষয়-তৃতীয়া ব্রত আরম্ভ করিলেন এবং তাঁর সকল অনুষ্ঠানের ফল যেমন নিরর্থক হয় নাই, এই অক্ষয়-তৃতীয়ার ব্রত যেভাবে সমাপন করিলেন, তাহা জীবনে একটা

যুগপ্রলয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে, তাঁর আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম এমন করিয়াই অঙ্গাঙ্গী হইয়া ছুটিয়া চলিল।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারী প্রস্থান করেন এবং সেইখানে তাঁর বাসস্থান স্থির হইলে, নিয়মিত ভাবে আমার সহিত তাঁর পত্র-ব্যবহার চলিতে থাকে। সে পত্রগুলির কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আজিও যেগুলি আছে, তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হই যে, তিনি উপর্য্যুপরি পত্রের ভিতর দিয়া, আমায় যোগের পথে টানিয়া আনিবার কি অকৃত্রিম প্রয়াসই না করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে আমি কেবল অধ্যাত্ম-সাধনার ভারই তাঁব উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হই নাই, জীবনের সব কিছুই একান্তভাবে শ্রীঅরবিন্দের উপরই নির্ভর করিত। তাঁর ধর্ম্মোপদেশের সঙ্গে কর্ম্মনির্দ্দেশ থাকিত, তাহা আমায় একেবারেই ছাইয়া ফেলিয়াছিল। আমার দিবারাত্রি জ্ঞান ছিল না। এই সময়ে রাত্রে নিদ্রার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইতাম না; এক বাড়ীতে থাকিয়াও আমার স্ত্রীর সহিত দেখাশুনা যেন বিরল হইয়া পড়িল। তিনি ভিতরে-ভিতরে গভীর চিন্তার সহিত নিদারুণ আশঙ্কায় বিমূঢ়া হইয়া পড়িতেছিলেন, তাহা তাঁর বিবর্ণ মুখকান্তি দেখিয়া বুঝিতাম; কিন্তু আমার সেই অবস্থায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবারও অধিকার ছিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে এক তৃতীয় শক্তির হস্তে নির্ভর করিয়া চলিতে হইত; যেন সর্ব্বদাই মনে হইত—যে-কোন মুহূর্ত্তে সব ছাড়িয়া আমায় চিরদিনের জন্য হয় তো বিদায় লইতে হইবে। ভিতরে সাধনার উত্তাপ, বাহিরে কঠোর কর্ম্মের গুরুদায়িত্বে আমি যে তখন কি হইয়াছিলাম, আজও তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। এই সময়টায় শ্রীঅরবিন্দই যেন আমায় গ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁর কল্পলোকে উঠাইয়া তিনি যেন আমায় নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

রবিবার যে সাহিত্য-সভা হইত, সেখানে নূতন থক্ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'যৌগিক সাধন' নামক ইংরাজী পুস্তকের দুই-এক পরিচ্ছেদ হাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—সেই নির্দ্দেশমত নিজের জীবনের সঙ্গে, সহতীর্থগণের জীবনকেও গড়িয়া তোলায় আমি উদ্বুদ্ধ হইয়াছি।

সুযোগ পাইলে আমার স্ত্রী একান্তে ধরিয়া বসিতেন, বলিতেন "হাঁ-গা, সাধন কর, ক্ষতি নাই। কিন্তু সারা রাত্রি কি কর, কোথায় যাও, আহার-নিদ্রা যে ত্যাগ হ'ল—কি বিপদের কাজে পা বাড়িয়েছ, বল না; তোমায় সাহায্য করব।"

তাঁর এই আন্তরিকতা উপেক্ষার বস্তু ছিল না। যোগের মর্ম্ম বুঝাইবার বস্তু নহে, তাহা চিরদিনই অনির্ব্বচনীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে তাৎকালীন কঠোর কর্ম্মযোগের আভাস দিলাম। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, আমার মুখের দিকে চাহিয়া করুণ নয়নে বলিলেন "এই জীবন আমার উৎকণ্ঠায় শেষ হবে। আরও তো লোকেব স্বামী আছে, তারা কি এমন বিপদে পড়ে! সংসারের অভাব, অনটন, অশান্তি-ভোগ হাসিমুখে করতে পাবি, কিন্তু তুমি ক্রমে বিপদের পব বিপদ্ ডেকে আন্ছ, আমি কিছুই বুঝি না, আমার দিকে ফিরে চেয়ো।"

জ্যোৎস্না-রাতে পৃথিবী যখন ঘুমাইয়া নিঝুম হইত, তখন একা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া—দালানেব থামগুলির ছায়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া মেঝের উপর পড়িয়া যে বিচিত্র ছবি আঁকিত, তাঁহাব দিকে চাহিয়া মনে কবিতাম—কোন্ সুদূর চির-প্রবাসেব মধ্যে এই স্মৃতি কত ব্যথাই না সৃষ্টি কবিবে। ভিতর-বাড়ীর প্রাঙ্গণপ্রান্তে একটা শিউলী গাছ ছিল। কি ফুল যে ফুটিত, তাহা আর বলিবার নয়; শিশিরবিন্দু বুকে ধবিয়া সেগুলি উঠানময় ছড়াইয়া সৌরভ বিস্তার কবিত। শয়ন করিতে আসিয়া সে শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিতাম, আর ভাবিতাম—জীবনের সঙ্গে বাড়ীর প্রত্যেক দৃশ্যটির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছে, তাহা বিচ্ছেদ-যুগে কত বিষাদের কারণ হইবে কে জানে! যেন সব ছাড়িতে হইবে—মনে-মনে এইরূপ প্রস্তুত হইবার তাগিদ শুনিতাম। তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয় গুমরিয়া কাঁদিত। যে সব ছাড়ার আদেশে আমার সবখানি তখন প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল, সে ছাড়া যে এমন দিক্ দিয়া ঘটিবে, তাহা সেদিন কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল।

কে যেন বুক জুড়িয়া বসিয়াছিল, আর সে যেন সব নিঙড়াইয়া নিঃশেষ করিতে চায়! এমন উদাসীন ভাব—যাহা আজ স্মরণ করিলেও চমকিয়া উঠি। বুকভরা প্রীতি ও আসক্তি ছড়াইয়া যে মানুষ সংসারে জড়াইয়া ছিল, তাহাকে কত দীর্ঘদিন ধরিয়া এই সাধনার ভিতর দিয়া বিধাতা আজ

সন্ন্যাসী করিয়া ছাড়িলেন—ভাবিয়া হাসি ও যোগেশ্বরের চরণে ভূয়সী প্রণতি জ্ঞাপন করি।

যোগ! যোগ!! যোগ!!! অন্য কথা নাই। আসন নাই, প্রাণায়াম নাই, ধারণা নাই, একেবারে গতানুগতিক জীবনের কোনই অনুষ্ঠান নাই। "যোগ"-শব্দ দিনে হাজার বার উচ্চারণ করিতে বাধ্য হই, আর কি একটা ভাবের ঘোরে জীবনের দিন অতিবাহিত হয়। খাইতে হয় খাই, কথা কহিতে হইলে—ঐ শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশ, আর যৌগিক সাধনের দুই পরিচ্ছেদের তত্ত্বকথা। ভারতের শাস্ত্র-পুরাণ অনাদরে ঘরের মেঝে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একাকার হইল, হাওয়ায় কত পুস্তকের পাতা উড়িয়া গেল। কাজেরও অন্ত নাই, অন্যদিকে অন্তর্যোগেও বিচিত্রানুভূতি আমায় তখন উন্মাদ করিয়াছে! কাজেই সংসার আর দেখিবে কে? স্ত্রী আমার অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইলেন। তিনি সংসারে যেটুকু মনের জোর দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ শেষ হইল। কাজকর্ম্মের বিশৃঙ্খলায় সংসার-জীবন যেন বিপ্লবের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ীতে একবিন্দুও শান্তি রহিল না।

এই সময়ে আমি যেন অন্য এক বস্তুর আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া থাকিতাম। যাহা বলিতাম, তাহা আমার নিজের কথা নহে; নিজের শিক্ষা-সাধনার চিহ্নও তাহাতে থাকিত না। অনর্গল যোগের মর্ম্ম-কথা বলিয়া যাইতাম—এমন কত রাত্রি কেবল কথা কহিতে-কহিতে ভোর হইয়াছে। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" যে এই আপূর্য্যমান প্রাণ ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া সেদিন জন্মলাভ করিতেছিল, তাহা আমার কল্পনাতেও ছিল না। নিজের অবস্থার কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানাইতাম; তিনি সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, আমার সকল দর্শনই উচ্চ প্রশংসার সহিত সমর্থন করিতেন; যেখানে ত্রুটি, অন্ধতা, তাহা সরলভাবেই বুঝাইয়া দিতেন—আমি স্বচ্ছ প্রবাহের ন্যায় বহিতাম, কোন বাধাই আমার চক্ষে পড়িত না।

যোগের প্রতি আস্থা হওয়ার সঙ্কেত পাতঞ্জলে আছে—"বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ" প্রভৃতি; অর্থাৎ চিত্তসংযমের ফলে গন্ধাদি বিষয়ের দিব্যজ্ঞান জন্মিলে সাধক বুঝিতে পারে, যোগ ব্যর্থ হয় নাই, যোগের পথে অধিকতর উৎসাহে চলিতে প্রবৃত্তি হয়। এই যোগেরও দিব্যানুভূতি ও কিছু-কিছু বিভূতির সন্ধান আমি পাইয়াছিলাম; সেগুলি প্রকাশ করা

বাঞ্ছনায় নয়। আমার সহধর্ম্মিগণ তাহার কিছু-কিছু সন্ধান রাখিত। কোন বিষয়ে কিছু জানিতে বা বুঝিতে হইলে, অন্তরের মণিকোটায় যে দেবতা বিরাজমান ছিলেন, তাঁর দিকে চাহিবামাত্র একটা অব্যক্ত সঙ্কেত পাইতাম—তাহা ভাব ও ভাষারূপেই ব্যক্ত হইত। যেখানে সংশয়ের ছায়া মিশ্রিত হইয়া ফুটিতে চাহিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা ভুল হইয়াছে; কিন্তু নিঃসংশয়-স্বচ্ছ-মূর্ত্তি লইয়া যাহা প্রকাশ পাইত, তাহা কখন ব্যর্থ হইত না। দুই-একটা সর্ব্বজনবিদিত উদাহরণ দিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। যোগের প্রতি অনেকে শ্রদ্ধাহীন; ইহা অনর্থক এবং কল্পনা বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি কাহারও যোগে আস্থা-সৃষ্টি হয়, এই উদ্দেশ্যেই আত্মকথায় কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি করিব।

আমার এক অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদের[১] জননীঠাকুরাণী কঠিন পীড়াগ্রস্তা হন। ইঁহার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁকে এই অধ্যাত্মযোগের কথা শুনাইতাম। তিনি বাংলার প্রচলিত তন্ত্র ও সহজিয়া সাধনার কিছু পরিচয় রাখিতেন, তাঁর কাছেও আমি সেই সাধনার সামান্য বিবরণ জানিয়াছি। কিন্তু আত্মসমর্পণ-যোগের প্রতি তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি এই সাধনপথে চলিতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন।

নিদারুণ-পীড়ায় যন্ত্রণাক্লিষ্টা হইয়া একদিন এই মহিলা অতি করুণকণ্ঠে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, এই রোগ কি ভাল হইবে না!" সত্যই দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আমি তাঁকে প্রস্তুত করিবার জন্যই—মৃত্যু অবধারিত, এই কথাই বলিলাম। তিনি প্রশান্ত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বলিতে পার বাবা, কবে আমার মৃত্যু হইবে।"

আমার প্রতি তাঁর বিশিষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল; তাঁর ধারণা—আমি নিশ্চয় তাঁর মৃত্যুর দিন বলিয়া দিব। আমি এক মুহূর্ত্ত মাত্র বিচলিত হইয়া অন্তরের দিকে চিত্ত-সংযম করিলাম; স্পষ্ট দেখিলাম—সেই সময় হইতে প্রায় পাঁচ মাস পরে, তাঁর মৃত্যুর তারিখ আমার চক্ষের সম্মুখে যেন ভাসিতেছে। একপ্রকার বাধ্য হইয়াই তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাহা কিন্তু খুব স্থির শান্ত চিত্তেই গ্রহণ করিলেন।

১। সাগরকালী ঘোষের মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বোল্লিখিতা নৃত্যকেশী ঘোষ।

আশ্চর্য্য, এই কথা আমার স্মরণে ছিল না ; কিন্তু ঠিক উক্ত দিনের পূর্ব্ব রাত্রে আমার বন্ধু আসিয়া খবর দিলেন, তাঁর জননী-ঠাকুরাণীকে একবার দেখিয়া আসিবার জন্য। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি সংসারের আসক্তি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ মানুষের ন্যায় রোগ-শয্যায় শুইয়া আছেন। আমায় দেখিবামাত্র তিনি সহাস্যে বলিলেন "বাবা ! তোমার কথাই ঠিক হইয়াছে। কাল আমার প্রস্থানের দিন। বউ, ছেলে, নাতিদের বিদায় দিয়াছি"—এই বলিয়া শীর্ণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি আমার পদধূলি লওয়ার উপক্রম করিলেন। আমি সন্তর্পণে পা সরাইয়া লওয়ায়, তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তার পরদিন সত্যই সজ্ঞানে তাঁর পরলোক-যাত্রা হইল। মরণকালে তাঁর স্তিমিত আঁখির অনিমেষ-দৃষ্টি আমার বুকে এখনও আঁকিয়া আছে। ইহার পরই আর একটা ঘটনার কথা বলি। যাঁকে লইয়া এই ঘটনা তাঁর অনেক কথাই পরে বলিতে হইবে ; কেননা, আমার জীবনসঙ্গিনীর সহিত তাঁর শুধু অন্তর-পরিচয় ছিল না, ভবিষ্য হৃদয়-গঠনের সাধনায় একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীরূপে তাঁর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ও যথোচিত সহায়তা করিয়াছিলেন।[২]

ইঁহার গর্ভস্থ শিশু অকালে নষ্ট হইত, কোনরূপেই রক্ষা পাইত না। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মৃত্যুর দিন অব্যর্থভাবে বলিয়া দেওয়ায়, হয়তো ইঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাঁর গর্ভরক্ষা হইবে। তাঁর কাতর অনুরোধ যখন কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন আমি সত্যই উদ্বিগ্ন হইলাম ; কিন্তু ভিতরে কে যেন বলিয়া উঠিল—গর্ভ-রক্ষা হইবে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে সেই বাণীর প্রতিধ্বনি করিলাম মাত্র। আশ্চর্য্য, সে যাত্রা গর্ভস্থ শিশু অকালে বিনষ্ট হইল না। যথাকালে এক সুস্থ কন্যারত্ন তিনি প্রসব করিলেন ; কিন্তু এই কন্যার আয়ুঃ অতি অল্পই ছিল। শোকাতুরা নারীকে সান্ত্বনা দিয়া আমিও সতর্ক হইলাম, যোগশক্তিকে এই ভাবে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াই মনে হইল। অতঃপর আমি এইভাবে আর নিজেকে নিয়োগ করি নাই, তবে ইহার মধ্য দিয়া আমি যোগের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাই লাভ করিলাম।

সংসারের বোঝা ভগবানই ধীরে-ধীরে সরাইয়া লইতেছিলেন ; আমার

২। বিনোদিনী ঘোষ, যিনি সঙ্ঘে 'মেজ-বৌ' নামে সুপরিচিতা।

মত আমার পত্নীও সংসারধর্ম্মে উদাসীনা হইলেন। তবে এই সময় হইতেই তাঁর নিদারুণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সূত্রপাত। তিনি আমার সহিত পরিচয়-রক্ষার সূত্র যেন আর খুঁজিয়া পান না, অথচ প্রতিপদে বিপদের সম্ভাবনা তাঁর হৃদয়কে নিরন্তর জ্ঞানে-অজ্ঞানে আঘাত দিতে আরম্ভ করিল। আমার মুখ দেখিয়া তিনি স্থির করিতেন—কি উৎকণ্ঠায় আছি; প্রফুল্ল ভাব দেখিলে নিশ্চিন্তা হইতেন। একটা ঘোরতর সংগ্রাম আমার ভিতরে চলিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় বিপ্লব-তরঙ্গ তখনও সবেগে ছুটিয়াছে। রুদ্র ভৈরবের গুরু ডমরুধ্বনির তালে-তালে নৃত্যশীল চরণ অবাধে আগাইয়া চলিয়াছে; মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া জীবনের রঙ্গ মহাধুম লাগাইয়াছে। সেদিন অন্তরে বাহিরে আর কেহ ছিল না; 'তুমি' আব 'আমি'-র মাঝে আজিকার এই বিরাট্ ব্যবধান অলক্ষ্যে বিধাতার বিধান-রূপেই ছিল—সেদিন কে তার কল্পনা করিবে?

ত্রুটি হইলে তিরস্কাব লাভ করিতাম। জীবনের স্বচ্ছতা-প্রকাশে শ্রীঅরবিন্দ আনন্দের সহিত উৎসাহ দিতেন। পৃথিবীতে দ্বিতীয় চিন্তা যে কিছু করিবার আছে, তাহা ভাবিয়া স্থিব করাব অবসর ছিল না। যে শক্তি আধারে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহাব নাম পাইয়াছিলাম—"কালী-শক্তি"। শ্রীঅরবিন্দ এই শক্তির সিদ্ধ-যন্ত্র-রূপে আমায় গড়িয়া তোলার জন্য মন্ত্রের সঙ্গে ক্রিয়াও দিয়াছিলেন। আমি তান্ত্রিক গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলাম; কিন্তু কোনরূপ আনুষ্ঠানিক সাধনায় তিনি আমায় ব্রতী করিতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু অগ্নি-সাধনার ভিতর দিয়া অভিনব তন্ত্র-সমুদ্র আমায় পার করিয়া দিয়াছেন; অকল্পিত বীরাচার-সাধনার মূর্ত্ত রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমার জীবনের গোড়ার মন্ত্র হইয়াছিল—জীবনই যোগ; তাই কোন কার্য্যই তাঁর দেওয়া এই সাধন ভিন্ন অন্য প্রত্যয়ে গ্রহণ করিতে পারি নাই। যখন ব্যর্থ হইয়াছি তখন তিনি নিষ্ঠুর ভাষায় জানাইয়াছেন—"Get rid of the remnants of *Sattwic Ahankara* and *Rajo-guna*······Kali demands a pure *Adhara* for Her work."

মন্ত্রের সঙ্গে কর্ম্মযোগে চিত্ত যুক্ত করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটাইয়া গিয়াছি। এই সময়ে ছায়ার মত একজন যে আমায়

ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, হতাশ অন্তরে পাশে-পাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা লক্ষ্যও করি নাই। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয় এইজন্য যে, সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, আমার সঙ্গ হইতে তিনি একদিনের জন্যও স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন নাই। আমি সাধনা করিয়াছি, তিনি অঞ্চল পাতিয়া ফল সঞ্চয় করিয়াছেন—নিজের জন্য নহে, আমাকেই প্রবুদ্ধ করিতে; তাই তিনি সত্যই ছিলেন আমার সহধর্ম্মিণী, যথার্থ ধর্ম্মপত্নী!

সংসার হইতে মুক্তির প্রেরণা প্রবল হইয়া দেখা দিত; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের আদেশ ছিল, "...if you try to hurry Her (Kali) by *rajasic* impatience, you will delay the success instead of hastening it." কোন বিশেষ কার্য্যের জন্যও তাঁর যে কথা, তাহা আমার জীবনের সব কাজেই প্রযুজ্য হইয়া উঠিত। এই ক্ষুদ্র জীবনের উপর দিয়া বড় কম প্রবল ঝড় বহিয়া যায় নাই, ভবিষ্যতেও হয়তো কত প্রবল ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইবে। আজ ধূর্জ্জটির মত অটল পদে অনন্ত যুগ দাঁড়াইয়া থাকার শক্তি শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ও সাধনার ফলেই যে আয়ত্ত হইয়াছে, ইহা অনন্ত যুগ ধরিয়া বলিয়া যাইব।

বৈষ্ণব সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম—"ভিজা কাষ্ঠ আখায় রেখে' দোরে বসে' কাঁদি।" আমার তখন এই অবস্থা। সংসারের সব কাজই করি, কিন্তু "ভিজা কাষ্ঠ আখায় রেখে"ই কান্নার সুযোগ করিয়া লই! ইহাতে আর যাহাই হউক, হাতের কাজ যে সুসম্পন্ন হয় না, ইহা অবধারিত। কাজেই সংসার অচল হইয়া পড়িল।

শ্রীঅরবিন্দের সাধন লওয়ার পর হইতে জীবন উজান গতি ধরিয়াই ছুটিয়াছে, অন্ততঃ এইরূপ দৃষ্টি পাইয়াছি; কেননা, আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে, যাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়, তাহাই এখন ঘটে দেখি। তাই ভাঙ্গার বজ্রপাতেই সৃষ্টির শতদল প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই বাধাই আমায় বীর্য্য দিয়াছে; ব্যর্থতার দুর্য্যোগেই আমার উল্লাস ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমার জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপ তীক্ষ্ণ কণ্টকের উপর দিয়াই হইয়াছে; ক্ষতবিক্ষত চরণ, হৃদয়ও আঘাতে-আঘাতে জীর্ণ হইয়াছে। এই সবের উপর দিয়া যে জয়ের যাত্রা, যে অমর প্রাণ, যে দিব্য হৃদয়,

তাহারই সন্ধান পাইয়া পরিণামে কৃতার্থ হইয়াছি। এই সময়েও সহজ জীবনযাপনের রীতি হইতে আমায় মুখ ফিরাইতে হইল—বাধার আঘাতেই। এতদিন অবাধ বিচরণে অন্তরায় ছিল না; ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একটা রাজনীতিক কাণ্ড অবলম্বন করিয়া আমার কয়েক জন নিকট-বন্ধু গুরুতর অভিযোগে ধৃত হন। এই সঙ্গে আমার উপরও পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষের প্রথম শুভ-দৃষ্টি পড়ে। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। রৌদ্রযুক্ত স্থানে দাঁড়াইলে নিজের ছায়া-দর্শনেও তবু বিঘ্ন ঘটে! কিন্তু পুলিসের অনুচর আমার নিত্য-সঙ্গী হইয়াছিল। ইচ্ছা করিয়া সারাদিন পথে-পথে ঘুরিতাম, দেখিতাম—তবুও আমি সঙ্গিহারা নহি; আকাশের অজস্র বর্ষণ মাথায় করিয়া পথে বাহির হইলেও, পরিত্রাণ নাই; কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ী নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে যাইতে হইলেও একা যাইতে হইত না, ছায়ার ন্যায় পুলিস-প্রহরী সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরিত। কৌতুক মনে হইত, মজাও অনেক করিতাম; কিন্তু ক্রমে বিরক্তির সীমা থাকিল না। এই উপলক্ষে কাজকর্ম্মের জন্য বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। যদি কোন প্রয়োজনে বাহির হইতাম, তাহা এই সতর্ক সঙ্গীদের চক্ষে ধূলা দিয়াই সারিতাম। জীবনটা ইহাতে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া পড়িল; কিন্তু ইহাই আমাব সাধনজীবনের অতুলনীয় সুযোগ সৃষ্টি কবিল।

প্রতিদিন যে মানুষ কলিকাতা-ঘর করে, সে বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিল—ইহাব তথ্য লওয়ার আকুলতা স্ত্রীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাঁহাকে বলিলাম—পুলিসেব উপদ্রবে কাজকর্ম্ম করার সুবিধা নাই, কোন ভদ্রলোকের নিকট যাওয়া এই অবস্থায় অসম্মান বলিয়া বোধ হয়। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, অবস্থা ঘনাইয়া আসিতেছে; লোকটী ক্রমেই স্বেচ্ছায় না হউক, বাধ্য হইয়াও দূরেই সরিয়া পড়িবে। কিন্তু সেদিন এই প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার সহিত অধিক বাক্যালাপের অবসর ছিল না।

আমার কোন কাজেই তাঁর সহযোগিতার প্রয়োজন হইত না। সংসারে একযোগে কার্য্য করিতাম, কিন্তু বর্ত্তমান সাধন-যুগে তাঁর সহিত অনেকখানি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলাম। আমি আশ্রয় পাইয়াছিলাম; তাঁর একান্ত আশ্রয় আমি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু ছিল না—প্রত্যক্ষভাবে তাহাও দুষ্প্রাপ্য

হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তাঁর যে কি দুঃখে দিন গিয়াছে, তাহা আজ অনুভব করি। সংসারে কথা কহিবার মানুষ ছিল না; মানুষ যে একদণ্ড হৃদয়ের গুরুভার-লাঘবের জন্ত হাস্ত-পরিহাস করিবে, তাহার সুযোগও তাঁহার ছিল না। তিনি মৌন-ব্রতী হইয়াই দিন কাটাইয়াছেন; অন্তরে-অন্তরে আমার চিন্তায় হৃদয়কে ধ্যানময়ী স্তব্ধতায় প্রস্তরকঠিন করিয়াই তুলিয়াছেন। আমার সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন পন্থায়—আমি পাইয়াছিলাম রসের উৎস; আর তাঁকে আপনার হৃদয় মন্থন করিয়াই অমৃত-সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। জীবন-সাধনায়, তাই আজ তুলনা করিয়া তাঁহাকেই বড় আসন দিই।

আমার এই অভিনব জীবনযাত্রার পথে ক্রমে তিনি নিজের সাধনবলেই একান্ত অনিবার্য্য-রূপেই সহযাত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন। সংসারে যখন মন নাই, তখন খুঁজিয়া-খুঁজিয়া তিনি নিজেই বাহির করিলেন—কোথায় আমার সবখানিকে গুটাইয়া তুলিতেছি, আর নিজেকেও নিঃশেষে সেই সঙ্গে জড় করিয়া আমায় গুণান্বিত করার পথেই তিনি শনৈঃ-শনৈঃ পা বাড়াইলেন।

বেশ মনে পড়ে—কোন এক সুহৃৎ দেশের কাজে একটী ক্ষুদ্র থলিপূর্ণ গিনি আনিয়া দেয়, তাহা গোপন করার প্রয়াস তাঁর চক্ষে ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি থলিটি উপুড় করিয়া মেঝের উপর গিনিগুলি ঢালিলেন। আমি বলিলাম "দুই-দশখানি নিতে ইচ্ছা হয় না!"

কি নির্লোভ, মহত্ত্বপূর্ণ, উজ্জ্বল চক্ষের দৃষ্টি আমার দিকে স্থাপন করিয়া তিনি আমায় তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা আমার মর্ম্মে-মর্ম্মে বিঁধিয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে তাঁর মর্য্যাদা-হানি করিয়া অনেক কটুবাক্য, অনেক অন্যায় আচরণ করিয়াছি। তিনি অন্য সকল প্রকার দুঃখ হাসিমুখে সহিতে অকুণ্ঠা ছিলেন, কিন্তু বড় উচ্চ মর্য্যাদা-বোধ ছিল; সেইখানে আঘাত পড়িলে, তিনি উর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনীর মত উন্নতগ্রীবায় তীব্র ভাষায় প্রতিশোধ লইতেন। এইখানে কেহ পরিত্রাণ পাইত না। আমিও তাঁহাকে আঘাত দিতে গিয়া প্রত্যাঘাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। পরবর্ত্তী যুগে এই মর্য্যাদা-বোধের উপর দুই জনের যে সংগ্রাম-সৃষ্টি হইয়াছিল, জয় আমার ভাগ্যে ঘটিলেও, তাহা তাঁহার উৎসর্গেরই মহিমা ছাড়া আর কিছু নয়।

গিনিগুলি যথাস্থানে রাখিয়া তিনি বলিলেন "তোমারও তো গোণা-গাঁথা নাই!"

আমি বলিলাম "প্রয়োজন কি? আমি বাহক—যাহাকে দেওয়ার কথা তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিব। আমার কাজ এই পর্য্যন্ত।"

তাঁর মন একদিকে উদার ও ক্ষমা-গুণ-সম্পন্ন হইলেও, কোন বিষয়কে তিনি এত সহজভাবে দেখিতেন না; মানবচরিত্রের রক্তগত দুর্ব্বলতা বিষয়ে সন্দেহ-সতর্কতারও যে প্রয়োজন আছে, ইহা তিনি মনে করিতেন। কিন্তু কাহারও উপর সংশয় হইলেও, সহজে তাঁর আচরণ কটু হইত না। তিনি বলিতেন "মানুষের অনেক দোষ, বড় কাজে সেই দোষ, মানুষের চেয়ে কাজের ক্ষতিই করে। এই জন্যই সাবধান হ'তে হয়, হিসাব করে' কাজ করাই ভাল।"

তাঁর বুদ্ধি-পরামর্শ আমার কাণেই প্রবেশ করিত, কাজে তাহা প্রয়োগ করি নাই। অভিজ্ঞতা পাইয়াছি অনেক। শুনিতে পাই—এই টাকা যথার্থ দেশের কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। আমার কোন এক সুহৃৎ পরে ইহার জন্য উক্ত দেশকর্ম্মীকে খুবই তাগাদা দিয়াছিল; কিন্তু ফলে কিছুই দাঁড়ায় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে টাকা জিনিষটার হিসাব রাখিয়া চলার খুব অল্প মানুষই দেখিয়াছি। অনেকেই এই ক্ষেত্রে গোলযোগ বাধাইয়াছেন। ভবিষ্যতে এই দিকে বাঙালী জাতিকে সমধিক সতর্ক হইতে হইবে। টাকার ক্ষেত্রে যার চরিত্র শক্ত নয়, তাহাকে বিশ্বাস করা খুব কঠিন হইয়া পড়ে।

বোধহয় ১৯১১ কি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথি-বার্ষিকীর খবর পাই—উহা "কালী"-র জন্মোৎসব-রূপে সংবাদ পাইয়াছিলাম।[৩] শ্রীঅরবিন্দ যখন আত্মগোপন করিয়াছেন, তাঁর সংবাদ বাহিরে কোনমতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না; এই হেতু আমরা যে কয় জন তাঁর সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছিলাম, তাঁহারা ছাড়া তাঁর কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতাম না। এই বিষয়ে আমরা এমনই সতর্ক ছিলাম যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচারী হইতে 'আর্য্য' পত্রিকা বাহির হওয়ার পূর্ব্বে, তাঁর খবর বাঙালীর নিকট একপ্রকার অবিদিতই ছিল।

৩। ১৫২ পৃষ্ঠার ১৬-শ পংক্তি দ্রষ্টব্য। তৎকালে পণ্ডিচারী হইতে লেখককে লিখিত তাঁর অধিকাংশ পত্রাবলী 'Kali' বা 'K' আদ্যাক্ষরে স্বাক্ষর করিতে দেখা যায়।

"কালী"-র জন্মোৎসব অতি গোপনেই করিতে হইবে—এইভাবে কয়েকটী অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই উৎসব ব্যাপারে 'তাঁর' আর উৎসাহের সীমা ছিল না; কেন-না, এই নূতন জীবনের পথে তাঁহাকে আমার যেটুকু প্রয়োজন হইত, সেইটুকু তিনি প্রাণপণে করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন এবং এইটুকুর মধ্যেই পতি-পত্নীর যে বিমল সম্বন্ধের আস্বাদ লাভ করিতেন, তাহাই বোধহয় সে-যুগে তাঁর প্রাণ-ধারণের অমৃতস্বরূপ ছিল।

আজ বেশ মনে পড়ে—সংসারের সকলকে লুকাইয়া খাদ্যাদি সংগ্রহ করার কথা। আলিপুর জেল হইতে বাহির হওয়ার পরের শ্রীঅরবিন্দের একখানি ছবি ছিল। সেই ছবিখানি ঝাড়িয়া-মুছিয়া, পুষ্পমাল্যে সুভূষিত করিয়া তিনি কি সুন্দর পরিপাটী-রূপে তাহা দালানের দেওয়ালে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। শ্রাবণের আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, সে কালীপূজাই বটে; অন্ধকারে মধ্যরাত্রে অনুরাগী বন্ধুদের আগমন—তিনি পা টিপিয়া-টিপিয়া কেহ দেখিতেছে কি না, সন্ধান লইতেছেন। এই সব খেলার ভিতর দিয়া জীবনের অভিনব পর্য্যায় গড়িয়া উঠিতেছিল—ইহা নিঃসংশয়; তাই আজ ইহা নিরর্থক মনে হইলেও, সেদিন যে কত প্রয়োজন ছিল, তাহা না বলিলেও চলিবে।

কত পবিত্র-সংযত চিত্তে, দুই-দশ জন অকৃত্রিম সুহৃৎ অন্ধকারময় আকাশের নীচে, একটী ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের আলোচনা করিয়াছি, তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছি, তাঁর পবিত্র প্রসঙ্গ লইয়া কত কথা বলিয়াছি! আজ সবই স্বপ্ন কিন্তু সেদিন ইহাই ছিল যে জীবনের রস ও আনন্দ। সর্ব্বত্যাগী হওয়ার অমর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ একদল মানুষ —গভীর নিশীথে, বিধৌত কদলীপত্রে, আমার স্ত্রীর স্বহস্তে প্রস্তুত খেচরান্নের সহিত নানাবিধ ভর্জ্জিত দ্রব্য, শেষে অমৃত-পায়স পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজনান্তে, শেষ রাত্রিতে সকলের বিদায়ের পালা—এমনই গভীরে নিবিড়ে যে কত অমৃত, জীবন-গঠনের কি অপূর্ব্ব রসায়ন নিঃসৃত হইত, তাহা আর বুঝাইয়া বলার নয়।

সংসারের কর্ম্ম হইতে এই নূতন কর্ম্মজীবনের পথে এমন করিয়াই তিনি আমার সঙ্গিনী হইয়া উঠিতেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাই তাঁর আর কর্ম্মের বিরাম ছিল না।

চক্ষের সম্মুখে আমায় রাখিয়া, এই গোপন-সাধনের সহযাত্রী-রূপে তাঁর এই প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে বড তৃপ্তি ঢালিয়া দিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "দেখ, আমায় তুমি কিছু গোপন ক'র না। তোমার পথই আমার পথ, আমার আর কি আছে বল? এক পাশে ঠেলে' দিয়ে আমায় বঞ্চিত ক'র না— তার চেয়ে বিষ দিও, খেয়ে মরি।"

তাঁর করুণ নিবেদন ভগবান ব্যর্থ করেন নাই। পরে এমন কাজ, এমন পরামর্শ, এমন গোপন ব্যাপার কিছুই ছিল না, যেখানে তাঁর হস্ত, তাঁর সতর্ক-দৃষ্টি আমায় সাহায্য না করিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ আমার উদ্দাম জীবনকে সংযত ও গভীর করার উদ্দেশ্যেই আত্মস্থ হওয়ার সাধনায় গোপন নীতির পথে আমায় নিয়ন্ত্রিত করিলেন। তাঁহাকে গুপ্ত কক্ষে অজ্ঞাতবাসে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে গিয়া সেই কার্য্যে যে খুবই সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলাম, তাহার পরিচয় ভবিষ্য-যুগে ভাল করিয়াই পাইয়াছি; আর এই প্রকার গুরুদায়িত্বপূর্ণ সকল কাজেই আমার স্ত্রীর নিবিড় সাহায্য আমার জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও সরল করিয়া তুলিয়াছিল—নতুবা আমার অসতর্ক, উচ্ছৃঙ্খল, উত্তেজনাময় প্রাণ কি প্রমাদ ঘটাইত, কে জানে! কিন্তু এই জীবনের পথে কিছুরই স্থিরতা ছিল না; আজ যে অবস্থা, দুই দিন পরে তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি। এই পরিবর্ত্তন পুরুষের পক্ষে মানিয়া লওয়া যত সহজ, নারীর পক্ষে তেমন নয়; তাই তাঁকে আমার পশ্চাদনুসরণ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। আর তাঁর চরিত্র দৃঢ় এবং কাজের হিসাব বড় সঠিক ছিল। এইজন্য কোন নূতন অবস্থায় আমি যেমন মরিয়া হইয়া ঝাঁপ দিতাম, তাঁহাকে সেই বিষয় গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইত এবং কিসে কি হইবে, তাহার বিচার করিয়া আগাইতে হইত। আর এই জন্যই আমি যত ক্ষিপ্র গতিতে আগাইয়া পড়িতাম, তিনি তাহাতে অসমর্থা হইতেন। অনেক সময়ে তিনি নিরাশ হৃদয়েই বলিতেন "আর পারি না, এ যাত্রা বদ্‌লে আসি।"

ভগবানের হাতে জীবনগঠনের পক্ষে, মানুষের উপাদান তরল ও নরম হইলে যে সুযোগ, উপাদান-কাঠিন্যে তাহা মিলে না, বড় বেগ পাইতে হয়। তিনি বড় শক্ত মাটির মানুষ ছিলেন। একটা গঠনের পর অন্য প্রকার গঠনের যুগে, প্রায় একটা বিপ্লব বাধিত, কিন্তু অনেক বিপ্লব অতিক্রম করিয়া

পরিণামে তিনি যুগের মানুষ-রূপেই সঙ্ঘের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশেষে দেহের রূপান্তর-সাধনের সময়ে তিনি দেহান্তরই শ্রেয়ঃ করিলেন—বুঝি ভগবানের ইহাই প্রয়োজন হইয়াছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের এক প্রভাতে তাঁহাকে হঠাৎ জানাইলাম—আমি পণ্ডিচারী যাইতেছি। আমার সকল কাজই এইরূপ অকস্মাৎ ঘটিত ; ইহার জন্য অন্যের যে একটা প্রস্তুতি আছে, তাহার হুঁষ রাখা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি শুনিয়া প্রথমে মনে করিলেন পরিহাস ; কিন্তু আমার ব্যস্ততা দেখিয়া পরক্ষণে আর সংশয় রহিল না। তিনি বিবর্ণ মুখে আমায় বলিলেন "আমায় কার কাছে রেখে' যাচ্ছ, আমার আর কে আছে!"

সত্যই জগৎ যেন তাঁর কাছে কিছুই নয়। পথে 'হরিবোল' ধ্বনি শুনিলে তিনি শিহরিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইতেন, একটা ঘোরতর দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখ কালি হইয়া যাইত—মরণ যে কখন আসিয়া কাহাকে সরাইয়া লয়, কে জানে!

আমার অধিক অবসর ছিল না। মাসখানেকের মতই যাইতেছি—এই বলিয়া আমি কাপড়-জামা গুছাইয়া লইতে উদ্যত হইলাম। তিনি যখন বুঝিলেন যাওয়া অবধারিত, তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার হাত হইতে সব-কিছু কাড়িয়া লইয়া, বিদেশ-যাত্রার উদ্যোগায়োজন নিজের হাতেই করিতে বসিলেন।

নয়নে অশ্রু ; কিন্তু পরিপাটী হস্তে কৌটায় মস্‌লা, দন্তমঞ্জন, পথে গাড়ীর রপটে দুর্গন্ধ-নিবারণের গন্ধ-দ্রব্য—একে-একে সব তিনি গুছাইয়া দিলেন। বিদায়-কালে তিনি নির্ব্বাক্ হইয়াই বিদায় দিলেন, অনিমেষ নয়নে চাহিয়া-চাহিয়া তাঁর দুই চক্ষে জলধারা বহিল। তাঁহাকে ছাড়িয়া এই আমার প্রথম বিদেশ-যাত্রা। সংসারে তাঁর আপনার বলিয়া কেহ নাই। কিন্তু ভগবানের হাতেই সব ছাড়িয়া দিবার নবানুরাগে আমার প্রাণ তখন উন্মাদ—সে কি টান। আমি উধাও হইয়া পণ্ডিচারী যাত্রা করিলাম।

"যাহাকে ভালবাস, তাহাকে চক্ষের আড়াল করিও না"—এই বাণী যদিও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী দিয়া বাহির হইয়াছিল, কিন্তু

ভালবাসা বস্তুটার মহিমা এই কথায় খুবই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ; কেননা, প্রেমের অমর বীর্য্য মরণের ব্যবধানেও ব্যর্থ হয় না, স্বামিস্ত্রীর অমর সম্বন্ধ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অবিচ্ছেদেই বহিয়া চলে। পবিত্র হিন্দুস্থানে তাই সাধ্বীর পক্ষে পত্যন্তর-গ্রহণ পতির জীবনে অথবা মরণেও সম্ভবপর নহে। পুরুষের পক্ষে যে ভিন্ন নীতি তাহা সুনীতি নহে, সম্বন্ধের ব্যভিচার।

দূরে আসিয়া এই সম্বন্ধ-তত্ত্বের অমৃতময় আস্বাদ ভাল করিয়াই পাইলাম। নিরন্তর নৈকট্যে সেই বস্তুর অভাব অনুভূত না হওয়ায়, নূতনের প্রতি তীব্র অনুরাগ যেন বাধাহীন ছিল ; কিন্তু নব আকর্ষণের কেন্দ্রে উধাও হইয়া যখন ছুটিলাম, তখন যে বস্তুটা হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল, যাহার মর্য্যাদা পূর্ব্বে বুঝি নাই, দূরে আসিয়া তাহাই নূতনকে সবখানি দিয়া পাওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিল। মানুষের দুঃখ—জীবন দ্বন্দ্বময় বলিয়া ; নির্দ্বন্দ্ব সমতাপূর্ণ জীবন সিদ্ধের লক্ষণ। কিন্তু সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, হিতাহিত, খ্যাতি-নিন্দা প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের সংঘর্ষে যে দ্বন্দ্ব-সৃষ্টি হয়, তাহা গীতা পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম ; আসল দ্বন্দ্ব যে কি বস্তু, তাহা এইবার বুঝিলাম। মানুষের মধ্যে এই যে আত্মবিরোধের খেলা, যেন একাধারে দুইটী সত্তার সংঘর্ষ (Play of Double Being)—ইহাই আমায় নাস্তানাবুদ করিয়াছে।

পুরুষমানুষ কে কোথায় চিরদিন ঘরে বসিয়া থাকে ! তাই এই সামান্য দিনেব জন্য বিদেশে যাওয়ার কথাটা বড় কথা নয়। কিন্তু 'সারা জীবনই যোগ' বলিয়া যার ধারণা, তার প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনা যে শিক্ষার কারণ হয়, সত্যই তাহা ভাষায় ব্যক্ত হওয়ার নহে। এই দুই-এক মাস তাঁহার নিকট হইতে স্বতন্ত্র বাসের মধ্যে সারা জীবনের ভাগ্য-চক্র অভিনব পথে নিয়ন্ত্রিত হইল। এইজন্য, আমার এই প্রথম পণ্ডিচারী-যাত্রার কালই বর্ত্তমান জীবনের সন্ধি-যুগ বলিতে হইবে।

একান্ত অন্ধের মতই ছুটিয়াছিলাম—নিজের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, কোন স্বপ্ন, কল্পনা আমার অন্তরে ছিল না। অন্তর্জ্জগতে সেদিন এক বিন্দুও আলোর সন্ধান পাই নাই, বাহিরের দৃষ্টিও সেদিন ঝাপ্‌সা হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ চক্ষুঃরোগে আক্রান্ত হওয়ায়, একটা নীল চশমায় দৃষ্টি ঢাকিয়া, কত পথ যে অতিক্রম করিতেছি, গাড়ীতে বসিয়া ইহাই কেবল ভাবিতেছি। আমার সহযাত্রী পণ্ডিচারীর কাউন্সিলে প্রতিনিধি-স্বরূপ যাইতেছিলেন ; তাঁর

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিতেছিল। মাঝে-মাঝে চমক হইতেছিল—কি যেন ছাড়িয়া চলিয়াছি! সহযাত্রীর গানের এই একটা ছত্র এখনও মনে পড়ে—"শ্যাম-শুক নামে প্রিয় পাখী কোন্ দেশেতে উড়ে' গেল"—গানের সঙ্গে যেন একজনের হৃদয়-ব্যথা অলক্ষ্যে মিশিয়া সেদিন কি এক বিরহী সুরে আমার বুকখানি উদাস করিয়া তুলিয়াছিল! নিজের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে-দিতেই দীর্ঘপথ অতিবাহন করিয়া তৃতীয় দিনের মধ্যাহ্নে মাদ্রাজ সহরে গিয়া হাঁপ ছাড়িলাম।

এইখানে নারী-স্বাধীনতার বিজয়-শ্রী আমার চক্ষে এমন অপূর্ব্ব রূপ লইয়া প্রতিভাত হইল, যাহা আমি কোনদিন ভুলিতে পারিব না। মাদ্রাজ সহরে সকল শ্রেণীর শিক্ষিতা-অশিক্ষিতা ভদ্রমহিলারা স্বচ্ছন্দে রাজপথের উপর দিয়া অনাবৃত মস্তকে সগর্ব্বে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, টম্‌টম্ হাঁকাইয়া ছুটিয়াছে, নারী-সৌন্দর্য্যের হাট বসিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্য পুরুষ ও নারী কাহারও মধ্যে কোনও সঙ্কোচ নাই। বাংলার দৃশ্য যুগপৎ স্মরণপথে পতিত হওয়ায় বঙ্গ-মহিলার অবগুণ্ঠিত মুখশ্রীর সঙ্গে এই স্বচ্ছন্দ-গতি নারীর তুলনা করিয়া লইলাম। নারীর মুক্ত জীবনই শ্রেয়ঃ মনে হইল। এখানে সঙ্কোচের অন্তরাল নাই, তাই নারী-পুরুষ উভয়ের স্নায়ুপেশী স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের আঘাত খাইয়া এমনই সবল ও শক্ত হইয়াছে, যাহাতে কেহই পরস্পর দৃষ্টিবিনিময়ে বিকল হয় না। আমার এই চক্ষুঃ দুইটা বস্তুতন্ত্র অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হইতে চিরদিনই এমন কিছু আহরণ করে, যাহা আমার মানসপ্রতিমাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলে। হৃদয়ের রাস-মন্দিরে যে নারী-প্রতিমা আমার অজ্ঞাতেই সেদিন গড়িয়া উঠিতেছিল, আমি এক মুহূর্ত্তে তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম। আমার মনে হইল—নারীর অবগুণ্ঠন-মুক্ত সৌন্দর্য্যই দেশকে পৌরুষ দিবে; পুরুষদের আড়ষ্ট প্রাণ, কপট মন ইহাতে সুন্দর ও উদার হইয়া উঠিবে, নারীও নিরাপদ হইবে। আড়াল করিয়া যে রূপের মোহ কুহেলিকা সৃষ্টি করে, সে ঐন্দ্রজালিক মায়া-যবনিকা বিদীর্ণ হওয়াই ভাল। বাংলার নারী-স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ জয়শ্রী আমার চক্ষে চিরদিনের জন্য আলোর কাজল পরাইয়া দিল। আমার এই মর্ম্মকথা 'তাঁকেই' জানাইয়াছিলাম। তিনি নিজ অবগুণ্ঠনের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলার ভবিষ্য নারী-সমাজের মাথার আবরণ সরাইয়া নূতন

প্রতীকেরও রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমার কোন সাধই তিনি অপূর্ণ রাখিতেন না। এই সকল কথা পরে কিছু বলিতে হইবে বলিয়া ঘটনাটি এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়া রাখিলাম।

পণ্ডিচারীতে অবস্থানকালে, বাহ্যতঃ তাঁহার দিকটা কিছু ভুলিলাম। এই সময়েই শ্রীঅরবিন্দের যোগ আমার মধ্যে অবাধে আশ্রয় পাইয়া বসিল। আমার আকুল আত্মনিবেদনের সহিত তাঁহার অমৃত-নির্ঝরিণী করুণা একত্র হইয়া আমাকে এক সম্পূর্ণ নব চেতনায় উঠাইয়া দিল। জীবনের এই আমূল পরিবর্ত্তনের সহিত আমার স্ত্রী বাকী জীবন মিলাইতে গিয়া যে কৃতিত্ব ও মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই 'তাঁর' আসল জীবন-কথা। এইজন্য এই সময়ের কথাগুলি একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পণ্ডিচারীর বড়বাজারের সান্নিধ্যে প্রসিদ্ধ "রাঙা পুলের" প্রাসাদ-সদৃশ ভবনে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ফরাসী চন্দননগরের দুইজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, আমি ও একজন পাচক, এই চারিজনে নূতন সংসার পাতিয়া বসিলাম। রাস্তার ধারে দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাজপথের বিচিত্র শোভা নিরীক্ষণ করিতাম। সম্মুখে 'ক্লক-টাওয়ারের' দিকে চাহিয়া কত কথা ভাবিতাম। প্রাঙ্গণ-চত্বরে বেসাতী বসিত। অপরাহ্নে ফুলওয়ালীরা গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, বেল, যূঁই ফুলের তোড়া ও মালা বিক্রয় করিতে বসিত। অনবগুণ্ঠিতা কবরী ফুলের মালায় সুশোভিতা করিয়া ভদ্র মহিলারা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্যপূর্ণা দেহ-বল্লরী ও চক্ষের উজ্জ্বল দীপ্তি আমার চিত্তে আনন্দের ধারা ঢালিয়া দিত। বাজারে গিয়া দেখিতাম—অধিকাংশ মহিলারাই অসঙ্কোচে ভীড় ঠেলিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করিতেছেন। বাংলার আবহাওয়ায়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সংসারের স্মৃতিচিত্রই আমার মনে আঁকিয়া উঠিত। আমি ইহাদের দেখিয়া তৃপ্তি পাইতাম। আমার কৌতূহল-দৃষ্টির ফলেই হয়তো দুইজন মহিলার সহিত আমার আলাপ ঘটিয়াছিল। তামিল ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকায়, ইঁহাদের মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া দুর্ঘট ছিল। চন্দননগরের কয়েকজন ছাত্র সেই সময়ে পণ্ডিচারীতে অধ্যয়ন করিত। তাহাদের সাহায্যে ইঁহাদের যেটুকু হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে নারীচরিত্রে যে স্বাভাবিক স্নেহ ও অনুরাগ, তাহা এই অবাধ স্বাধীনতায় যে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহা জানিয়া খুবই আনন্দ হইয়াছিল।

ইঁহারা আমার দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যেও অনেক সহায়তা করিতেন। বাল্যকাল হইতে আমার নিজের কাপড়খানি পর্য্যন্ত আমায় গুছাইয়া রাখিতে হয় নাই। শয়নের বিছানা পাড়িয়া, আবার তাহা গুছাইয়া, খুঁটিনাটি অসংখ্য কার্য্য নিজের হাতে করিয়া লওয়া ছাড়া বিদেশে আর অন্য উপায় ছিল না; কিন্তু যে স্নেহ-নিগড় ভগবানের দান, তাহার বন্ধন বোধ হয় ঘুচিবার নহে। এই বিদেশে এই দুইজন মহিলা আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়াপরবশে সকল কাজই করিয়া দিতেন। আমি ভাবিতাম—ভগবানের দয়া; কিন্তু পরে বুঝিয়াছি—একজনের অন্তর-প্রার্থনাই সর্ব্বক্ষেত্রে মূর্ত্তি লইয়া আমায় নিরাপদ করিয়াছে।

পণ্ডিচারীতে আসার কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সহজ ভাবে সাক্ষাৎকার করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। কেননা, তাঁহাকে ঘিরিয়া সর্ব্বদা পুলিস-প্রহরী অবস্থান করিত। তাঁহার সহিত আমার সম্পর্কের কথা গোপন রাখার তখন প্রয়োজনও ছিল।

তাঁহার নিকট তখন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ নলিনী, সুরেশ, বিজয় আর সৌরান—ইঁহারাই থাকিতেন। ওদোঞ্জল নামক একটা মাঠে প্রতিদিন অপরাহ্ণে ফুটবল খেলায় ইঁহারা যোগ দিতেন। একদিন অপরাহ্ণে এইখানে ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্যই উপস্থিত হইলাম। সৌরীন আমায় দেখিয়া সঙ্কেতে একটু দূরে লইয়া গেলেন ও পণ্ডিচারীবাসী এক তরুণকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। সে কি সতর্কতা! কাহারও সহিত আমার পরিচয় আছে, ইহা যেন সতর্ক পুলিস-প্রহরীর চক্ষে না পড়ে—ইহাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। এই তরুণের সহিত আলাপ করিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎকাবের সুব্যবস্থা করা হইল। আমি বাসায় কি উৎকণ্ঠায় যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহার স্মৃতি আজও মুছিতে পারি নাই। একদিন সন্ধ্যার পর এই তরুণের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাড়ীখানি খোলার। ইনি অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হইল না। সংসারে একমাত্র বিধবা বৃদ্ধা মাতা। তিনি আমায় অভ্যর্থনা করিয়া একটা চেয়ারে বসিতে দিলেন। পরে এই তরুণ পণ্ডিচারীর একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং নেতা—পণ্ডিচারীর মেয়র মিঃ জোসেফ ডেভিড নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। আমি বহু প্রকারে এই সচ্চরিত্র যুবকের সাহায্য পাইয়া

চিরকৃতজ্ঞ আছি। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, তরুণ বন্ধু একখানি পুশ্-পুশ্ ভাড়া করিলেন। পণ্ডিচারীতে এই গাড়ী ছাড়া অন্য যানাদির একপ্রকার প্রচলন ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরোহীকে গাড়ীতে উঠিয়া নৌকার হালের মত গাড়ীর ব্রেক্ ধরিয়া বসিতে হয়। গাড়ীওয়ালা পশ্চাৎ হইতে উহা ঠেলিয়া লইয়া চলে—এই-জন্যই ইহার নাম পুশ্-পুশ্ হইয়াছে।

আমি একখানি মাদ্রাজী চাদরে সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। বুকের মধ্যে আনন্দের নৃত্য হইতেছিল। সে অপূর্ব্বানুভূতির কথা আজ প্রকাশ করিতে বাধে—শুধু ভাষার অভাব নহে, চির বিরহের আব্হাওয়ায় আজ সে মিলনের সুর কতখানি ঠিক খাপ খাইবে, সেই কথা ভাবিয়া।

শ্রীঅরবিন্দ যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহা সাহেবপল্লীর মধ্যে এক প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা ভবন। দূর হইতেই দেখিলাম—তাঁহার বাড়ীর অপর পার্শ্বে পুলিসের লোকে থানা বসাইয়াছে। গাড়ী প্রকাণ্ড দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রশস্ত বিচিত্র চাদরে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া আমি সর্ব্বাগ্রে নামিয়া পড়িলাম। আমার তরুণ বন্ধুও আমার অনুসরণ করিল। পা দুটা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল—কতকটা আনন্দে, আর কতকটা গোপন করার দায়েও। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম—স্নায়ুর দুর্ব্বলতায় নহে, এই বৃহৎ বাড়ী আলোকশূন্য। বড-বড় ঘরগুলি বিকট রাক্ষসের মত যেন গিলিতে আসিতেছে। একটা হল পার হইয়া অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে পড়িতেই, সম্মুখে ছোট একটা কুঠারীতে মিট্-মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে দেখিলাম। আমাদের পায়ের সাড়া পাইয়া যে ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন, তাহার নাম সুরেশ, ওরফে মণি। সঙ্গে নলিনী আসিয়া হাসিয়া বলিলেন "আজ ইনিই আমাদের সৈরিন্ধ্রী।" বুঝিলাম পালা করিয়া প্রত্যেককে রাঁধিতে হয়। রাঁধার বালাই বেশী নহে—একবার উনানে হাঁড়ীটা চড়াইয়া দেওয়ার ওয়াস্তা। খাওয়া-দাওয়ার দিক্‌টা যে বিশেষ খেয়ালে নাই, তাহা কথার আঁচেই বুঝিলাম। সেদিন চালে-ডালে খিচুড়ি পাক হইতেছিল। আলোর কথা উঠিলে, জবাব পাইলাম যাহা, তাহাতে চক্ষুঃ স্থির হইল—অর্থাৎ "কর্ত্তা অন্ধকারেই থাকেন,

রন্ধনশালার ল্যাম্প হাঁড়ী উঠার সঙ্গে খাওয়ার সুযোগ দেয়, আলোর দরকারই হয় না।"

ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হওয়া মাত্র আমার পণ্ডিচারীর বন্ধু প্রস্থান করিলেন। সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দরজার সম্মুখে দেখিলাম—সৌম্যমূর্ত্তি শ্রীঅরবিন্দকে। সবখানি বুঝি ঝুঁকিয়া পড়ে—ভাবপ্রবণ বলিয়া আমার অখ্যাতিটা এইখান হইতেই বেশী প্রচারিত হইয়াছিল। কেননা, ভাব চাপিয়া রাখার সাধ্য আমার ছিল না। আনন্দ দুই কূল যেন উপচাইয়া পড়িত। জ্ঞানহারার মত প্রণাম করিয়া চাহিব কি, চক্ষুঃ আঁধার করিয়া অবিরল জলস্রোত ঝরিল। ভাল-মন্দ কিছুতেই সংযম জানিতাম না। যাহা হইত, তাহা বাধা মানিত না শ্রীঅরবিন্দ মাথাটা বুকের কাছে লইয়া বুঝি বিগলিত স্নেহে আঘ্রাণ করিতেছিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে কিছু দূর গিয়া প্রকাণ্ড হলের এক প্রান্তে একখানা অর্দ্ধভগ্ন টেবিলের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি সম্মুখেই আসন লইলেন। টেবিলের উপর একটা অর্দ্ধদগ্ধ বাতি জ্বলিতেছিল, আর কয়েকটা মটর-ভাজা পড়িয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ বোধ হয় এতক্ষণ তাহাই এক-একটা খুঁটিয়া খাইতেছিলেন!

চাহিয়া দেখিলাম—চন্দননগরে তাঁহার যে কান্তি, যে শ্রী, যে প্রশান্ত ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা কে যেন হরণ করিয়াছে। শরীর অপেক্ষাকৃত শীর্ণ, বদনমণ্ডলে কালো ছায়া, ক্লান্ত-ব্যথিত মুখচ্ছবি আমার প্রাণে বড় নিষ্ঠুর আঘাত দিতে লাগিল! কিন্তু তাঁর প্রশান্ত-দৃষ্টির ভিতর দিয়া মধু ঝরিতেছিল। দুই জনে দুই জনের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। তিনিই প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ? সাধন চল্‌ছে?"

কথা কহিতে বসিলে, আজও বাঁধ মানে না। সুদীর্ঘ একটী বৎসরে সব ঘটনা অকপটে ব্যক্ত করিলাম। তিনি ধৈর্য্য-সহকারে, অতিশয় মনোযোগের সহিত সব শ্রবণ করিলেন। এক দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে তিনি চাহিয়া থাকেন, আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া ঊর্দ্ধে স্থাপন করেন; স্থির অপলক নেত্র যেন অন্তহীন সমস্যার মীমাংসায় আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

তিনি অনেক ক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন "কত দিন আছ?"

আমি বলিলাম "মাসখানেক তো বটেই—তারপর কাউন্সিল যদি দীর্ঘদিন চলে, দেড় মাসও হ'তে পারে।"

তিনি বলিলেন "রোজ আসা হবে না, পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে। তোমার বাংলায় নিরাপদেই ফিরতে হবে, সেখানেই তোমার কাজ। আজ মঙ্গলবার, আবার শুক্রবারে এস। সপ্তাহে দু'দিন, কেমন?"

আমার ইচ্ছা প্রতিদিনই আসি। কিন্তু ঘন-ঘন আসিলে, পুলিসের দৃষ্টি পড়া অসম্ভব নয়। এইজন্য তাঁর নির্দ্দেশ-মতই সায় দিলাম। যাওয়া-আসার ব্যবস্থাও হইল। বাড়ীর পশ্চাৎ-দিকে একটা এঁদো-পড়া কাটা দরজা ছিল। সেই দরজা দিয়া বাহির হইলে, একটা গলি-পথে পড়িতে হয়। সেই গলিটা এইখানেই রুদ্ধ হইয়াছে। বাড়ীর আবর্জ্জনাদি এইখানে নিক্ষেপ করা হয়। এই দিক্‌টায় পুলিসের দৃষ্টি ছিল না। এই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করিয়া, সেদিনের মত শ্রীঅরবিন্দের দর্শন শেষ হইল। কেবল বলিলাম "আপনার সে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হয়েছে, চন্দননগরে বড় সুন্দর দেখেছিলাম।" তিনি হাসিলেন। সেদিন তো জানি নাই, এই প্রবাস-বাসের দুঃখ কতখানি! বিদায় লইয়া, গোপন দ্বার দিয়াই পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। আসিবার সময়ে সৌরীন বলিলেন "কাল মধ্যাহ্নে সাধারণ উদ্যানে দেখা হবে। কথা আছে।" আমি মনে-মনেই "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় লইলাম।

'ধান ভানিতে শিবের গাজন' আরম্ভ করিয়া সম্ভবতঃ ভাল কাজ করি নাই। পণ্ডিচারীর কথা এখন অধিক করিয়া না বলাই সঙ্গত। একদিন এই সম্বন্ধে হয়ত ভাল করিয়া বলিতে হইবে, তবে এই প্রসঙ্গে নহে; এইজন্যই সংক্ষেপে ইহা শেষ করি।

প্রায় দেড় মাস কাল পণ্ডিচারীতে থাকিয়া, সপ্তাহে দুই বার মাত্র, রাত্রিতে দুই তিন ঘণ্টা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়া অন্তর ও বাহির অনেকটা মিলাইয়া লইলাম। অন্তর-সাধনার সহিত ক্রিয়াযোগের সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্য চরিত্রকে কতখানি শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মেই বুঝিলাম। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সব সময়েই ভাবিতাম—জীবনের কোথাও তো বন্ধনের লেশ নাই, আমার ভাবনা কি? কিন্তু দেখিতাম—হৃদয়ের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে এক জনের আসক্তি এমনই

নিবিড়ভাবে জড়াইয়া আছে যে, আত্মদানের চরম কথা স্মরণ করিলেই সবখানি মোচড় দিয়া উঠে।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষায় ও সাধনায়, আমার আজন্মের সঙ্কল্প স্থির অটুট হইয়াছিল, জীবনের প্রতি রক্তবিন্দু ভগবানের কাজে ঢালিয়া যাওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু বিসর্জ্জনের উৎসব ম্লান হইয়া পড়ে, যখনই মনের মধ্যে একজনের পূর্ণ-নির্ভরতার অমল-শ্রী ফুটিয়া উঠে। আপনার সব কিছু উৎসর্গ করিতে এক মুহূর্ত্তও চিত্ত বিচলিত হয় না; কিন্তু জীবনের ঐশ্বর্য্য অথবা বন্ধন যাহাই হউক না, এই বস্তুটিই আমার সাধনপথে বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া উঠিল।

সাধনার আবর্ত্তে আপনার সব কিছু নিঃশেষে ঢালিয়া, অন্তরের প্রলয়-মেঘ যেন ঘনাইয়া তুলিয়াছিলাম। বিদ্যা, ধন, মান, খ্যাতি—এই সকল বালাই আমার ছিল না: জীবনের সঙ্গে একটা নারীর প্রাণ এমনই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল, যাহা টানাটানি করিতে গেলেই বন্ধন-গ্রন্থি আরও জলটিতর করিয়াই ফেলি। ইহা হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যখন উন্মাদ হইয়াছি, ঠিক সেই সময়ে 'তাঁর' হাতের লেখা এক-টুকরা চিঠি আমার হস্তগত হইল।

তাঁর মুখে যেমন কথা ছিল না, তেমনি যেটুকু বিদ্যা তিনি শিখিয়াছিলেন, সেটুকু প্রাণের বড দায় না হইলে কোন কালে ব্যবহারও করিতেন না। আমার সহিত কারও সম্মুখে কথা বলিতে হইলে তিনি লজ্জায় মরিয়া যাইতেন, পত্র ব্যবহার করা তো দূরের কথা। চিঠি পোষ্টবক্সে ফেলিতে দেওয়ার সঙ্কোচে, চিঠির পর চিঠি লিখিয়া তিনি নিজের কাছেই জমা করিয়া রাখিতেন। এই দেড মাসের মধ্যে শক্ত আটায় যোড়া পত্রখানির মধ্যে সসঙ্কোচে গোটা আট লাইন তাঁর হাতের লেখাটী পাইয়া ভাবিলাম—বেদনার সহিত লজ্জার শিহরণে অক্ষরগুলি এখনও বুঝি কাঁপিতেছে—কালির আঁকরগুলিও মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট ও যেন চক্ষের জলে অভিষিক্ত হইয়া তাঁর অন্তরের অব্যক্ত মর্ম্মবেদনা অলক্ষ্যপথেই আমার বুকে ছোঁয়াইয়া দিতে চায়—সে কাতর-করুণ মিনতি-পত্র আজও ভুলি নাই। 'তাঁর এই ক্ষুদ্র জীবনটুকুর মাঝে আমার সাধনার মোহ যেন অনর্থক একটা দাঁড়ি টানিয়া না বসে, কোথাও তিনি বাধা সৃষ্টি করিবেন না। পৃথিবীতে তাঁর

আশ্রয় নাই; এ আশ্রয় যদি ভাঙ্গে, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর জীবনও শেষ হইবে'—এমনই প্রার্থনার সঙ্গীত পত্রটুকুতে ছিল।

আমি কয়েক বার চিঠিখানি পড়িয়া নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম—অপরিত্যজ্য এই সম্বন্ধ; কিন্তু সাধনার পথে ইহা যদি অন্তরায় হয়, তবে নির্ম্মম হইয়াই তাহাকেও ত্যাগ করিতে হইবে। মাথার উপর যে বিজ্ঞানঘন নব চেতনা ঘনাইয়া উঠে, তাহা শরতের মেঘের মত গর্জ্জন করিয়াই শেষ হয়, জয়লাভ করে হৃদয়ের ধর্ম্ম—আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল।

দ্বন্দ্ব-সৃষ্টি মনেরই ছলনা। সত্যের বিধান মানুষের বিচার-বিশ্লেষণে লঘু হইয়া পড়ে না, অন্তর্হিত হয় না। সাধনার অহঙ্কারে মনে হয় একটা অসাধারণ কিছু করা চাই। তাহা না হইলে, সাধনার মর্য্যাদাবোধ হয় না। মোহ আসক্তির ভিতরেও যেমন সজীব থাকে, নিরাসক্ত জীবনকেও যে উহা তদ্রূপ ছাড়িয়া যায় না, তাহা জানি, আসলে ঈশ্বরের ইচ্ছাই যেখানে জয়যুক্ত হয়, আনন্দ ও শান্তি সেইখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ছাড়িতে যখন যাহা চাহিয়াছি, তখন তাহা অপরিত্যজ্য হইয়াছে; ছাড়িতে হইলে জীবনের অর্দ্ধেকখানি যখন খসিয়া পড়ে বলিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছি, তখনই তাহা শেষ হইয়াছে—অলক্ষ্যে অট্টহাস্যে নিয়তির এই পরিহাস মানুষের দুর্ব্বুদ্ধিরই প্রতি ধিক্কার। আজ স্তব্ধ, মৌন হইয়া ভাবি—সর্ব্বস্ব-হারা হওয়ার জন্য আমায় তো কিছু করিতে হইল না!

বিধাতার তৃতীয় হস্তের বজ্রও যেমন মাথা পাতিয়া লইতে হয়, তাঁর আশীর্ব্বাদের অমৃত-বর্ষণও তেমনি একই ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। সেইজন্য যে সকল অবস্থার ভিতর এই অপার্থিব আলিঙ্গনের অনুভূতিতে পাগল হইয়া "যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ"—এইরূপ একটা বিপরীত, অসাধারণ জীবনের ছন্দে জাগে ও ঘুমায়, প্রকাশে ও অপ্রকাশে অপ্রাকৃত অখণ্ড প্রেমের ধারা তারই বুক অবিরত ভরাইয়া রাখে।

বুদ্ধি সেদিন এতখানি পাকে নাই। সাধনার পথে বিঘ্নস্বরূপ এই প্রাকৃত সম্বন্ধের বন্ধন না ছিঁড়িলে, বুঝি ভগবানের পথে পা বাড়ান কপটতা—আমার এইরূপই যেন মনে হইত। প্রতি পদে মানুষের দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে, যদি ভগবানের করুণা মানুষকে সতত জিয়াইয়া না রাখে। অনুকূল-প্রতিকূল

দুই রূপেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তাঁর সন্তানকে শ্রেয়ের পথে শনৈঃ-শনৈঃ আগাইয়া লয়।

শ্রীঅরবিন্দের কাছে বিষণ্নমুখে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করিলাম। তিনি খুব গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "তোমার স্ত্রী সাধনের বিঘ্ন হইবে না, বরং সাহায্য করিবে; তোমার ভয় নাই।" হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম—যদি তিনি বিপরীত বলিতেন, সেইদিনই ফাঁদে পড়িতাম। মানুষের সকল ভাব ও বৃত্তি স্বভাব-বৃন্তে গাছের ফলেরই মত ঝুলে, পাকিলেই খসিয়া পড়ে; কাঁচায় ছিঁড়িলে, অপরিণত অবস্থার পরিণাম বিষময় হয়।

পণ্ডিচারী-বাসের মধ্যে সাধনার মর্ম্ম ভাল করিয়াই বুঝিলাম। বিদায়ের সময়ে মন্ত্রের বোঝা নামাইয়া দিলাম, তাহা যেন গতির পথে বন্ধন-স্বরূপ বোধ হইতেছিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন "মন্ত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে।" আজ নিজের মনেই হাসি—আমার মত স্বেচ্ছাচারীকে অনুকূল স্রোতে ভাসিতে না দিলে, আজ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতাম কে জানে! সকলের প্রকৃতি-স্বভাব সমান নয়—কোথাও স্বেচ্ছাচার নিম্নগামী করে, কোথাও বা আপনার ইচ্ছার মধ্যেই ভাগবত-প্রেরণা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, অহঙ্কারের শিকড় অতর্কিতে ক্ষয় করিতে-করিতে একদিন ভগবানের জয়েই জীবন ভরাইয়া তুলে। সাধনা আমার নহে, ভগবানের: দয়া মানুষের চেয়ে ভগবানেরই অধিক। এ তরীর কর্ণধার তিনি ভিন্ন আর কে হইবে! জীবন সত্য হইতেই সত্যে ছুটিয়াছে, সংশয় তাই একদিনও আমায় আচ্ছন্ন করে নাই।

বিদায়ের অশ্রুতে চরণ সিক্ত করিয়া, শ্রীঅরবিন্দের দিকে চাহিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলাম। দুই হস্ত মাথার উপর রাখিয়া, তিনি তাঁর সবখানি যেন উজাড় করিয়া দিলেন। প্রেমে হৃদয় উপছাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তটুকু স্বর্গের; মৃত্যুচিহ্নিত মর্ত্ত্যের কবল হইতে ইহা ভিন্ন হইয়া আমায় অমৃতসিক্ত করিয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ আমার অজ্ঞাতে সাধনার নির্দ্দেশ লিখিয়াছিলেন; বিদায়ের কালে এক তাড়া টাইপ-করা কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া তিনি বলিলেন "মন্ত্র আর না জপ, ইহার মধ্যে যে সাধনার নির্দ্দেশ দিয়াছি, তাহাই

তোমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে।" অযাচিত করুণা! ভূয়সী প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় লইলাম। ইহার পূর্ব্বেও তিনি সাধনার সঙ্কেত দিতে কয়েক পরিচ্ছেদ 'যোগ' সম্বন্ধে লেখা দিয়াছিলেন। এই দুইটী সাধন-নির্দ্দেশ "Yogic Sadhan" ও "Yoga and its Object" নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে।[১]

পথে বাহির হইয়া একটি ক্ষুদ্র বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। পণ্ডিচারী হইতে রামেশ্বর-তীর্থ ঘুরিয়া যাওয়া স্থির হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে চন্দননগরের দুইটী ছাত্র—যাহারা পণ্ডিচারীতে শিক্ষার জন্য ছিল, তাহারাও সঙ্গী হইয়াছিল। ফরাসী সীমা অতিক্রম করিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে পৌঁছিবামাত্র, এই ছাত্র দুইটি পুলিস-কর্ত্তৃক ধৃত হইল।[২] আমাদের দ্রব্যাদিও তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়া, শ্রীঅরবিন্দের লেখা কাগজগুলি পুলিস হস্তগত করিয়া বলিল "ইহার মধ্যে যদি রাজদ্রোহমূলক কিছু না থাকে, তবে ফেরৎ পাইবেন এবং আপনাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।" এই ঘটনায়, এই দুইজন ছাত্রের অভিভাবক-স্বরূপ আমি ও আমার উকিল-বন্ধু ইহার একটা সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গেই থাকিয়া গেলাম। কাঙালোরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছাত্র দুইটিকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখিলেন। শ্রীঅরবিন্দের লেখাগুলি ফেরৎ পাইলাম। বৃথা চেষ্টায় কাজ হইবে না বুঝিয়া, ব্যাপারটা পণ্ডিচারীর গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিয়া, আমরা যথাস্থানে প্রস্থান করিলাম।

পথের এই বিপদের কথা বাড়ীতে জানাই নাই। রামেশ্বর দর্শন করিয়া একদিন অকস্মাৎ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাড়ীতে আমার স্ত্রী তখন ছিলেন না। প্রথমে মনে হইল—বোধহয় পিত্রালয়ে গিয়াছেন; কেন-না, এই অশান্তিপূর্ণ সংসারে আমি থাকিতেই গোলমাল হয়, আমার অনুপস্থিতিতে হয় তো একটা কাণ্ড বাধিয়া থাকিবে। তাঁর কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না; স্নানাহার শেষ করিয়া ঘরে বিশ্রাম করিতে শয্যাগ্রহণ করিলাম।

১। পরে এই দুইখানি ইংরাজী পুস্তকের বাংলায় মর্ম্মানুবাদ করিয়া লেখক (সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল) যথাক্রমে 'যৌগিক সাধন' ও 'লীলা' নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

২। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ।

অনতিবিলম্বেই তিনি যে মূর্ত্তি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাহা এখনও আমার বুকে আঁকিয়া আছে, বুঝি সে মূর্ত্তি কোনদিন ভুলিব না। আমার আগমন-সংবাদ তিনিও জানিতে পারেন নাই; স্বচ্ছন্দ মনে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমায় দেখিবামাত্র তাঁর চক্ষুদ্বয় সমুজ্জ্বল হইল। মাথায় লালপেড়ে গরদের শাড়ীর কিয়দংশ তিনি টানিয়া দিলেন; কিন্তু আকুঞ্চিত, ভ্রমর-কৃষ্ণ নিবিড় কেশপাশ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়াই রহিল—শোভার সীমা রহিল না। ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুরের টিপ্, সীমন্তে বিস্তৃত সিন্দুর-রেখা। তিনি সহাস্তে বলিলেন "একবার উঠে ব'স। আজ আসা হবে, জানাতে নেই বুঝি।" তাঁর কাছেই শিখিয়াছিলাম শায়িত ব্যক্তিকে প্রণাম করিতে নাই, অকল্যাণ হয়। আমি উঠিয়া বসিতেই, তিনি প্রণাম করিয়া বলিলেন "আজ বাড়ী এসে দেখতে পাওনি বলে' ভেব না রোজই ঘুরে' বেড়াই—বাড়ীর বাইরে এই আজই পা বাড়িয়েছি!"

আমি হাসিয়া বলিলাম "আমি এমন কথা মনেই ভাবিনি। ঠাকুর-ঘরের সাড়া নেওয়ার কালে, কলা না খাওয়ার অঙ্গীকার বরং সন্দেহ সৃষ্টি করে—তবে তোমার উপর আমার সন্দেহ নেই।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "সে আমি জানি। উঃ! এক মাস, দেড় মাস যেন একটা যুগ, দিন আর কাটে না! ননদ বল্‌লে, সর্ব্বদা মন গুমরে' বসে থেকে' পাগল হবি—চল, পৌষ-কালী দেখে' আসি, মনের কালি মুছে যাবে।"

আমি জানিতাম—মুলাযোড়ে ঠাকুরবাড়ীর যে কালী-মন্দির, তাহা এই অঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ। পৌষ মাসে পুরনারীবর্গ কালীদর্শনে পুণ্যসঞ্চয় করিতে বাহির হয়। প্রবাদ—পৌষ মাসে কালীদর্শন করিলে মনের কালি ঘুচিয়া যায়। আমি শুনিয়া হাসিলাম।

কথা অনেক ছিল কিন্তু তিনি চিরদিনই একটা দিকে খুবই দৃষ্টি রাখিতেন—আমার শরীরের দিকটা তিনি বড় করিয়া দেখিতেন। বাল্যকালে পিতামাতা যেমন করিয়া পুত্র-কন্যার শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখে, আমার যৌবন-যুগে তেমনি তাঁর দৃষ্টি আমায় সতত রক্ষা করিত। নিজের সুবিধা-অসুবিধা তিনি দেখিতেন না; কেমন করিলে আমি সুস্থ থাকি, ইহাই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল।

গাড়ীতে অনেক কষ্ট হইয়াছে। চারি দিন নিরন্তর গাড়ীতে থাকিয়া কত ক্লেশ পাইয়াছি, এই কথা ভাবিয়া তিনি বলিলেন "মাগো, এই চারদিন নাওয়া-খাওয়া নেই, কেবল হড-হড় গড়-গড় করে' গাড়ীতে দিন-রাত কেটেছে! ভাল করে' খেয়েছ তো! আমারও কপাল, আজ গেলুম পৌষ-কালী দেখতে!"—এইরূপ বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে-দিতে ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময়ে তিনি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করিয়া আবার বলিয়া গেলেন "আর কথা কয়ো না, কেউ এলে যেন উঠ না, একটু ঘুমোও, সুস্থ হও।"

ঈশ্বরের করুণাই তাঁর অলৌকিক-সৃষ্টির ভিতর দিয়া সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়ে; তাহা না হইলে জাবনের কি উপায় হইত, কে জানে! এ করুণা-লাভ যে ভাগ্যবিশেষেই হয়, তা' নয়; সচেতন যে, সেই ইহার মর্ম্ম বুঝিবে; অন্যে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিবে, অমৃত পাইয়াও বঞ্চিত থাকিবে। সুধাময়ী পত্নীর অপার্থিব স্নেহানুরাগের বিনিময় ছিল না; কোনদিন ইহার হিসাব খতাইয়া দেখি নাই, প্রাপ্য-বোধেই গ্রহণ করিয়াছি। আজও এই অনুরাগের ঝরণাধারায় মাথা পাতিয়া বসিয়া আছি। দেহান্তরে যদি সব ফুরাইত, তবে অলক্ষ্য হইতে সেই চিরপরিচিত স্নেহ-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হই নাই কেন; বরং আরও অধিক করিয়াই সে অমিয়-ধারায় ডুবিয়া আছি।

সংসারের কাজ পূর্ব্ব হইতেই ছাড়িয়া যাইতেছিল; কিন্তু আমি যাহা করি, সেইটুকুই হয়, বাকী সবই অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ফলে দুরবস্থার মাত্রা বাড়িয়া যায়; কিন্তু সেদিকে আর দৃষ্টি দিতে পারি না। ইহাতে আমিই অধিক করিয়া জড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। দায়িত্ব আমার উপরেই ছিল; এই হেতু দেনা-পাওনার বোঝা ক্রমেই মাথার উপর চাপিতে লাগিল। প্রতিকারের উপায় নাই। যে দিন যায়, সেইদিনই ভাল—এই অবস্থায় দিন কাটিতে লাগিল।

সংসার ব্যতীত যে কর্ম্মের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহা সহজ কাজ নয়। দিবারাত্রি এক হইয়া গেল। এই সময়ে পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া আমার এক পা অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না। পূর্ব্বে কলিকাতায় বাহির হইলে পুলিসের দৃষ্টি সঙ্গে-সঙ্গে থাকিত; এখন বাড়ীর অদূরেই উহারা ঘাঁটি বসাইয়া দিল। ব্যাপার খুবই গুরুতর হইয়া উঠিল। সারাদিন আর বাড়ী হইতে বাহির হই না। ব্যবসা সম্বন্ধে যতটা-সম্ভবপর কাজ ভিতর

হইতেই সারিয়া দিই, আমার অগ্রজ ও ভ্রাতুষ্পুত্র যথাসাধ্য তাহা পালন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যে গুণ থাকিলে স্বাধীন ব্যবসা পরিচালন করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা ইঁহাদের ছিল না। কাজেই ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল।

অন্য দিকে, কাজের ভীড়ে জীবন অবকাশহীন হইয়া পড়িল। দিবাভাগে প্রাণপণে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার ও ব্যবসাটুকু রক্ষা করার নিদারুণ পরিশ্রম, আর রাত্রিতে বিনিদ্রাবস্থা—ইহার উপর স্বদেশী-যুগে যে সকল তরুণ আমায় ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, তাহাদের প্রাণে শ্রীঅরবিন্দের সাধন-প্রবাহ ঢালিয়া দেওয়ার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প আমায় পাগল করিয়াছিল। আত্মসমর্পণযোগের মর্ম্ম নিজেও যেমন উপলব্ধি করিতেছিলাম, আমার সঙ্গীদের মর্ম্মেও তাহা অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিবার অনুপ্রেরণা তেমনি বাড়িয়াই উঠিতেছিল।

শরীরের দিকে লক্ষ্য ছিল না। তবুও যে স্বাস্থ্য অটুট ছিল, তাহার একমাত্র কারণ—আমার অবস্থা বুঝিয়া 'তিনি' অন্তরালে থাকিয়া বাহিরের ব্যবস্থায় যতটুকু না হউক, অন্তরের অবদানে আমায় ভরাইয়া তুলিতেছিলেন। শান্তি ও আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ রাখিতে তাঁর প্রাণময়ী চেষ্টার কথা মনে হইলে, আজও আমি আকুল হইয়া উঠি।

সারা রাত্রি বাহিরের ঘরে বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনা যতক্ষণ চলিতে থাকে, ততক্ষণ তিনিও কাণ পাতিয়া আড়ালে বসিয়া থাকেন; যখন কলরব বন্ধ হয়, তখন ধীর নিঃশব্দ পদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বলেন "বাপ্-রে এত কথা, আর এত লোক তোমার কাছে আসে। ওদের কি বল না; সারা রাত্রি জেগে কাল সারা দিন ঘুমোবে। তোমায় যে রাত পোহালেই অসুরের মত খাটতে হবে। এস, আর বসে' ভেব' না, এখনও রাত আছে, ঘুমোবে।"

এই সময়ে আমার পশ্চাৎ এমনই একজনের জাগ্রৎ হৃদয় যদি পাহারায় না থাকিত, আমি সত্যই নিশ্চিহ্ন হইতাম। বকিয়া-বকিয়া মাথা গরম হইয়া যাইত, আমি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতাম। তিনি মাথায় পাখার বাতাস করিতেন, নতুবা পদতলে সরিষার তৈল দিয়া আমার স্নায়ু স্নিগ্ধ করিতেন—তখন আমি অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িতাম। কোনদিন কি

ভাবিয়াছি—যিনি আমার দিকে চাহিয়া দিবারাত্রি উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হৃদয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেন, তাঁর অবস্থা কিরূপ চলিতেছে! পূর্ব্বে বরং সে অবসর একটুও ছিল, কিন্তু এই সময়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখাও সম্ভবপর হইত না। একান্ত অবসর হইলে, যখন দুইজনে মুখোমুখী হইয়া বসিতাম, শিহরিয়া উঠিতাম—এ কি শরীর হইতেছে, এই শীর্ণ কলেবর আমার অত্যাচার সহিয়া কোনদিন বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে! মুখেই সহানুভূতির কথা বাহির হইত, কার্য্যে কিছু করাব উপায় ছিল না, তিনি তাহা বোধহয় চাহিতেনও না—আমার অন্তরের তলে যে অজানা প্রেমের ধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইত, বোধহয় তাহাতেই ডুব দিয়া তিনি স্নিগ্ধ বিমল অন্তঃকরণে আমার সঙ্গে ছায়াব ন্যায় ঘুরিতেন।

দিবাভাগে কোথাও যাওয়া সম্ভবপর ছিল না; কিন্তু রাত্রিতে জরুরী কাজে বাহির হইতে বাধ্য হইতাম, রাতারাতিই কাজ সারিয়া ফিরিতে হইত। দিবাভাগে বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকিলে, আত্মীয়-স্বজনের অপেক্ষা যাঁহারা পল্লীমুখে পাহারায় আছেন, তাঁহাদেব সংশয়দৃষ্টিতে পড়িব—এই হেতু, এক রাত্রিতেই আমায় অনেক অসাধ্য কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে হইত। প্রতি সপ্তাহে এইরূপ দুই-তিন বাত্রি নৌকাপথে, বাইসিকেলে, গাড়ীতে নানা ভাবে বহু দূর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে বাহিব হইতাম। এই সময়টুকু তাঁর উৎকণ্ঠার সীমা থাকিত না। কত বিনিদ্র রজনী তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কথা তো একপ্রকার বন্ধই হইয়াছিল, ক্রমে রাত্রিকালেও তাঁর সঙ্গে দেখা-শুনা প্রায় বন্ধই হইল। দিবাভাগে নানা কার্য্যে সাহায্য লইতেই যেটুকু সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন, তাহা ব্যতীত তাঁর সহিত যেন আমার বিশেষ আর সম্পর্ক রহিল না; কিন্তু আশ্চর্য্য, বাহিরের কাজে তিনি যতই দূরে পড়ুন না, বাহিরের সম্বন্ধ হইতে যতই তিনি বিযুক্ত হউন না, অন্তরের মণিকোটায় পরিচয়ের প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়াই উঠিতেছিল। একবার যদি উভয়ের চক্ষুর্বিনিময় হইত, তবে উভয়ে এক নিমেষেই ভাবিয়া লইতাম—কত নিকট সম্বন্ধ আমাদের, একই হিয়া যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র আকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

১৯১২।১৩ খৃষ্টাব্দ এমন করিয়াই শেষ হইল। সংসারের অর্থাভাব ক্রমে এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে আর ইহার রক্ষা হয় না।

কিন্তু দিন যায়, অভাবের হাহাকার বুকে বহিয়াই চলে; প্রতিকারের ব্যবস্থায় লক্ষ্য রাখার কোন সুবিধাই হয় না।

এই সময়ে আর এক দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিল। পণ্ডিচারী হইতেই শুনিয়াছিলাম—শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারীবাসের পক্ষে যে প্রয়োজন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা হইলেও উহা স্থায়ী হয় নাই; নিজের এই অর্থসঙ্কটের উপর সে ভারও কাঁধের উপর চাপিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে এমন খবরও আসিয়াছে—"The situation just now is that we have Re. ¼ or so in hand." সে যে কি উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা, তাহা আজ বুঝাইয়া বলা যায় না! সে যুগে শ্রীঅরবিন্দের নাম করিতে মানুষ ভয় পায়, আমার নিজের পিছনেও সর্ব্বদা পুলিস-প্রহরী; কিন্তু এই ভার বহিয়াই পা দুটা শক্ত হইয়া উঠিল। সেই দিনই শিখিলাম—আমার অভাবই কেবল গণনার মধ্যে রাখিলে চলিবে না, শ্রীঅরবিন্দের অভাবটাও নিজের করিয়া লইতে হইবে। আজ যে একটা বিরাট্ দায়ভার মাথায় বহিয়া, অসংখ্য অন্তরায় ও অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া, এক অখণ্ড অধ্যাত্মপরিবার গড়িয়া তোলার স্বপ্ন সার্থক হইতেছে, ইহা সেদিনের কঠোর সাধনেরই ফল বলিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দের অভাব নিজের অভাব বলিয়া মাথায় তুলিয়া লওয়ার অধিকারই ছিল আমার সেদিনের সাধনা; সেই সাধনার সিদ্ধি-রূপেই আজ অর্থকে ধর্ম্মাঙ্গ করিয়া লওয়ার দাবী করি। অর্থের রূপান্তরিত বিনিয়োগে ভাগবত ধর্ম্ম সিদ্ধ করার যে নীতি, তাহা সেদিনের সেই কঠিন দায়িত্বের ভিতর দিয়াই রূপ লইতেছিল। সহজ স্বভাবঘটনা আশ্রয় করিয়াই, ভবিষ্যৎকে পূর্ণাঙ্গ করার মহতী ভগবদিচ্ছা সেদিন কি নিগূঢ় ছলে এই অপূর্ব্ব বিধান সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আজ ভাবিয়াও তৃপ্তি পাই।

শ্রীঅরবিন্দের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে—এই ছিল আমার প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশ। সংসার-খরচ, ব্যবসার পুঁজি, স্ত্রীর অলঙ্কার, ঋণ—যে কোন উপায়েই অর্থ হস্তগত হউক না, তাঁর সমগ্র ব্যয়ের প্রবাহে তাহা ঢালিয়া দিয়া কৃতার্থ হইতাম। এই সব কথার অবতারণা এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক; কেবল উল্লেখ করিবার কারণ—আমাদের দুই জনকে আত্মস্বার্থের সীমা হইতে উঠাইয়া লওয়ার

অপার্থিব করুণাই তখন এই লীলা প্রকটিত করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের এই কথা কয়টা এখনও মর্ম্মে বিঁধিয়া আছে, "...I must ask you to procure for me by will-power or any other power in heaven or on earth..........."

—সে যে কি উন্মাদনা, তাহা আজ ভাষায় ব্যক্ত হয় না! তাঁর তাৎকালীন সামান্য অভাব, কিন্তু সেইটুকু পূরণ করাই ছিল তখন মহাসিদ্ধির লক্ষণ। ক্ষুদ্রকে আশ্রয় করিয়া মহতী সৃষ্টি কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, সে ছন্দ নিজেও যেমন অনুভব করিয়াছি, যিনি ছায়ার ন্যায় সকল কর্ম্মের সঙ্গিনী, পরামর্শদাত্রী ছিলেন, তিনিও তাহার আস্বাদে, ভিখারীর পাশে ভিখারিণীর মতই দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। টাকার হিসাব রাখা তখন সম্ভবপর নয়; মাথার উপর বিরাট্ সংসার চাপিয়া বসিয়াছে। বাধা যতই থাকুক, চিন্তার ভার যতই গুরুতর হউক, সময়ে-সময়ে একেবারে নিরাশও হইয়াছি; কিন্তু আসন্নকালে দুই কূল উপ্‌চাইয়া কোথা হইতে যে সব পূরণ হইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আজও বিস্মিত হই। ভগবানের উপর যথার্থ নির্ভরতার সাধনা যেখানেই সত্য, সেইখানে মানুষের ধারণাতীত ভগবানের সুনিয়ন্ত্রিত বিধান কার্য্যকর হয়। মানুষের হিসাবের বাহিরে ভগবানের যে নির্ভুল অঙ্ক, তাহা এমনই অকাট্য এবং সঠিক উপায়ে তাঁর নিগূঢ় উদ্দেশ্যকে নিখুঁতভাবে পূরণ করিয়া তুলে। সেই মহান্ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যদি মিশিয়া থাকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি, তাহাই শুধু হাহাকার করে, এবং তখনই অন্তর্দৃষ্টির নির্ভুল কষ্টিপাথরে কোথায় আত্ম-স্বার্থের মিশ্রণ, তাহা কষিয়া বাহির করা সম্ভবপর হয়। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র সংসারের হিসাব-নিকাশ লইয়া যেমন দুই জনে ব্যস্ত থাকিতাম, এই সময়ে কেবল আমার ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনযাপনের ব্যবস্থায় নয়, সারা দেশটার হিতাহিত-চিন্তায় আমরা তন্ময় হইয়া পড়িলাম। কোথায় উঞ্ছকাম-চরিতার্থতার আকর্ষণ! বৃহতের মাঝে ক্ষুদ্রত্বের বিসর্জ্জনে, নারী-পুরুষের মাঝে যে অমর সম্বন্ধ, তাহার অমৃতময় আস্বাদ নিজে সম্ভোগ করিয়াছি বলিয়াই তো আজ অভিনব জীবনধারায় অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে আকুল হইয়াছি।

যখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছি, তখন তিনি তাঁর সর্ব্বশেষ হাতের রুলী-গাছটি খুলিয়া আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন—তাহা কি ভুলিবার! তাঁর চাওয়া বলিয়া দ্বিতীয় বস্তু ছিল না; কিন্তু কি সে চাওয়া, যাহা ব্যক্ত করিতে পারি না, যাহা অনির্ব্বচনীয়, যে বস্তুর আকর্ষণে নারী নারীত্বের দাবী হাসিমুখে ছাড়িয়া দেয়, আর কোথায় সেই অপূর্ব্ব স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ, যেখানে জীবনের দায় লইয়া দ্বন্দ্ব নহে, শুভ্র চেতনা-যুগলের মিলন-রসে বিভোর হইয়া যুগলে-যুগলে চলিয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাই সার্থক করিতে—এই নব-গৃহ-রচনায় কোথায় তাঁর আশীর্ব্বাদ মূর্ত্ত হইবে, সেই আশানেত্র মেলিয়াই তো চাহিয়া আছি!

এমনই করিয়া দিন আমাদের কাটিয়া যায়। আমার কাজ বাহিরে, তাঁর কাজ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকা—সে যে কত তৃপ্তি, তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না! যদি তিনি আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়াছেন, তখনই প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অভাবের ছায়া যদি ঘিরিয়া থাকে, তবে নিরলঙ্কারা সহায়হীনা করিবেন কি! কিন্তু এই বাহিরের দারিদ্র্য তো তাঁহাকে অন্তরে সম্পদ্‌হীনা করে নাই, অভাব পূরণ করার বিজয়িনী প্রেরণায় তিনি অচলা কমলার আসন পাতিয়া আমার হৃদয় পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। ভাবিয়াছি—আত্মসাধনার ছন্দে, গরিমা ও বাসনার গ্রন্থি মোচন করিতে যে কুবেরের অক্ষয়-ভাণ্ডারের প্রয়োজন, বাহ্যতঃ কপর্দ্দকহীনা হইলেও, তিনি বুঝি স্বভাবতঃ তারই যথার্থ অধিকারিণী ছিলেন।

বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিলে, উদ্দেশ্য-বিহীন বিস্ফারিত নেত্রে আমি যখন বসিয়া থাকিতাম, তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ব্যাপাব শুনিয়া স্বভাব-গম্ভীর মুখখানি তুলিয়া, আমার চক্ষের উপর চক্ষুঃ স্থাপন করিয়া অভয় দিতেন "ভয় নাই, কিছু হবে না।" কি জানি এমন অভয়-বাণী কেমন করিয়া তাঁর কণ্ঠে এমনি নিঃসঙ্কোচে বাজিয়া উঠিত। এই কথায় মনের মাঝে যে কালো মেঘ কুণ্ডলী পাকাইয়া আমায় ব্যাকুল করিত, তাহা এক নিমেষে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া অপসারিত হইত, আবার নির্ভয় অন্তরে আমি অগ্রসর হইতাম।

চারিদিক্ হইতেই কিন্তু বিপজ্জাল জড়াইয়া ধরিতেছিল। তখনকার কথা একটা যুগের ইতিহাস—কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতব্যাপী কাজের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে সব কাহিনী সুযোগ পাইলে অন্যত্র বলিব। বিপদের সম্ভাবনা শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপরই ছিল না, এক দল মানুষ লইয়া আমার চিন্তার অবধি থাকিত না—ঐ অবস্থায় সংসারের কাজকর্ম্ম একেবারেই বন্ধ হওয়ার উপক্রম করিল।

দৈন্য বাড়িয়াই চলিল। অভাবে মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়ে; আমার এই সকল ভাবনা ছিল না। তাহা ছাড়াও সংসারের ভিতর যে তুষানল ধিকি-ধিকি জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহাব উত্তাপ আমার অঙ্গে পৌঁছিত না; কেন-না, তিনি আমায় আড়াল করিয়া থাকিতেন, সকল ব্যথার আঘাত তিনিই নীরবে সহিয়া হাসিমুখে আমার কার্য্যে সহায়তা করিতেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন—কি বৃহৎ কর্ম্মভার আমাব মাথার উপর চাপিয়া বসিয়াছে। দুর্ভাবনার মাত্রা আমার একদিকের ছিল, তিনি দুইদিক্ হইতেই ঘা খাইয়াও আমার পাশে অটল পদে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

একদিন একান্ত আর্ত্ত হৃদয়ে তিনি আমার চরণতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তাঁর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের করুণ মিনতি আমায় বিচলিত করিল; কিন্তু এইদিকে এক্ষণে কাণ দিলে আমার চলিবে না। আমি নিষ্ঠুর কণ্ঠে তাঁহাকেই তিরস্কার করিয়া বলিলাম "নারীই ঘর ভাঙ্গে। তোমার চেয়ে সহোদর আমার অধিক আপনার—যদি আমার মুখ চাও, কাদায় গুণ ফেলে' থাক; নতুবা তোমার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই।"

কথা শুনিয়া তিনি বজ্রাহতা হইলেন। দীন নয়নে আমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর তিনি বলিলেন "আমি কি ঘর ভাঙ্গার জন্য এই সব কথা কাণে তুল্‌ছি, আমার আর সহ্য হয় না—কোন ব্যবস্থা না কর, গলায় পা দিয়ে' আমায় মেরে' ফেল!"

তিনি যাহা শুনাইলেন, তাহাতে আমারও সর্ব্বশরীর ক্ষোভে ও দুঃখে জ্বলিয়া যাইতেছিল। আক্রোশটা সংসারের উপর দিয়াই বহিয়া যাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা' বলিয়া একট কথা আছে —জীবনের যত বিষ এই জন্যই মাটিতে অঙ্কুর সৃষ্টি করে নাই, তিনিই সব বুক পাতিয়া নিঃশেষ করিয়াছেন। বাহিরে আমি অক্রোধ, শান্ত, ধৈর্য্যশীল

বলিয়া খ্যাতি পাইতাম ; কিন্তু ইহার বিপরীত স্বভাব চতুর্গুণ হইয়া ঘরে প্রকাশ পাইত। তিনি এক-এক সময়ে এইজন্য বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন "ঘর জ্বালানী পরভালানি !" তিনি যেন বুঝিয়া লইয়াছিলেন—আমার দোষের দিক্‌টাই তাঁহাকে বহিয়া এ জীবন শেষ করিতে হইবে। তাহাই তো ঘটিল ! জীবনের যত দুর্ব্বলতা, অসংযত ব্যবহার সবই তো তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া, আজ পারে আসিয়া দাঁড়াইলাম—এ ঋণ-পরিশোধের উপায় রহিল কৈ !

কথাটা খুবই গুরুতর। আমার বাড়ীতে বসিয়া থাকা সম্বন্ধে সংসারে যে কাণাঘুষা চলিত, ক্রমে তাহা পরিজনবর্গ মুখ ফুটিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা দুই জনে সংসারের ঘাড়ে চাপিয়া খাইতেছি, এই অপবাদের সঙ্গে কারবার হইতে দুই পয়সা যে হাতাইয়া চলিয়াছি, এই দুর্নামও প্রকাশ করিতে কেহ-কেহ কুণ্ঠা করে নাই। ব্যবসা ছিল আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে, তাহার উপর আমার কোনও অধিকার ছিল না ; ইহার জন্য ভাবনাও করি নাই। জীবনের প্রয়োজন এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল—দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন আর দুই জনের লজ্জানিবারণের কয়েকখানি বস্ত্র হইলেই আমাদের দিন চলিয়া যাইবে। কলিকাতা যাওয়া বন্ধ হইলেও, বাড়ীতে বসিয়া যাহা করি, তাহার মূল্য কি ইহার জন্য যথেষ্ট নহে ! কথাটা শুনিয়া এক মুহূর্ত্তে এই সকল চিন্তায় মাথার খুলি ভরিয়া গেল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাবধান হইয়া তাঁহাকেই ধমক দিয়া বলিলাম "এরূপ কথা যদি কখনও মুখ দিয়া বাহির হয়, তোমার মুখ দেখা বন্ধ হবে।"

তিনি কি বলিতে চাহিতেছিলেন, আমি বিকট চীৎকার করিয়া বলিলাম, "যাও, কোন কথা শুন্‌তে চাই না, আমার এই অবস্থায় তোমার দাসীবৃত্তি করে'ই এখানে পড়ে' থাক্‌তে হবে।" গলার আওয়াজ শুনিয়া বাড়ীর মেয়েরা আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা চুপি-চুপি যে কথা কহিল, তাহা যে বুঝিলাম না, তাহা নহে। আমাকে লাগাইয়া-লাগাইয়া ছোট-বৌ সংসারটা ছারেখারে দিল, এই অভিযোগেরই গুঞ্জন উঠিল। তিনি মরমে মরিয়া গেলেন, ঘরের মেঝেয় বসিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম।

তাঁহার প্রকৃতি আমি জানিতাম। তিনিও বুঝিতেন—এ পৃথিবীতে

আমি ছাড়া তাঁর মর্ম্মকথা আর কেহ জানে না। তবুও লোকের কাছে তাঁহাকে এইরূপ অপদস্থ করিতাম, কে যেন করাইত! ভাবিয়া দেখি—জগতে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতি ততক্ষণ মানুষের আকর্ষণ, যতক্ষণ সেই বস্তুর উপর দরদ থাকে; প্রাপ্ত হইলে অনাদর, ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়। যাহা পাইতে চাই, তাহার দিকেই লুব্ধ-দৃষ্টি পড়ে; পাইয়াও হারাইবার আশঙ্কা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণও কত যত্ন, কত আদর! কিন্তু যাহা কোন যুগে হারাইবে না, আদরে-অনাদরে বুকে গাঁথা থাকিবে—অত্যাচার সেইখানেই অধিক হয়। আমি তাঁহাকে পাইয়াছিলাম, এইজন্যই জীবনের সকল ব্যথা অকাতরে তাঁহার উপর চাপাইয়া দিতাম। দেওয়ার ভঙ্গিমাদোষ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ছাডা আমার আর উপায় ছিল না।

আবার যখন ঘরে গিয়াছি, সান্ত্বনা দিবার আকুলতা লইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া পুনরায় দৃষ্টি ফিরাইতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁর গম্ভীর, আনত, বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া কোন কথা কহিতে ভরসা করি নাই; বরং প্রয়োজনচ্ছলে ক্রুদ্ধতার ভানেই ধমক দিয়াছি। কথার একটা উত্তর যদি পাই, হৃদয়ের রুদ্ধ বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রেমেব বানে তাহাকে ভাসাইয়া দিই; কিন্তু সে সুযোগ তিনি আদৌ দিতেন না।

কোন ঘটনা লইয়া তিনি কোনদিন অভিমান করেন নাই; সত্য ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিলেই, তাঁর পরিতাপের সীমা থাকিত না। পদে-পদে আমিই অপরাধী হইতাম; কিন্তু কোথাও সহজে তাহা স্বীকার করিতাম না। জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যার দিক্‌টায় ভর করিয়া তাঁহাকে শাসন করিতাম। স্বামী বলিয়া তিনি নীরবে তাহা সহ্য করিতেন। কিন্তু দিনের পর দিন, এমন কি মাস অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাঁর মুখে হাসি বা কথা বাহির হইত না; আমিই শেষে নত হইয়া আত্মাপরাধ স্বীকার করিতাম। এক নিমেষে, আমাদের মধ্যে যে প্রলয়-মেঘ ঘনাইয়া থাকিত, তাহা অপসারিত হইত। সত্যটার আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি যেন পাথরের মত হৃদয় লইয়া ঘর-সংসারের সকল কাজ করিতেন। আমার প্রতি তাঁর যে অসীম মমতা, প্রয়োজন ব্যতীত তাহা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পাইত না। আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইত। সমস্যা শেষ হইলে, তিনি বলিতেন "দেখ, তুমি আমায় অকারণ অপরাধী মনে করে' কষ্ট দাও। এই যে

দিনের পর দিন তোমার দিকে মুখ তুলে' চাইতে পারি না, সংসারে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যার সঙ্গে হাসি, কথা কই, আমায় মুখ বুজে' থাকতে হয়, কষ্ট যে কি হয় তা' তুমি বুঝবে না, বুকে যেন ছুরি চলে—আমায় এমন করে' ব্যথা দিও না।"

কত সরল সত্য মর্ম্মপ্রকাশ! নিজের উপর ধিক্কার হইত। কিন্তু স্বভাব আমার এই রকম জটিল ও তির্য্যক্ যে, যাহাকে অধিক ভালবাসি, অত্যাচার তাহার উপরই করিয়া বসি। আমায় যে ভালবাসে, তার অত্যাচার কি সহিতে পারি? আজ অনেক কথাই তিনি আমায় ভাবিতে শিখাইয়াছেন।

এ ঝড়ও থামিল। নানা অছিলায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আপনার অপরাধ স্বীকার করিলাম। একটা বৃহৎ কাজ মাথায় লইয়াছি—এই অবস্থায় সংসারের দিক্ হইতে অনবরত আঘাত আসিলে, আমি যে কিরূপ অস্থির হই এবং কেন যে তাঁহাকে লাঞ্ছিতা, অপমানিতা করিয়া বসি, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইলাম। সত্য-প্রকাশ হইলেই তাঁর মুখে হাসি ফুটিত। এমন অমিশ্র জীবন আমি দেখি নাই—সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত আমার বিচিত্র জীবনের সহিত সংঘাত পদে-পদেই হইত, শেষে তাঁর সত্যতা প্রমাণিত হইলেই সব আপদ্ চুকিয়া যাইত। কত ব্যথা, কত দুঃখ তিনি পাইতেন; কিন্তু সেগুলি যেন সত্যাশ্রয়ীর সংগ্রাম-নীতিরই অঙ্গ, ইহার জন্য তিনি এক বিন্দু অনুতপ্ত হইতেন না। সত্যের জয়ই ছিল তাঁর মহাজয়। আজ হিসাব করিয়া দেখি—এতখানি জীবনের মধ্যে একটী বাণীও তাঁর মিথ্যা হয় নাই। আমি এক তিল বাড়াইয়া বলিতেছি না, সত্য দিয়াই তাঁর স্বভাব যেন গড়িয়া উঠিয়াছিল।

যাহা হউক, সংসারের উপর আমি একান্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িলাম। অন্যান্য কাজে যতই ব্যাপৃত থাকি, সংসারের আমিই এক প্রকার মেরুদণ্ড ছিলাম। দুঃখের দিনে সুখের স্বপ্ন দেখিলে অধিক দুঃখই হয়, সে শিক্ষা নিজেই লইয়াছিলাম; আমার একান্ত অনুগতা বলিয়া তিনিও ইহা মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যে তাহা গ্রহণ করে নাই, অতীতের মতই প্রাচুর্য্যময় সংসারের উপযোগী জীবনের দাবী লইয়া আমায় ব্যতিব্যস্ত করিত। হাল ছাড়িয়া দিলে ভরাডুবি হইবে, ইহা জানিতাম। তাই তাঁহাকে সকল দিক্ দেখাইয়া আবার সংসারের কাজে প্রবৃত্ত করাইলাম।

তিনি প্রফুল্ল মুখে অসংখ্য-লাঞ্ছনার ভিতর দাঁড়াইয়াই আমার কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিতেন, "দুঃখ, অপমান, দারিদ্র্য আমায় কাতর করে না; ইহার চেয়ে অধিক যন্ত্রণা হাসি-মুখেই সইতে পারি, যদি তোমার দৃষ্টিটুকু পাই। বাঁকা চোখে আমায় যখন দেখ, বুক ফেটে চোখে জল আসে—আমার কথা তুমিও বুঝবে না!"

বড সরল অম্লানমুখে তিনি এই কথাগুলি বলিতেন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে জাগতিক সম্বন্ধ, তাহা হইতে বঞ্চিতা হইয়াও, এত প্রেম, এত স্নেহ উপচাইয়া উঠে—ইহা কল্পনায় ছিল না। জগতে সুন্দর বস্তু—রূপ নয়, যৌবন নয়, ভোগবিলাস নয়—প্রেম। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিমল সম্বন্ধ—ইহাই আজ আমি ভাগবত-তত্ত্ব-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছি।

এই সময়ে আকাশে কাল-মেঘ ঘনাইয়া প্রবল বর্ষণারম্ভ হইল। দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান ভাসিয়া গেল[১]। অর্দ্ধোদয় যোগের পর দেশসেবার মহাযজ্ঞ এমন করিয়া আর দেখা যায় নাই। দলে দলে তরুণেরা দেশবাসীর সাহায্যার্থে ছুটিল। এই সুযোগে আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। বর্দ্ধমান সহরে আমাদের কেন্দ্র স্থাপিত হইল। বন্যাপীড়িত স্থানসমূহে সেবকেরা দেশবাসীর খাদ্যদ্রব্য ও অর্থ লইয়া উপস্থিত হইল। বাঙালী সেদিন মুক্তহস্ত হইয়াছিল। অর্থের হিসাব ছিল না। সৎ ও অসৎ, দুই ভাবের লোকই বন্যাপীড়িতের সাহায্যে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থের অপচয় হইতেও দেখিয়াছি; দেশবাসী সাহায্য পাইয়া কৃতার্থও হইয়াছে। প্রায় তিন মাস বর্দ্ধমান-কেন্দ্রে বসিয়া আমায় কার্য্য করিতে হয়। সংসারের সকল চিন্তা এক নিমেষেই দূর হইয়াছিল। অবসর পাইলে বাড়ী আসিতাম। আমার ব্যস্ততা দেখিয়া তিনি কিছু বলিতেন না। তিনি বৃহতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন; যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা সৎ, তাহার জন্য আমায় উদ্বুদ্ধ দেখিলে নিজের কষ্ট প্রকাশ করিতেন না। এমন কত ব্যথা আমার অজ্ঞাত থাকিয়া গিয়াছে। আমি সামান্য কারণে উত্যক্ত হইয়া উঠি দেখিয়া, তিনি সন্তর্পণে আমার মেজাজ দেখিয়া চলিতেন। বোধ হয় কোন সূত্রে আমার এই প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াই আমার

১। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ

অকৃত্রিম সুহৃৎ, অধুনা পরলোকগত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন আমার মেজাজের খবর লইতেন, তখন আমার হৃদয়ের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত! সত্যই মেজাজটা আমার ভাল নহে। বাহিরের দিকে ইহার যে প্রকাশ, তাহাই তো সবখানি নয়; আমার মন্দ দিক্‌টা সবই তিনি গ্রাস করিয়া আমায় ধন্য করিয়াছেন। বাহিরে লজ্জা, ঘৃণা, নিন্দার ভয় আছে—প্রকৃতির কষাঘাতে যে প্রবৃত্তি মাথা নীচু করিয়া থাকে, তাঁর কাছে তাহা উলঙ্গ-মূর্ত্তি লইয়াই প্রকাশ পাইয়াছে; সেইখানেই আমার সত্য স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছি এবং কোথায় কতখানি ত্রুটি, তাহা চাক্ষুষ দেখিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ করার অবকাশ পাইয়াছি। পুরুষ নারীচরিত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়ার অবকাশ না পাইলে, তাহার পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যায়।

বর্দ্ধমানে গিয়াই এক বিপদে পড়ি। বড় কাজে হাত দিতে যাই বটে, কিন্তু চিরদিন নিয়মে থাকিয়া দেহ অনিয়ম মানিতে চাহে না। সামান্য আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমার হাতে কেন্দ্রের কার্য্যভার দিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ কাঁথি চলিয়া গেলেন। বন্যার জলে মাটি ভিজা, তাহার উপর শুইয়া থাকিতে হয়। খাদ্যের মধ্যে মোটা চাউলের অন্ন, আর মশুর দাল। দুই দিনেই আমার উদরাময় হইল। তখন বর্দ্ধমানে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। সারা রাত্রি ধরিয়া পায়খানার বিরাম নাই; প্রাতঃকালে নির্জ্জীব হইয়া পড়িলাম। একজন স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে বর্দ্ধমান সহরের এক প্রান্তে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তাঁহাদের শুশ্রূষায় ও সুচিকিৎসায় সুস্থ হইলাম। শরীর কিন্তু খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। কাজের ভার লইয়া এমন করিয়া পিছাইয়া যাওয়া আমার ধাতে ছিল না। দুই দিন পরেই কেন্দ্রস্থানটী বর্দ্ধমানের টাউন হলে লইয়া গেলাম। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের ও কেন্দ্রস্থ কর্ম্মীদিগের খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করিলাম। সুব্যবস্থার ফলে কাজ ভালই চলিতে লাগিল।

অসুখের খবর পাইয়া গৃহলক্ষ্মী উৎকণ্ঠিত-ভাবে আমায় একবার বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সময় করিয়া বাড়ী ফিরিলাম, তাঁর সহিত দেখা হইল। তখনও আমার শরীর ভাল-রূপ সারে নাই; তিনি আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "দাসীর কথা শোন। যে কাজ

নিয়েছ, তার মত দেহ কই! দৌড়াদৌড়ি কাজ তোমার নয়, তুমি এক যায়গায় স্থির হয়ে বস'—আমি বল্‌ছি, তাতেই তোমার কাজ সিদ্ধ হবে।"

আমি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। জীবনের নির্দ্দেশ স্ত্রীর মুখে শুনিতে ভাল হইলেও, তাহা পালন করার মত মতি আমার নাই। আমি বলিলাম "দেহের ভাবনা তুমিই ভেবো—পা যখন বাড়িয়েছি, তখন ঘরে থাকা আর সম্ভবপর নয়। সাবধানে থেকো।"

তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন "সাম্‌নে পূজা—কাজ আর কতদিন চলবে?"

আমি ভাবিলাম—বন্যার কাজই তো সবখানি নয়, এই কেন্দ্রস্থানে বসিয়া সেদিন সমগ্র বাংলা দেশের সহিত পরিচয়ের সুবিধা হইয়াছিল। যে কাজের আরম্ভ হইয়াছিল চন্দননগরে, বর্দ্ধমানে তাহা আরও বৃহৎ আকার লইয়া গড়িয়া উঠিতেছিল; অতএব এই কর্ম্মস্রোতে কোথায় যে আমায় ভাসিয়া যাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা কি? তাঁহাকে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম "পূজার সময়ে কাজ বন্ধ থাকৃবে, তবে এখনও অনেকের গৃহনির্ম্মাণ হয়-নি—কাজ দীর্ঘদিন চল্‌বে।"

বন্যার গল্প শুনাইলাম। কেমন করিয়া জননীর মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া জীবিত শিশু জলে ভাসিয়া রক্ষা পাইয়াছে, স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করিতে গিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে—গাছে চড়িয়া অসংখ্য নারীপুরুষ কেমন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে—এমন কত সত্য-কাহিনী! তিনি অবাক্ হইয়া শুনিলেন। সর্ব্বস্বান্ত গ্রামবাসী কি ভাবে সাহায্য পাইতেছে, একে-একে জানিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন "আহা, এই তো কাজ। শরীরটা দেখো। তোমার যে সব নিয়মে চলা, খাওয়া-দাওয়ার অনেক কট্‌কিনে, আমার তাই ভয় হয়!"

আমি আবার বর্দ্ধমানে আসিলাম। একমাস কঠিন পরিশ্রমে এবং বর্ষার জল রৌদ্রতাপে শুষ্ক হইয়া সর্ব্বত্র দূষিত বাষ্প-সৃষ্টি হওয়ায়, আমার এবার হাড় ভাঙ্গিয়া জ্বর আসিল। সে কি জ্বর—একেবারে বেহুঁষ হইয়া পড়িলাম। সচেতন হইয়া দেখিলাম—নিজের শয়ন-কক্ষে। তিনি আমার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন, চক্ষুঃ মেলিতেই বলিলেন, "আঃ বাঁচালে! কি জ্বর! একেবারে বেহুঁষ। এখন একটু সুস্থ মনে হচ্ছে!"

আমার মাথা ঘুরিতেছিল, বিস্ময়ভরে বলিলাম, "কে নিয়ে এল!"

তিনি বলিলেন "এখন ওসব কথা থাক্। আমি মুখ ধুইয়ে দিচ্ছি, এক বাটি সাগু খেয়ে সুস্থ হও। খবর পরে শুনো।"

দারুণ ম্যালেরিয়ায় অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিল। জ্বর আর বারণ মানে না। এক পক্ষ-কাল এমন করিয়া একবার উঠিয়া বসি, আবার কাঁপিয়া বিছানায় পড়ি। শরীর শীর্ণ হইল। বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়া দেশ-বিখ্যাত, উহা আমায় একেবারে পাড়িয়া ফেলিল।

প্রায় এক মাস পরে অজস্র কুইনাইন খাইয়া জ্বর বন্ধ হইল; কিন্তু শরীর একেবারে অচল হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহার উপরই আবার রাত্রি-জাগরণ সুরু হইল। দিবারাত্রি লোকের গমনাগমন হইতে লাগিল, পূর্ব্বাপেক্ষা কাজের ভীড় বাড়িল বৈ কমিল না। তিনি হতভম্ভ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন; বাহিরের দিক্ হইতে করার কিছু ছিল না, তিনি অন্তরের দিক্ হইতে আমায় রক্ষা করার উপায় আবিষ্কার করিলেন। একা থাকিলেই দেখিতাম, তিনি চক্ষুঃ বুজিয়া বসিয়া আছেন। যদি জিজ্ঞাসা করিতাম, "কি ভাব?" তাহার জবাব তিনি দিতেন না। বহুদিন পরে তাহা জানাইয়া তিনি সান্ত্বনা পাইতেন।

ভোরে উঠিয়া তিনি গাহিতেন:

"মধুস্থদন, মধুসূদন, বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন,
যে জন নাম করে স্মরণ,
বিপদ্-ভয় তার থাকে কখন?"

লজ্জায় কণ্ঠ চাপিয়া বড় করুণ সুরে এই দুই ছত্র গান তাঁহাকে কতদিন গাহিতে শুনিয়াছি। তাঁর বিশুদ্ধ চরিত্রে সবই বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে ফুটিত; সত্যময়ী এই প্রার্থনা তাঁর অগ্নিদীপ্ত বিশ্বাসে অপূর্ব্ব প্রভাব সৃষ্টি করিত—আসন্ন বিপদ্ কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতাম না। তাঁর এই প্রার্থনার শক্তিই যে আমায় রক্ষা করিত, এ বিশ্বাস আমার ছিল না; কিন্তু তিনি ইহাতে এক কণা সংশয় করিতেন না। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, সমর্থনে অথবা উপেক্ষায় তাহা হইতে এক তিল বিচলিতা হইতেন না; যাহা তিনি একবার ধরিতেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বিরত হইতে দেখি নাই এবং কোন স্থলে একটি মিথ্যা আশ্রয় করিতেও তাঁহাকে দেখা যায় নাই।

ম্যালেরিয়া হইতে মুক্তি পাইতে না পাইতে স্থির হইল—আমায় পণ্ডিচারী যাইতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে, তথা হইতে ইন্দো-চায়না, এমন কি পরে অন্যত্রও যাওয়া হইতে পারে। আমার দেহ-মন শক্ত নয়; কিন্তু যেখানে কথা দিয়া ফেলি, সেখানে দুর্ব্বল দেহ-মন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিই। স্নায়ুগুলা শ্লথ হইয়া বিপ্লব সৃষ্টি করে, মনও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হয়। তবে এইরূপ কার্য্যের ভিতর দিয়াই, মানবের অস্তিত্ব যে দেহ-মন নয়, ইহারা আশ্রয় মাত্র—ইহা বস্তুতন্ত্র-ভাবেই বুঝিয়াছি।

একটু সুস্থ হইয়াই যাত্রার উদ্যোগারম্ভ হইল। আমার চিরদিনের স্বভাব—কোন জিনিষটার ভাল দিক্ দেখিয়া আশা ও উৎসাহ পাই না, খুব মন্দ দিক্টা ভাবিয়াই পা বাড়াই; যতদূর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লই, তারপর কর্ম্মক্ষেত্রে শনৈঃ-শনৈঃ অগ্রসর হই। এইজন্য সকল বিষয়ই একদিক্ দিয়া অতিরঞ্জিত হইয়া পড়ে। কর্ম্ম-সাফল্যে মানুষ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলে, একেবারেই যে ক্ষতি হয় না, তাহা বলি না; তবে ব্যর্থতায় যে নিদারুণ অবসাদে ও নৈরাশ্যে তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি যেভাবে কাজ করিতাম, তাহাতে ক্ষতির মাত্রা যতটা নির্ণয় করা থাকিত, বস্তুতঃ ক্ষতিটা সে সীমার কাছে পৌঁছিতেই পারিত না। এই হেতু প্রতিক্রিয়ায় কখনও আমার হৃদয় আহত হয় নাই। যেখানে সার্থক হইয়াছি, সেখানে জয়োল্লাসে উৎসাহ অধিক পাইয়াছি—হৃদয়কে তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া না রাখিলেও, আনন্দের বোঝা বহিতে কোথাও আমায় বেগ পাইতে হয় নাই।

এইবার জীবনের পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে, তার একটা চিত্র মনে-মনে আঁকিয়া লইলাম; তারপর সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার কাছে কথাটা পাড়িলাম। তিনি প্রসন্ন মুখে আমার কথা শুনিবার জন্য বসিলেন। শেষে সবখানি শুনিয়া, তাঁহার মুখমণ্ডলে গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ ঘনাইয়া আসিল। নির্ব্বাক্ হইয়া অধোমুখে কেবল চক্ষে অশ্রুবর্ষণ হইল। আমার বুকে খুবই ব্যথার অনুভব হইতেছিল; কিন্তু যে কাজ মাথায় তুলিয়া লইয়াছি, সে কাজের পথে হৃদয় দেখিলে চলিবে কেন? যদিও এইখানেই আমার সকল দুর্ব্বলতা জমা হইয়াছিল।

তিনি বুঝিলেন—আমি যাহা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা বারণ

মানিবে না, চক্ষের জলে হৃদয় আমার গলিবে না ; তবুও যে আমি নিষ্ঠুর নহি, তাঁর প্রতি মমতাহীন নহি, ইহা তিনি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিতেন। পুরুষ জগতে বড় কাজ করিতে আসিয়াছে ; নারীর মুখ চাহিয়া সে যদি তাহা হইতে বিরত হয়, সেরূপ কাপুরুষকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বৃহতের অভিমুখে যাত্রা করিতে দেখিলে গর্ব্বে তাঁহার হৃদয় লম্ফ দিয়া উঠিত ; এবং ইহার জন্য যে দুঃখ বরণ করিতে হইবে, তাহার জন্য তিনি সততই প্রস্তুত থাকিতেন। আমারই মত, তাঁরও হৃদয় দুর্ব্বল ছিল—এ দৌর্ব্বল্য আর অন্য কিছু নহে, একনিষ্ঠ প্রেমেরই ফল। ব্যভিচারী হৃদয় একের মুখ চাহিয়া এত যন্ত্রণা সহে না ; দুঃখের পাষাণ-ঘর্ষণে যে অমৃত উথলিয়া উঠে, তাহারা সে বস্তুর সন্ধান রাখে না।

তিনি ধীরে-ধীরে অশ্রু মোচন করিয়া, সজল রক্তাভ চক্ষে আমার পানে চাহিয়া, ফুঁপাইয়া বলিলেন "যাওয়ার দিন কি স্থির হয়ে' গেছে ?"

আমি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। একি ! একটা নিষেধ-বাক্যও কি তাঁহার মুখ হইতে বাহির হওয়া উচিত ছিল না ? আমার বীরত্ব-প্রকাশের একবিন্দু অবকাশ না দিয়া, তিনি যে আমার অপেক্ষা নিষ্ঠুর হইয়া আমার যাত্রাপথ বড় সরল-স্বচ্ছন্দ করিয়া দিলেন ! আমি তো যাইবই ; কিন্তু কত বড নির্ম্মম পুরুষ আমি, দেশের কার্য্যের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে কত বড় স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি, এইরূপ আত্মপ্রসাদ অনুভব করার সুযোগও রহিল না ! আমায় নীরব থাকিতে দেখিয়া তিনি যেন একটু সাহস পাইলেন ; মুখের উপর যে কাল ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা নিমেষে সরিয়া গেল। তিনি বলিলেন "তবে বুঝি ঠাট্টা করছ !"

অনেক সময়ে তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যের সুযোগ লইয়া আমি আমোদ উপভোগ করিতাম। তিনি ঠাট্টা বুঝিতেন না। আমি যাহা বলিতাম, তাহাই তিনি বিশ্বাস করিয়া লইতেন ; তারপর আমি যে তাঁহাকে পরিহাস করিয়াছি, ইহা শুনিয়া মুখ ভারী করিয়া বলিতেন "আমার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'র না। আমি তোমার সব কথাই সত্য বলে' নিই, তাই কষ্ট দাও।" আমার নিকট হইতেই তিনি সংশয় করিতে শিখিয়াছিলেন। অনেক আঘাত সহিয়া, কোন কথা বলিলেই তাহা সত্যই কি পরিহাস—ইহা লইয়া পরে অনর্থক মাথা ঘামাইতেন। কোন্‌টী

সত্য আর কোন্‌টী পরিহাস, শেষে তাহা তিনি অকাট্যভাবে ধরিতেন। মানুষের মর্ম্ম বুঝিতে তিনি সত্যই দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কথাটী যে আমার ঠাট্টা নয়, ইহা তিনি প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছিলেন—এইজন্য এক মুহূর্ত্তে স্থির করিয়া লইলেন তাঁহাকে কি করিতে হইবে। আমি যে উপস্থিত পণ্ডিচারী যাইব, তারপর প্রয়োজন হইলে ভারতের বাহিরেও চলিয়া যাইতে পারি এবং পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অসংখ্য বাধা-সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়, সব দিক্‌টাই তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম। তিনি অতিরঞ্জিত ভবিষ্যৎ আমলে আনিলেন না। আমার সঙ্গে থাকিয়া, আমার কথার কতটা গ্রহণযোগ্য, তাহা তিনি বুঝিতেন; এইজন্য আমিই মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হইতাম। যাহা কখন হইবে না, তাহা ভাবিয়া আমার এক অভূতপূর্ব্ব সুখ হইত: সেইটা অপরকে ভাবাইয়া সুখের মাত্রা অধিক উপভোগ করার প্রবৃত্তি থাকিত বলিয়া আমার সবখানি ভাল করিয়া গৃহীত না হইলে আমি বড় বিরক্ত হইতাম। তিনি হাসিয়া বলিতেন "যেটা এখনও দেখা যায় না, সে বিষয়টা এত বড় করে' নেওয়ার কি আছে? উপস্থিত যা' চোখে দেখ্‌ছি, সেইটাই এখন ভাবি।" তাঁর জীবনে যেন একবিন্দু কল্পনার স্থান ছিল না; সে নীরব-মৌন বিগ্রহের সবখানিই বুঝি বস্তুতন্ত্র পদার্থ দিয়া বিধাতা গঠন করিয়াছিলেন।

চক্ষের জল ফেলিতে-ফেলিতেই তিনি জিনিষপত্র সব গুছাইয়া দিলেন। আমি ভাবিলাম—এবারকার যাত্রাটার ভিতর যে চির যুগের মত বিদায়ের আভাস রহিয়াছে, যাহা এতই স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম, তাহা বুঝিয়াও, কি মর্ম্ম লইয়া তিনি আমার যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন! বাহির ভিতর তো তাঁর দুই রকম নাই; আমার মুখ না দেখিয়া যিনি এক অনুপল সময়ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তিনি কি করিয়া এমন উদ্বেগশূন্যা হইলেন—ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইলাম না।

সারা রাত্রি আর কথা হইল না: তিনি কাঁদিয়াই কাটাইলেন। তিনি খুব স্বল্পভাষিণী ছিলেন, হৃদয়ের ভাব ভাল করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। আমি তাঁহাকে এইজন্য বহু বার ভুল বুঝিয়াছি, অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তিনি আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে স্পষ্টতা আসিলে, তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন "আমার সবখানি যে তুমি, তবু

আমায় বুঝ না কেন?" এই কেন—ইহার উত্তর আজও খুঁজিয়া পাই নাই। এই যে তাঁর মহাপ্রস্থান, ইহাও কি তাঁর সেই মমতা, সেই অকৃত্রিম অনুরাগেরই লক্ষণ?

কাঁদিয়া-কাঁদিয়া চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইল। বাড়ীতে কাহাকেও এই কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছি। তাঁর মুখ হইতে কোন কথা বাহির করা সহজ ছিল না। যাহা তিনি গোপন করিতে চাহিতেন, তাহা কোন কারণে প্রকাশ পাইত না। অতি প্রত্যূষে—পরিবারবর্গ যখন নিদ্রাত্যাগ করে নাই, আমি বিদায় লইলাম। তিনি অনিমেষ নয়নে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আমার মনে হইল—আর সাক্ষাৎকার হইবে না; কিন্তু তাঁর চক্ষে তখন যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহাতে যেন স্পষ্টই লেখা ছিল—'ঈশ্বরের বিধান বাধায় নিবারিত হয় না। এ যাত্রা তোমার চির-বিদায় নহে।' অন্তরের গভীর স্থলে সান্ত্বনার ফল্গু-প্রবাহ বহিতেছিল, উপরে কিন্তু যন্ত্রণার অন্ত ছিল না—তাঁর হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

হেমন্তের প্রভাতে ঘর হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সুপ্তা গৃহস্থালী। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া সদর-দ্বারে আসিয়া, তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিলাম "ভগবান্ আছেন, ভয় নাই। ফিরি ভাল, নয় এই শেষ—মনে রেখো, আমার হৃদয় তোমার কাছেই রইল।"

তিনি নির্ব্বাত-দীপশিখার ন্যায় নীরবেই চাহিয়া রহিলেন। আমি পা আগাই, আবার ফিরিয়া চাই। দুয়ার ধরিয়া নিশ্চল প্রতিমা একদৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া আছেন। দৃষ্টির বাহির হইলাম, দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম। আমায় গোপনেই গৃহত্যাগ করিতে হইবে, তাই অন্ধকার থাকিতেই যাত্রা করিয়াছি। যে বন্ধুর সাহায্যে সহর পরিত্যাগ করিব, তাঁর বাড়ীতে গিয়া দেখি তিনি অনুপস্থিত। মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আবার ফিরিলাম। নদীপথে কিছু দূর যাইতে হইবে, এই বন্ধুর নৌকা প্রস্তুত রাখার কথা ছিল। ভাবিলাম ঘাটে হয় তো নৌকা বাঁধা আছে। ফিরিতে হইলে বাড়ীর গলি পথের সম্মুখ দিয়াই যাইতে হইবে—যথাস্থানে আসিয়া ঘুমন্ত বাড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়িল। ছবির ন্যায় তিনি যে এখনও দাঁড়াইয়া আছেন, কেহ তো তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার নাই! বেলা বাড়িলে আমার খোঁজ হইবে, তাঁহাকে লোকে নির্য্যাতন করিবে; হয় তো ভাবিবে,

তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়াই আমি গৃহত্যাগী হইয়াছি। তাঁর তো কিছু বলিবার অধিকার নাই, নীরবে তিনি সব সহিবেন; আর আমার কথা ভাবিয়া নীরবেই অশ্রুবর্ষণ করিয়া, জীবনের দিন গণিয়া যাইবেন। পা যেন চলিতেছিল না; কিন্তু জোর করিয়া গঙ্গাতটের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

অন্ধকার থাকিতে-থাকিতেই গঙ্গা পার হইয়া গাড়ী চড়িলাম। কলিকাতায় পৌঁছিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলাম। আমার সতীর্থগণ উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে, পরামর্শ সারা দিন ধরিয়াই চলিল। গোপনে যাইব, তাহার জন্য ছদ্মবেশের আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছিল; বাকী ছিল—আমার চুলটা ফিরিঙ্গিদের মত ছাঁটিয়া লওয়া। আমার যে বন্ধু এই কাজে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তিনি পরে ভারত ত্যাগ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রাসবিহারী বসু। মাদ্রাজ মেলে আমি একজন আর্দ্দালীর সঙ্গে বে-মালুম চড়িয়া বসিলাম। যাহারা আমায় চক্ষে-চক্ষে রাখিত, তাহারা সদল-বলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল; আমি তাহাদের সম্মুখ দিয়াই চলিয়া আসিলাম, কেহই আমায় চিনিল না। যিনি আর্দ্দালী সাজিয়াছিলেন, তিনি খুব চতুর লোক ছিলেন।[১] গাড়ী ছাড়ার সময় হইলে তিনি আমায় সেলাম ঠুকিয়া প্রস্থান করিলেন। আমি শূন্য-হৃদয়ে গাড়ীর গদীর উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

কখনও একা পথে বাহির হই নাই। চিরদিন হবিষ্যান্ন, নিরামিষ ভোজন করি, নিষ্ঠাবান্ গোঁড়া হিন্দুর আচার মানিয়া চলি—সাহেব-সাজে আড়ষ্ট হইয়া রাত্রি-যাপন হইল। প্রাতঃকালে চা-মাখন আসিল, আমি তাহা গ্রহণ করিলাম না; মধ্যাহ্নে বিপদ্ আরও বাড়িল। গাড়ীতে আরও দুইজন সাহেব ছিলেন, তাঁরা সামান্য পরিচয়ে কি বুঝিয়াছিলেন, জানি না; তবে আমি সহসা অ-সাহেবী কিছু করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম না। সারা দিন উপবাস করিয়া থাকারও সম্ভব নয়। সেই দুঃখের কথাই বলি—আড়াল করিয়া ভীম নাগের সন্দেশ মুঠা ভরিয়া লইলাম, আর লেভেটারীর ভিতর গিয়া এক ঘটি জল খাইয়া বাঁচি! তার পরদিন এত কষ্ট হয় নাই। গাড়ীতে আর কেহ ছিল না, স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিয়া তবে রক্ষা পাই। মাদ্রাজ

১। সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়

ষ্টেশনে আর আত্মগোপন সম্ভব হইল না; প্লেগ-ক্যাম্পে নাম-ধাম দিতে গিয়া বিপদে পড়িলাম। বাঁকা করিয়া "এম. রে" বলিয়া রেহাই পাইলাম না; ন্যাশন্যালিটী জানিতে চাহিলে, কিছুতেই মুখ দিয়া 'খ্রীষ্টান' কথাটা বাহির হইল না—আমি যে একজন হিন্দু, গর্ব্ব করিয়া তাহাই বলিলাম। ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন "আপনি বাঙালী!" আমিও ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' দিলাম। আর রক্ষা নাই, সঙ্গে-সঙ্গে ছয় জন শরীর-রক্ষক যুটিল—আমাদের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল।

একজন মাদ্রাজী বন্ধুর বাড়ী গিয়া উঠিলাম। রাজদ্রোহাপরাধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পণ্ডিচারীতে পলাইয়া আছেন; কাজেই ইনিও একজন 'পুলিস-সাস্‌পেক্ট'। সোনায় সোহাগা হইল। এই সময়ে আবার বড়লাট বাহাদুর মাদ্রাজে আসিতেছেন; অনেকে অকারণে বন্দী হইতেছেন। আমার বন্ধু বলিলেন "আপনার এ স্থান নিরাপদ্ নহে; আজ সমস্ত দিন এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে; আপনাকে এখনই অন্যত্র যাইতে হইবে।"

পুলিস-প্রহরীদের দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া বুঝিলাম—আমার পরিচয় পাইবার জন্য ইহারা অস্থির হইয়াছে। বাড়ীতে আসিয়া আমাকে মোটঘাট নামাইতে দেখিয়া বোধ হয় ইহারা স্থির করিয়াছিল—এইখানেই থাকিব; আমরা কিন্তু একটা গোপন দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার বিছানা, ট্রাঙ্ক বাহিরেই পড়িয়া রহিল; কাহারও সন্দেহ হইবে না যে, আমি প্রস্থান করিয়াছি। বন্ধু মাদ্রাজ-বীচ ষ্টেশনে আমায় এক গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন "আজ আপনার কোন খবর কেহ পাইবে না। আপনার জন্য পদস্থ কর্ম্মচারী আমার নিকট আসিলে, আজ তাহাকে ঘুরাইয়া নাকাল করিব। আপনি কাল ভোরেই নিরাপদে পণ্ডিচারীতে পৌঁছিবেন।"

অতি সংগোপনে ঠিক ভোরেই পণ্ডিচারী ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। সাহেব দেখিয়া কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। একটা পুশ্‌পুশে বসিলাম—পুশ্‌পুশওয়ালা তার ভাষায়, কোথায় যাইব, জিজ্ঞাসা করিল। আমি পূর্ব্ব বার আসিয়া গোটাকতক তামিল কথা শিখিয়াছিলাম, কোন গতিকে তাহাকে বুঝাইলাম—রু-দে-ডুপ্লেতে যাইব। সেও পুশ্‌পুশ্ লইয়া ছুটিল। কিন্তু ঠিক কোথায় গিয়া উঠিব,

স্থির করিতে পারিলাম না। সোজাসুজি শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীতে গিয়া উঠা ভাল নহে ; বিশেষতঃ, তাঁহাকে পূর্ব্বে কিছুই জানাই নাই। পুলিসের চক্ষে পড়িব, আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। অনেক ভাবিয়া, আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর ভ্রাতার কাছেই যাইব—স্থির করিলাম। তিনি এই প্রত্যূষে ভিজিতে-ভিজিতে অকস্মাৎ আমায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দূরে একটা পাতার ছাওয়া সরু বারান্দায় পুলিসের গুপ্তচর বসিয়া বাড়ীর দরজার দিকে চাহিয়া ছিল। তিনি বলিলেন "এখন করবেন কি!" আমি বলিলাম "আমি গোপনে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ী যাইব।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "সে ব্যবস্থা আগে হইলে সম্ভবপর হইত। এখন দেখিতেছেন না—ওরা সব একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; যেখানে বাহির হইবেন, ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিবে। হয় এখন এইখানেই থাকুন, বেলা হইলে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ী যাইবেন, নয় চলুন এখনই আপনাকে রাখিয়া আসি।"

আমি শেষোক্ত প্রস্তাবই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। দুইজনে ভোর-বেলায় শ্রীঅরবিন্দের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বন্ধু বিদায় লইলেন। আমি উপরে উঠিয়া যাহাকে দেখিলাম, সে মাদ্রাজী যুবক অমৃত। সে আমায় জড়াইয়া ধরিয়া, আমার সাহেবী বেশের ভূয়সী প্রশংসা করিল। শ্রীঅরবিন্দ সাড়া পাইয়া ঘুম-চক্ষেই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভূমিষ্ঠ প্রণাম সম্ভবপর হইল না, সাহেব সাজিয়াছি। তিনি আমায় দেখিয়া উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিলেন। মাথায় ছোট-বড চুল কাটার সঙ্গে আমার তরুণ বয়সের নধর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গুম্ফ-যুগলেরও বিসর্জ্জন হইয়াছিল। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "নিরাপদে এসেছ, কোথাও জানাজানি হয় নি!"

আমি মাদ্রাজ ষ্টেশনের ঘটনা শুনাইলাম। তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "এই মাটি করেছ! তোমার উদ্দেশ্য—গোপনে আসা, তার জন্য যা' প্রয়োজন তা' না করে', তোমার অহঙ্কার গণ্ডগোল পাকিয়েছে। যদি হিন্দু বলার গৌরব না ছাড়বে, তবে সাহেব সাজা কেন!"

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলাম।

প্রায় দেড় মাস পণ্ডিচারী বাস করিয়া, শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাহিরের দিক্ হইতেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। একত্র থাকায়, তিনি আমায় কতখানি

হৃদয়ের সহিত যে ভালবাসেন, তাহার অনুভবে আমি পূর্ণ হইলাম। দিবারাত্র অবিশ্রাম কত ক্রীড়া-কৌতুক, হাস্যপরিহাস, দর্শন, সাহিত্য, যোগ সম্বন্ধে সে যে কত আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, তাহা আজ ভাবিয়া স্বপ্ন মনে হয়। সেদিন তিনি শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন না; দূরে থাকিয়া তাঁহাকে "কালী" বলিতাম, কাছে গিয়া "অরো" বলিয়া চিনিলাম। সে প্রেমের পরিচয় আজ দিব না, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

টাকার কিছু ব্যবস্থা হওয়ায়, তিনি পূর্ব্ব-বাটী পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত ভাল বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। রন্ধন-কর্ম্মেও আর বন্ধুদের ব্যস্ত থাকিতে হয় না। একজন ভদ্রবংশীয়া দুঃস্থা নারী দুই বেলা রাঁধিয়া দিয়া যাইত। বিজয় নাগ তাহা দ্বিতলে আনিয়া সকলকে বণ্টন করিয়া দিতেন। আমায় লইয়া বিপদ্ হইল। পণ্ডিচারীতে রান্নার মধ্যে দুই বেলাই ভাত, মাংস ও মাছ ব্যতীত আর কিছু ছিল না; আমি নিরামিষাশী, দুই বেলাই আলু ভাতে দিয়া আহার চলিল। কষ্ট হইতেছিল। "অরো" জিজ্ঞাসা করেন "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না?" নলিনী, বিজয়, মণি হাসিয়া বলেন "মাছ-মাংস খেলে বোধ হয় আপনার জাত যাবে, কি বলেন?" "অরো" নিরপেক্ষ; কিন্তু বন্ধুদের ইচ্ছা—আমার গোঁড়ামী ভাঙ্গিয়া যাক্। আর এখানে অন্য কথা না বলিলেও এইটুকু বলিয়া রাখি—জীবনের যত সংস্কার খাদ্যে, আচারে, নীতি-ধর্ম্মে, সবই এবার জলাঞ্জলি দিলাম। দেখিতে-দেখিতে শুধু মাংসাশী হইলাম না, সেদিন তন্ত্রাচার আমার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া হাতুড়ির আঘাতে ধাতুকে পিটিয়া স্বর্ণকার যেমন অলঙ্কার প্রস্তুত করে, শ্রীঅরবিন্দ তেমনি আমার প্রকৃতিকে তপস্যার আগুনে গলাইয়া একেবারে অভিনব আকার দিতে উদ্যত হইলেন।

যাক্ সে সব কথা—মানুষ ভাগবত প্রয়োজন সিদ্ধ করে। যে ক্ষেত্রে যাহা প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ করাই তাহার কাজ, সে কাজ ষোল আনা আমার পূর্ণ হইয়াছে। এই দেড় মাসে আমি অনেক শিখিলাম, অনেক পাইলাম। সাধনা তাঁর কাছে বসিয়াই চলিল। দুই-এক ঘণ্টা নহে, রাত্রে আমাদের ঘুম ছিল না, সারা রাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটিত। মধ্যাহ্নে আহার সমাপ্ত করিয়া কত আলাপালোচনা হইত। তখনও "আর্য্যের"

ভিতর দিয়া শ্রীঅরবিন্দের বীণা ঝঙ্কার তুলে নাই; তাঁর কণ্ঠে আর তাঁর লেখনীমুখে যাহা পাইয়াছি, বুক ভরিয়া তাহা সঞ্চয় করিয়াছি। এইখানে পুরাণ, ইতিহাসের সঙ্গে জগতের রাষ্ট্রনীতি ভাল করিয়া বুঝিলাম, দেশকে চিনিলাম, দেশের নেতৃবৃন্দের পরিচয় পাইলাম। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কথাও তাঁর মুখ হইতেই শুনিলাম। তিনি বলিয়া যান, আর আমি লিখিয়া যাই—সে সব ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া যাইতেছি।[১]

পুলিসের দিক্ হইতে সন্ধান চলিতেছিল। শেষে ফরাসী পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ বাড়ীতে আসিয়া হাজির। বন্ধুগণ পরামর্শ দিলেন—পিছনের দ্বার দিয়া উপস্থিত লুকাইয়া পড়িতে। কিন্তু এ বাড়ীতে অবাঞ্ছিত কেহ আসে নাই—ইহাই সপ্রমাণ করিতে "অরো" স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আমার মুখের দিকে চাহিয়া, তিনি অতি গম্ভীরভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। তিনি পুলিস-কমিশনারকে সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন ও আমার পরিচয় দিলেন। তাঁহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন "He is my disciple." পুলিস-কমিশনার করমর্দ্দন করিয়া, ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন। আসার উদ্দেশ্য এইখানেই শেষ হইল। "অরো" গোড়ার জিনিষটা তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লইতেন ও যাহা অভ্রান্ত বোধ হইত, নিজস্ব ভাবে তাহা সিদ্ধ করিতেন। বিদেশে যাওয়ার কথায় তিনি স্পষ্টই বলিলেন "কাজ বিদেশে নয়, দেশেই বেশী, বিশেষ বাংলায়।"

বাংলাকে তিনি তখন ভারতের হৃৎপিণ্ড বলিয়া আখ্যা দিতেন; বিশেষতঃ, হুগলী জেলা জগতের তীর্থস্বরূপ বলিয়া ইহার তিনি খুব প্রশংসা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি খুব উচ্চাসন দিতেন—সে কত কথা, বলিয়া ফুরাইবে না।

তিনি কাজের মোড় ফিরাইয়া দিলেন—রাজসিক ভাবটা যেন সংহরণ করিয়া লইলেন। আমার ভিতর যত রুদ্র সংস্কার ছিল, তাহা যে কি যাদুমন্ত্রে প্রকাশ করিয়া দিন-দিন তিনি আমায় স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহা আজও ভাবিয়া তাঁর চরণে নত হইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়! দেড় মাস কেবল সাধনা; কথা নয়, বস্তুতন্ত্র জীবন দিয়া। যাহা স্বপ্নে ভাবি নাই,

১। শ্রীঅরবিন্দের বাল্যজীবনীর কতকাংশ।

কল্পনা করি নাই, তাঁর হাতের সঙ্কেতে একে-একে তাহা সিদ্ধ করিলাম। তিনি আমায় বাড়ী ফিরিতে বলিলেন।

সে সময়ে যদিও ভারত-রক্ষা আইন প্রচলিত হয় নাই, তবুও চারিদিকে ধরপাকড় আরম্ভ হইয়াছে। আমার মনে হইল—আমি পুলিস-প্রহরীদের চক্ষে যে ভাবে ধূলা দিয়াছি, তাহাতে আর কিছু না হউক, আক্রোশবশতঃ আমায় তাহারা বন্দী করিতে চেষ্টা করিবে, আর সে কাজ তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না। দেশের খবর পড়িয়া, যে কোন একটা সূত্রে আমায় জড়াইয়া দেওয়া যে তাহাদের পক্ষে অসুবিধা হইবে না, ইহা স্পষ্টই বুঝিতেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন "কিন্তু তোমার ফেরা চাই, কাজ ঢের বাকী।"

আমি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম—সেখান হইতে যেমন চুপে-চুপে আসিয়াছি, এখান হইতেও সেইরূপ গোপনেই প্রস্থান করিব। তিনি ভাবিতে বসিলেন—সে যে কি করুণা, তাহা ভাবিলে আজও আমার চক্ষে অশ্রু-সাগর উথলিয়া উঠে। আমি "অরো"-কেই চিনিয়াছি, এবং তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধের চেয়ে আরও বৃহৎ, মহৎ কিছু থাকিতে পারে, কেবল এ-যুগে নয়, অনন্তযুগ তাহা স্বীকার করিব না। এই বিশ্বাস আমার অমর—আমার তাই ক্ষুদ্রত্বে ভয় নাই; বৃহতের লালসা নাই। আমি অসম্পূর্ণ বস্তু কোনদিন দেখি নাই; তাই সত্য ও পরিপূর্ণতায় অটল-প্রতিষ্ঠ হইয়া আজ সেই নিঃস্বার্থ হৃদয়যুগলের দান-প্রতিদানের কথাই ভাবি—সেই বুকে ধরিয়া চুম্বনের সহিত চরম কথা আজও কাণে প্রতিধ্বনি তুলে—"মতি, তোমার কাজ, আমারই কাজ। **You shall always get my unwritten there**" আমার এ সান্ত্বনা আজিও শেষ হয় না। বিশ্বাসের মর্ম্ম যাহারা বুঝে, তাহাদের পক্ষে ইহা শেষ হওয়ার বস্তু তো নহে!

শেষ সিদ্ধান্ত হইল—গোপনেই বাহির হইতে হইবে, কিন্তু রেলপথে নহে; তখন ফরাসী ষ্টীমার পণ্ডিচারী হইতে কলিকাতা বন্দরে আসিত, এই জলপথেই প্রস্থানের উদ্যোগ আরম্ভ হইল।

আমি গোপনেই বাহির হইলাম, গোপনেই ষ্টীমারে গিয়া উঠিলাম। যাইবার সময়ে তিনি আমায় বুকে লইয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, সে অনির্ব্বচনীয় প্রেমের আস্বাদ আমার জীবনকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

সমুদ্রের তরঙ্গায়িত বক্ষে সুবৃহৎ জাহাজ দুলিয়া-দুলিয়া চলিয়াছে। নীল

তরঙ্গে নানা রঙ্গে জলচর জীব বিহার করিতেছে। সে অনন্তের রূপ যে না দেখিয়াছে, তাহাকে এ সৌন্দর্য্যের কথা বুঝান যায় না। চারিদিন বঙ্গোপসাগরের উদ্বেলিতা তরঙ্গমালা বিদীর্ণ কবিয়া, গঙ্গার মোহনায় জাহাজ নঙ্গর করিল। জোয়ার না আসিলে, কলিকাতার বন্দরে যাওয়ার সম্ভব হইবে না—ইহাই স্থির হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ কাপ্তেন সাহেব ভিন্ন-মত হইলেন। তিনি দেখিলেন—অনর্থক এক রাত্রি জাহাজের যাত্রীদের খোরাক যোগাইয়া কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে; তিনি জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন।

প্রিভেন্টিভ্ অফিসারেরা জিনিষপত্র তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল। অকস্মাৎ আমার পেটের বস্ত্রে হাত প্রবেশ করাইয়া, ভিতরে কিছু রাখিয়াছি কি না, তাহারা দেখিল এবং প্রকাশ্যেই বলিল "পণ্ডিচারী হইতে অস্ত্রশস্ত্র কিছু যোগাড করিয়াছ কি না, দেখিয়া লইলাম।" আমার মাথা ঘুরিয়া পডিল, মনে হইল—জাহাজ হইতে ইংরাজ-রাজ্যে পা দিলেই নিশ্চয় বিপদ্ হইবে, ফবাসী জাহাজ বলিয়া এতক্ষণ নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

কলিকাতার বন্দরে রাত্রি এগারটায় জাহাজ আসিয়া উপনীত হইল। তীরে উঠিয়া দেখিলাম—কেহ কোথাও নাই। এই রাত্রে কোথায় যাইব, স্থির করিতে পারিলাম না। মনে হইল—কলিকাতায় এক পরিচিত বন্ধু আছেন সেইখানে উঠিয়াই রাত্রিকালটা বিশ্রাম করি। গাডীও সেই দিকে হাঁকাইতে বলিলাম। অর্দ্ধ-পথ গিয়া মন বড চঞ্চল হইয়া পডিল। এতদিন যে স্মৃতি বিস্মৃত-ঘোরে ঢাকা পডিয়াছিল, সহসা তাহা জাগিয়া আমায় অস্থির করিয়া তুলিল। আমার মনে হইল—হাওড়া হইতে একখানা থিয়েটার-ট্রেণ গভীর রাত্রেই ব্যাণ্ডেল যায়। গাডী ঘুরাইয়া হাওডা ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ট্রেণে উঠিয়া, একখানা কলিকাতার দৈনিক কাগজে চক্ষুঃ পড়িতেই চমকিয়া উঠিলাম। যে বন্ধুর বাসার দিকে যাইতেছিলাম, গুরুতর অভিযোগে তিনি আর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন যুবক সেইদিন প্রাতঃকালে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন।[১] সহরে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে!

আমি হতভম্ব হইয়া রহিলাম। অলক্ষ্যে তৃতীয়া শক্তি যে আমার

১। এই বন্ধু অমৃতলাল ওরফে শশাঙ্কলাল হাজরা—যিনি কলিকাতা, রাজাবাজার বোমার মামলায় ধৃত ও যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। ইহাই আমার বিশ্বাস। আজও জীবন-তরীর কর্ণধার-রূপে আমি নারায়ণ ছাড়া আর কাহাকেও দেখি না।

গভীর নিশীথে আমি চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে কেহই ছিল না। এই ট্রেণে প্যাসেঞ্জার প্রায় থাকিত না, নিকটস্থ সহরের সাহেবদের কলিকাতা হইতে অধিক রাত্রে ফিরিবার সুবিধার জন্যই এই গাড়ীখানির বন্দোবস্ত ছিল।

তৃতীয় প্রহরে বাড়ীর দুয়ারে ধীরে-ধীরে আঘাত দিলাম। হৃদয়খানি দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। ভিতর হইতে উত্তর হইল "কে?" সাড়া দিলাম "আমি"। দুয়ার খুলিয়া দাঁড়াইলেন আমার ধাত্রী-স্বরূপিণী, যাঁহাকে দিদি বলিয়া সহোদরার অধিক স্নেহ আদায় করিতাম। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন "হতভাগা এসেছিস্—কোথায় গেছ্‌লি ভাই, সোনার সংসার আঁধার করে' কোথায় গিয়েছিলি ভাই!" আহা, পর যে এত আপন হয়, তাহাও যে এই জীবন দিয়া নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার চক্ষে বসুধারা ঝরিতেছিল।

গৃহ শূন্য দেখিলাম; উৎকণ্ঠায় হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। দুশ্চিন্তা দূর করিয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন "ছোট-বৌকে এত বল্‌লুম, সংসার ক'রতে হ'লে কত হয়; সে কোন কথা শুন্‌লে না, তোর যাওয়ার দু'দিন পরে বাপের বাড়ী চলে' গেল, আর এ-মুখো হ'তে চায় না।"

আমি আশ্বস্ত হইলাম।

তার পরদিনই লোক পাঠাইলাম। চন্দননগর হইতে চুঁচুড়া অধিক দূর নয়; দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে উন্মাদিনী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। এ কি দৃষ্টি—শান্ত, নির্ম্মল, স্থির কটাক্ষ! পরিধেয় বস্ত্রখানিও নারীর পক্ষে সুশোভন নয়। রুক্ষকেশা, মলিনমুখী, অনিমিষ নয়নে তিনি অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। বোধহয় তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না—ইহা স্বপ্ন না সত্য! এই দেড় মাসের মধ্যেই আমার মহাযাত্রার সমাপ্তি হইল! এ আনন্দের আবেগ তিনি নীরবে ধারণ করিলেন, তারপর পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন "আর কোথাও যেতে হবে না তো?"

কথার মধ্যে জিজ্ঞাসার ভাব থাকিলেও, যেন ইহার ভিতর নির্দ্দেশসূচক

একটা অব্যর্থ-শক্তি ছিল ; আমি বিহ্বল হইয়া বলিলাম "না, আর তোমার চিন্তা নাই, আর কোথাও যাব না।"

তিনি হাসিলেন। মলিন ওষ্ঠে বিদ্যুৎরেখার মত তাহা তখনই মিলাইয়া গেল। আমি বলিলাম "দেহের প্রতি খুব অযত্ন করেছ দেখ্‌ছি!"

আবার সেই হাসি। আমার শরীরের দিকে চাহিয়া, তাঁহার নয়নে তৃপ্তির আলো ঝরিয়া পড়িল। দেহটা যে বেশ সারিয়া উঠিয়াছে, তাহা নিজেই বুঝিতেছিলাম, বলিলাম "নিশ্চয় তোমার রাগ হচ্ছে, দূরে কেমন করে' সুখে ছিলাম—কেমন নয়!"

তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "আসার আগে খবর দিতে বারণ আছে বুঝি!"

তিনি পথ-ক্লান্তি দূর করার আয়োজনে নিমগ্না হইলেন। বাড়ীতে আমার প্রস্থান-ব্যাপার লইয়া যে কাণ্ড বাধিয়াছিল, তাহা পরে শুনিলাম। তিনি সব জানেন, অথচ প্রকাশ করিতেছেন না—এই অভিযোগ পাড়া-প্রতিবাসী মিলিয়া এমন গুরুতররূপে উত্থাপন করিয়াছিল যে, তাঁর এখানে তিষ্ঠান অসম্ভব হইয়াছিল। তিনি নীরবেই দুই দিন কাটাইয়াছিলেন, তারপর এখান হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন।

তিনি যে কি ভাবে এই দেড মাস কাল কাটাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া বুঝা গেল। এই দেড মাস তিনি দর্পণে মুখ দেখেন নাই, এক বেলার অধিক ভোজন করেন নাই, একাকী বসিয়া কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইতেন—আমার কর্ম্ম ব্যর্থ না হয়। আপনার স্বার্থ লইয়া তিনি কোনদিন ঈশ্বরের দুয়ারে যাচ্ঞা করেন নাই।

এবার আসিয়া কাজেই অধিক মনোযোগ দিলাম। এই দেড় মাসে কারবারের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, না দেখিলে আর টিকে না। আমায় দেখিয়া আমার গুপ্তচর বন্ধুগণ অবাক্ হইলেন। এইরূপ ফাঁকি দিয়া যাওয়ায়, তাঁহাদের যে কি দুর্গতি হইয়াছে, তাহা বলিয়া একজন তো কাঁদিয়াই ফেলিলেন! এই ভাবে দিন চলিতেছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অক্ষয়তৃতীয়া। গৃহলক্ষ্মীর এই বৎসরে ব্রত পূর্ণ হইবে। কয়দিন ধরিয়া অনেক যাচাযাচির পর দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি।

সবৎসা গাভীর অঙ্গে চন্দন ছিটাইয়া, তিনি তাহার মুখে দুর্ব্বাদল আঁটি বাঁধিয়া দিতেছেন। সম্মুখে ব্রাহ্মণপত্নিগণ পিঁড়ায় বসিয়া আছে; সকলেরই চরণতল অলক্তরঞ্জিত। তাঁর করতল আল্‌তার রঙে রঞ্জিত; বুঝিলাম— এই চারুশিল্প তাঁর হাতেরই রচনা। নৈবেদ্য সজ্জিত। ব্রাহ্মণ মন্ত্রপূত করিয়া সদক্ষিণা প্রস্থান করিয়াছেন। শাশুড়ী-ঠাকুরাণী দুহিতার ব্রত পূর্ণ করার সাহায্যার্থে আসিয়াছেন। তিনি লুচির খোলা লইয়া বসিয়াছেন; আমায় দেখিয়া, মাথায় একটু কাপড় টানিয়া ব্রাহ্মণপত্নীদের সেবায় মন দিলেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। বৈশাখের খরতাপে সব যেন ঝলসিয়া যাইতেছিল। আমি তাড়াতাড়ি তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান শেষ করিলাম, অলিন্দে গিয়া দেখিলাম—ভোজনের ব্যবস্থা নাই। তিনি কর্ম্মান্তরে থাকিলে, অনেক সময়ে আমাকেই হাঁড়ির কাণা ধরিয়া ভাত বাড়িয়া খাইতে হইত। আজও সেই অবস্থা ভাবিয়া রন্ধনশালায় উপস্থিত হইলাম—হরি, হরি, হেঁসেল শূন্য, অন্নব্যঞ্জনের চিহ্ন নাই। বাহিরে আসিয়া হতাশ হইয়া বলিলাম "ব্যাপার কি?"

তিনি অকস্মাৎ আমার গলার হাঁকুনি শুনিয়া বাহির হইলেন। শেষে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডগোলের পর জানা গেল—বসিয়া-বসিয়া খাওয়া বন্ধ করার জন্য আমার বৌদিদি ঠাকুরাণী আজ হেঁসেল তুলিয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছেন —আমার খাওয়া বন্ধ।

ক্রোধে সর্ব্ব-শরীর জ্বলিয়া গেল। সম্মুখে চাহিতেই তাঁর বিস্ময়দৃষ্টি আমার চক্ষে পড়িল। বিস্ময়ের সহিত এত বড় অত্যাচার আমি কি ভাবে গ্রহণ করি, তাহা দেখিবার জন্য তাঁর উৎকণ্ঠার সীমা নাই। আমি স্থির হইয়া এই অপমান সহিয়া লইলাম, স্থির হইয়াই তাঁহাকে গিয়া বলিলাম "তোমার ব্রত পূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ অন্ন দাও।"

সে চিত্র ভুলিতে পারি না; সে মূর্ত্তি মানবীর নহে। সে রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রশস্ত পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণে গো, ব্রাহ্মণ, দেবতার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া, আমার চরণে তিনি উপুড় হইয়া পড়িলেন। যখন তিনি উঠিলেন, মুক্তাফলের ন্যায় তাঁর চক্ষে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে। লুচির খোলা নামাইয়া, তিনি বিনীতভাবে ব্রাহ্মণপত্নীদের বলিলেন "মা, মনে কিছু ক'র না; একটু দেরী হবে, আমি ওঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করে' দিই।"

কিন্তু কোন পক্ষকেই বিলম্ব করিতে হইল না। আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী মেয়েকে স্থির হইতে বলিয়া, অন্যত্র আমার জন্য বোকনা চড়াইয়া দিলেন। এক দিকে ব্রাহ্মণপত্নীরা ভোজনে বসিলেন; আর অন্য দিকে তাঁর পূজার নৈবেদ্যে পবিত্র হবিষ্যান্ন ভুর্জ্জপত্রে আমায় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে ডাকিল। আমি অভাবনীয় আনন্দে আসনে উপবিষ্ট হইলাম। সম্মুখে সজল চক্ষে তিনি আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। হাতে তালবৃন্ত চলিতেছিল। আমি ভাবিলাম—আজ অন্নপূর্ণার হস্তে অমৃত-সেবন করিতেছি—আজ আমি ধন্য!

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অক্ষয়তৃতীয়ার সেই অন্নপূর্ণার রাজ্যে আজ আমিই অতিথি নই, সঙ্ঘের অসংখ্য নরনারী ভীড় করিয়া বসিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্বপ্ন আমি ভাঙ্গি নাই—একটি জাতির অখণ্ড অন্নক্ষেত্রের নূতন স্বপ্ন মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেই বিধাতার ইচ্ছা সেদিন এমনই ভাবে লীলায়িত হইয়াছিল।

সেই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সেদিন পর্য্যন্ত একদিনও আর মধ্যাহ্নভোজন-কালে তাঁকে আর কোথাও দেখা যাইত না: সেই ব্যজনী হস্তে সম্মুখে বসিয়া, পাতে পাছে মাছি বসে, তাহার জন্য তিনি সতর্কা থাকিতেন। একদিনও তিনি সঙ্গ-ছাড়া হন নাই, মরণেও তিনি হৃদয় ভরাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু আমারও কি অভিমান হয় না। এত প্রেম, এমন করিয়া কি ভাঙ্গিতে হয়। এত নয়নের সাধ, এমন করিয়াই কি ঘুচাইতে হয়! আজ তো আর তেমন করিয়া কাছে আসিয়া ব'স না। তোমার মেয়েদের হাতে ভার ছাড়িয়া নিশ্চিন্তা হইয়াছ। কিন্তু আমার কি তৃপ্তি আছে। আজ সতীহারা শিবের মতই এই বলিয়া সান্ত্বনা পাই :

"বিলপন্তং কথং দৃষ্টা কৃপা কস্য ন জায়তে।
বিশেষতঃ পতিং বালে ননু ত্বমতিনির্ঘৃণা॥
ত্বয়োক্তানি বচাংস্যেবং পূর্ব্বং মম কৃশোদরি।
ত্বয়া বিনা ন জীবেয়ং তদসত্যং ত্বয়া কৃতম্॥"

যাহা কোনদিন ভাবি নাই, তাহাই হইল। আমার ভাগ্যে চিরদিনই এইরূপ হইয়াছে, আজও হয়। আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিয়াছি—মানুষ স্বেচ্ছাধীন নহে। সে যাহা চায়, তাহা যখন ঘটে, নিজেকে খুব বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হয়—নিজেকে নিজের নিয়ন্তা মনে করিয়া অহঙ্কার বড় হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার বিপরীত ক্ষেত্রে বুদ্ধিশক্তি ও অহমিকা কোথায় তলাইয়া যায়, তখন আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সীমাহীন সংসার-সমুদ্রে নিরুপায় আরোহী কর্ণধারের দিকেই চাহিয়া বলে—তুমিই পারের কর্ত্তা। মাথা নত হয়, চক্ষে তখনই অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। অকস্মাৎ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমার এই অবস্থাই হইল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও ভাবি নাই যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্ত্রীকে লইয়া আমায় এমনভাবে নিরাশ্রয় হইতে হইবে। অলক্ষ্যে ভাগ্যবিধাতা যে এত বড় জীবনাঙ্কের সূচনা করিতেছিলেন, তাহা কিছুই আমি জানিতে পারি নাই। বরং দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি নিঃসন্তান হইলেও, অগ্রজের সংসারটিকে গুছাইয়া তুলিব। সে সঙ্কল্প চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হইল। অক্ষয়তৃতীয়ায় গৃহলক্ষ্মীর ব্রতপূর্ত্তি যে আশীর্ব্বাদ নামাইয়া আনিল, আমি তাহা মাথা পাতিয়া লইলাম। আমাকে অগ্রজের সহিত যুক্ত পরিবার হইতে স্বতন্ত্রই হইতে হইল।

রাত্রে নিদ্রা হইল না। সে যে কি দুর্ভাবনা, তাহা বলিয়া বুঝান যাইবে না। সেদিনের কথা ভাবিয়া আজ হাসিয়া আকুল হই; কিন্তু সেদিন এই দু'টী প্রাণীর অন্নসংস্থানের দুশ্চিন্তায় আমি যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। গৃহদেবী আমার অবস্থা দেখিয়া বার-বার বলিয়াছেন—"রাগের মাথায় যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাই যে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, এমন কথা মনে করিয়া দুঃখ করিও না। কাল সকালেই আবার যেমন ছিলে, তেমনই হইবে। ভাশুরও তোমায় ছাড়িবেন না। তুমি ঘুমাও, ভাবিও না।"

তিনি যত সান্ত্বনা দেন, যত আশা দেন, সেদিন কিন্তু মন আর কিছুই মানিতে চাহে নাই। বহু বার অনেক কিছু হইয়াছে, তাহাই চরম হইয়া থাকে নাই; ঘটনার সংঘাতে ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আবার পূর্ব্ব ক্ষেত্রে ফিরিতে হইয়াছে। অদ্যকার ঘটনারও যে সেইরূপ পরিণতি হইবে না, এমন ধারণা মনে দৃঢ় হইতেছিল না। কিন্তু কে যেন অন্তর-বীণায় আঘাত দিয়া বার-বার ফুকারিয়া বলে—'আর তোমার ফেরা হইবে না, আজি হইতে যাত্রা তোমার নূতন পথে!' এই সঙ্গীত হৃদয় শীতল করে না, সেখানে জ্বালা-সৃষ্টিই করে। প্রথমেই মনে হয়—নূতন সংসার দুইজন প্রাণী লইয়া হইলেও, তাহার জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থ, তাহা আমি কোথা হইতে পাইব? দ্বিতীয় চিন্তা—শ্রীঅরবিন্দের। পণ্ডিচারীতে উপস্থিত হইয়া তিনি কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু টাকা পাইয়াছিলেন। দুই বৎসর তাহাতেই চলিয়াছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অভাবের পাষাণঘর্ষণে কি কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি মাসে আশী টাকা পাঠাইলেই তিনি দিন চালাইয়া লইবেন, এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৎসরের প্রথম তিন মাস কোনরূপে চলিয়াছিল। এপ্রিল মাসের চিন্তায় মাথা আমার ভারী হইয়াছিল। তাহার উপর এখন নিজেই বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। দুর্ভাবনার মাত্রা এইজন্য অনেকখানি বাড়িয়া উঠিল। তাহার উপর আবার দাদার সংসারটির ভবিষ্যচ্চিন্তায় আমার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া পড়িতেছিল। অগ্রজের সাহচর্য্যে আমার জীবনযাত্রা সহজগতি ছিল বটে, কিন্তু আমার অভাবে সে সংসারটী যে অচল হইয়া পড়িবে, এই বিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। আপনার জনের প্রতি মমতার দৃঢ় শৃঙ্খল বিধাতা সেদিন হাতুড়ির আঘাত দিয়া ভাঙ্গিতেছিলেন, আমি তাহা বুঝি নাই। বৌদিদির দুর্ব্ব্যবহার হেতু অগ্রজের প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে এবং তাহাতে পিতৃকুল উৎসন্ন যাইবে, আমি কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব—এইরূপ অন্তর-দ্বন্দ্বে হৃদয় আমার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বলিলেন "কাল যে কাণ্ড হইয়াছে, আজ হঠাৎ সংসারের কাজে নামিলে টিট্‌কারী কম হইবে না। আমার দুঃখের চেয়ে তোমার প্রতি সকলের যে অনাস্থা

হইবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। এখন কি করিব, তুমিই বলিয়া দাও।”

আমি অসহায়ের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ক্লান্তির কালিমায় মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছে। আমার দুশ্চিন্তার গুরুভার যেন তিনি সারা রাত্রি গ্রহণ করার চেষ্টা করিয়া শ্রান্তিতে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। কাল যে গর্ব্বে ও আনন্দে ব্রতপূজার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করাইয়াছেন, কাল অন্নপূর্ণার সেই বিজয়িনী মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চক্ষে যে উৎসাহের আলো তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এই এত বড় বাস্তব ব্যাপারটা এক রাত্রের মধ্যেই স্বপ্নের মত মিথ্যায় পরিণত হইবে, এই কথা ভাবিয়া লজ্জায় আমার চক্ষুঃ নত হইল। তিনি বলিলেন “আমি জানি—তুমি তেমন শক্ত মানুষ নও। রাগের মাথায় এমন কাণ্ড করিয়া ফেল—তাল সামলাইতে আমার প্রাণ যায়। সংসারের কাজে এখনই গিয়া লাগিতে লইবে। কিন্তু আবার যদি তোমার মন বিগড়ায়, সে কেলেঙ্কারী আমার সহ্য হইবে না। ঠিক করিয়া বল—আমি কি করিব?”

কল্যকার অত বড় ব্যাপার আমরা দুটি প্রাণী যত বড় করিয়া লইয়াছি, সংসারে কেহই উহা তেমন আমলে আনে নাই। ছোট-বৌয়ের ঘর হইতে বাহির হওয়ার বিলম্ব দেখিয়া, পরিবারের অন্যান্য লোকেরা যথারীতি তাঁর প্রতি শ্লেষবাক্যই প্রয়োগ করিতেছিল। “তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংসারের কাজ কে করিবে” বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে নানা জনে নানা প্রশ্ন করিতেছিল। তিনি আমার দিকে সজল নয়নে চাহিয়া কাকুতি-বাক্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন “কি করিব, ঠিক করিয়া বল?” তিনি অতিশয় সুখের সময়ে এবং অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইলে, প্রায়ই ব্যঙ্গশ্লোক উচ্চারণ করিতেন “মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ্ পর্য্যন্ত।” এ ক্ষেত্রেও তাই হইবে কি না, জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৌদিদির সদর্পকণ্ঠ পরিশ্রুত হইল—কর্ণে নিষ্ঠুর বজ্রের মত উহা বিঁধিল। বৌদিদি বলিতেছিলেন “কাল তো খুব গৃহিণীপণা করিয়া, আড়ম্বরে রাঁধিয়া খাওয়া-দাওয়া হইল। জিনিষ-পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে—আজ চলুক না, কতটা বাহাদুরী দেখা যাক্।”

বিস্ফারিত, সজল, সমুজ্জ্বল চক্ষে নির্ব্বাক্ প্রতিমা যেন চাবুক মারিয়া

বলিতেছিল "এত অপদার্থ তুমি, তুমি কি পুরুষ নহ? তোমার শ্রমের কি মূল্য নাই? তোমার আশ্রয়ে আমি কি সত্যই অসহায়া?" আমার বুকে শিবের বিষাণ গর্জ্জন তুলিল। আমি বলিলাম "আজ তোমায় নিশ্চয় বলি, আর আমি ফিরিব না। বাহির হইতেছি; দুইজন হইলেও, অর্থের প্রয়োজন—দেখি কি ব্যবস্থা করিতে পারি।" তিনি আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন "এখনই অর্থের জন্য তোমায় বীরত্ব দেখাইতে হইবে না। ইহার জন্য স্থির হইয়া পরমার্শ করিতে হইবে।" আমি বলিলাম "অদ্যই যে আমাদের অন্নচিন্তা চমৎকার, আজিকার ব্যবস্থাই বা কি হইবে?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভোলানাথের সংসার কিনা, আমায় একটু ভাবিতে হয়। যদি তোমার স্বতন্ত্র সংসারই করিতে হয়, দুই-তিন দিন না ভাবিলেও চলিবে। তবে একটা কিছু স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কথা ঠিক তো?"

আমি তাঁহার পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিলাম "অন্তর্য্যামী বলিতেছেন—আর ফেরা হইবে না।"

তিনি আজ একাশ্রয়িনী হইয়া একজনের মুখ চাহিয়া ঘর হইতে অতিশয় দর্পের সহিত বাহির হইলেন। মুক্তির দীপ্তি তাঁর বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বাঁধন সহজে টুটে না। প্রতিদিন দাদা আসিয়া ডাকিতেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই—কোন কারণে আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন হইব। তিনি এ বিষয়ে অসম্ভব রকমেই উদাসীন ছিলেন। আমাদের প্রতি অত্যাচারটা কতখানি হইতেছে এবং তাহা যে আমাদের সহিষ্ণুতার সীমা ক্রমেই ছাড়াইয়া উঠিতেছে, আমরা যে আজ মুক্তির জন্য বন্ধনগ্রন্থি একেবারেই শিথিল করিয়া ফেলিয়াছি, ইহা তিনি আমলেই আনিতে চাহেন না। কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে, ছোট-বৌমা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন--এমনই অভিযোগ মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া, তিনি আমায় পূর্ব্বের মতই পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে এড়াইয়া চলিলাম। এই ভাবে তিনদিন অতিবাহিত হইবার পর, বিষয়টা পিতৃদেবের কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। তিনি বর্ত্তমান থাকিতে ছোট বৌয়ের প্ররোচনায় আমি এই সংসারে স্বতন্ত্র

হাঁড়ি কাড়িয়াছি, এই তথ্য জানিতে পারিয়া, তিনি হুতাশনের ন্যায় জলিয়া উঠিলেন। আমায় ডাকিয়া তিনি সকল কথা শুনিলেন, তারপর মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন "তোমার মত বুদ্ধিমান্ ছেলে, মেয়ে-মানুষের কাণ-ভাঙ্গানী শুনিবে, এমন ধারণা আমার ছিল না। আমি স্রেফ্ বলিয়া দিতেছি—যদি সংসার ভাঙ্গার ইচ্ছাই থাকে, এখনও আমি বাঁচিয়া আছি, এ বাড়ী আমার, তুমি আমার ত্যজ্য-পুত্র হইবে।"

কথাটা খুব গুরুতর বটে, কিন্তু আমার প্রাণে কোন আঘাত বাজিল না। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। পিতার উচ্চ বাক্য পত্নীর কাণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তিনি বলিলেন "এইবার জব্দ হইবে তুমি। আমি কিন্তু আর কালি-মুখ লইয়া সংসারে ফিরিব না।"

আমি বলিলাম "বাবার রাগ খড়ের আগুনের ন্যায়—দপ করিরা জলে, উহা আবার নিভিয়া যাইবে। তুমি চিন্তা করিও না। ফেরা আমার অসম্ভব।"

দিন যায়, রাত্রি আসে। প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ক্রমে সকলে নীরব হইল। সংসাবে এমন নিত্য ঘটিতেছে। এই ঘটনা কিছু অস্বাভাবিক নহে। যিনি এই সংসারে ধাত্রী-স্বরূপা আমাদের পালন করিয়াছিলেন, তিনি আর আমাদের ফিরিবার ইচ্ছা নাই বুঝিয়া, সংসার হইতে কয়েকখানা বাসনপত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন—আপত্তি উঠিলে, বলিলেন "বাপ এখনও বাঁচিয়া আছেন। সংসারের সব কিছুরই অর্দ্ধেক অধিকার তোমাদেরও আছে।" তাঁহার সে স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া, সেদিনের মত আজও আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠে।

সাধন বেশ জমিয়া উঠিল। কোন কাজ নাই—আহার, নিদ্রা আর ধ্যান। শ্রীঅরবিন্দের কৃপায় আসন ছাড়িয়াছি, প্রাণায়াম ছাড়িয়াছি, মন্ত্রাদি-জপেরও বালাই নাই। গতানুগতিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের ত্রিসীমায় যাইতে হয় না। পূর্ব্ব-সাধনার সঙ্কেতে মূলাধার হইতে দ্বিদল চক্রে কুণ্ডলিনীশক্তিকে উঠাইয়া সহস্রারে পৌঁছাইবার রেচক, পূরক, কুম্ভকের যে বাড়াবাড়ি ছিল, তাহাতে সময় যাইত, কসরৎও বড় কম হইত না। খাদ্যাদির বিচারও আজ

নাই। এই কয়দিন বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হইল। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় দ্বিদল চক্র বুদ্ধির কেন্দ্র। অনাহত, মণিপুর ও স্বাধিষ্ঠান যথাক্রমে মন, চিত্ত ও প্রাণ। মূলাধার স্থূল আধারকেন্দ্র। সারা জীবনটাই যোগ। অন্তর-সাধনায় ডুবিয়া গেলাম। গীতার "যৎ করোষি যদশ্নাসি" মন্ত্রটী অনুভূতির গ্রামে উঠিল। চলিবার সময়ে পদক্ষেপটিও কে যেন নিয়ন্ত্রিত করে; অন্নগ্রাস লইয়া হাতটিও মুখে উঠে তৃতীয়শক্তিসহায়েই, বুদ্ধিযোগে ইহাই চিন্তা হয়। হৃদয়ে প্রেমের ঢেউ উঠে, প্রাণে কর্ম্ম-প্রেরণা জাগে। আমার কর্তৃত্ব সেখানে কিছু নাই, শুধু বসিয়া-বসিয়া দেখি। আসনসিদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই ছিল—নৈষ্কর্ম্ম্যে শয়নের অপেক্ষা পদ্মাসনে বসিয়া অধিক আনন্দ পাই। নিরবচ্ছিন্ন 'আমি' ও 'তুমি' এই দুইয়ের চেতনায় আমার সব ডুবিয়া যায়। সে এক অপার্থিব আনন্দ—আজিও আয়ুঃ ও স্বাস্থ্য হইয়া ইহা আমায় পুলকিত করে।

এমন করিয়া চিরদিন যে চলিবে না, এ কথা এই কয়দিনের অন্তর-সাধনায় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পূর্ব্ব হইতেই বহির্ব্বাটীটী আমারই অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বতন্ত্র হইয়া সে অধিকার আরও অক্ষুণ্ণ হইল। সংসার হইতে পরিত্যক্ত এই দুইটী প্রাণীর মুখদর্শনে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না। কাজেই এইদিকে আর কেহ আসিতেন না। দালানের পাশে সেই ক্ষুদ্র কক্ষটী—কারখানার চেয়ার-টেবিলের গুদামে যেখানে শ্রীঅরবিন্দকে একদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ঘরটী সংস্কৃত করিয়া সাধন-ভজনের জন্য ব্যবহার করিতাম। অন্ধকার থাকিতে-থাকিতে এই ঘরে আসিয়া ধ্যানে বসিতাম। সূর্য্যালোকে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইলে, তিনি মধ্যপথে একটী দরজার কড়া ধরিয়া মৃদু শব্দ তুলিতেন, উহাই প্রাতরাশের, মধ্যাহ্নভোজনের এবং নৈশভোজনের আহ্বান জ্ঞাপন করিত। নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্যে পরম পরিতোষে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতাম। পৃথিবী আমার নিকট শূন্য হইয়া গিয়াছিল। ধ্যান-নেত্রে দেখিতাম—আমি আর আমার সহধর্ম্মিণী, এতদ্ব্যতীত কিছু নাই। আর দূরে সে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে শ্রীঅরবিন্দের প্রসন্নমূর্ত্তি। আর সেখানে কত রূপের তরঙ্গ-লীলা! কত সময় অপ্রাকৃত দর্শনের ভিতর দিয়া অতিক্রান্ত হইত; আর কত সময় নিজের অভ্যন্তরে জ্ঞানের, প্রেমের, কর্ম্মের লীলা-প্রেরণা লক্ষ্য করিয়া অতিবাহিত হইত। এ সুখ, এ তৃপ্তির অবধি ছিল না! আমার

প্রসন্ন-গম্ভীর মুখ তাঁহাকে তৃপ্তি দিয়াছিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে, আমার অন্তরের আনন্দ গুণান্বিত হইয়া উঠিত। দিন এমন করিয়া কিন্তু চলিল না। মধ্যাহ্নে ভোজন শেষ হইলে, তিনি কথা পাড়িলেন, বেশ একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন "সে রাত্রে বিছানায় পড়িয়া দুর্ভাবনায় কত না ছট্‌ফট্ করিয়াছিলে। সংসারের দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে তো?"

সেদিন পর্য্যন্ত কত প্রকারের দায়িত্ব যে ঘাড়ে চাপিয়া আমায় পিষিয়া মারিতেছিল, সে কথা স্মরণে পড়িল। ব্যবসা-বাণিজ্যের দুশ্চিন্তা, তদুপরি আয়ের চেয়ে ব্যয়েব মাত্রাধিক্য ছিল সংসারে—এই দুই বিরোধী অঙ্কের সামঞ্জস্য আনারও কি অসাধারণ প্রচেষ্টাই না করিয়াছি! নানা কারণে ঋণের গুরুভারও মাথার উপর কম ছিল না। বিপ্লব-যুগের ইতিহাসও মর্ম্মে-মর্ম্মে গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রতিদিন বিপদের আশঙ্কায় সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিত। এই সব হইতে এই কয়দিন যেন মুক্তি পাইয়াছি। শরীর ও মন বেশ লঘু হইয়াছে। দায়িত্বহীন মুক্ত জীবনেব অমৃতাস্বাদে শ্রী ও যৌবন আমাকে যেন নূতন করিয়া বরণ করিয়াছে। আমার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁরই নয়নের আলোয় আমার প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিত—আনন্দের অবধি থাকিত না।

তিনি যে সকল কথা পাড়িলেন, তাহাতে পূর্ব্ব-চেতনায় আবার ফিরিয়া আসিলাম। সব যেন ডুবিয়া গিয়াছিল, আবার সব ভাসিয়া উঠিল—নূতন ভঙ্গীতে, নূতন ছন্দে। আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "এই কয়দিন আমি যেন কি হইয়াছি। কেমন কবিয়া দিন চলিয়াছে, একবারও ভাবি নাই। বল তো কি ব্যাপার?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমি যদি মেয়ে-মানুষ না হইতাম, তোমায় আর দুর্ভাবনার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া দুঃখ দিতাম না। অনেক বার ভাবিয়াছি, কথাটা পাড়ি; কিন্তু তোমার মুখখানিতে এই কয়দিন যে সুখের রং দেখিয়াছি, তাহা পাছে মুছিয়া যায়, তাই কিছু বলি নাই। কিন্তু আর যে চলে না—দুঃখ তোমায় দিতেই হইল!"

একজনের কর্ত্তব্য অন্যকে বহিবার শক্তি ভগবান্ দেন না। নিজের মধ্যে যে নারায়ণ, তাঁর জাগরণ-ভঙ্গী সর্ব্বক্ষেত্রে এক প্রকারেরও নহে। আমি অধ্যাত্ম-সাধনায় তন্ময় হইয়া থাকিব, আমার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের

জন্য আমার শক্তির অনুশীলন আমি করিব না—এমন ভাগ্য আমার নহে। সেদিনও যেমন, আজও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। আমি খবর লইয়া জানিলাম—আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাদের অবস্থা বুঝিয়া পাঁচটী টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। এই কয়দিন তাহাতেই সব-কিছু চলিয়াছিল। কিন্তু বাজার-হাট করিল কে ? সন্তান-প্রতিম সে ব্যক্তি প্রতিদিনই আমার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার আনাগোনার কারণও মনে যে প্রতিবিম্বিত হয় নাই, তাহাও নহে। কিন্তু সাধনার গভীরতায় চিত্তে উহা রেখাপাত করে নাই। আমার এই নব-সংসার-রচনার সূচনা-পর্ব্বে শ্রীমান্ রামেশ্বর দের নাম শুধু উল্লেখযোগ্য নহে, সঙ্ঘের ইতিহাসের একটী যুগে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

স্বদেশী যুগ হইতে শ্রীঅরবিন্দের যুগ পর্য্যন্ত যে সকল তরুণের জীবন আমাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, রামেশ্বর তাহাদের অন্যতম। আমি যেদিন হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছি, সেইদিন হইতেই সে গৃহদেবীর পদপ্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া বুঝি নবজন্মের দীক্ষা লইবার অভিলাষী হইয়াছিল। তাঁকে সে "মামীমা" বলিয়া মাতৃ-প্রেম-সুধায় অভিষিক্ত হইত। এই রামেশ্বরের সহিত যুক্তি করিয়াই তিনি সংসার চালাইয়াছেন এই কয়দিন। রামেশ্বর বাজার-হাট করিয়া আনিয়াছে, রামেশ্বর ঘড়া কাঁধে করিয়া দূর হইতে পানীয় জল আনিয়া দিয়াছে। মামীমার আদেশ-প্রতীক্ষায় রামেশ্বর স্বগৃহ পরিত্যাগ করিতেও কাতর নহে। রামেশ্বরকে সেদিন নূতন চক্ষে দেখিলাম। অপত্যস্নেহে হৃদয় আমার বিগলিত হইল।

তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া বুঝিলাম—আর একদিন পরেই তিনি কপর্দ্দক-হীনা হইয়া পড়িবেন। আমাকে আর না জানাইলে নয় বলিয়া তিনি আজ অভাবের কথাটা আমায় শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু আমি কি করিতে পারি ? তখনই ভাবিতে বসিলাম। ভাবিবার বিষয় কিছু না পাইলে, নিরালম্ব, নিরাশ্রয় হইয়া কোন্ গভীরে তলাইয়া যাই ! আত্মজ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া অসীমের অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হই ; কিন্তু বিষয় পাইলে, আর রক্ষা নাই। তাহাকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া অতিক্রম করার ধূর্জ্জটিশক্তি আমার মধ্যে জাগিয়া উঠে। অত.ব আজ জটিল সমস্যার বিষয় হইয়া সম্মুখে উপস্থিত —উহাকে অতিক্রম করার চিন্তায় মুখর-কণ্ঠ হইয়া নানা প্রশ্নে তাঁহাকে

পীড়িতা করিয়া তুলিলাম। সব কথা ছাড়িয়া এই দুইটী প্রশ্ন বড় হইয়া উঠিল—ব্যবসায় করিব অথবা চাকুরীতে বাহির হইব? তিনি চাকুরীর চেষ্টাই করিতে বলিলেন। নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের দিকেই স্বভাবতঃ তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমার উৎপাতময় জীবনের সংঘাতে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তান্বিতা হইয়া উঠিতেন। আমার চঞ্চল উত্তেজনাময় চরিত্র ব্যবসায়ের পক্ষে উপযোগী নহে বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। আমার কিন্তু চাকুরী করার আর প্রবৃত্তি ছিল না। একবার যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহাতে পুনরাবর্ত্তন আমার স্বভাবে নাই। ইহা ছাড়া একটা চাকুরীর মত চাকুরী যোগাড় করাও সহজ ছিল না। কাহারও উমেদারী করার মত প্রবৃত্তি অন্তরে ঠাঁই দিতে কষ্ট-বোধ হইত। আমি বলিলাম "সংসারে যেমন আর ফিরিব না, তেমনি চাকুরীর দিকেও আর নয়। একটা ব্যবসায়ই করি, কি বল?"

তিনি বলিলেন "ব্যবসা করা তোমার পক্ষে আর সম্ভব মনে হয় না।"

কথাটা ভাবিবার মতই তখন মনে হইয়াছিল। আমার মনে কিছুই করিবার আর নাই। সম্মুখে ঠিক অন্ধকার-যবনিকা ঝুলিয়া না পড়িলেও, একটা বিরাট্ শূন্যের সম্মুখে যেন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই অবস্থায় কিছু করা যায় না। তবু বলিলাম "খুব একটী ছোট্ট ব্যবসা করিব। ২০।২৫৲ টাকার মত আয় হয়—এমন ব্যবসা।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যবসাটা কি?"

কয়েক বৎসর ব্যবসার ক্ষেত্রে থাকিয়া অনেক ছোট-ছোট কারবারে মানুষের দিন চলে দেখিয়াছি।

আমার মনে হইল—দুই-এক ওয়াগন কয়লা আনিয়া যদি বিক্রয় করি, ২০৲।২৫৲ টাকা রোজগার অনায়াসেই হইবে।

তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন "তাহার জন্য তো টাকার দরকার? শ্রমও বড় কম হইবে না। তুমি যে মানুষ, দুই দিনেই পুঁজি-পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবে।" দেখিলাম—তাঁহার ইচ্ছা ব্যবসায়ের দিকে আদৌ নাই। অথচ চাকুরীর কথা স্মরণ করিলেই আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা দুই জনে অনেকক্ষণ পরামর্শচ্ছলে তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল—যাহা করিবার, আজই নিশ্চয় করিয়া লইব। তিনি তর্ক বন্ধ করিয়া চুপ করিলেন।

সেই ছোট ঘরখানিতে আসিয়া বসিলাম। বসিলাম আজ এই প্রথম—অন্তর-দেবতার বাণীশ্রবণের জন্য। আজ যেন আমার সমস্তখানি এক হইয়া প্রার্থনা সুরু করিল—প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষায়। উর্দ্ধে চাহিয়া যুক্তকরে অন্তরে-অন্তরে বলিতে লাগিলাম "হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা আমার কাছে আজ বাণীরূপে নামিয়া আসুক। সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প পদে-পদে বুঝি ব্যর্থ হয়! নিজের অহঙ্কারই চিন্তা করে, কর্ম্ম করে। নিজের কর্ত্তৃত্বই তাহার জন্য দায়ী—ঈশ্বরের নামাঙ্কিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। হে ভগবান্, আজ আমায় মুক্তি দাও। তুমি বল—আমি কি করিব?"

জীবনে এই প্রথম ডাকিয়া সাড়া পাইলাম। নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পদ্মাসনে বসিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কত দীর্ঘ সময়ে একাগ্রচিত্ত হওয়ার সাধনা করিয়াছি, কত রাত্রি নির্ব্বাত জলন্ত দীপালোকের দিকে চাহিয়া চঞ্চল মন স্থির করার জন্য ত্রাটক অভ্যাস করিয়াছি। মন্ত্র জপ করিতে-করিতে চিত্ত আমার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রোত্থিত ধ্যান-ভঙ্গে একটা আরাম অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আজ এই ভবিষ্যতের দিকে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ-প্রাপ্তির প্রার্থনায় হৃদয়-মন এমন এক অভিনব আনন্দে অভিষিক্ত হইল, যাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবে না। চক্ষে পুলকাশ্রু, সমস্ত মেরুদণ্ডটা স্থির অকম্পিত। চাহিয়া আছি, কিন্তু দৃশ্যমান কিছুই নাই। আত্মচেতনা আছে, শরীরের স্থূলানুভূতি নাই। একটা জ্যোতির্ম্ময় জগতে যেন আসিয়া উপনীত হইয়াছি। তারপর হাতখানা কে যেন জোর করিয়া তুলিয়া ধরিল, লেখনী হস্তে ধরাইয়া পরিষ্কার প্যাডের উপর এক ছত্র লেখা বাহির হইল "Wait, all will come."

চমক ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নোত্থিত চিত্তে কাগজের লেখাটুকুর দিকে চাহিয়া-চাহিয়া সঠিক কর্ম্ম-নির্দ্দেশ মিলিল না। অপেক্ষার সঙ্কেত—আর সব আসিবে। ভাল তাহাই হইবে। কি সব আসিবে? দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য—ব্যাধি, অনশন, মৃত্যু—লজ্জা, লাঞ্ছনা, অপমান! ধৈর্য্য-সহকারে সব বরণ করিয়া লইতে হইবে? আমি চিরদিনই জীবনের সম্মুখে বিপদের অন্ধকারই ঘনাইয়া আসিবে দেখিয়া থাকি, সুখের কল্পনা কোনদিন করি না। দুঃখের অপেক্ষা সুখের ভার-বহন অভ্যাসগুণে অধিক সহজ-সাধ্য হয়।

দুঃখের জন্য কায়-মনে-প্রাণে প্রস্তুত হইয়াই আছি। সুখের প্লাবনে কিন্তু অভিষিক্ত হই। দুঃখ অপ্রস্তুত ক্ষেত্র নহে বলিয়া আমায় বিচলিত করে না। আজ সব কিছুর প্রতীক্ষায় দুঃখের স্বপ্নই চিত্রিত করিলাম। ব্যবসায়ও নহে, চাকুরীও নহে—অপেক্ষমাণ জীবন লইয়া আমি স্থির হইয়া থাকিব। সব আসিবে ; আমায় প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

দরজার কড়া-নাড়ার শব্দে ধীর প্রশান্ত চিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শিশু কন্যাটির মৃত্যুর পর হইতে আমার সেবার ভার সর্ব্বপ্রকারেই স্বহস্তে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রন্ধন, পরিবেশন, গৃহ-মার্জ্জন, শয্যা-রচনা—যাবতীয় কর্ম্মের সহিত আমাকে তিনি স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিতেন। অন্যের চক্ষে ইহা কিরূপ ঠেকিবে, সে বিচারের অবকাশ আমার ছিল না। জীবন-যাপনের ব্যবস্থায় আমি তাঁর হাতের পুতুল ছিলাম। অন্তর-প্রেরণা বলিয়া যাহা অনুভূত হইত, সেখানে ছিলাম আমি নিঃসঙ্গ—এই অবস্থায় তাঁহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইত। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে সব ছাড়িয়া ছুটিতে হইত। অনুগমনের অনভ্যাসে তাঁর চরণ বুঝি রক্তাক্ত হইত। যেখানে আমি অস্পষ্ট হইতাম, সেখানে তাঁহার চক্ষে অশ্রুর নির্ঝর ঝরিত। আজ আমার প্রশান্ত-গম্ভীর ভাব দেখিয়া, তাঁহার কৌতুকপ্রিয় আঁখিযুগল স্থির-চকিত হইয়া আমার অন্তর-দেশ দেখার চেষ্টা করিল। কত কি তিনি মনে করিলেন, ভাবিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি সেদিন মূক, মৌন, উদাসীনের ন্যায় স্নানাহার সারিয়া, আবার সেই ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া স্থির হইয়া বসিলাম। যেন মনে হইতেছিল—এতদিন অধ্যাত্ম-সাধনার অভিনয় চলিতেছিল। আমিই যন্ত্র ও যন্ত্রী সাজিয়া সাধন জমাইয়াছিলাম। আজ কিন্তু আমা ছাড়া আর কেহ যেন আমায় পাইয়া বসিয়াছে। ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

আজ সত্যই আমি কর্ত্তা নহি ; এ ঘর গুছাইবার, গড়িবার ভার আমার নহে। আমি একটা শূন্য-চেতনা। অন্যের নিয়ন্তৃত্বের ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছি মাত্র ; সারা অপরাহ্ণ এইরূপ তন্ময় হইয়াই কাটিয়া গেল। প্রকৃতি সন্ধ্যার ধূসর বর্ণ আকাশে লেপিয়া দিল। ধীরে-ধীরে অন্ধকার গৃহ-কোণে জমা হইতে লাগিল। গৃহস্থের বাড়ী হইতে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি উঠিল। সন্ধ্যাপ্রদীপ

হস্তে তিনি আমার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন—ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া পূতগন্ধে গৃহ আমার আমোদিত করিলেন। আর শেষে নিস্তব্ধ-নিশ্চল-মূর্ত্তি আমার চরণে ভূনত প্রণাম করিয়া, তিনি সম্মুখে স্থির হইয়া বসিলেন। অভাবের মলিন তির্য্যক্‌ রেখা-চিহ্ন তাঁহার ললাটে লেশমাত্র নাই। উজ্জ্বল দীপালোকে তাঁহার ভাস্বর বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব দীপ্তির ছটা। আজ তিনিও কি মুক্তির মন্ত্রে অভিষিক্তা? আমার হৃদয়ের অনবদ্যা অনুভূতি-প্রতিমা যেন সম্মুখে বসিয়া আমার চৈতন্য গড়িয়া লইতে লাগিল। সে দেবী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া-চাহিয়া, তাঁর প্রণতির প্রতিদান দিবার জন্য আমার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সেই সন্ধ্যার এই অন্তরানুভূতির কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই।

এই স্বপ্ন স্থায়ী হইল না। প্রাঙ্গণে আমার পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠরব পরিশ্রুত হইল। গৃহলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। হাসিমুখে বন্ধু ১ আসিলেন, তৎপশ্চাৎ রামেশ্বর।

এই চিরসুহৃদের কথা পূর্ব্বেও কিছু বলিয়াছি। ইঁহারই জননীর মৃত্যুদিন আমি পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। ইঁহার পত্নী আমাদের কাছে "মেজবৌ" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার ভক্ত-শিষ্যা। এই পরিবারটির সহিত আমার সম্বন্ধ আজও অচ্ছেদ্য হইয়া আছে। বন্ধু বলিলেন "তুমি স্বতন্ত্র হইয়াছ, শুনিয়াছি। ভালই হইয়াছে। কিন্তু দিন চলিবে কি করিয়া—ভাবিয়াছ কি?"

আমি বলিলাম "আগে ভাবিয়াছি, আজ হইতে তাহার নিষেধ হইয়াছে।"

এই বন্ধুটী আমার পূর্ব্ব-সাধনার সহযোগী, সহতীর্থ ছিলেন। তিনি আমার ভাব বুঝিতেন—বলিলেন "তাহাই যদি হয়, খুব ভাল। আমার সাধ্য কম, তবুও তুমি দেশের জন্য, ভগবানের জন্য যদি নিছকভাবে জীবন যাপন কর, আমি প্রতি সপ্তাহে তিন টাকা দিতে পারিব।"

আমার নয়ন বিস্ফারিত হইল। মুখ দিয়া বাক্য বাহির হইল না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব কি? যিনি আজ নির্দ্দেশ দিয়াছেন স্থির থাকিবার, তিনিই উপলক্ষস্বরূপ বন্ধুকে টানিয়া আনিয়াছেন। আমি, তুমি, সে—সবার

১। সাগরকালী ঘোষ

উপরে এই যে পরমা শক্তি, তাঁহার উপর প্রগাঢ় প্রত্যয় জন্মিল। শ্রদ্ধায় চক্ষুঃ অশ্রুসিক্ত হইল।

আমার করিতে হইল না কিছুই। রামেশ্বর মাসিক ১২৲ টাকা হাতে লইয়া, তাহার মামীমার সহিত সংযুক্ত হইয়া, নূতন সংসার রচনা করিল। সে তার পরদিনই "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রধ্বনি করিতে-করিতে সংসার-পাশ ছেদন করিয়া এই নূতন সংসারে সাথী হইল। ১২৲ টাকার সংসার আমাদের। তিন জনের দিন চলিতে লাগিল স্বচ্ছন্দে, পরমানন্দে।

দিন চলিতে লাগিল নিরুপদ্রবে। সংসারে সুব্যবস্থা হওয়ায়, তাঁহার সহিত কথার আর প্রয়োজন ছিল না। ভোজনাদির সময় ব্যতীত দেখা শোনারও প্রয়োজন ফুরাইয়াছিল। নৈশ ভোজনের পর আমি বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করিতাম, সঙ্গী ছিল রামেশ্বর। অতি প্রত্যূষে আমরা তিন জনে শয্যা ত্যাগ করিতাম। প্রাতঃকৃত্যাদি লইয়া আমি যখন ব্যস্ত থাকিতাম, রামেশ্বর বহির্ব্বাটীর গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিত। অন্তঃপুরের শয়ন-কক্ষটী হইতে ধূপ-ধুনার গন্ধ ছোট্ট বাড়ীখানিকে পুলকিত করিত। এমনই করিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত হয়। দিন ভালই চলে দেখিয়া পিতৃদেব দাবী জানাইলেন—যখন তাঁর দুই সন্তান, তখন রাত্রির ভোজন-ব্যাপারটা আমার সংসারেই চলিবে। আমি নতশিরে তাহা স্বীকার করিলাম, পত্নীকেও কথাটা জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "ইহা ত পুণ্যের কথা, আমাদের সৌভাগ্যের কথা!" ১২৲ টাকার উপর তিন জন হইতে সাড়ে তিন জনের দিন চলিতে লাগিল। কেমন করিয়া চলে, সে খবর লওয়ার অবকাশ আমার ছিল না।

একটা দরজা-জানালা-শূন্য পোড়োঘর পড়িয়া ছিল। এক প্রতিবেশী বন্ধু [১] আসিয়া তাহা কায়েমী করিয়া দিলেন; আর এই ঘরের সম্মুখে সুদীর্ঘ খোলা বারান্দায় অল্পাংশ ঘিরিয়া রন্ধনশালার ব্যবস্থা হইল। ক্ষুদ্র সংসার, এই অল্প আয়েও উহা এমন পরিপাটী পুণ্যশ্রী ধরিল—যে দেখিত, সেই দুই দণ্ড চাহিয়া থাকিত। দ্রব্যাদি অল্প হইলেও, গুছাইয়া রাখার কৌশল সকলকে চমৎকৃত করিত।

১। সত্যচরণ কর্ম্মকার

গভীর স্তব্ধতা-পূর্ণ পরিবেশে চিত্ত সমাহিত হইলে, আমার চক্ষের সম্মুখে অপূর্ব্ব অক্ষরে আকাশলিপি ভাসিয়া উঠিত। পড়িবার উপক্রম করিতাম; কিন্তু লেখাগুলি নিমেষে মিলাইয়া যাইত। এমন কত লিপি যে চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কোনটীর মর্ম্মবোধ করিতে পারি নাই।

কলিকাতার কোন এক বন্ধুর[১] সহিত পরিচয় হওয়ার পর, বাংলার এক প্রসিদ্ধ বিপ্লবপন্থী দলের[২] সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সেই বন্ধু দল-বল সহ পুলিস কর্তৃক ধৃত হওয়ায়, এই সময়ে আমার অবকাশের অন্ত ছিল না। আমি অন্তর্জ্জগতে তলাইয়া যাওয়ার অবকাশ পাইয়াছিলাম। অন্তর্জ্জগতের বিচিত্র রহস্য আমার চিত্ত চমৎকৃত করিত। সাধনার এই সুযোগ দীর্ঘদিন রহিল না। হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন—'পল রিশার (Paul Richard) নামে তাঁহার এক বন্ধু ফরাসী ভারতের প্রতিনিধি-রূপে ডেপুটিপদপ্রার্থী, চন্দননগরে তাঁহার পক্ষে ভোট-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।'

মঁসিয়ে পল রিশার ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্পে পণ্ডিচারী আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী মাদাম রিশার পরে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সংযুক্তভাবে "আর্য্য" পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মঁসিয়ে পল রিশারের জন্য চন্দননগরে আমাকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় দল গড়িতে হইল। সাধারণতঃ দুইটি রাষ্ট্রদল বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের এক দল অন্যতম প্রতিনিধিপদপ্রার্থী মঁসিয়ে ব্লুজেনের পক্ষে; অপর দল দ্বিতীয় পদপ্রার্থী মঁসিয়ে লেম্যারের পক্ষে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি একক তরুণদের লইয়া তৃতীয় পক্ষ-রূপে ভোট-যুদ্ধে অবতরণ করিলাম। মঁসিয়ে রিশার পণ্ডিচারী প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হইলেন। চন্দননগরে দুইটী প্রবল প্রতিপক্ষকে সম্মুখে রাখিয়া আমার এই নূতন পদপ্রার্থীর জন্য যতগুলি ভোট সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা চন্দননগরের পক্ষে নগণ্য হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য স্থানে মঁসিয়ে রিশারের পরাজয় হওয়ায়, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া

১। অমৃতলাল হাজরা ওরফে শশাঙ্কলাল হাজরা

২। অনুশীলন সমিতি

যায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেতে এইরূপে ফরাসী রাষ্ট্র-সাধনায় আমার দীক্ষা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইহাতে আমরা সিদ্ধকাম হইয়াছিলাম, সে কথাপরে বলিব।

ম সিয়ে পল রিশারের পরাজয়-বার্ত্তা লইয়া শ্রীঅরবিন্দের যে পত্রখানি আমার হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার আর্থিক অভাবের কথাও লিখিত ছিল। আমি সেই অংশটুকু বার-বার পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। উপায়-ক্ষম হইয়াও একপ্রকার পরার্থে জীবন যাপন করিতেছি—এই অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দের অভাব-অভিযোগ কিরূপে পূরণ করিব, তাহা ভাবিয়া অস্থির হইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন "তোমার ৮০৲ এ মাসে না পাওয়ায়, অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছি। ১৫০৲ বাড়ী ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। বাহির হইতে টাকা আসার পথ বন্ধ। তোমার ভিতর দিয়া অর্থ যদি না আসে, বলিতে হয়—"Fate has been against us."

পত্র পড়িয়া আমার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। সেদিন সত্যই নিরুপায় মনে করিয়া চক্ষুঃ আমার অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। স্নানের সময় উপস্থিত হইলে আমি উঠিলাম না; কাজেই স্ত্রীই আমার নিকট আসিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি বিষয়টা জানিয়া লইলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহারও মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমার চেয়েও এ বিষয়ে তিনি যে অধিক অসহায়া, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন। তবুও তিনি ভরসা দিয়া বলিলেন "স্নানাহার সারিয়া লও। দুর্ভাবনায় কোন ব্যবস্থাই হয় না। স্থির হও, সুস্থ হও—ভগবান্ একটা উপায় করিয়া দিবেন।"

মনে পড়িল—"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।" শ্রীঅরবিন্দের দাবী পূরণ করার অক্ষমতা অন্তহীন দুর্গতি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঈশ্বরপ্রসাদ ব্যতীত এই অবস্থায় পরিত্রাণের আর পথ কি? অন্তরে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়িল, তবুও উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন পথ দেখি না, আমাদেরও এই অবস্থা—কি করা যায় বল তো?"

সে যুগে দেখিয়াছি—অন্ধকারে যখন সর্ব্বদিক্ ছাইয়া গিয়াছে, আশার ক্ষীণ খদ্যোৎও একবিন্দু আলো দেয় না, তাঁর অতি অকিঞ্চিৎকর আনুকূল্য আমার ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে; আজও তাহার অন্যথা

হইল না। আমার কন্যার গলার একছড়া বিছা-হার ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া বলিলেন "এইটা বেচিয়া, যাহা পার পাঠাও; তারপর একটা পথ বাহির হইবেই।"

এই অতি অকিঞ্চিৎকর সাহায্য আমার প্রাণে আশার উদ্রেক করিল না। কিন্তু কেমন যেন মনে হইল—এই সূত্র ধরিয়াই একটা পথ মিলিবে। আমাদের সম্পূর্ণ নিঃস্ব হওয়ার ব্রত পূর্ণ না হইলে, শ্রীঅরবিন্দের দাবী পূরণ করার অধিকার মিলিবে না। আমি তৎক্ষণাৎ সেই হার-ছড়াটি আমার সেই অকৃত্রিম সুহৃৎ-পত্নীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলাম "ইহার বিনিময়ে আমায় কয়েকটা টাকা দাও।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "কত টাকা চাই?"

আমি সব কথা তাঁহাকে বলিয়া, তিনি যাহা পারেন, তাহাই দিতে বলিলাম। তিনি হার লইলেন না; ত্রিশটী টাকা আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। এই নারী আমাদের মধ্যে 'মেজ-বৌ' নামে চিরস্মরণীয়া হইয়া আছেন।

আমি এই ৩০৲ টাকা তৎক্ষণাৎ 'তার' করিয়া শ্রীঅরবিন্দকে পাঠাইলাম, সঙ্গে-সঙ্গে জানাইলাম—পত্র পরে পাঠাইতেছি। হার-গাছটি স্ত্রীর হাতে ফেরৎ দিলাম।

এই ঘটনার পর বুক হইতে দুশ্চিন্তার জগদ্দল পাথর যেন নামিয়া গেল। সমস্যার সমাধান দেখিলাম না। কিন্তু অন্তর যেন লঘু হইয়া, কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব সুখ ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিল।

আমি চিরদিন দেখিয়াছি—প্রত্যেক মানুষের পশ্চাৎ অলক্ষ্যে কর্ম্মের পর কর্ম্ম সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া বিধাতা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। দুর্ভাগ্য যখন আসে, স্রোতের ন্যায় একটির পর আর একটী আসিয়া মানুষকে বিপন্ন করে। সৌভাগ্যেরও এমনই প্রবাহ বহিয়া চলে। অলক্ষ্য যাহা, মানুষের জীবন তাহার ক্রমবিকাশের প্রণালী মাত্র। ব্যর্থতার অনাহত প্লাবন দেখিয়াছি, সাফল্যেরও প্রবল স্রোতঃ স্বীয় জীবনের ইতিহাসে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যাকাশে যখন প্রথম নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল, তাহার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া মনে হইল—আমার ভিতর দিয়া শ্রীঅরবিন্দ যখন তাঁর অসাধারণ জীবন-ব্যাপারের রসদ দাবী করিয়াছেন, তাহা কোন মতে অপূর্ণ

থাকিবে না। আজিকার ত্রিশ টাকা পাঠাইবার অনুপ্রেরণার মধ্যে সমস্ত ভবিষ্যতের সাফল্য যেন বিগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা ঘটে, অন্তরে-অন্তরে তাহার সূচনা পূর্ব্বেই হইয়া যায়—এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। রাত্রির অন্ধকারে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ক্লান্ত পথিকের ন্যায় আশ্রয়-প্রার্থী এক পরিচিত বিপ্লবী আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরীর তাঁর কৃশ, মাথার কেশ রুক্ষ। কাসি-সর্দ্দিতে কণ্ঠে তাঁহার শব্দ উচ্চারিত হয় না। এমন কত অসহায় নিরাশ্রয় দেশপ্রেমিক এইখানে শ্রান্তি অপনোদন করিয়া প্রাণ পাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। একদিন যেমন সাধু, সন্ন্যাসী, মোহন্ত দিবারাত্র এই ক্ষুদ্র বাড়ীটিতে ভীড় করিতেন, তেমনি শ্রীঅরবিন্দের শুভাগমনের পর ভারতের সর্ব্বত্র হইতে সর্ব্বহারা দেশ-সাধকদের ইহা হইল অবাধ আশ্রয়ক্ষেত্র। ইহার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন—কত নাম করিব—এই ক্ষেত্রে পদধূলি দিয়াছেন; আবার এই প্রাঙ্গণেই উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণ বৈঠক বসাইয়া ছদ্মচারী দেশকর্ম্মীদের মুক্তি দিয়া গিয়াছেন। দেশজননীর পূর্ণ-দৃষ্টি এই সঙ্ঘতীর্থে চিরদিন লীলায়িতা হইয়া উঠিয়াছে। আমি অপ্রত্যাশিত বন্ধুটির দিকে চাহিয়া বলিলাম "খুব পরিশ্রান্ত আপনি, বিশ্রাম করুন।" ইঁহারা আসিয়াছিলেন আমার নিকট বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের সুবিধার জন্য। আমি ইঁহাদের দিয়াছিলাম শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-যোগ। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর লইয়া ইঁহারা যখন আসিতেন, আমি তাঁহাদের নিরাপদ্ শ্রমাপনোদন ও সেবাদির ব্যবস্থার সঙ্গে অন্তরে উৎসর্গ-যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিতাম। আত্মসমর্পণের ঋঙ্মন্ত্র তাঁহাদের কর্ণপুটে ঝঙ্কার তুলিত। আর অলক্ষ্যে যে অনবদ্যা সেবার পবিত্র হস্তখানি চির উদ্যত থাকিত, তাহার স্পর্শ আজ পর্য্যন্ত কেহই বোধ হয় ভুলিতে পারেন নাই। সে যুগের সেই সকল দেশ-সাধনার পুরোহিতগণের সহিত দীর্ঘ দিন পরে আবার যখন সাক্ষাৎকার হইয়াছে, স্বতঃ-উৎসৃতা সে স্মৃতির কাহিনী তাঁহাদেরই কণ্ঠে শুনিয়া চক্ষুঃ আমার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন যে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক সমিতির একজন কর্ণধার। আমাকে সকলেই ভালবাসিতেন, এ আশ্রম ছিল তাঁহাদের শান্তি ও স্বাস্থ্যের পুণ্যতীর্থ।

সারা রাত্রি কাসিয়া-কাসিয়া বন্ধু মেঝের উপর গয়েরের স্তূপ জড় করিলেন। পরদিন প্রভাতে গৃহদেবী নির্ব্বিকার চিত্তে সকলের অলক্ষ্যে কখন যে তাহা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, তাহা জানিবার উপায় রহিল না।

নিরুপায়াবস্থায় আমার সেই বৈপ্লবিক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল—ইঁহারা যেমন করিয়া পারেন, শ্রীঅরবিন্দের জন্য প্রতি মাসে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। এই পৃথিবীতে কেহ কাহারও নিকট কিছুর জন্য ঋণী নহে। বর্ষণধারার ন্যায় ঈশ্বরের দান যখন নামিয়া আসে, মানুষ যন্ত্রস্বরূপ তাহা বহন করে তাঁহারই ইচ্ছায়। তবুও সেই কয় বৎসর শ্রীঅরবিন্দের ব্যয়ভারবহনের উপায় যাঁহাদের জীবন আশ্রয় করিয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, আমি তাঁহাদের প্রশংসা করিব, তাঁহারা চিরদিন আমার ধন্যবাদার্হ হইয়া থাকিবেন।

কথা শুনিয়া গৃহলক্ষ্মী প্রফুল্ল মুখে বলিলেন "নূতন সংসার পাতিয়া ভগবানের বাণী পাইয়াছ—তোমার সব কিছু আসিবে। এ কথায় বিশ্বাস হারাও কেন?"

আমি সজল নয়নে বলিলাম "জীবনের ধ্রুবতারা তুমি। কুটিল কণ্টকময় কর্ম্মক্ষেত্রে পথ হারাইলে আলো দিও, আনন্দ দিও।" ইহার পর শ্রীঅরবিন্দের পত্র পাইলাম। "Your money (by wire & letter) —clothes reached safely"—আনন্দে বুক ফুলিয়া উঠিল।

শ্রীঅরবিন্দের টাকার সুবিধা হইল; কিন্তু আমার অসুবিধার মাত্রা কিছু বাড়িয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দের অর্থ নিঃস্বার্থ দান-রূপে আমার নিকট উপস্থিত হইলেও, দেশের মুক্তিকামীদের দাবী অগ্রাহ্য করার মত দুর্ব্বুদ্ধি আমার ছিল না। এই কর্ম্মে আমি সহধর্ম্মিণীর সাহায্য পাইয়াছি প্রচুর। দিন নাই, রাত্রি নাই, নব-নব অতিথি-সমাগমে বাড়ীটা আমার উৎসবময় হইয়া থাকিত। ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যেও অতিথি-সৎকারের ত্রুটি হইত না। প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলাম "ধৈর্য্য ধর, সব আসিবে।" আমি স্থির হইয়া একাসনে দিবারাত্র শুধু দেখিতাম—অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি। প্রাতঃকালে দলে-দলে ভিখারী—কেহ নাম লইয়া, কেহ গান গাহিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইত। অন্নপূর্ণার মুষ্টিভিক্ষা কোন কারণে বারণ মানিত না; তার উপর ধর্ম্মের অতিথি, কর্ম্মের অতিথি, বিপ্লবের অতিথি—কেমন করিয়া

কি হয়, কিছুই আর বুঝিবার উপায় ছিল না। ক্রমে এমন হইল—রন্ধনশালার অগ্নি আর নির্ব্বাপিত হয় না। দিবারাত্র রন্ধনাদি চলিতেছে! এই অন্তহীন শ্রম তাঁহার একার উপর দিয়াই বহিত। নিজের ভোজনাদির সময় ছিল না, বিশ্রামেরও অবকাশ মিলিত না; কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতাম—প্রফুল্ল মুখে হাসির জ্যোৎস্না। তিনি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলিতেন না—নীরব নতমুখে মহাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আমি ভাবিতাম—এই প্রাণ ক্ষুদ্র সংসার-ক্ষেত্রে বন্দী থাকিতে পারে না বলিয়াই ভগবান্ দেশ-ব্রতসাধনার বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহাকে টানিয়া আনিয়াছেন—এ মহাব্রত কবে পূর্ণ হইবে কে জানে?

দেখিতে-দেখিতে দুই মাস অতিবাহিত হইল। শ্রীঅরবিন্দের মুরারি-পুকুরের বাগান বিক্রীত হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার অংশের কিছু টাকা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে টাকা তাঁহার নিকট পৌঁছায় নাই। আমার উপর তাগিদের ভার পড়িল। অতি কষ্টে কিছু টাকা আদায় হইয়াছিল। ইহার উপর এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের "সাগর সঙ্গীতের" ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দেওয়ায়, তিনি তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ মহাযোগী উমানাথ শঙ্করের ন্যায় একদিকে খুব উদাসীন হইলেও, অন্যদিকে বেশ হিসাবী লোক ছিলেন। তিনি টাকার দিকে খুব হুঁসিয়ার থাকিতে বলিতেন। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন "দেশহিতৈষীর উদর-গহ্বরে টাকা প্রবেশ করিলে, উহা উদ্গীর্ণ হওয়ার উপায় নাই।" তাঁহার অনেক টাকাই অর্দ্ধ পথে লোপাট হইয়া যাইত। তিনি তাই একবার দুঃখমিশ্রিত রহস্যচ্ছলে লিখিয়াছিলেন—"Philanthropic stomach digests sovereignly."

যাহা হউক, তিনি এই সময়ে মঁসিয়ে পল রিশারের সহিত পরামর্শ করিয়া একখানি দার্শনিক পত্র প্রকাশ করার অভিলাষ করেন। উহা ইংরাজী ও ফরাসী উভয় ভাষায় বাহির করার কথা হয়। ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার জন্য ইংরাজী ও ফরাসী দেশের জন্য ফ্রেঞ্চ ভাষায় বেদ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ, উপনিষদের অনুবাদ ও মর্ম্মার্থ, যোগ ও সাধন সম্বন্ধে আলোচনা প্রভৃতি এই পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর-ভাষ্যের মায়াবাদকে গোড়া হইতেই

নাকচ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ভিত্তির উপর নিজের অভিনবানুভূতি সকল প্রকাশ করিয়া, নূতন জীবনাদর্শ-প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই এই সময়ে বলিয়াছিলেন—"It will be the intellectual side of my work for the world."

শ্রীঅরবিন্দের এই কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁর অসাধারণ প্রতিভালোকে ভারতীয় যোগ ও দর্শন শাস্ত্রের যে অমর তত্ত্বরাজি প্রকাশিত ও সঞ্চিত হইয়াছিল, তিনি তাহা নিঃশেষে জগৎকে দান করিয়া অধ্যাত্মশক্তির নির্দ্দেশে অভাবনীয় পথের সন্ধানে অভিযান করিয়াছিলেন।

এই সময়ের আর দুই-একটা কথা না বলিলে, আমার জীবন-রঙ্গের আবর্ত্ত-ভেদ হয় না; তাই অতি সংক্ষেপে সেই যুগের কথাগুলি বলিতে হইতেছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুগগুরুর সঙ্কেতেই বিপ্লব-তন্ত্রের যে ভীম অগ্নি আমার ভিতর দিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা যখন সারা ভারতে প্রলয়-সৃষ্টির উপক্রম করিল, তখন শ্রীঅরবিন্দই হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "থাম, তন্ত্রসাধনার প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ না উহা বেদান্ত-প্রচারের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। তন্ত্রের লক্ষ্য—বেদান্তের প্রতিষ্ঠা। ইহার নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই। এক কথায়, ইহার প্রয়োজন আর এখন নাই বলিলেও চলে।" তিনি আমায় অতঃপর তাঁহার "আর্য্য" পত্রিকার গ্রাহক-সংগ্রহের আদেশ দিলেন। আমি এক সঙ্গে দুই শত "আর্য্য" চাহিলাম। তিনি আমার অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন "উগ্র রাষ্ট্রপন্থীদের মধ্যে "আর্য্য"-প্রচার হইলে, 'আর্য্যে'র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যাহারা বেদান্ত ও যোগের অনুরাগী, তাহাদের মধ্যেই "আর্য্য" প্রচারের চেষ্টা করিও।" তাঁহার এই সকল উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া, আমার তাৎকালীন বৈপ্লবিক সঙ্গিগণ একটু বিচলিত হইলেন। আমি কিন্তু নিজের উদ্দাম গতিপথ রোধ করিয়া, তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আমার অন্তরে এই যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিতেছিল, সহধর্ম্মিণী তাহার সংবাদ রাখিতেন না। বিন্দুমাত্র কাল তাঁহার সহিত আলাপালোচনারও অবকাশ ছিল না। যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'রাষ্ট্রনৈতিক তন্ত্রসাধনায়' সে যুগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সুগভীর আন্দোলন ও আলোচনায়

আমার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইত। তিনি গৃহদ্বারে কাণ পাতিয়া সব কিছু শুনিতেন; কিন্তু কি সমস্যার সমাধানে আমরা এমন ভাবে অভিনিবিষ্ট, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সুবিধা পাইলে জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমাদের মধ্যে এত তর্কযুদ্ধ কিসের জন্য ?"

আমার মুখে তখন হাসি ছিল না, আমি তখন অতি জটিল সমস্যাজালে জড়াইয়া পড়িয়াছি। শ্রীঅরবিন্দ পত্রিকাপ্রকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ, তিনি বেদান্তের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন জাতিগঠনে উদ্যত হইয়াছেন। আমি বাংলার বিপ্লবী দলের সম্পর্কে থাকায়, তাঁহার উপদেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সমতালে চলিতে পারিতেছি না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশ বিপ্লবী-নেতৃগণের কর্ম্ম-কৌশলে প্রায় অগ্নিক্ষেত্র-রূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ বহু দূরে। তিনি আমার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। তিনি একবার স্পষ্ট করিয়াই লিখিলেন: "I want now some breathing time, however brief which will enable me to accomplish the present stage which is the central of my advance......that is the first reason why I call a halt." আমার সহজ-জীবন-যাত্রার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আমায় আত্মসমর্পণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারই তর্জ্জনী-সঙ্কেতে বৈপ্লবিক তন্ত্রসাধনায় উদ্বুদ্ধ প্রাণে অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমার নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না; ছিল শুধু মন্ত্র ও সাধনা—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত পণ্ডিচারীতে পুনঃ সাক্ষাৎকার-কাল পর্য্যন্ত, তিনি যে আদেশ দিয়াছেন, সাফল্যে অথবা বিফলতায় আমি সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছি। তাঁর আদেশপালনের অক্ষমতাকে আমার মৃত্যুর ন্যায় মনে হইত। তাঁর কাজে রত থাকাই জীবনের সর্ব্বার্থসিদ্ধি বলিয়া মনে হইয়াছিল। আজ অকস্মাৎ প্রগতিশীল জীবনের অগ্নি-গতি রুদ্ধ করিয়া তিনি সুস্পষ্ট কণ্ঠে হাঁকিলেন "দাঁড়াও"। আমার পশ্চাৎ তখন প্রচণ্ড গতিবেগ লইয়া রুদ্রবাহিনী ছুটিতেছিল; তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা তখন যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তিনি হয়তো তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাই ইহার পর কোন-কোন কার্য্যে তাঁহার লেখনী-মুখে লঘু তিরস্কার আমার

বুকে খোঁচা দিয়াছে। আমি বুঝিলাম—যোদ্ধার হস্তের তরবারির ন্যায় আমি যন্ত্র মাত্র। তাঁর প্রয়োজন যখন শেষ হইয়াছে, আমায় এক মুহূর্ত্তেই অচল-স্তব্ধ হইতে হইবে। কিন্তু মানুষ একটা জড়যন্ত্র নয়, সজীব বস্তু। তাই জীবনের প্রচণ্ড-গতি সামলাইতে আমায় আরও একটী বৎসর অতিশয় চিত্তক্লেশ লইয়া চলিতে হইয়াছিল। জীবনের এই সন্ধিক্ষণ কিরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলিবার ভাষা নাই। আমার অবস্থা যে ভাল নহে, স্ত্রী তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। সময় পাইলেই করুণ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "আজকাল তুমি কেমন হইয়া যাইতেছ—আমায় আর কোন কথা বল না!"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিতাম "এসব কথা শুনিবার মত অবস্থা তোমার নয়, আমি ক্রমেই তোমার সীমার বাহিরে আসিয়া পড়িতেছি।"

তিনি হাতের কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িতেন, বলিতেন "আমায় পর করিয়া তোমার কোন কাজ সিদ্ধ হইবে না। আমাকে বলিতেই হইবে তোমার অবস্থার কথা।"

আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখেব দিকে চাহিয়া ভাবিতাম—এই গৃহাঙ্গনা বর্ত্তমান গুরু-সমস্যার সমাধানে কি কাজে লাগিবে? তাঁহাকে এই সকল কথা জানাইয়া লাভ কি? ইহাতে তাঁহাব দুর্ভাবনাই বাড়িবে।

কিন্তু তিনি আমাকে নীরব থাকিতে দিতেন না। গৃহস্থালীর সকল কাজ ফেলিয়া, আমার পা দুইটা কোলের উপর তুলিয়া বলিতেন "ছাই খাওয়া-দাওয়ার কাজ, তোমার মুখ চাহিয়াই আমার জীবন; তোমার কাজের জন্যই আমার এই তপস্যা, আমার এই শ্রম। আমার সঙ্গে তোমার যদি ভেদ ঘটে, তোমার কথা আমি যদি জানিতে না পারি, এত খাটুনী কি শরীর সহিয়া নিবে?" তাঁহার সে আকূতি উপেক্ষা করার উপায় ছিল না, আমি তাঁহাকে সব কথাই বলিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহাকে জানাইলাম—শ্রীঅরবিন্দের নূতন নির্দ্দেশ লইয়া আমার সঙ্গীদের মধ্যে যে বিক্ষোভ-সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উপশান্ত করার মত পথ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

যখনই আমি সমস্যার অন্ধকারে ডুবিয়া যাই, আর তাহা হইতে মুক্তির পথ অন্বেষণ করিতে গিয়া আঁধারের মাত্রাই বাড়াই, তখন দেখি—কি এক

দৈবীশক্তি তাঁহার হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়—তাঁহার চক্ষের দীপ্তি, কণ্ঠের বাণী আমার মনের আঁধার দূর করিয়া দেয়। আমি বহু বার উহা দেখিয়াছি; কিন্তু প্রতি বার উহা উপেক্ষা করিতেও কসুর করি নাই।

তিনি সব কথা স্থির হইয়া শুনিয়া বলিলেন "অরবিন্দ ঠিক কথাই বলিয়াছেন। তোমার এ কাজ নয়! তবুও যে এতদিন তিনি তোমায় ইহা হইতে বিরত করেন নাই, বরং এই কাজে উৎসাহ দিয়াছেন, সে কেবল তোমার বাহিরের চাঞ্চল্য দেখিয়া। তোমায় অরবিন্দের পথই লইতে হইবে।" নির্ভুল প্রত্যাদেশের বাণী তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। আমিও জানি—আমার এ কাজ নহে। "যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি"—এই মন্ত্রই আমি পালন করিতেছি। কোথাও কাপট্য রাখি নাই। কোন স্বার্থে পাছে জড়াইয়া পড়ি, এই জন্য দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ব্যবস্থার ভার সম্পূর্ণভাবে রামেশ্বরের হাতেই ন্যস্ত। রামেশ্বরের সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা আমায় তৃপ্তি দিত। এই সংসারের সকল কর্তৃত্ব তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া, আমি এক প্রকার নিঃসঙ্গ নির্ব্বিকার চিত্তে গান গাহিতাম—'তাঁরই কাজে আছি রত, আর কিছু জানি না রে!' কর্ম্মে কিন্তু কোথাও ত্রুটি রাখিতাম না। একদিন শ্রীঅরবিন্দই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া আমায় যে ক্রিয়া-যোগের অনুষ্ঠান দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আজ তিনি আমায় সম্পূর্ণরূপে বিরত করিয়া বেদান্তের আশ্রয়ে নিখিল মানবজাতির কল্যাণ-মন্ত্রে অভিষিক্ত করিতে চাহিতেছেন। সহধর্ম্মিণীর চক্ষের দৃষ্টিতে, কণ্ঠের ভাষায় তাহাই সমর্থিত হইল। যে সমস্যার জাল হৃদয়ে আমার ঘনাইয়া উঠিতেছিল, এক মুহূর্ত্তে তাহা বিদীর্ণ করিয়া স্থির সঙ্কল্পের হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। গীতার আশ্বাসবাণী অগ্নিময় অক্ষরে আমার কাছে অভিনব মর্ম্মার্থ ফুটাইয়া তুলিল "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে সার্ব্বিয়ার অন্তর্গত সেরাজেভো নগরে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নী নিহত হওয়ার ফলে, আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ইউরোপে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। এই বৎসরেরই ১৫ই আগষ্টে ৬২ পাতায় 'আর্য্য' পত্র মঁসিয়ে রিশার ও মাদাম রিশারের সহযোগিতায় শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় বাহির হয়। 'আর্য্য'-এ প্রকাশিত

দিব্যজীবনের তত্ত্বদর্শন, বেদের রহস্য, উপনিষদের বাণী, যোগ-সমন্বয় প্রভৃতি সন্দর্ভ এক্ষণে আমাদের আলোচনার বস্তু হইল। এই সময়ে স্বদেশী যুগ হইতে যে সকল তরুণ আমার সান্নিধ্যে আসিয়াছিল, দিবাভাগে তাহাদের সহিত 'আর্য্য' লইয়া আলোচনা চলিত; আর বর্ষার ঘন ঘটায় দুর্য্যোগময়ী রজনী আসিলে, বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর বিপ্লবীরা আসিয়া এই সুযোগে তাঁহাদের কর্ত্তব্য লইয়া গভীর-গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতেন। একদিকে বেদ ও বেদান্ত; অপর দিকে জীবন্ত বিপ্লব-তন্ত্রের ক্রিয়া। কি মহাশক্তি যে আমায় সেদিন সব্যসাচীর ন্যায় একদিকে অমিশ্র ভবিষ্য-যুগসৃষ্টি, অন্যদিকে বর্ত্তমান যুগের যবনিকা-ক্ষেপণ করিতে সহায় হইয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। দিবারাত্র দর্শন, সাহিত্য আর বিপ্লবের যুক্তিতর্কে কণ্ঠনালী আমার আড়ষ্ট হইয়া উঠিত। অলক্ষ্যে সহানুভূতির অশ্রুসিক্ত চক্ষে আমার হৃদয় শান্তি-সুধায় অভিষিক্ত করিতেন যিনি, তাঁর সেদিনের অন্তরের আকুতি উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। শ্রমের অন্ত ছিল না, কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের বুদ্ধি হার মানিয়া প্রতি পদ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিত।

চন্দননগরে ইংরাজ গুপ্তচরদিগের সতর্ক পাহারায় গোপন মন্ত্রণা-বৈঠক দুঃসাধ্য ছিল। স্থির হইল—উত্তরপাড়ার এক অব্যবহার্য্য প্রাচীন ভগ্ন ঘাটের যে ক্ষুদ্র কুটুরীটি এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করে, সেইখানে সকলে উপনীত হইয়া ইউরোপের এই মহাযুদ্ধে ভারতের বিপ্লবীদের কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইবে।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশে মেঘ কালি লেপিয়া দিয়াছে। সারা দিনের অজস্র বর্ষণে পথ কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল। আমি বাহির হইলাম। পত্নীর কাছে আর কোন কথা গোপন ছিল না। তিনি আমার কাজে বাধা ছিলেন না কোনদিনই—শুধু বিষণ্নমুখে বলিলেন "এই দুর্য্যোগে নৌকাপথ ব্যতীত অন্য উপায়ে কি যাওয়া চলিবে না?"

আমি বলিলাম "না, কোন পথই নিরাপদ্ নহে; তুমি কি বিপদের আশঙ্কা করিতেছ?"

তিনি বলিলেন "বিপদ্ তোমায় স্পর্শ করিবে না, তাহা আমি জানি। তবুও একা পথে যদি কষ্ট হয়, ঝড়-তুফান উঠে!"

আমি "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি" বলিয়া নৌকা-পথে উত্তরপাড়ায় উপনীত হইলাম।

বিপুল অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষের আড়ালে অর্দ্ধভগ্ন কুটিরীর মধ্যে সেদিন পরিচিত অনেক বন্ধুকেই দেখিলাম। আজ কেহ বাঁচিয়া আছেন, কেহ নাই। মনে পড়ে আজ যিনি মানবেন্দ্র, ওরফে নরেন্দ্রনাথ, তিনিও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সেদিনের সকল কথা অবশ্য এই ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। রাত্রি-শেষে বর্ষার কোটালে গঙ্গাস্রোতঃ দুই কূল উপচাইয়া ছুটিতেছে। প্রচণ্ড দক্ষিণা-বাতাসে পাল তুলিয়া নৌকা নক্ষত্রবেগে ছুটিল। বাড়ী পৌঁছিলাম অতি প্রত্যূষে। নিদ্রাহীন দুটি আঁখি আমার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত। তিনি আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। সেদিন ভাবি নাই, কে এই দুরন্তের পৃষ্ঠ রক্ষা করে। আজ মধ্যে-মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে সাধ যায় "কে তুমি মহাদেবি, আজ মৃত্যুর পারে বসিয়াও আমায় সান্ত্বনা দাও? অন্ধকারে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া রাখ?"

সেদিনও বাংলার প্রগতিপন্থী রাষ্ট্রসাধকগণ মনে করিয়াছিলেন—ইউরোপের যুদ্ধে ইংরাজ যত জড়াইয়া পড়িবে, ভারতের মুক্তি-দাবী তত প্রবল করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহা উপেক্ষা করার সাধ্য রাজশক্তির হইবে না। বাংলার তাৎকালীন বিপ্লবপন্থীরা এই আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, বাংলার জেলায় জেলায় দল গড়ার কাজে লাগিয়া গেল। প্রকৃতির রহস্যময়ী নীতি এমন ঘটনার সৃষ্টি করিল, যাহার জন্য এই সময়ে বাংলার সর্ব্বশ্রেণীর বিপ্লবী দল আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন। অন্তর বাধাহীন ছিল না; বাহিরে কিন্তু এই প্রবল উত্তেজনাস্রোতঃ ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। অন্তরে অনুভব করিতাম—জাতির মধ্যে অন্ততঃ এমন একটা সমষ্টি গড়িয়া উঠার দরকার, যে সমষ্টির উন্নত চেতনান্তরে ভারতের স্বাধীনতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। কিন্তু তেমন সম্ভাবনা সেদিন কোথাও ঘটিয়া উঠে নাই। তাই স্বাধীনতার স্বপ্ন সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু বন্ধুদের চক্ষের সম্মুখে আসন্ন মুক্তি-চিত্র সেদিন এমন ভাবে ঝলসিত হইয়া উঠিল, সেখানে কোন যুক্তি কার্য্যকরী হইবার নহে। অন্তর-পুরুষ দ্রষ্টার আসন লইয়া বসিল, বাহিরের সবখানি দেশব্রতীদের ইচ্ছানুসরণ করিয়া চলিল।

ঈশ্বরের বিধান অতিক্রম করার সাধ্য কাহারও নাই, এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিপৎসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম।

সাধনার অনেক কথা বলিতে পারি নাই। অনেক কিছু অপ্রকাশ থাকিয়া গেল। বাংলার এই বিপ্লবযুগের ইতিহাসও তেমনই প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। ইহাও চিরদিন হয়ত গোপন থাকিয়াই যাইবে; কেন-না ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার বিপ্লব-যুগের পরিপূর্ণ ইতিহাস অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয় জাগরণের পর বাংলার বিপ্লব-যুগের একটী প্রলয়ঙ্কর অঙ্কের যবনিকাপাত এই সময়ে হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে ধরণের মনোবৃত্তির উপর বাংলার বিপ্লব-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল, অতঃপর তাহার আর খোঁজ পাওয়া যায় না। যে মেধা ও মস্তিষ্ক লইয়া বাংলার বৈপ্লবিক যুগের সূচনা, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পর তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

এই ইতিহাসের বিশদালোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার দুইটী কারণ আছে। প্রথম কারণ—সে যুগের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা বিজড়িত ছিলেন, তাঁহাদের ভাব ও আদর্শের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের টানিয়া আনা অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় হেতু—সে ব্যর্থতার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া অকারণ অর্ব্বাচীন যুগের তরুণ দলের পুনরায় বিপথে চলার প্রবৃত্তি-সৃষ্টি দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। তরলমতি তরুণেরা বিষয়ের অন্তর্নিহিত গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি না দিয়া, বিস্ময়কর বৈপ্লবিক কর্ম্ম-কৌশলের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। ইহা ব্যতীত আরও একটী কারণ—নীরব, মৌনবিগ্রহ, এক অতি অপ্রসিদ্ধ নারী-জীবনের যে পুণ্যকাহিনী অনুস্মরণ করিয়া এই বিষয়ের অবতারণা, শুধু তাঁর ভাব ও চরিত্র আমার জীবনের সংঘাতে যে-যে ঘটনায় প্রকাশ পাইতে পারে, তাহার অধিক ব্যক্ত করা শোভনীয় হইবে না বলিয়া মনে করি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে কাজের তাড়া প্রবল হইল। পুলিস অসতর্ক ছিল না; দেখিতে-দেখিতে আমি পুলিস প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া রাত্রিদিন এক প্রকার বন্দীর মত কাল কাটাইতে আরম্ভ করিলাম—কিন্তু কর্ম্মের তাগিদে তাহাদের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ করিয়া মধ্যে-মধ্যে আমায়

বাহিরে যাইতে হইত। এই বিপৎ-সঙ্কুল দিনে আমার বাহিরে যাওয়া ও পুনরায় নিরাপদে বাড়ী ফিরিয়া আসা, ইহার মধ্যে যে কালের ব্যবধান, উহা একজনের পক্ষে কিরূপ অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল, তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই ব্যক্তির দিকে চাহিয়া মর্ম্মে-মর্ম্মে এক করুণ সুর অনুভূতির তন্ত্রে জাগিয়া উঠিত। বহির্গমনের জন্য তাঁহার বিষণ্ণ মুখ ও সজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া কত বার বিরক্ত হইয়াছি। তিনি তাহা বুঝিতেন; বুঝিতেন বলিয়াই বলিতেন "তুমি বিরক্ত হইতেছ, কিন্তু আমি কি তোমার কাজে বাধা দিতেছি?"

আমি বলিতাম "বাধা দিতেছ বৈ কি, কত উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ লইয়া আমায় চলিতে হয়, আর প্রতি বার বাহির হওয়ার সময়ে তোমার এই ম্লান বিষণ্ণ মুখ হৃদয়ে কি যে আঘাত দেয়, কতখানি যে আমায় নিরুৎসাহ করে—ভাবিয়া দেখ কি?"

তিনি অঞ্চলে চক্ষুঃ মুছিয়া কখনও নীরব হইয়া থাকিতেন, কখনও বলিতেন "আমি যে কত বড় অসহায়া, তুমি বুঝিবে না। এই যাইতেছ, আবার যতক্ষণ না ফিরিয়া আইস, ততক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্ত দুশ্চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় বুকে আমার অন্ধকার ঘনাইয়া তুলে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়—সে বেদনা তুমি স্বামী হইয়াও বুঝ না, এই আমার দুঃখ!"

আমি বলিতাম "দেশের কাজে যাদের প্রাণ, তাদের এই বন্ধন শ্রেয়ঃ নয়। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তোমার একমাত্র আশ্রয়। বড় বিপদে পড়িয়াছি!"

তিনি এই কথায় বড় ক্ষুণ্ণ হইতেন, নিজেকে অপরাধী মনে করিতেন—মনে-মনে মৃত্যুচিন্তাও আসিত। তিনি বলিতেন "আমার জন্য তোমার বিপদ্—তাই ঈশ্বরকে বলি, যত শীঘ্র হয় এ বাধা দূর হোক। যাঁরা বড় কাজ করেন, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র না থাকাই ভাল। সত্যই তুমি একমাত্র আশ্রয়—দুর্ব্বল মন, ভয়ে প্রাণ অস্থির হয়। ঈশ্বর আছেন, তুমি বড় কাজ কর, আমি যেন শীঘ্র মুক্তি পাই—এই আশীর্ব্বাদ চাই।"

তাঁর ম্লান হাসি আমায় বিদায় দিত; বুকে কিন্তু ছুরি চলিত। কিন্তু এই অনুভূতি অধিকক্ষণ ভোগ করার সময় ছিল না—আমি বিদায় লইয়া কোন ঝোঁপের ধার দিয়া এঁদো পুকুরের পাড়ে উঠিয়া, গলি-ঘুঁজির পথে

চোরের মত ছুটিতাম, পুলিস-প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া। দুই ঘণ্টার রাস্তা ছয় ঘণ্টায় অতিক্রান্ত হইত। কলিকাতার ষ্টেশনে নামিবার কথা—দমদমায় নামিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিতাম। ফিরিবার সময়ে দুই-চারিটা ষ্টেশন দূরে নামিয়া, হাঁটিয়া-হাঁটিয়া অতিশয় ক্লান্ত দেহে গোপন-পথে বাড়ী ফিরিতাম। পথের যত ক্লান্তি, যত আতঙ্ক, সব মুছিয়া যাইত; কর্ম্মের গুরুত্ব লঘু হইয়া পড়িত—তাঁর অসীম আকুলতাপূর্ণ সজল নয়ন আমায় অভিষিক্ত করিত প্রতি ক্ষেত্রে। আজ ভাবি—এত বিপদ্ বরণ করিয়া এই নির্বিঘ্ন-জীবনযাত্রার মূলে ঈশ্বর-প্রসাদ দায়ী বটে, কিন্তু এই সতীকে আশ্রয় করিয়াই তাহা মূর্ত্তি লইত—উপলক্ষস্বরূপ এই আশ্রয়-তত্ত্বের মহিমা তাই বুঝি ভুলিবার নয়।

সে একদিন—আমারই বাড়ীতে এক বিষম সমস্যাপূর্ণ বিষয় লইয়া সভানুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যার পর হইতেই একজন, দুইজন করিয়া এমন কত বন্ধু উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের নৈশ-ভোজনের গুরুভার চিরদিনের ন্যায় তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যে গুরু-সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদের আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আর শেষ হয় না; কখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, বর্ষার আকাশে ঘনঘটায় কত চিকুর হানিয়া গিয়াছে; গুরু-গুরু বজ্রধ্বনি উঠিয়াছে, থামিয়াছে, কতবার ঝাঁপিয়া-ঝাঁপিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় শেষ হয়, আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলাম না। স্থির হইল—এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ লইয়া কার্য্য হইবে। সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সকলেই ক্ষুধাতুর। ইতিমধ্যে দরজায় হয় তো বহু বার কড়া নাড়ার শব্দ হইয়াছিল, সে মৃদু আহ্বান কর্ণে প্রবেশ করে নাই। নিশীথ রাত্রি, নিঃশব্দ পদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। অপ্রশস্ত রন্ধন-গৃহে মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিজা স্যাঁৎসেতে মেঝের উপর অঞ্চল বিছাইয়া স্তিমিত নেত্রে প্রফুল্ল কমল ঢলিয়া পড়িয়াছে। দিবারাত্রির শ্রমকাতর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসাদে শিথিল, শ্লথ। যেন অজস্র স্নিগ্ধ বারিপতনের আঘাতে লতাবল্লরীর ন্যায় তাঁর সবখানি অবনমিত, এলায়িত। নিদ্রা শ্রম-লাঘব করে। ইচ্ছা হইল না—এই শ্রান্তি-সুখে বাধা দিই। অনেক সময়ে তাঁহার

অতর্কিতে আমার সাধ্যমত যাহা, তাহা করার উপক্রম করিয়াছি ; কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার চক্ষুঃ পড়িয়া যায়—আমার উদ্যম প্রায় সর্ব্ব সময়েই ব্যর্থ হয়। দেখিলাম—রন্ধন-কর্ম্ম শেষ করিয়া, সব কিছু সুসজ্জিত রাখিয়া, অবসন্নতার ভার দেহখানি সহিতে না পারায়, তিনি ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। বর্ষাকালে রাত্রে ভোজনের জন্য খেচরান্নই হইয়াছিল। আমি সেই অন্নভাণ্ডটী ধীরে-ধীরে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার অতর্কিতে একটা বিরাট্ কর্ম্ম সমাধা করার বাহাদুরী লইবার জন্য হাঁড়ীর কাণাটী ধরিয়া দুই হস্তে যেমনই উঠাইতে যাইব, মুখের পাত্রটী সহসা অপসারিত হইয়া তাহা হইতে অত্যুষ্ণ বাষ্প উদ্গীর্ণ হইল, আমার হাত দুইটী তাহাতে প্রায় ঝলসিয়া গেল, মুখে একটা অব্যক্ত অস্ফুট চীৎকারও উঠিল। তাঁহার বিশ্রামসুখ-ভঙ্গ না করার জন্যই আমার এই সাধুপ্রয়াস, তাহা তিনি বুঝিলেন না—সুপ্তোত্থিতা হইয়া কটু ভর্ৎসনায় আমায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। আমি একেবারে চোরের ন্যায় হতভম্ব হইয়া 'ন-যযৌ ন-তস্থৌ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রথমেই হাত দুটা ধরিয়া তিনি আমায় বলিলেন "খুব জল্‌ছে তো! গরম ভাপ্ লেগেছে, জল্‌বে বৈ কি!" তিরস্কার বড় কটু কণ্ঠেই উচ্চারিত হইত। বিরক্তির সুর কাণে মধুবর্ষণ করে না। গজ্-গজ্ করিয়া সে যে কত কথা—সারা দিনের ক্লান্তি, সারা রাত্রির দুঃখ সব একত্র হওয়ায় তাঁহাকে সে রাত্রি বড় নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইল। "আমার এমন জীবন যদি, তবে বিবাহ করার কি প্রয়োজন ছিল?" "সারাদিন খাটিয়া রাত্রে যে দুই দণ্ড নিদ্রা যাইব, সে ভাগ্যও নাই।" "পয়সা-কড়ির দিকে খোঁজখবর নেই, যজ্ঞশালা খুলিয়া বসা হইয়াছে!" মুখে তাঁহার খৈ ফুটিতে লাগিল। আবার সঙ্গে-সঙ্গে স্পিরিটের বোতল আনিয়া আমার দুই হাতের উপর ঢালিতে-ঢালিতে তিনি বলিতে লাগিলেন "আমি মরিনি তো? ডাকিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত? ও সব সোহাগ দেখান নয় তো, আমায় জ্বালাতন করা!" গঞ্জনার বেদমন্ত্র নীরবেই সহ্য করিলাম। ওদিকে ক্ষুধাকাতর বন্ধুগণ বিলম্ব দেখিয়া হট্টগোল সুরু করিলেন। শেষে দশ-পনেরখানা হাত টেবিল চাপড়াইয়া বিজ্ঞপ্তি দিতে লাগিল "আমরা আর থাকিতে পারি না, অন্তঃপুরেই বোধ হয় খাওয়া করিতে হইবে।"

রঙ্গ দেখিয়া তিনি হাসিবেন কি কাঁদিবেন বোধহয় বুঝিতে পারিলেন না; শেষে হাসিয়াই ফেলিলেন, বলিলেন "ভাক, এত ক্ষণে বাকড় জলিয়াছে তবু ভাল! এদিকে ভোরও হইয়া আসে।"

বৈঠকখানায় যত বড় উৎসবই লাগিয়া থাকুক, রামেশ্বরের সুনিদ্রার ব্যাঘাত কিছুতেই হইত না। কিন্তু এত বড় একটা গোলযোগে তাহারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে নিদ্রোত্থিত হইয়াই বুঝিয়া লইল—ব্যাপারটা কি; তাহার পর যাহা হইবার, তাহাতে আমার আর প্রয়োজনই রহিল না।। অতি প্রত্যূষে ভোজনাদি সমাধা করিয়া, যাঁহাদের প্রস্থানের সুযোগ ছিল, তাঁহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন; অবশিষ্ট যাঁহারা রহিলেন, স্নিগ্ধ বর্ষার বাতাসে অঙ্গ মেলিয়া দালানে সারি-সারি শুইয়া পড়িলেন। নীরব-নিস্তব্ধ গৃহ-মন্দির, কে বলিবে কিছু পূর্ব্বে এখানে এত বড় একটা অভিনয় হইয়া গিয়াছে!

শ্রীঅরবিন্দের পত্র আসিল। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে আত্মগোপন করিলে, বাংলায় রাষ্ট্রনেতা বলিয়া কেহ ছিলেন না। বাংলার বিপ্লবপন্থীরাই দেশের রাষ্ট্রভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেন। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাংলা, এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিপ্লবপন্থীদের সংহতি একই ছত্রতলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাংলার ঢাকা, বরিশাল ও কলিকাতার ভিন্ন-ভিন্ন বিপ্লবী নেতারা এক হইয়া সেদিন শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশের প্রতীক্ষা করিতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, এই সময়ে ৫০ হাজার তরুণ বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেত পাইলে, একযোগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শ্রীঅরবিন্দ এই উগ্র রাষ্ট্রনীতির মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য এই সময়ে নূতন ঋক্-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিপ্লব-দল প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ হয়তো মনে করিয়াছিলেন—এই সকল তরুণ যদি তাহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুপথ পায়, তাঁহা হইলে ষড়যন্ত্রমূলক বিপ্লবপথ তাহারা পরিত্যাগ করিবে। এইজন্য তিনি বাংলা হইতে দুই সহস্র যুবকের সেবা-বাহিনী-গঠনের বাণী ঘোষণা করেন। কিন্তু তাৎকালীন দেশনেতাদের কণ্ঠে ইহাতে তেমন সাড়া উঠে নাই এবং যে কয়েক শত যুবক এই কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করার জন্য আবেদন করিয়াছিল, বাংলার তরুণ বিপ্লবীর

সংখ্যা তাহাদের মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়। অবস্থা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

সেবা-বাহিনী-গঠনের আহ্বান শুনিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাদের এই বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমরা এই সমস্যার সিদ্ধান্ত স্থির করার জন্য পূর্ব্বে এক পরামর্শ-সভার আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু আমরা সেদিন কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি নাই। শ্রীঅরবিন্দ যে সুস্পষ্ট অভিমত পত্রযোগে পাঠাইলেন, তাহা তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করিতেন এবং উদীয়মান জাতিকে কি ভাবে গড়ার আকৃতি রাখিতেন, এই পত্রখানিতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে—ইহা অবশ্য ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

তাঁহার সেই সুচিন্তিত ও সঙ্গতিপূর্ণ রাজনীতিক সিদ্ধান্ত আর অপ্রকাশ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে এবং এই পত্রের মধ্যে তাঁহার যে সঙ্কেতপূর্ণ ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশ ছিল, তাহা আমার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমি পত্রখানির মর্ম্ম যথাসম্ভব এইখানে সন্নিবেশিত করিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন "দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর যে নীতি, তাহা রাজভক্তিরই প্রেরণায়। ইহা বর্ত্তমান ভারতের পক্ষে উপযোগী নহে। বাংলার সেবা-বাহিনী-গঠন নিছক রাজভক্তিরই নিদর্শন, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর কর্ম্ম তবুও কতকটা নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-নীতি দ্বারা পরিশোধিত। দাসমনোবৃত্তির প্রকাশ রাষ্ট্রনীতিক কৌশল নহে, এবং ইহা আদৌ উত্তম-নীতি বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না। প্রতিপক্ষকে ইহার দ্বারা প্রতিহতও করা যায় না। শত্রু নিরস্ত্রও হয় না। বরং এই নীতির দ্বারা জাতির স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যই বাড়ে, আতঙ্কের সৃষ্টি হয়; পরাধীন পরপদলেহী জাতির হীন চাতুরীই ইহাতে প্রশ্রয় পায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল—তথাকার ভারতীয়েরা যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ সদয় ব্যবহার লাভ করে। অবশ্য এই কার্য্যের ফলে গান্ধীজির আরও বড় কিছুর প্রতীক্ষাও ছিল। কিন্তু ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী নহে। এখানে রাজভক্তিমূলক এম্বুলেন্স-দল-গঠন আমাদের আদৌ উপযোগী নহে। ভারতের সেবা-বাহিনী-গঠন করিয়া রাজভক্তি-প্রদর্শনের কোনই হেতু নাই।"

ইহার পর তিনি জাতির লক্ষ্য সম্বন্ধে অতি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য—কয়েকটা সুযোগ-সুবিধার অর্জ্জন নহে। আমাদের লক্ষ্য—স্বাধীন জাতির সংগঠন। ইংরাজীতেই তাঁর মূল বাণীটুকু উদ্ধৃত করি—"Not to secure a few privileges but to create a nation of men, fit for independence and able to secure and keep it."

এই পত্রে তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চারিটি নীতির নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন: প্রথমতঃ—চরম লক্ষ্য হইবে স্বাধীনতা (Eventual independence); দ্বিতীয়তঃ—যেখানে অধিকার নাই, সেখানে সহযোগিতাও নাই (No co-operation without control); তৃতীয়তঃ—কথায় ও কার্য্যে চাই পুরুষোচিত সাহস (A masculine courage in speech and action); এবং চতুর্থতঃ—প্রকৃত অধিকার পাইলে, তাহা গ্রহণ করার তৎপরতা এবং উহা যেটুকু, সেটুকুরই ঠিক মূল্য দেওয়া, তাহার একটুও বেশী নহে (Readiness to accept real concessions and pay their just price, but no more)।

স্বাধীনতা চরম লক্ষ্য রাখিয়াই জাতির জাগরণ। তিনি স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছিলেন "আমাদের স্বীকার করিতে হইবে—এই স্বাধীনতা এখনই সম্ভবপর নহে। ইহার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। ইতিমধ্যে কোন বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে বৃটিশশাসন-রক্ষার জন্য আমাদের উদ্যত থাকিতে হইবে। কারণ, ইহার দ্বারা নিজেদেরই ভবিষ্য-স্বাধীনতা রক্ষা করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট যদি স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী-গঠনে সম্মত হন, এমন কি বয়েস-স্কাউট-সংহৃতি-গঠনেও হস্ত প্রসারিত করেন, আমরা সেখানে দলে-দলে যোগ দিব। কিন্তু সেবা-বাহিনী-গঠনের ডাকে আমরা কোন মতেই সাড়া দিব না।"

বেলুড় মঠের শরৎ মহারাজ লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণাপত্র পড়িয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তরুণের সেবাবৃত্তির আদর্শপূর্ত্তি লক্ষ্যে রাখিয়া যুবকদের উৎসাহ দিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন "ইউরোপের রণক্ষেত্রে নির্ব্বাক্ আত্মবলির ভিতর দিয়া জাতির সেবাবৃত্তির

অনুশীলন কষ্টকল্পনা। সেবাবৃত্তির অনুশীলন আমরা জীবনের প্রতি পদে করিতে পারিব। ইউরোপের যুদ্ধে সামরিক শিক্ষালাভের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন আছে। যদি গভর্ণমেণ্ট টেরিটোরিয়াল্ আর্ম্মি অথবা স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী, এমন কি বয়েস-স্কাউট দলগঠনের অভিলাষী হন, আমরা ইহার পরিবর্ত্তে কোন প্রতিদানের দাবী করিব না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে —এক টেরিটোরিয়াল্‌স্ ছাড়া বয়েস-স্কাউট ও ভলাণ্টিয়ার দলের উপর সামরিক শাসন ভিন্ন গভর্ণমেণ্টের অন্য কোনই কর্তৃত্ব থাকিবে না।"

তাঁহার পত্র লইয়া সারা রাত্রি আবার বিচার-বিতর্ক চলিত। নানা চিন্তায় আমাদের চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। সেনাবাহিনী-গঠনের সঙ্কল্প গভর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেরই আর প্রয়োজন ছিল না। গভর্ণমেণ্ট যখন সেনাবাহিনী গঠন করিতে চাহিবেন, তখন ব্যাপারটা বুঝা যাইবে—এই স্থির করিয়া আমাদের সভার কার্য্য সেই রাত্রির মত শেষ হইল।

বর্ষার আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল। শারদ প্রভাতের অরুণবর্ণ সূর্য্যকিরণ দেখিয়া মনে পড়িল—বাংলার ঘরে-ঘরে এইবার মায়ের বোধনমন্ত্র উচ্চারিত হইবে। আমার শূন্য দালান দশভুজার আবির্ভাবে কি এবারও নবশ্রী ধারণ করিবে ?

দরিদ্রের সংসার—মহালয়ার পর প্রতিদিন প্রভাতে নূতন-নূতন রূপ লইয়া দেখা দেয়। রন্ধনশালা হইতে শয়নগৃহ, বৈঠকখানা, গৃহাঙ্গন সুনিপুণ করস্পর্শে অপূর্ব্ব-শ্রী ধরে। বর্ষার প্রভাতে মঙ্গল-ঘটে গঙ্গাবারি পূর্ণ করিয়া, প্রবেশদ্বার হইতে সর্ব্বত্র জলসেচনে তিনি অভিষিক্ত করিলেন। জগজ্জননী মহাদুর্গা আসিবেন, তাহারই আবাহন-পর্ব্বারম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মা আসিবেন, খবর পাইয়াছ নাকি ?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "মা আসিবেন না ? সারা বর্ষ ধরিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছি, মা আসিবেন। তাই কোথাও ময়লা না থাকে দেখিয়া বেড়াই।"

এক অপূর্ব্ব ভাব ! হউক কল্পনা, কিন্তু বাস্তব রূপের যে পবিত্র-দ্যোতনা

এই অনুভূতির স্পর্শে চক্ষে পড়িয়াছে, তাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। তবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মা আসিবেন, কোথায় গিয়াছিলেন? কোথা হইতেই বা আসিবেন?"

তিনি বলিলেন "তোমাদের বুদ্ধি আছে, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাস কম। তিনি আসিবেন সাড়া পাইতেছি, সংবাদ পাইতেছি, হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিতেছি; কোথা হইতে আসিবেন, সে উত্তর জানার আর দরকার কি?"

বাড়ীতে যখন প্রতিমা আসিত, তখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি, প্রতিমা আনার সাধ্য যখন রহিল না, সেদিনও মহাপূজার সময়ে তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি; আর আজ এ মন্দিরে মহাকালীর আসন পাতিয়া নিয়ত-পূজার যুগেও এই পর্ব্বকালে তাঁহার দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে ভাবিয়াছি—জীবনের তালে-তালে মহাকালীর যে চরণচ্ছন্দঃ, তাহা তো অনাহত; আজ অকস্মাৎ নূতন আবির্ভাবের মত দেবীর আগমন-কল্পনা মনের বিলাস নহে কি? কিন্তু সে রূপ দেখিয়া বিশ্বাস করিয়াছি—দেবী আসেন। ঘটে-পটে-প্রতিমায় তিনি হয়তো বিশেষভাবে, এই বিশেষ দিনে আবির্ভূতা হন। কিন্তু আমার এই জীবন্ত-প্রতিমায় পূজার যে ধূম দেখা দেয়, তাহা তো অস্বীকার করিতে পারি না! কালও তো এই লালিমা, এই ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্যে পড়ে নাই! সপ্তমীর প্রভাতে এই প্রতিমার আরও আনন্দময়ী মূর্ত্তি, অষ্টমীতে আরও, নবমীর প্রভাতে সে রূপশ্রী ইহাতে পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিবে। বর্ষে-বর্ষে ইহাই দেখিয়াছি। আজ আমার নূতন সংসারে তিনি কি অপূর্ব্ব-শ্রী ধরিবেন, তাহার জন্য চিত্ত আমার উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল।

তিনি প্রাঙ্গণময় জল ছড়াইতে-ছড়াইতে হাসিয়া বলিলেন "আজ মা আসিবেন, কিন্তু আমাদের বাড়ী নয়, হাড়ীদের বাড়ী দিন যাপন করিবেন। কাল প্রভাতে—বুঝেছ—"

সে আবেশবিভোর নয়নপল্লবে ভক্তিবিশ্বাসের ঝরণা যেন ঝরিয়া পড়ে। বহির্দ্বারে বামাকণ্ঠে কে বলিল "পেতে ধুচুনী লিবেক মা?"

মলিনবস্ত্রা, রুক্ষকেশা, কর্কশশ্রী হাড়ীর মেয়ে বাঁশের চাঁচ তুলিয়া ধুচুনী, পেতে, ফুলের সাজি কাঁকে-পিঠে করিয়া হাঁকিতেছে—"পেতে-ধুচুনি লিবেক মা?"

ওষ্ঠপুটে রহস্যময়ী হাসি! ষষ্ঠীর প্রভাতে পাঁচ পয়সায় একযোড়া পেতে

খরিদ করিয়া তিনি সগর্ব্বে অন্তঃপুরের দিকে প্রবেশ করিতে-করিতে বলিয়া গেলেন "আমার মা আসিতেছেন। এ পেতে কেনা নয়, পাঁচ পয়সা মায়ের পূজা দিলাম, বুঝ্‌লে!"

সারাদিন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় সে অনিন্দ্যমুখে লাবণ্যের তুলি আর এক পোঁচ কে যেন মাখাইয়া দিয়াছে! কলায়-কলায় চন্দ্রের সৌন্দর্য্যই বাড়ে, দেবীপক্ষের প্রতিদিন আমার গৃহ-দেবীর এই নব নব ভাবোন্মেষ ও সৌন্দর্য্যোন্মেষ অতি অপূর্ব্ব—অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে হৃদয় ভরাইয়া দেয়।

আমি নিঃস্ব, অর্থহীন। সংসারে থাকিতে প্রতি বৎসর এইদিন পূজার বাজার করিয়া আনিতাম। নূতন বস্ত্র প্রতি জনকে দিয়া, একখানি মনের মত লাল-পেড়ে শাড়ী তাঁহার করকমলে অর্পণ করিয়া মহাতৃপ্তি অনুভব করিতাম। দেবীর আগমনের এই ষষ্ঠী-সন্ধ্যায়, পরমানন্দের মধ্যে নয়নে বোধহয় অভাবের এক ফোঁটা অশ্রুও বাহির হইতে চাহিতেছিল। পলকে তিনি তাহা বুঝিয়া লইলেন। সন্ধ্যার প্রদীপে আজ যে আনন্দের শিখা জ্বলে, তাহাতে নিরানন্দের ছায়া কেন! তিনি প্রশ্ন করিলেন "তুমি বিষণ্ণ কেন?"

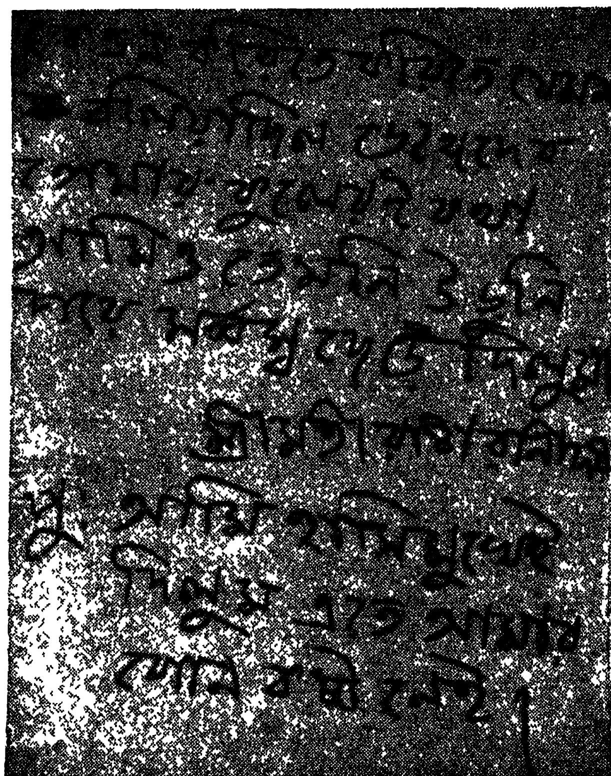
এই পূজার দিনে একখানি নব বস্ত্রের অতি ক্ষুদ্র দাবী আমার হৃদয়কে পীড়িত করিতেছিল। নিজেকে অকৃতার্থ মনে হইতেছিল। মানুষের এ দুর্ব্বলতা বুঝি বর্জ্জনের বস্তু নয়। আমার মনের কথা তিনি বাহির করিয়া লইলেন; তারপর সান্ধ্য-প্রণাম চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন "আমি তো কিছু চাহি না। কাছে বসিয়া আমার সময় নষ্ট করিও না, রাত্রির খাওয়া তো আছে!"

মৃদু হাসিয়া তিনি গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে অন্ধকারে পদচারণা করিতে-করিতে অনুচ্চ কণ্ঠে গাহিলাম:

"আমি ছিলাম গৃহবাসী,
করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি করিবি কেলে সর্ব্বনাশী—"

রাত্রি ঘন হইলে, বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছি—মাঝের দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া আওয়াজ হওয়ায় উঠিয়া গেলাম—তিনি হাতে দিলেন একখণ্ড

কাগজ। আলোয় মেলিয়া দেখিলাম—পেন্সিলে অস্পষ্ট বাঁকা-বাঁকা অক্ষরে এই কয় ছত্র লেখা :



হই আত্মসমর্পণযোগী—ঈশ্বরের যন্ত্র মেধা, হৃদয়, প্রাণ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র লিপিটুকুর মধ্যে আমার দারিদ্র্য-দুঃখের উপর যে অমৃতপ্রলেপ দিবার ব্যাকুলতা তাঁর হৃদয়ে রূপ-রসে সেদিন লীলায়িত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়া চক্ষের অশ্রু বারণ মানে নাই। পূজার দিনে নব-বস্ত্র দিবার যোগ্যতা স্বামীর নাই। পত্নীর প্রাণে সে দুঃখের তাড়না ক্ষুন্নতা আনিল না, রূপান্তরিতা হইয়া আমায় সান্ত্বনা দিল, এই শিক্ষাহীনা নারীর মহত্ত্বপূর্ণ হৃদয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। তাঁর কথাগুলির মধ্যে আমারই একটী কাহিনী নিহিত ছিল। সেইটী উপলক্ষ্য করিয়া তিনি জানাইয়াছেন—"তুমি

দুঃখ করিও না, আমি তোমার উড়ুনি পরিয়াই লজ্জানিবারণ করিব ; ইহাতে আমার কোন দুঃখ নাই, তোমার হাসিমুখই আমার জীবনের আলো ও আনন্দ।"

সপ্তমীর প্রভাতে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া অনুভব করিলাম —দেবী আসিয়াছেন বৈ কি, এত তৃপ্তি, এত প্রসন্নতা তাহা না হইলে কোথা হইতে আসিল ?

রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি চক্ষুঃ মুদিয়া শুইয়া থাকিতেন ; আমি নিদ্রাভঙ্গে বহির্ব্বাটী হইতে আসিয়া রুদ্ধদ্বারে টোকা মারিতাম। তিনি নিমীলিত চক্ষে খিল খুলিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিতেন "সাড়া দাও—তুমি তো ?" কত ব্যঙ্গ-কৌতুকের পর তিনি চক্ষুঃ উন্মীলিত করিতেন। প্রভাতে প্রথম দৃষ্টিটুকু স্বামীর জন্যই তাঁহার তোলা থাকিত। সপ্তমী-প্রভাতে মধুধারা বহিয়া গেল। আমি তাঁহার শয্যাধারে বসিলাম। আমি তখন কত কি ভাবিতেছিলাম !

—"ছোটদিদি, যাব ?"

মেজ-বৌয়ের কণ্ঠস্বর। মেজ-বৌ ঘরে প্রবেশ করিল। হাতে তার সিঁদুর, আল্‌তা, রুলি আর নব বস্ত্র। এক ছড়া ফুলের মালা আমার গলায় দোলাইয়া, সে ভূনত প্রণাম করিল। তারপর সে বসিল ছোটদিদির প্রসাধনে। সে অপার্থিব দর্শন, দুটা চোখে দেখা যায় না। আমি তাই বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম।

সপ্তমীর মধ্যাহ্নে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা। এত অমৃতাস্বাদ—মহেশ্বরীর প্রসাদ বৈ কি ! গৃহলক্ষ্মীর পরিধানে নববস্ত্র। চরণ অলক্তরঞ্জিত, ললাটে সিন্দুরবিন্দু। এই রূপ দেখিবার নহে, ধ্যানের। আমার সপ্তমীর রাত্রি নেশাখোরের মত বিভোর হইয়াই কাটিয়া গেল।

অষ্টমীর প্রভাতে মেজ-বৌ আসিয়া জানাইল "আজ ঠাকুরের নিমন্ত্রণ—মধ্যাহ্ন-ভোজনের।"

'ছোটদিদি' আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমার মুখে 'হাঁ-না' কিছুই নাই। আমার চিত্ত মহাদুর্গোৎসবের আনন্দে হারাইয়া গিয়াছে ! ভোজনের পর মেজ-বৌয়ের বাড়ী হইতে ফিরিলাম—নূতন ধুতি, নূতন চাদর, ললাট শ্বেতচন্দনলিপ্ত। তিনি দেখিয়া বলিলেন "মেজ-বৌ বড় হারাইয়াছে ; আচ্ছা দেখে' নেব, এক পৌষে জাড় পালায় না!" এই কথার অর্থ সেদিন বুঝি নাই।

পূজা শেষ হইল অন্তর্যোগে, অধ্যাত্মোপচারে—বুকে আঁকিয়া দিয়া গেল এক অভিনব চৈতন্যের অনুভূতি। সম্মুখে আসন্ন পরিবর্ত্তন-যুগ।

শরৎ গেল, হেমন্ত আসিল। ইউরোপের রণডঙ্কা কাণের কাছে আসিয়া বাজিতে লাগিল। আমার চিত্ত কিন্তু লাটু খাইতেছে পরমানন্দে—কোন এক উর্দ্ধ-চেতনার স্তরে। তারপর একদিন প্রভাতে শীতের আড়ষ্ট মূর্ত্তি কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিল—আমি আসিয়াছি জীবনের আর এক অঙ্কপাতের সূচনা হাতে করিয়া।

পিতৃদেব কয়েক দিন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। নানা উপসর্গ। চিকিৎসকেরা আসিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। পীড়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে কেহই রায় প্রকাশ করিলেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে ডাক আসিল; দেখিলাম—পিতার শূন্যে উর্দ্ধ-দৃষ্টি, নিথর শৈলখণ্ডেব ন্যায় শয্যাব উপর স্তব্ধ কলেবর। তাঁহার ললাটে হস্ত সঞ্চালন করিতে-করিতে বলিলাম "কেমন আছ?"

তিনি সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন "বস, কথা আছে।"

আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। তাঁহার কথা আশ্চর্য্যবৎ শুনিলাম। কোন যোগ্য পুত্রের সম্মুখে পিতা অকপটে জীবনের আত্মকাহিনী এমন করিয়া বলিতে পারেন, সে ধারণা আমার ছিল না। বলিতে-বলিতে তাঁহার নয়নপুটে যেন অশ্রুসাগব উথলিয়া উঠিতেছিল; আমিও নয়নবারি সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। সুকৃতি অপেক্ষা জীবনের দুষ্কৃতির দিক্‌টাই তিনি এমন আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছিলেন, যেন মনে হইতেছিল—কোন এক আগ্নেয়গিরি তাহার গর্ভস্থিত জ্বালাময় অংশটাকে নিঃশেষে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, চিরদিনের জন্য শান্তশীতল-মূর্ত্তি ধারণ করিতে চায়। ঠিক তাহাই হইল। তাঁহার কথা শেষ হইলে, দেখিলাম—তাঁহার ললাটে অরিষ্টযোগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যেন হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া, সন্তানের কাছে জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া আজ মুক্তিপ্রার্থী। শ্বাসকষ্ট লক্ষ্যে পড়িল। নাড়ী টিপিয়া স্পন্দনের ভেকগতি অনুভূত হইল। অগ্রজকে ডাকিলাম। বৈঠকখানায় কয়েক জন বন্ধু

বসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সব কথা বলিলাম। গৃহদেবী শুনিয়া বলিলেন "তুমি সব কাজেই বড় ব্যস্ত হও। এই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আসিয়াছি। তুমি জীয়ন্ত মানুষ মার্‌বে না কি?"

এ দুর্নাম আমার ছিল। রোগীর শুশ্রূষায় আমার বড় আনন্দ হইত। কিন্তু যেই আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখিতাম, আমি উতলা হইয়া উঠিতাম। মৃতদেহ লইয়া আত্মীয়-স্বজনের হাহাকার আমার ভাল লাগিত না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হইয়াছে, মুমূর্ষু ব্যক্তি আমার কাঁধের উপরই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িয়াছেন। অরিষ্টলক্ষণাদি আমার কিছু জানা ছিল। খুব জিদ্ হইল—পিতাকে আমি গৃহ-মধ্যে মরিতে দিব না। আমি তাঁহাকে সঙ্গীদের সাহায্যে বিছানাশুদ্ধ তুলিয়া লইলাম। তিনি কাতর-কণ্ঠে বলিলেন "কোথায় লইয়া যাও?" গৃহ হইতে বাহির করার সময়ে তিনি হাত বাড়াইয়া দরজার শিকল ধরিলেন। আমি ধীরে-ধীরে তাঁহার করমুষ্টি শিথিল করিয়া ছাড়াইয়া লইলাম। সিঁড়িতে নামিবার সময়ে তিনি আবার দরজার বাজু চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু আমার সহিষ্ণুতা ছিল না, অতি শীঘ্র যেন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে হইবে—এইরূপ প্রেরণার ঝঙ্কার অন্তরে উঠিতেছিল। বহিঃপ্রাঙ্গণে তাঁহাকে নামাইলাম, বলিলাম—"গৃহ-দেবতাকে প্রণাম করুন।" যোড় করে তাহা তিনি করিলেন। আমার স্ত্রী আসিয়া তাঁহার মুখে জল দিলেন, ললাটে চন্দন লেপিয়া তুলসীপত্র সাজাইয়া দিলেন। আমরা তারক-ব্রহ্ম নাম করিতে-করিতে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া আসিলাম।

পৌষ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। আকাশের চন্দ্র হিমজালে জড়াইয়া অপরূপ শোভা ধরিয়াছে। শষ্পাচ্ছাদিত গঙ্গাতটে আসিয়া আমরা তাঁহাকে ভূমিশয্যার উপর স্থাপন করিলাম। ঘন-ঘন শ্বাস লইতে-লইতে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন; আমি জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা কুহেলিকাময়ী গঙ্গা-ধারার দিকে সঙ্কেত করিয়া বলিলাম "ঐ কলুষনাশিনী জাহ্নবীধারা, আপনাকে এইবার আমি গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাইব।"

গঙ্গাসৈকতে তাঁহাকে শয়ান করাইলাম। শীতের শিহরণে ভাগীরথী শীর্ণকায়া হইয়াছেন। সবেমাত্র জোয়ার আসিতেছে। মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় গঙ্গাদেবী তটদেশে যেন সেইরূপ তরঙ্গোচ্ছ্বাসের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-

লীলারত। প্রথম একটি তরঙ্গ পিতৃদেবের চরণস্পর্শ করিল; তারপর একটী-একটী করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁহার চরণযুগল জাহ্নবীসলিলে নিমজ্জিত হইল। মুক্ত উদার চক্ষের চাহনি অনন্ত নীলের দিকে মেলিয়া সব স্থির হইয়া আসিতেছিল। উচ্চকণ্ঠে আমরা তখন নাম-কীর্ত্তন করিতেছি। অর্দ্ধ অঙ্গ জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ স্থলে, আর তালে-তালে ঈশ্বরীর নাম-কীর্ত্তে জীবের দেহান্তর—পূজনীয় জনকের এই মহামৃত্যুৎসব, আমি অসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া-বেড়িয়া গাহিতে লাগিলাম:

"জয় জগদীশ হরে।
জয় জগদীশ হরে।
জয় জগদীশ হরে॥"

পিতার জীবন-দীপ নিভিল। অতীতের অঙ্কপাত এইখানে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ জীবনের নূতন অঙ্ক সংযোজন করিল।

শ্মশান হইতে বাড়ী ফিরিলাম আর এক দুশ্চিন্তার ভার বহন করিয়া। অগ্রজের সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, এই কয় মাসের মধ্যে একমাত্র উপার্জ্জনের ক্ষেত্র কাঠের কারখানাটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় অগ্রজের অবস্থা চক্ষে পড়িল; বুঝিলাম—তিনিও কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার আমাদের বহন করিতে হয় নাই, সুহৃজ্জনের অর্থেই এই ক্ষেত্রে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। কিন্তু হিন্দুর পিতৃদায় বড় দায়। ভিতরের অবস্থা যাহাই হউক, বাহিরে নাম ও খ্যাতি যেরূপ আছে, তাহাতে পিতৃশ্রাদ্ধ নীরবে সম্পন্ন করার নয়। অগ্রজ জানাইলেন—তিনি এই বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য করিতে অক্ষম। আমিও একপ্রকার ভিক্ষুক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পিতৃদায় হইতে উদ্ধারের চিন্তায় আকুল হইলাম।

চিন্তা যখন সুরু হয়, হৃদয়ে যখন ভাবানুভূতি জাগে, তখন হৃদয় ও মস্তিষ্ক সকল প্রকার চিন্তা ও অনুভূতি হইতে মুক্ত হউক, এই ইচ্ছা যতই করি, ততই সেই সকল চিন্তা ও অনুভূতির স্রোতঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। ধ্যান করিতে বসিলে, কোন এক বিষয়ে চিন্তা-প্রবাহ ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা মস্তিষ্কে চলিতে থাকে। এই চিন্তা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া হৃদয়ে তদ্বিষয় সম্বন্ধে অনুভূতির সাড়া তুলে। সঙ্গে-সঙ্গে সমাধানের সূত্র

খুঁজিয়া পাই। আত্মসমর্পণের সাধনায় আমি সব কিছু হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অদৃশ্য শক্তির হাতে সমর্পণ করিতে পারি নাই। অন্তরেন্দ্রিয় প্রাণ, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি এক দিনের জন্যও নিষ্ক্রিয় জড়বৎ উদাসীন রাখিতে পারি নাই। যে নিথর-নিষ্ক্রিয় চিত্তপটে ঊর্দ্ধলোক হইতে জ্ঞান ও শক্তির অবতরণ ঘটিবার সম্ভাবনা শুনিয়াছি, সে অবস্থা আমার আত্মসমর্পণযোগে ঘটিয়া উঠে নাই। আমি কিছু করিতে চাহি নাই। যেমন পূর্ব্বে চলিতেছিলাম, আত্মসমর্পণের সাধনা গ্রহণ করিয়া তেমনই সব চলিতেছিল। আমি ভাবিতেছি, আমি করিতেছি, আমার অনুভূতি হইতেছে, এই চেতনাটা স্বতঃই উল্টাইয়া গিয়া অন্তর্জ্জগতের কোথাও একটা নূতন চেতনার স্তর গড়িয়া উঠিতেছিল মাত্র, যেখানে এই জ্ঞানই ঘনীভূত হইয়া যেন নিরন্তর বুঝাইয়া দিতেছিল যে, মস্তিষ্কে যে চিন্তাস্রোতঃ, চিত্ত-মন লইয়া যে অনুভূতির সাড়া, প্রাণে যে কর্ম্ম-প্রেরণা, তাহার কর্ত্তা আমি নহি। আমার মস্তিষ্ক লইয়া যে চিন্তা চলিতেছে, তাহা যেন আমার ক্রিয়া নহে, তেমনি উহা নিবারণ করার সাধ্যও আমার নাই। নয়নের দৃষ্টি যে দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপব নহে এবং আমিও তাহার জন্য দায়ী নহি। আমার এই চেতনায় অতীতে যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা চক্ষের উপরই ভাসিয়া আছে। আত্মসমর্পণের সাধনায় কি অন্তর্যন্ত্র, কি বহির্যন্ত্র কিছুতে অনুরক্ত বা কিছু হইতে বিরত হওয়ার জন্য আমার কোনই চেষ্টা ছিল না। ধ্যানের জগৎ এই সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হইত। হস্ত, পদ সঞ্চালিত হয়, চক্ষুঃকর্ণাদি নিজ-নিজ কর্ম্ম করে, প্রাণে কত কর্ম্মপ্রেরণা, চিত্তে কত নূতন ও পুরাতন সংস্কারের লীলাতরঙ্গ! মনের জগতে দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের কত চাঞ্চল্য! বুদ্ধির জগতে কত স্বপ্ন, কত কল্পনা! দিব্য হউক, আসুরিক হউক, সে বিচার আমার ছিল না। আমার যেখানে ধ্যান জমিত, সেই স্থান হইতে এই শরীর-মনের জগৎটা পৃথক্ হইয়া পড়িতেছিল। শরীর-মনকে আমি কোনদিন সংযত করি নাই, বশে আনিতে চাহি নাই। আত্মসমর্পণের সাধনায় এই আধার-যন্ত্রটা উৎসাহে ও আনন্দে যাহা খুশী করিত, এই সকলের উপর আমা হইতে স্বতন্ত্র কিছুর কর্ত্তৃত্বের জ্ঞানটা ভিতরের একটা জায়গায় পাকা হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে আত্মসমর্পণের সাধনা করিয়াছি, তাহাতে বিধিনিষেধের বাঁধনে আমার

এই আধারটা পরিবর্ত্তিত ও শোধিত হয় নাই। উহা বেপরোয়া উদ্দাম-ছন্দে নিরন্তর শক্তির দ্যোতনায় চালিত হইয়া যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ও হইতেছে। দুঃখের আবর্ত্তে পড়িলেও, আমি ভাবি নাই। আনন্দের আতিশয্যেও আমি আত্মহারা হই নাই। শাশ্বত সুখ যদি চরম সিদ্ধান্ত হয়, তাহা শরীর ও মনে আমি পাই নাই। পাইয়াছি শরীর-মন ছাড়া অন্যত্র। বিষয়টা ঘটনার সংঘাতেই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

বুদ্ধির দুশ্চিন্তার সীমা নাই। শ্রীভগবান্ই চিন্তা সুরু করিলেন। এই চিন্তার কারণ নাই। ইহার মূলে সর্ব্বনিয়ন্তার শক্তিই কার্য্য করিতেছে। চিন্তা বিষয় লইয়া, অথচ আমি নিঃস্ব কপর্দ্দকহীন। পিতৃদায় লইতে মুক্ত হইতে হইবে। ভার যাঁহার, তিনিই ভাবিতে লাগিলেন। মস্তিষ্কের ব্যথা ও ক্লান্তি, উহা মস্তিষ্ক-যন্ত্রেরই অক্ষমতা। ঈশ্বরের চিন্তাযন্ত্র ঈশ্বরই সর্ব্বসামর্থ্যে তাঁহার সিদ্ধ-চিন্তার উপযোগী করিয়া লইবেন। আত্মসমর্পণযোগীর আত্মকর্ম্ম নাই। সবই ঈশ্বর-কর্ম্ম, মল-মূত্র-ত্যাগ পর্য্যন্ত এই চেতনায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব পিতৃশ্রাদ্ধের চিন্তা ঈশ্বর-কর্ম্ম বৈ কি!

আমার মধ্যে চিন্তা হয়। চিন্তার সাফল্য-বিফলতা দুইই তরঙ্গের মত উঠিতে ও পড়িতে থাকে, সমস্যার আবর্ত্তে বুদ্ধিবৃত্তির ওলট-পালট চলিতেছে আমার মধ্যে। সমাধানের মূর্ত্তি সহধর্ম্মিণীর নয়নের আলোয়। তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভাবনায়-ভাবনায় চক্ষের কোলে কালি পড়িল যে! ভাবনা কিসের? রামচন্দ্র বালুর পিণ্ড দিয়াছিলেন। এক মুঠা তণ্ডুল কি যুটিবে না?"

চিন্তার মূর্ত্তি আছে, প্রেমের মূর্ত্তি আছে, কর্ম্মের মূর্ত্তি আছে। যখন চিন্তা হয়, তাহা বিশেষ-বিশেষ মূর্ত্তিযুক্ত। চিন্তা নানা প্রকারের। তাহার রূপও নানা ভঙ্গী ধরে। যখন বুকে ভালবাসা জাগে, তখন ভালবাসার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। ভালবাসারও প্রকারভেদ আছে—রূপভেদও অসঙ্গত নহে। প্রাণে কর্ম্মপ্রেরণার উদয়েও তাহার আর এক মূর্ত্তি। ভিতরে যাহা হয়, বাহিরে তাহারই অভিব্যক্তি। আমার দুশ্চিন্তার মূর্ত্তি আমার মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ের দেবী তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। এই চিন্তার রূপ ছিল অভাবাত্মক; কাজেই অভাবের মসীরেখা চক্ষের কোলে ছায়াপাত করিয়াছিল। চিন্তা হইতেছিল আমার মস্তিষ্কে, সমাধান মিলিল তাঁহার

নয়নে। এই কর্ম্ম আমার নহে, তাঁহারও নহে—শ্রীভগবানের। চিন্তাজগতে যিনি আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই তাহা নিস্তরঙ্গ করিয়া স্থির ও সমাহিত করিলেন। কি অতুলনীয়া প্রশান্তি!

পিতৃশ্রাদ্ধের কথা উঠিল আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্বর্গের মধ্যে। হিসাবের অঙ্ক কষা হইল। ষোড়শোপচারে পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হইবে, এক বাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থিত হইল। ইহাই ছিল ঈশ্বর-বিধান। যথাসময়ে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হইল। এই সময়ের এক প্রীতিময়ী স্মৃতির রেখা চিত্তে আঁকিয়া আছে। শ্রাদ্ধের পর নিয়ম-ভঙ্গ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবে বাড়ীখানি সমাকীর্ণ, রন্ধনক্রিয়ায় গৃহকর্ত্রী ব্যাপৃতা। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "দেখ, মেজদির আক্কেল দেখ—এতখানি বেলা হইল, তাহার আসিবার গা নাই। কুটুমের মত তাহার জন্য গাড়ী পাঠাইতে হইবে না কি? একবার দেখ তো!"

পৌষ মাসের বেলা এক প্রহর অতীত-প্রায়, কুয়াশা কাটাইয়া প্রখর রবি-করে ধরণী উদ্ভাসিতা। বৈঠকখানায় খোল-করতালে কীর্ত্তনের সুর উঠিয়াছে। দেবীব আদেশে আমি মেজ-বৌকে আনিতে চলিলাম। মুণ্ডিত মস্তক, মাথায় দীর্ঘকেশ সদ্যঃ চাঁচিয়া ফেলিয়াছি। শুভ্র ধুতি, শুভ্র চাদর। অতীতের বন্ধনমুক্ত। মুক্ত শুভ্র হৃদয়। মেজ-বৌকে আনিতে চলিলাম। দাসী ছিল, ভৃত্য ছিল; কাজের বাড়ীতে অসংখ্য বালক-বালিকা ছিল—গৃহস্বামীকে তিনি আনিতে পাঠাইলেন মেজ-বৌকে। আমি সকলের অগোচরেই বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমার তো কিছুই নহে। সবই ঈশ্বরের। পিতৃশ্রাদ্ধ ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পাদিত হইল। এই যে চরণ চলিয়াছে, তাহা ঈশ্বরশক্তিরই চালনায়। নয়নের দৃষ্টি ঈশ্বরের। হৃদয়ে কিসের ক্ষুধা জাগে, সে ক্ষুধাও আমার নহে। আমি শুধু দেখি, আমি শুধু অনুভব করি। সূর্য্যকরোজ্জ্বল পথের উপর দিয়া, বিভোর বিহ্বল চিত্তে চলিতেছিলাম মেজ-বৌয়ের বাড়ীর দিকে। হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া কার কণ্ঠ যেন বিগলিত সুরে গাহিতেছিল :

"ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ী মায়েরে জানে।

সে না যায় তীর্থ-পর্য্যটনে
কালী নাম বিনা না শোনে শ্রবণে'র্'
সন্ধ্যাপূজা কিছুই না মানে—
যা করান কালী, এই সে জানে।"

ভাবিতে-ভাবিতে মেজ-বৌয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। গৃহকর্ত্তা সাগরকালী বাবু যেন তাঁরই পিতৃশ্রাদ্ধে উদ্বুদ্ধ। শ্রাদ্ধের প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার-বহনের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ভার তাঁহারই উপর। তিনি আমারই বাড়ীতে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া আছেন। বাড়ী শূন্য। কেহ নাই। ইহাদের সংসারে এইরূপ ঔদাসীন্যেব ভাব নূতন নহে। সুতরাং বিস্ময়ের কিছুই নাই। আমি সোজাসুজি দ্বিতল কক্ষে গিয়া একখানি আরাম কেদারায় ঠেস দিয়া বসিলাম। অশৌচান্তে শ্রাদ্ধপর্ব্বে শবীরেব শ্রম কিছু হইয়াছিল, উৎসব-বাটীর কোলাহল এখানে ছিল না। বড নিরাপদ শান্তিময় স্থান। নিমীলিত নয়নে, বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পডিয়াছিলাম। হঠাৎ অন্তরে সুখকর স্পর্শ অনুভূত হইল। সহসা নয়ন উন্মীলিত কবিয়া দেখিলাম—এক অপরূপা নারীমূর্ত্তি। সদ্যঃস্নাতা, আলুলায়িতকুন্তলা, সমুজ্জ্বল-শ্যামবর্ণা, একখানি সুশোভন শাড়ী-পবিহিতা—আমার সম্মুখে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেন প্রস্তরপ্রতিমা। কোমল বাহু দুইটী আলম্বিত, স্থিত। মণিবন্ধে সুবর্ণ বাহুভূষণ, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর। আমি কুসুমোদ্যানে ফুলের সন্ধান পাইলাম না, সৌরভ প্রত্যক্ষ কবিলাম। নারীমূর্ত্তির বোধ আমার লুপ্ত হইল, আমি নারীত্বেব সন্দর্শন পাইলাম। বক্ত-মাংসের নহে—নারী-স্বরূপের!

কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! কেবল কর্ণে অকপট মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্রের ন্যায় একটী ধ্বনি পূতপরশ দিল "সুন্দব।"

কি সুন্দর? এ তো রূপের জয়গান নহে। মেজ-বৌ কি দেখিয়া আজিকার এই সন্ধিক্ষণে ত্র্যক্ষর স্তুতিমন্ত্র উচ্চারণ করিল। আমার অন্তর-বাহির চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নদীবক্ষের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। আমি যে কি করিব, অন্তর্লোকে তাহার একটা সঙ্কেত পাওয়ার জন্য প্রত্যেক স্নায়ুপেশী, রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত মাতাল হইয়া উঠিতেছিল। মেজ-বৌয়ের দৃষ্টি-সুধার মাদকতায় আমার স্থানকালপাত্র-জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইতেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটী মন্ত্র-শব্দ মেজ-বৌয়ের ওষ্ঠপুটে

উচ্চারিত হইয়া, আমায় স্থির সমাহিত করিয়া দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে মূর্ত্তিমতী নতি নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমার দিকে অশ্রুপুলকিত নয়নে চাহিয়া বলিল "ঠাকুর, তুমি কত সুন্দর!" আর তারপর তার মাথাটা আমার চরণ-যুগলে এলাইয়া পড়িল। জীবনে এই প্রথম দিন পরকীয়া রতির বিমল আত্মনিবেদনে উদ্বুদ্ধ হইলাম। আমার অন্তরদেবতা যেন এতদিন এই সোণার কাঠির পরশাভাবে ঝিমাইতেছিল। আজ মেজ-বৌয়ের ইন্দ্রজালে সে দেবতা মাথা তুলিয়া, শ্বাসে-শ্বাসে নবামৃত বুক ভরিয়া গ্রহণ করিল। যে ভাব অন্তরে গুমরিয়া মরিতেছিল, সেই মহাভাব গুরুমূর্ত্তি ধরিয়া মেজ-বৌয়ের শিরে দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়া যেন স্বীকার করিয়া লইল— 'তুমি আমার শিষ্যা, আর তুমি আমার যুগ-যুগের সহযাত্রী; আমাদের এই সম্বন্ধ অনন্তকালের জন্য।' ইহা যদি দীক্ষা হয়, তাহা হইলে মান্ত্রিকী দীক্ষার আর প্রয়োজন কি? মেজ-বৌ নবজন্ম লইল। তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী মুখশ্রী, আর দুই গণ্ডে বসুধারা সেদিন আর কেহ দেখে নাই; সে মন্দিরে সেদিন ছিল সে আর আমি!

উৎসব-বাটীতে দুইজনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহদেবীর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। মেজ-বৌ বেশ সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডলে কি এক অপার্থিব লাবণ্যের শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে রূপ লুকাইবার ছিল না। মেজ-বৌয়ের দিকে তিনি কয়েক মূহূর্ত্ত অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। অক্ষিগোলক সে চাহনিতে নিশ্চল ছিল না, থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। এক মূহূর্ত্তের জন্য ললাট তাঁহার কুঞ্চিত হইল। তিনি মেজ-বৌয়ের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, আমার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিলেন। আমি বেশ অনুভব করিলাম—আমাদের দেখিয়া তাঁহার অন্তর্জ্জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই সঙ্কেতের অর্থ কি ভাবে তিনি গ্রহণ করিলেন, তাহা বুঝা গেল না। কয়েক মূহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলাইয়া, অতি আপনার জনের উপর যে দাবীর কণ্ঠ উঠিতে পারে, সেইরূপ ভাবেই মেজ-বৌকে আদেশ করিলেন "যাও, দু'জনে গল্প-গুজব খুব হয়েছে দেখছি, এখন খানিকটা বাটনা বাট দেখি!"

নারীর ভাব নারী যেমন বুঝে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না। মেজ-বৌয়ের ভাবান্তর যেমন তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, তেমনি মেজ-বৌও তাঁহার অন্তরালোড়নের লক্ষণ বোধহয় ধরিতে পারিয়াছিল। মেজ-বৌয়ের জীবনে যে দিব্য চৈতন্যের স্রোতঃ বহিতেছিল, তাহাতে অভিষিক্তা হইয়া তার চিত্ত বুঝি বড় নির্ম্মল হইয়াছিল। যে নতি আমার চরণে নামাইয়া তার এই নব-দীক্ষা, সেই নতি উজাড় করিয়া সে ঢালিয়া দিল ছোটদিদির যুগল-চরণে। প্রাকৃত জগতের আপনার জনের স্পর্শ ও অনুভূতি একপ্রকার; কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রে আপনার যে হয়, তার অনুভূতি ও স্পর্শ কি অপ্রাকৃত আনন্দ-পূত, তাহা অনুভব্য, বর্ণনার বস্তু নহে। ছোটদিদির সহিত মেজ-বৌয়ের সংযুক্তি আমার চোখে মধুবর্ষণ করিল। আমি সেদিন বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সারা বেলা আনন্দে অধীর হইয়া বন্ধুদের সহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলাম—

"হরি যব আওঅব গোকুলপুর।
ঘরে-ঘরে বাজব মঙ্গল-তুর ॥"

তারপর যথারীতি ত্রিস্রোতের সঙ্গমস্থলে পূর্ব্বের ন্যায়ই নাকানী-চুবানী খাইতে লাগিলাম। একদিকে শ্রীঅরবিন্দের স্থির ও শান্ত অধ্যাত্মপ্রবাহ, অন্যদিকে বৈপ্লবিক প্রবল বন্যাস্রোতঃ; আর তালে-তালে বহিয়া চলে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের ফল্গুধারা। কোন্ টানে জীবনতরী ভাসিয়া যাইবে, তাহার দর্শনপ্রতীক্ষায় আমার ভিতরটা নীরব নিশ্চেষ্ট। শ্রীঅরবিন্দের "আর্য্য" আসিতেছে, যোগ-সমন্বয়ের বাণী ধারাবাহিকরূপে পড়িতেছি। গীতার সন্দর্ভ, বেদের নিগূঢ় রহস্য, উপনিষদের নূতন-ভাষ্য নিবিড়ভাবে আলোচনা করিতেছি। সঙ্গে-সঙ্গে আসন্ন বিপ্লবের রক্ত-পতাকা চক্ষুঃ ঝলসিয়া দিতেছে। জীবনের পশ্চাৎ শাশ্বত-সত্তার বিদ্যমানতা যদি স্বপ্ন হইত, সেদিন আমার অস্তিত্ব হয় ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইত, নতুবা বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া পথের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আদর্শ ও লক্ষ্যের এই দ্বন্দ্বযুগে বাহিরে যে ঝড় উঠিত, অন্তরের দেবতা তাহাতে যে অটল থাকিতেন, তার হেতু ছিল আমার চির-সহচরীর স্নেহশীতল সাহচর্য্য। অন্তর-পুরুষের নিকট তিনি যেন সতত নিমীলিত নেত্রে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ঢালিয়া,

পরম তৃপ্তি আস্বাদ করাইতেন। এই ঝটিকাবর্ত্ত বাহিরে উঠিয়া বাহিরেই শেষ হইয়া যাইত। দুশ্চিন্তা-কাতর নয়নে গৃহ-মন্দিরে দেবীর নিকট যখনই উপস্থিত হইতাম, স্মিতাননা ভরসা দিয়া বলিতেন "ঈশ্বরের বিধান শুভ ছাড়া অশুভ নহে। তাহা অতিক্রমের বস্তু নয়। তুমি সব জানিয়াও বড় ব্যস্ত হও। দুর্ভাবনা ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিও না।"

দেশের বিপ্লবীদের গোপন অনুষ্ঠান ও আয়োজনের কথা আমি সব জানিতাম। ভারতের সর্ব্বত্র কোন্ মুহূর্ত্তে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তিনি এই সকল বিষয়ের সবখানি অবগত ছিলেন না, শুধু নিরুদ্বেগ নয়নে স্বামীর কল্যাণ-কামনায় শীতল-স্নিগ্ধ দৃষ্টি সঞ্চারে আমি যে নিরাপদ, এই প্রত্যয়ই জাগাইয়া রাখিতেন। মধ্যাহ্নে সঙ্গিগণকে লইয়া আমি স্নানে বাহির হইতাম। শীতের রৌদ্র বড় মিষ্ট বোধ হইত। বালুতটে দাঁড়াইয়া কত সময়ে ভারতের বিপ্লবচিত্র কল্পনায় আঁকিয়া কত আলাপ-আলোচনা হইত! স্বপ্ন-নেত্রে আকাশের এক প্রান্তে শোণিতলিপ্ত মেঘোদয় দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতাম। গঙ্গাবারি যেন রক্ত-রঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইত। সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইত। এই দুঃস্বপ্ন অন্যের প্রাণে হর্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আমার কিন্তু এইরূপ চিন্তায় সবখানি বিষাদলিপ্ত হইত। মনে হইত—ভারত-দেবতার এই কর্ম্মে সমর্থন নাই। রৌদ্রের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া, তীরভূমির উপর নিজের ছায়ামূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতাম।

বহুক্ষণ আমাকে এইরূপ নীরব-নিস্তব্ধ দেখিয়া বন্ধুগণের চিত্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইত। আমাকে ঘিরিয়া তাহারা নীরবে বসিয়া থাকিত। আমি ধীরে-ধীরে নির্ম্মল নীলের দিকে চাহিয়া দেখিতাম—অনন্তের কোলে আমার ছায়ামূর্ত্তি সবখানি ছাইয়া প্রকট হইয়াছে। কিছুক্ষণ সে মূর্ত্তি অবিকল সুস্পষ্ট থাকিত, বিরাট্ রূপের কল্পনায় অন্তর্জ্জগতে তলাইয়া যাইতাম—অনিমেষ নয়ন ধীরে-ধীরে মুদিত হইত ছায়ামূর্ত্তির অস্পষ্টতার সঙ্গে। হাস্যমুখরিত কণ্ঠে স্নানঘাটে আসিতাম। জনশূন্য মধ্যাহ্নে গঙ্গাতটে দশ-বিশ জন বসিয়া যুক্তিতর্কের কোলাহল তুলিতাম। স্নান করিয়া ফিরিতাম আত্মস্থ যোগীর ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া। স্নান সারিয়া আসিতে অযথা বিলম্বের জন্য তিনি তিরস্কারোন্মুখ হইয়া

আমাদের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আর কিছু বলিতে পারিতেন না। হয়তো তিনি ভাবিতেন—কোন দুঃসংবাদ পাইয়া আমরা সুগভীর চিন্তামগ্ন। তিনিও গম্ভীর-বিষণ্ণ মুখে অতি সন্তর্পণে আমাদের সম্মুখে অন্নের থালি ধরিয়া দিতেন। সারারাত্রি এ গাম্ভীর্য্য হয়তো ভাঙ্গিত না। এই সময়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে অতি সতর্কতার সহিত তাঁর সংসারের সকল কর্ম্ম একে-একে সমাপন করার ছন্দোনৈপুণ্য আজও চিত্তে আমার অপূর্ব্ব ভাব জাগাইয়া তুলে। হঠাৎ আমাদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শুনিয়া তিনি আমায় বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনিতেন, জিজ্ঞাসা করিতেন "মাঝে মাঝে তোমাদের কি হয় বল দেখি ?"

আমি সবিস্ময়ে বলিতাম "কেন ?" তিনি বলিতেন "এই হাসিখুশী, তর্কাতর্কি, তারপর সব চুপচাপ। বুকে যেন কে ভাতের হাঁড়ী চাপাইয়া দিয়াছে ! আমি ভাবিয়া মরি—হয়তো বা কোন নূতন বিপদের সম্ভাবনায় তোমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছ। ক্রমে বুঝিতেছি—এই সব ভঙ্গী আমায় শুধু ভাবাইয়া তোলা।"

দিন হাসিকৌতুকেই কাটে বটে ; বিপদ্ কিন্তু পদে-পদে। বিপদের সাড়া যখন পাই, দৃঢ়চিত্ত হইয়া তাহার চরম কল্পনা করিয়া লই। বিপদের জন্য যখন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াই, দেখি বিপদ্ অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। সেদিন রাষ্ট্রবিপ্লবের বিপত্তি জীবনকে ঘিরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিত। জীবন-সংগ্রামে আজও অন্য বিপদ্ আসিয়া তেমনই পথ আগুলিয়া ধরে। আজও কি তুমি অশরীরিণী মূর্ত্তি ধরিয়া আমার চিত্তদৌর্ব্বল্যের অংশভাগ গ্রহণ কর ? আমার চেতনার ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাখ ?

কোথায় কি হয় জানিতে পারি না। গুপ্ত পুলিস-প্রহরীর কড়াকড়ি ক্রমেই বাড়িয়া উঠে। একজন সঙ্গী কোথা হইতে খবর পাইলেন—পথে বাহির হইলে, সকলের অজ্ঞাতে আমায় ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই জন্য ইংরাজ পুলিসের মোটরগাড়ীও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার পথে বাহির হওয়া বন্ধ হইল। আর একদিন খবর পাওয়া গেল—কয়দিন ধরিয়া স্নানের ঘাটে একখানা মোটর-লঞ্চ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্নানের সময়ে আমায় ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইংরাজ পুলিসের হাতে বন্দী হই না হই, স্ত্রীর নজরবন্দী প্রহরায় আমার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইল। সন্ধ্যার পর মেজ-বৌয়ের বাড়ী বেড়াইয়া আসার সুবিধাটুকুও হারাইতে হইল। মানুষ

অনন্যোপায় যখন হয়, তখন তাহার বাঁচিবার আশ্রয়স্বরূপ এক পরমোপায় লক্ষ্যে পড়ে। দিবারাত্রি এই বন্দিজীবনে করুণকণ্ঠে গান গাহিতাম, চক্ষে অশ্রু ঝড়িয়া পড়িত—

"আমার শুধু চেয়ে' থাকা,
কখন তোমার পাব দেখা!"

আজিও সেই একেন্দ্রিয় হইয়াই আছি। যাঁহার জন্য জীবন, দেখার মত দেখা যদি তাঁহার পাই, তবেই তো যোগ সিদ্ধ হয়, নতুবা আজীবন শুধুই শ্রম, শুধুই তপস্যা!

পুলিসের কঠোর-দৃষ্টি শুধু আমারই জীবনকে সঙ্কুচিত করিল না; ক্রমে দেখা গেল—যে কেহ আমার বাড়ীতে আসে, তাহারই পশ্চাৎ গুপ্ত পুলিস ধাওয়া করে। ক্রমে এমন হইল যে, শুধু আমার বাড়ী কেন, এই পথে লোক-চলাচলও কমিয়া গেল। আর আমার নিন্দা ও কুৎসা সর্ব্বত্র কে যে ছড়াইয়া দিতে লাগিল, তাহা জানিবার উপায় রহিল না। অনেক নিকট-বন্ধুও আমার নাম উঠিলে, অশ্রাব্য ভাষায় গালি পাড়িতেন। স্বদেশীর প্রতি জনসাধারণের যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল, পুলিসের কঠোর বিধানে তাহা এই সময়ে প্রায় নির্ম্মূল হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। আমার এক ভক্তশিষ্য "আর্য্য" পড়িতেন বলিয়া বাড়ীওয়ালা তাঁহাকে ঠাঁই দিতে চাহেন নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর পাইয়াছিলেন "এ, জি'র সাহিত্য পড়েন!" সেদিন শ্রীঅরবিন্দের নাম করিলেও, মানুষ আতঙ্কে মুখ ফিরাইয়া লইত।

দুঃখের কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানাইলাম। তিনি তদুত্তরে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমার সহকর্ম্মীদের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু আমার চৈতন্যসঞ্চার হইল। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ: "যুদ্ধের সময় হইতে আমাদের অবস্থা ক্রমেই বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়িতেছে। এখানকার শাসনযন্ত্র বর্ত্তমানে যে সকল অধস্তন কর্ম্মচারিগণের হস্তে পরিচালিত হইতেছে, তাহারা স্বভাবতঃই স্বদেশীদের প্রতিকূলে। আমি এই হেতু একেবারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছি। অতি নিরীহ লোকেদের সহিতও পত্র-ব্যবহার বন্ধ করিয়াছি। তোমার বিপদের মূলেও সম্ভবতঃ বড় কারণই আছে। যাহাতে শত্রুপক্ষীয়েরা আমাদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে

পারে, এমন কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে। তোমার পত্রগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া রাজসিকবৃত্তির লক্ষণ দেখিতেছি। ইহার কারণ আর অন্য কিছু নহে, বাংলার পুরাতন তন্ত্রসাধকদের সহিত তোমার নিবিড় সাহচর্য্য। ইহাতে আমাদের যোগের পথ বিঘ্নিত হইবে।"

এই পত্রখানি বাংলার বৈপ্লবিক জীবনের উপর ভীম বজ্রনিক্ষেপ করিয়াছিল। এই পত্রে তিনি নিজেকে আমার নিকট যেমন সুস্পষ্ট করিয়াছিলেন, এমন অতীতের কোন পত্রে করেন নাই। আমি ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয় লাভ করি; তারপর জীবন-মরণ-রঙ্গে অকাতরে নাচিয়াছি তাঁহারই অঙ্গুলীহেলনে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্ষুরধার পথে প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া চলার পশ্চাৎ শ্রীঅরবিন্দের অমোঘ নির্দ্দেশই ছিল। আজ তিনি আমায় অকস্মাৎ এক নিরাপদ্ ক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে চাহিলেন; আমার পূর্ব্বজীবনের অধ্যাত্মসাধন-বিজ্ঞানের অনুভূতি এই পত্র পড়িয়া আবার মধুর আকর্ষণ সঞ্চার করিল। ভাবিয়া লইলাম—যাঁর হাতে জীবনতরীর হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, বৈপ্লবিক উত্তাল তরঙ্গে তিনি এ তরী চালাইয়াছেন। সে দিনের নির্দ্দেশ অট্ট-অট্টহাসে মহাকালীর বজ্রধ্বনির ন্যায় যিনি শুনাইয়াছেন, আজ নব মূর্ত্তি ধরিয়া তিনিই এক নূতন যোগসাধনায় জীবনকে চালাইতে চাহেন। আপত্তি করিলে চলিবে না। এ দেহ, এ মন যন্ত্র। অহঙ্কার আজ দ্রষ্টার আসন লইয়াছে। যন্ত্রীর মূর্ত্তি—শ্রীঅরবিন্দ। তিনি আমার পুরুষোত্তম। তাঁহার বাণী আর উপেক্ষা করা চলিবে না। তিনি লিখিলেন "আমি আসিয়াছি ভারতের শক্তিশালী সন্তানদের ডাকিয়া আনিতে কৃষ্ণকালীর লীলাক্ষেত্রে। অতীতের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে। তাই বলিয়া আমি সাধুসন্ন্যাসীর মঠ গড়িতে চাহিতেছি না। মনে রাখিও—বৌদ্ধযুগের পর হইতে এইরূপ সন্ন্যাসমূলক আন্দোলন ভারতকে দুর্ব্বলতর করিয়াছে, এবং তাহার কারণ সুস্পষ্ট। জীবন মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া এক কথা এবং জীবনকে—ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিশ্বজনীন জীবনকে—মহত্তর ও দিব্যতর করা অন্য এক বস্তু। তুমি এক আদর্শবাদকে বড় করিতে পার না, অন্যকে দুর্ব্বল না করিয়া। তুমি জীবন হইতে উত্তম আত্মাগুলিকে সরাইয়া লইতে পার না। ইহাতে জীবন বৃহৎ ও বলপ্রদ হয় না। আমি জীবন হইতে মুক্তি চাহিতেছি না, অহঙ্কার হইতে

মুক্ত হইয়া জীবনেই ভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিতেছি। এই যোগই আমার শিক্ষার বিষয়। অন্য প্রকার ত্যাগ আমার যোগের প্রতিপাদ্য নহে।"

ইহার পর তিনি আমার কার্য্যে তীব্র নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন "তুমি তন্ত্র ও মন্ত্র, অনুষ্ঠান ও বেদান্ত এক সঙ্গে চালাইতে চাহ; আমার আপত্তি—তন্ত্রানুষ্ঠানের সহিত বেদান্ত একত্র চলিবে না। অবশ্য ইহার সমন্বয় সম্ভবপর, কিন্তু মিশ্রণ সমন্বয় নহে।" তারপর P. S. অর্থাৎ পুনশ্চ দিয়া আর একটু টিপ্পনীপূর্ব্বক তিনি বলিতেছেন "একটা জিনিষ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও—যে কাজ আমরা করিতে চাহিতেছি, ইহার ফল সে পর্য্যন্ত বৈষয়িক জগতে ফলপ্রসূ হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত না আমার অষ্টসিদ্ধি ততখানি প্রবল হয়, যতখানি হইলে এই বস্তুতন্ত্র মর্ত্ত্যের উপর উহা সমগ্রভাবে কলের মত কাজ করিতে পারে। তাহা এই অবস্থায় এখনও পৌঁছায় নাই। আমার পক্ষে অথবা তোমার পক্ষে, অথবা যে কোন লোকের পক্ষে রাজসিক ব্যস্ততা দূর হইলেই এই অষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে এবং ইহাই দিব্য যন্ত্রস্বরূপ অমোঘভাবে কার্য্য করিয়া চলিবে। আমার শিক্ষা যদি তুমি গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতে পার, তিক্ত অভিজ্ঞতার্জ্জনের জন্য সময় নষ্ট করিতে হইবে না।"

পত্র পড়িয়া হাসি পাইল। যে হস্ত স্রক্ ধারণ করিয়া ভারতের অতীতকে ফিরাইয়া আনিতে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, সেই হস্তে, হে দেবতা তুমিই তো ধ্বংসের বজ্র একদা তুলিয়া দিয়াছিলে! তান্ত্রিকেরা যেমন সুরার বিকল্পে গঙ্গোদক সেবন করে, তেমনই উহা তোমারই করুণায় হস্তে আমার বিধৃত রহিল। এ নিগূঢ় সাধন-রহস্য অবর্ণনীয়। আমার নিকট যাহা অনুকল্প, তাহাই প্রত্যক্ষ হইয়া দেশব্যাপী বিপ্লববাদের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাকে রাখিলে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক করিয়া। এই পত্রখানি হাতে লইয়া সেদিন জীবন-সহচরীর নিকট উপনীত হইলাম। মনে হইতে লাগিল—চতুর্দ্দিকে যে আতঙ্ক, বিভীষিকা, রক্তলাঞ্ছিত পতাকা, স্বপ্নে-কল্পনায় তাঁহার ঘন-ঘন হৃৎকম্পের কারণ হইয়াছিল, বিধাতার ইরম্মদ-গর্জ্জন শুনিয়া যে প্রাণ উত্তেজনাদৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে সতত সশঙ্ক করিয়া রাখিত, আজ তৎপরিবর্ত্তে বংশীবটে, স্বচ্ছসলিলা যমুনার পুলিনে, বিকশিত-কদম্ব-শোভিত মধুবনে

শ্যামরায়ের মধুর-মুরলী বাজিয়াছে। রুদ্রের ভৈরব তাণ্ডব-নৃত্য তিনি দেখিতে ভালবাসেন না, তাই কৃষ্ণ-কালীর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের অপরূপ লীলা-যুগ আমাদের সম্মুখে।

পত্রখানি আগাগোড়া অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। তাঁহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইল বটে! এ দীপ্তি রুদ্রকে দেখিয়াও প্রকাশ পাইত। এ যেন অসীম বারিধি। ঘটনার তারতম্যে এখানে চাঞ্চল্য নাই। তিনি হাসিলেন। এমন হাসি নূতন নহে। আমি যেন এই অসীম প্রেম-বারিধির চঞ্চল তরঙ্গ। উঠি, নামি ঘটনার আবর্ত্তে। অশেষ-ধৃতিসম্পন্ন এই নারীত্বের স্বমহিমায় অটল-প্রতিষ্ঠ রূপের কথা ভাবি—সাধ যায়, প্রতিমা যদি না ভাঙ্গিত, আজও বুঝি জীবনবেদী ফুলে-ফুলে নব শোভা ধারণ করিত।

বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু তাহার জের মিটাইতে আরও কয়েক বৎসর বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, 'ভারত-রক্ষা আইন' প্রবল হইলে, সেই পথে আমার বাড়ী বিপ্লবীদের কেল্লায় পরিণত হইয়াছিল। স্থান-সঙ্কুলানে অসমর্থ হইয়া, শেষে চন্দননগরের নানা স্থানে ইঁহাদের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই কার্য্যেও গৃহকর্ত্রীর এবং অন্যান্য বন্ধুগণের সাহায্য প্রচুর পাইয়াছিলাম, নতুবা এই দুরূহ কার্য্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হইত না। এই সকল কথা প্রয়োজন মত বলিব।

ব্যক্তিকে, জাতিকে, বিশ্বজনীন জীবনকে মহত্তর ও দিব্যতর করার অগ্নি-প্রেরণা আমার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। বৌদ্ধযুগ হইতে নির্ব্বাণবাদীর শূন্যবাদের পর মায়াবাদীর মোক্ষবাদ আশ্রয় করিয়া ভারতের জীবনের প্রতি যে গভীর ঔদাসীন্য, তাহারই সুদীর্ঘ ইতিহাস আমার চক্ষের সম্মুখে এই সময়ে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কুরুক্ষেত্র-মহাসংগ্রামের পর ভারত-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের প্রবাহ ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মহারাজ অশোকের নির্ব্বাণমুখী জীবন-যাত্রার আকাঙ্ক্ষা আমার চিত্তকে পীড়িত করিয়া তুলিল। এমন কি পাঠানগণ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত প্রতাপরুদ্রের রাজ্যাক্রমণকালে তাঁহার এই বিষয়ে ঔদাসীন্য জীবন-ধর্ম্মের

বিরোধী বলিয়া মনে হইল। পল্লীর পথে-পথে বৈরাগ্যের গান গাহিয়া ভিক্ষুব্রতী চারণেরা পল্লী-জীবনের আয়ুঃক্ষয় করে, এমন কথাই মনে হইতে লাগিল। আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে যদি কোন ভিখারী জীবনকে, জগৎকে মায়া বলিয়া ঈশ্বর-শরণের সঙ্কেত দিয়া সঙ্গীত করিত, আমি তাহা নিবারণ করিতাম। ভূতাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখার একটা প্রয়োজন আছে বটে, তবে তাহা মাত্র দার্শনিকের অনুভূতি। বস্তুতন্ত্র জীবনের সাধনা ইহা নহে। ভূতাত্মার সহিত পরমাত্মার যুক্তিই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। আর এই যুক্তির অভিব্যক্তিস্বরূপ বুদ্ধিতে জ্ঞানপ্রকাশ, হৃদয়ে প্রেমপ্রকাশ, প্রাণে শক্তিপ্রকাশ, দেহে সৌন্দর্য্যপ্রকাশ—ইহাই জীবের সাধ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

এই অনুভূতি ভারতধর্ম্মের স্বরূপ আমার বুকে জাগাইয়া তুলিল। বৌদ্ধ-যুগ, মায়াবাদ-প্রচারের যুগ আমার চক্ষে প্রতিক্রিয়ামূলক বলিয়াই প্রতিভাসিত হইল। কে যেন চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল—ভারতের ধর্ম্ম বেদ-প্রবর্ত্তিত। আর সেই বেদ ঈশ্বর-স্বীকৃতির ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—কর্ম্মে, জ্ঞানে ও উপাসনায়। ভারতের প্রাচীন-জাতি বেদের দিব্য আদর্শ জীবনে অনুবাদ করার জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রে রীতিনীতি, বিধি-নিষেধ-মূলক সূত্রের রচনা করিয়াছেন। ভারত-জাতির ইহাতেও মনস্তুষ্টি হয় নাই। বেদকে, স্মৃতিকে যুক্তি-তর্কের যন্ত্রে ফেলিয়া, সে ন্যায়শাস্ত্রে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে জীবন হইতে মুক্তির ব্যাখ্যা আমার মনে কু-ব্যাখ্যা বলিয়াই বোধ হইল। এ জাতি জীবনকে ইন্দ্রজাল বলিয়া উড়ায় নাই, জীবনকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম তুরীয় নহে—জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তি ও সৌন্দর্য্যে আমরা জীবনেরই জয়-কামনা চিরদিন করিয়াছি। এই অনুভূতির সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বেদচর্চ্চার আকূতি আমায় বেদাদি শাস্ত্রে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—"I have not seriously entered on in connection with the Veda and the sanskrit language. In that same connection will you please make a serious effort this time to get hold of Dutt's Bengalee translation of Rig-Veda and send it to me or any translation for that matter which gives the European version?"

ইহার মর্ম্ম—"বেদ এবং সংস্কৃত ভাষায় আমি গভীরভাবে প্রবেশ করি নাই, এইজন্য তুমি এই সময়ে অতিশয় প্রযত্নসহকারে দত্তের[১] ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, যাহাতে ইয়োরোপীয়ানদিগের বেদ-সম্বন্ধীয় মতবাদ পাওয়া যাইবে—পাঠাইয়া দিও।" এই সময়ে তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে থাকিয়াও, অন্য কোনদিকে লক্ষ্য না থাকায়, তাঁহার অন্তর্প্রেরণার সহিত নিজেকে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত মনে করিতাম—ইহা অন্তরে অশেষ তৃপ্তি দান করিত। 'আর্য্যে' বেদ-রহস্য বাহির হইলে, অতি মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতাম। হিন্দু-শাস্ত্রের প্রতি প্রবল অনুরাগ শ্রীঅরবিন্দের ইন্ধনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং শাস্ত্রাদির প্রাচীন ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তে নূতন ব্যাখ্যার আলো চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রবিবাসরের ছাত্রসভায় ধারাবাহিকভাবে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এক্ষণে উহা নূতনরূপে আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠিল। যতই শ্রীঅরবিন্দকে অন্তরে পাইতে থাকি, মস্তিষ্কে ততই যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে। উদ্দীপনায় সমস্ত শরীর নৃত্য করিতে থাকে। শাস্ত্রাদির নূতন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহার প্রচারাকাঙ্ক্ষা প্রাণকে ভাবাবেশে নাচাইয়া তুলে। তাঁহার আদেশ-বাণী যেন কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল। তাঁহার মূর্ত্তিও চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। বাহিরে শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত এই ভাবের সমর্থন আমি কোথাও পাই নাই; কিন্তু আমার নিকট এই ভাব আজও সত্য হইয়াই রহিয়া গিয়াছে। সে কথা এখন যাক্।

পরম সুহৃদের দান ক্ষুদ্র হইলেও, আমার অভাব এই সময়ে কিছুই ছিল না। শরীরধারণের জন্য এক মুষ্টি অন্ন ও লজ্জানিবারণের জন্য এক খণ্ড বস্ত্র আমি যথেষ্ট মনে করিতাম। আমার পত্নীও আমার ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত উড়ানীগুলি সংগ্রহ করিয়া লজ্জানিবারণে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কোন দুঃখই আমাদের ছিল না। মাত্র একমাস কাল এই অবস্থা ছিল। কর্ম্মপ্রেরণায় আমার পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভবপর হইল না—কর্ম্মসৃষ্টির জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তখনও জানিতাম—বিষয় ও অবিষয় লইয়া জগৎ। বিষয় ত্রিগুণাত্মক। নির্গুণ অবিষয়। পার্থকে শ্রীভগবান্ অবিষয়-বস্তুর সহিত যুক্তি লইয়া নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম

১। রমেশচন্দ্র দত্ত

ও আত্মবান্ হইতে বলিয়াছিলেন। অধীত জ্ঞান এক বস্তু, আর বাস্তব জীবনের ধর্ম্ম অন্য বস্তু। কর্ম্মপ্রেরণায় আমি বিষয়-সৃষ্টির পথেই প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইলাম। তবুও আজও আমি বিশ্বাস করি—যাহা কিছু হয়, যাহা কিছু করি, তাহা অধীত জ্ঞান অথবা সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারে নহে। ঈশ্বরই কর্ত্তা। তাঁহার ইচ্ছায় সব কিছু হয়। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলা সম্ভবপর নহে। বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তি পাইয়া, নূতন জীবনক্ষেত্রে পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মপ্রচেষ্টাই আমাকে পাইয়া বসিল।

আমার মনে হইতে লাগিল—অন্যে শ্রদ্ধা করিয়া যে অর্থ আমার জীবন-যাত্রার জন্য দান করে, তাহা অন্য কোন বৃহৎ কর্ম্মে ব্যয়িত হইবে, যদি আমার মধ্যে জীবন-যাপনের যে আয়াস, তাহা অবরুদ্ধ না রাখি। প্রত্যেক মানুষের যেটুকু প্রয়োজন, তাহা প্রত্যেক মানুষকে নিজেই মিটাইতে হইবে। কাহারও মধ্যে ঈশ্বর দীন-মূর্ত্তি ধরিয়া আবির্ভূত হন নাই। নিজের মধ্যে এইরূপ কর্ম্মপ্রেরণার অনুভূতি আরও একটি উদ্দেশ্য লইয়া আমায় অতিষ্ঠ করিয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন যে মূর্ত্তি ধরিল, তাহার সহিত আমার সংযুক্তি-রক্ষা যখন আর সম্ভবপর নহে, তখন শ্রীঅরবিন্দের জন্য যে মাসিক অর্থ-প্রেরণের ব্যবস্থা পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহাও স্বতঃই বন্ধ হইয়া আসিল। 'ভারত-রক্ষা আইনের' চাপে বিপ্লবীরাও ছন্নছাড়া হইতেছিল এবং আমারও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও সমর্থন না থাকিলে, উঁহাদের কাছ হইতেই বা অর্থসাহায্যগ্রহণ কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? অতএব স্বাবলম্বনের সাধনাই শ্রেয়ঃ করিলাম। সেদিন এই 'স্ব'-র সহিত শ্রীঅরবিন্দ সংযুক্ত ছিলেন; সেদিন জীবনের ছিল ইহাই রস, ইহাই আনন্দ। পরকে আপন করার সুপথ আমার মিলিয়াছিল। সাধন সিদ্ধ করার যোগ্য আশ্রয়ও আমি লাভ করিয়াছিলাম।

যাহা ঘটিতেছিল, তাহাই আমি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি; কোনরূপ কার্পণ্য বা সঙ্কোচ আমার নাই। কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, কোনরূপ দুর্ভাবনার প্রশ্রয় আমি দিতাম না—কোনরূপ বাধাও স্বীকার করিতাম না। সবই অনুকূল মনে হইত। প্রতিকূল কিছু চিন্তাক্ষেত্রে উদিত হইলে, তাহা আমি আমলে আনিতাম না। কেহ বিপরীত কিছু প্রকাশ করিলে, তাহাতে বড় একটা কাণ দিতাম না। কিন্তু একজন ছিলেন, যিনি আমার প্রতি কর্ম্মে

বাধাস্বরূপা হইতেন—ভাল হউক, মন্দ হউক, যে কোন কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হই, তাঁহার মুখে একটা বিরুদ্ধতার বাণী শুনিবই, ইহা আমি জানিতাম। সেদিন তাঁহার এই আচরণ আমি অতি বিরক্তির চক্ষে দেখিতাম এবং কটুভৎর্সনায় তাঁহাকে নিরস্ত করিতাম।

আজ ভাবিয়া দেখিতেছি—আমার উদ্দাম স্বাধীন জীবন বেগের প্রতিবাদী বা সমালোচক অন্য কেহ না থাকায়, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ম্ম করার যে সুফল, তাহা আমার ভাগ্যে মিলিত না—একমাত্র তাঁহারই ক্ষীণ প্রতিবাদ এইটুকু সুযোগ আমায় দিতে চাহিত। আজ তাহাই অনুভব করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই প্রতিবাদ ঈর্ষ্যার নহে, বিদ্রোহী মনোভাবের নহে, আমার কর্ম্ম-প্রেরণার সত্যতা-পরীক্ষার জন্যই বুঝি গতির প্রতি পদে তাঁহার কণ্ঠে প্রতিবাদেব সাড়া উঠিত। দুইজনেই যন্ত্র; যন্ত্রীকে সেদিন দুইজনেই এমন করিয়া চিনি নাই। প্রতি পদে সংঘাতই বাধিত অতি আপনাব জনের সঙ্গে। শেষে দুইজনের অশ্রু একত্র সম্মিলিত হইয়া সংযুক্ত প্রাণ জাগিয়া উঠিত—জীবনে অমৃত সঞ্চারিত হইত। কর্ম্মের সূত্রপাতে প্রতিবাদ, তারপব তাঁর অকৃত্রিম সাহচর্য্যে আমি সর্ব্বত্রই বিজয়ী হইতাম।

আমি বলিলাম "ব্যবসা করিব।" তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "ঝঞ্ঝাটে গিয়া কাজ নাই। বেশ আছি, বেশ আছ; সাধন-ভজন ভালই চলিবে। ব্যবসা করিবে কাহাব জন্য?"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম "পবমুখাপেক্ষী যে, তার জীবন শ্রেয়ঃ মনে করি না। নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইব।"

তিনি বলিলেন "কালীবাবু আমাদের পর নহেন। যেদিন পর মনে হইবে, সেদিন ব্যবস্থা করিও।"

কথা যত বাড়ে, বিরক্তিও ততই মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে। যাহা করিতে ইচ্ছা, তাহার পথে বাধা আমি আজও সহিতে পারি না। ইহার জন্য দেহমন শাস্তি পায় প্রচুর। কিন্তু তবুও আমি নিরুপায়। গোড়া হইতে স্বীকার করিয়াছি—কর্ত্তা শরীর বা মন নহে, নারায়ণ। একটি তৃণখণ্ডও তাঁর বিনা ইচ্ছায় নড়ে না। দুঃখ দেহ-মনের, তাহা স্থায়ী নহে। যাহা ঈশ্বরেচ্ছা নহে, তাহা হইবে কেন?—এই আমার বিশ্বাস। আমার জিদ্ দেখিয়া, তিনি

পথ ছাড়িয়া দিলেন। যাঁহার কণ্ঠে প্রতিবাদের বাণী উঠিয়াছিল, তিনিই আমার নূতন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান-গঠনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সহযোগিনী হইয়া দাঁড়াইলেন।

স্বাবলম্বী হইতে হইবে। নিজেকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। উপার্জ্জন করিয়াই শ্রীঅরবিন্দের দাবী পূরণ করিব। উৎসাহে, পুলকে আমার সর্ব্বশরীরে বিদ্যুৎ বহিতে লাগিল। অগ্রজের কাঠের কারবারে আমার অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহার কাজ বন্ধ হইয়াছে। সেই কাজ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিব। কিন্তু পুঁজি নাই। অর্থহীন আমি। যাঁহার প্রেরণা, তাঁহাকেই চিন্তা করিতে হয়। আমি আধার-যন্ত্রটি তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

২১শে পৌষ আমার জন্মদিন। এ বৎসর এই জন্মদিনে একটী ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন হইল। এই আয়োজনের প্রধান আয়োজন-কর্ত্রী আমাদের মেজ-বৌ। গৃহলক্ষ্মী এই উৎসবটীকে অভিনন্দিত করিয়া লইলেন। ১০।১৫ জন অনুরাগী বন্ধুদের আনন্দোচ্ছ্বাসে এই দিনটী নূতন ভাবে ও ছন্দে আমার জীবনে একটি নূতন অনুভূতির সাড়া তুলিল। ১২৲ টাকার সংসারে সেদিন প্রাচুর্য্যের বান ডাকিল। জীবনের উৎসব। উৎসব-সঙ্গী যাঁহারা, তাঁহারা অতি পরিচিত। সকলের সহিত অভিনব সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছি। মনে হইল—এই উৎসব কোন এক নূতন অতিথিকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। শীতের অন্ধকার-রাত্রি দীপমালায় জ্বলিয়া উঠিল। ফুলের সৌরভ, ধূপ-ধুনার গন্ধে গৃহ-মন্দির পুলকিত হইল। সকলে একত্র উপবেশন করিয়া কত আলাপ কত প্রসঙ্গ, কত কথার আলোচনা হইল। প্রতি জন মনের দুয়ার খুলিয়া কত মর্ম্ম-কথা প্রকাশ করিল। ১০।১৫টী মানুষের হৃদয় সংযুক্ত হইয়া জাতি, বর্ণ, বয়স সব এক হইয়া গেল। মধুর সঙ্গীতে উৎসবের ঘোষণা হইল। সেদিন এই অভাবনীয় আনন্দের আতিশয্যে সেই একজনকে স্মরণ করিয়াই গাহিয়াছিলাম—

"তুমি ধন্য, তুমি ধন্য,
আমায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছ ;
তোমার অসীম প্রেম-পাথারে
সাদরে আমারে নিয়াছ।

তোমার প্রেম-বিগলিত বাহু দুটী দিয়া,
জড়ায়ে রেখেছ জুড়াইয়া হিয়া ;
আমি সংসার-দহনে দহিতে পারি-নে,
তাই এত দয়া করেছ।
আমার মিটাইয়া আশ, দিয়া আলিঙ্গন,
অমিয়-সাগরে রেখ অনুক্ষণ ;
অকিঞ্চন বলে' ভুলো না কখন—
যদি দীনে দয়া করেছ ॥"

মর্ম্ম ছিঁড়িয়া এ সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উৎসব-মন্দির মুখরিত করিল। অনেক ক্ষণ স্তব্ধ মৌন থাকিয়া যখন নয়ন উন্মীলিত করিলাম, তখন দেখিলাম —সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় শুধু আমাদেরই নয়ন আর্দ্র হয় নাই, দুটী সজল নয়নের চাহনি দ্বারপার্শ্বে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে। সেদিন তিনি আমায় কেমন দেখিয়াছিলেন, জানি না। ভোজনের ডাক পড়িলে, যখন তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, মেজবৌয়ের আগেই তিনি আমার পদতলে মাথা নত করিলেন। তারপর প্রণতির স্রোতে আমি হাবুডুবু খাইলাম।

নৈশ-ভোজন সমাপন করিয়া, কয়দিন ধরিয়া যে কথাটা মনের মধ্যে গুমরিয়া মরিতেছিল, তাহা সকলের কাছে প্রকাশ করিলাম। কালীবাবুকে বলিলাম "খরচের টাকা আর তোমাকে দিতে হইবে না। আমি নিজেই ইহার ব্যবস্থা করিয়া লইব। আমি আজ হইতেই স্বাবলম্বনের সাধনায় ব্রতী হইলাম।"

তার পরদিন প্রভাতে আমার সোদর-প্রতিম তরুণ সুহৃৎ মাণিকলাল আসিয়া প্রশ্ন করিল "আপনি কাল স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, কোন ব্যবসা করিবেন নাকি?"

আমার সম্মতিসূচক উত্তর শুনিয়া, সে বলিল "আমারও লেখাপড়া শেষ হইয়াছে, আপনার কাজে আমিও লাগিয়া যাইতে চাই।"

স্নেহ-প্রীতির উৎস আমার নয়নে অশ্রুকণা ঝরিয়া পড়িল। স্বাবলম্বী হওয়ার উলঙ্গ-প্রেরণাটুকুই আমার সম্বল ছিল। কি করিব, পুঁজি কোথা হইতে পাইব, তাহার চিন্তা তখনও বুদ্ধি-যন্ত্রে অবতরণ করে নাই। মাণিক-লালের মুখে তাহার সহযোগিতা পাইব শুনিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই

আমার কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির হইয়া গেল। আমি বলিলাম "একটী মাত্র ব্যবসা সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, সেটী কাঠের কারখানা। আমি এই কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত করিব।"

চন্দননগরে তাঁতের কাপড়ের ন্যায়, কুমারের হাঁড়ীর ন্যায়, সেগুন, মেহগ্নি, শিশু প্রভৃতি দামী কাঠের চেয়ার এক প্রকার একচেটিয়া ছিল। কলিকাতার ইউরোপীয়গণ চন্দননগরে আসিয়া কারখানা স্থাপন করিতেন। এমন দিন গিয়াছে, যখন চন্দননগর হইতে ৩।৪ লক্ষ টাকার চেয়ার কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সম্বৎসরে চালান গিয়াছে। আমাদের পারিবারিক ব্যবসাটিরও বেশ সুনাম ছিল। আমিই তাহার তত্ত্বাবধান করিতাম। কলিকাতার খরিদ্দারগণ আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইতেন। এই সময়ে যদিও আমার কলিকাতায় যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল, তত্রাচ পত্রাদি-সহযোগে মাণিকলালকে কলিকাতায় পাঠাইলে, প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের অসুবিধা হইবে না। কিন্তু ব্যবসা ফাঁদিবার পক্ষে উপযুক্ত লোকের সঙ্গে-সঙ্গে অর্থেরও প্রয়োজন।

আমি অর্থহীন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা যখন ব্যবসার পথে আমায় লইয়া চলিয়াছে, তখন লোক-বল ও অর্থ-বল, দুই-ই পাইব—এই বিশ্বাস আমার ছিল। মাণিকলাল নিজেই বলিল "আপনার টাকা নাই, ব্যবসা করিবেন কি প্রকারে?"

আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। পরক্ষণেই সে বলিল "আমি কিছু টাকা দিতে পারি।"

পল্লীর যে সকল তরুণেরা আমায় ভালবাসিত, তাহাদের সহিত আমি নিজেকে একাত্ম মনে করিতাম। কালে অনেক ক্ষেত্রে অতি নির্ম্মমভাবেই আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। বিশ্বাসের অমৃত-সায়রে ডুব দিয়া, অবিশ্বাসের কণ্টকগুল্মে আমি আজ পর্য্যন্তও ক্ষত-বিক্ষত হই। কিন্তু কি এক অমৃত-প্রলেপে সে ব্যথা আমায় বিচলিত করিতে পারে না। এই মাণিকলাল অতি কিশোর বয়সে আমায় অগ্রজের ন্যায় ভালবাসিয়াছে; আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমা সে অতিক্রম করে, তার অনবদ্য প্রীতি-বন্ধন নানা অপ্রীতিকর ঘটনার সংঘাতেও শিথিল হয় নাই। ঈশ্বরের এই সকল মহাদান জড় হইয়া আমায় অধ্যাত্মক্ষেত্রে ইহাদের মুখ চাহিয়াই স্থির রাখিয়াছে। মাণিকলালের ঋণ

বাহ্যতঃ পরিশোধ্য হইলেও, অন্তরে তাহা চিরযুগ অপরিশোধনীয়। সম্বন্ধের অমৃতবন্ধন মর্ত্ত্যের নহে, স্বর্গের।

মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কত টাকা দিতে পার?" মাণিকলাল হাসিয়া বলিল "কত টাকা আপনার প্রয়োজন?"

মাণিকলাল সদ্যঃ বিদ্যামন্দির হইতে বিদায় লইয়াছে। সে আর কত টাকা দিতে পারে? আমি বলিলাম "আমি একটী চেয়ারের কারখানাই খুলিব। প্রথম তোমাদের শিক্ষার জন্য সামান্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। ব্যবসা শিক্ষা করিলে ক্রমে-ক্রমে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে।"

মাণিকলাল কথার উত্তর না দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া সে আমার হাতে ২০০৲ টাকা দিয়া বলিল "পড়া ছাড়িয়াছি, কাজ শিখিব, শ্রম দিব। টাকার আমার প্রয়োজন নাই। আপনার কাজ এই ব্যবসার দ্বারাই চলিবে।"

আমি নির্ব্বাক্। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমিও আর এক দিনও বিলম্ব করিতে পারি না। কয়েকখানা বাঁশ ও দুইখানা হোগলা বাজার হইতে আনিতে বলিলাম। আমার আর এক সুহৃৎ রায় বাহাদুর ৺পূর্ণচন্দ্র সোমের পুত্র শ্রীঅরুণচন্দ্র সোমের বাগানে হোগলার ঘর নিজেরাই বাঁধিলাম। তার পরদিন প্রভাতে জয়মূর্ত্তি গৃহদেবী বলিলেন "পূজার আয়োজন হইবে না?"

আমি বলিলাম "তোমার সম্মতিই আজিকার অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্র।" তিনখানি খাতা খরিদ করা হইয়াছিল, তাঁহাকে সেই খাতা তিনখানি হাতে করিয়া আমায় তুলিয়া দিতে বলিলাম। অন্নপূর্ণার এই শুভদান প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের জয়যাত্রার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমি নিঃসঙ্গ নিষ্কাম কর্ম্মজীবনের পথে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের দায় বড় ছিল না। জাতিরই ভ্রূণ-মূর্ত্তি-স্বরূপ সঙ্ঘের এই প্রথম অর্থক্ষেত্রে মাণিকলালের প্রথম উৎসর্গপূত জীবনের অর্ঘ্য আজ সুদূর-প্রসারিত ও উৎসর্গেরই সমবায়ে গুণান্বিত হইয়া কলিকাতায় আরও নূতন প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছে। ইহার বীজক্ষেত্র চন্দননগরেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

রামেশ্বর সেদিন আমার সহযাত্রী, সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সম্বন্ধের বন্ধন

ছিন্ন হইতে পারে, এ কল্পনা আমার ছিল না। অকৃত্রিম সুহৃৎ কালীবাবুর অযাচিত দানে বিগত নয় মাস আমার জীবনযাত্রা চলিয়াছে। এই তিন ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় রাখার জন্য কারবারের নামকরণ হইল "রক্ষিত-দে-ঘোষ এণ্ড কোম্পানী।"

সেদিন বাণী-প্রেরণা বুকে ধরিয়া শ্রীঅরবিন্দের যে সকল পত্র আসিত, সেই সকল পত্রের প্রান্তভাগে তিনি ইংরাজী 'কালী' নাম স্বাক্ষর করিতেন। আমি খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিলাম, "শ্রীশ্রী৺কালীমাতার ইচ্ছায় এই কারবারের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার মূলধন ১০,০০০৲ টাকা হইল। উপস্থিত ২০০৲ টাকা প্রদত্ত হইল।"



প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ইতিহাসে ব্যবসাক্ষেত্রে আমার প্রথম অভিযানের এই স্মরণীয় দিনটি এই গ্রন্থে অনুলিপির মধ্যে রক্ষিত হইল।

খাতা-পত্তনের সময়ে এই ২০০৲ টাকা মাণিকলালের নামে জমা করিবার কথা। মাণিকলাল জানাইল "এ টাকা আমার নহে, আপনার।" আমি তখন ১০০৲ টাকা মাণিকলালের নামে আর ১০০৲ টাকা রামেশ্বরের নামে জমা করিয়া, নিজের হাতে খাতা লিখিয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলাম। কালীবাবু বলিলেন "ব্যবসা আমাদের নামে, কিন্তু ইহা তোমার কাজের জন্য করা হইল, এই কথাটা যেন আমরা স্মরণে রাখি। আমিও ইহার পুঁজি বাড়াইতে সচেষ্ট হইব।"

কারবার চলিল। কর্ম্মস্রোতঃ সংহতির শ্রম আকর্ষণ করিল। মাণিক-লালের তরুণ প্রাণশক্তি বিস্তৃত প্রবাহে কারবারটীকে দেখিতে-দেখিতে বৃহৎ করিয়া তুলিল। নৌকায় কাঠ আসিত, গঙ্গাতীর হইতে আমরাই পাঁজা করিয়া তাহা বহিয়া আনিতাম। বড়-বড় চকোর কাঠ ২০।২৫ জন মিলিয়া টানিয়া গোলায় তুলিতাম। হাত-করাতে কাঠ চিরিতাম। চেয়ারের পাটিতে

নম্বর দিতাম। শিরীষ কাগজে ঘষিয়া কলিকাতায় যেদিন মাল প্রথম চালান দেওয়া হইল, সেদিন সাফল্যের শিহরণ দেখিয়াছিলাম যাঁহার মধ্যে, আজ তিনি নাই। কত কর্ম্মপ্রকাশ সঙ্ঘের জীবনে, সে আনন্দের অনুভূতি আর পাই না। দর্পণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রতিচ্ছবি দেখার আশা দুরাশা।

স্বাবলম্বনের সাধনায় তন্ময় হইলাম। মাণিকলাল হাতের কাজ কাড়িয়া লইতে লাগিল। কালিবাবু খাতা লিখিতে বসিলেন। হোগলার চালের পরিবর্ত্তে পাকা কারখানা-গৃহ গড়িয়া উঠিল। দুইজন, চারিজন করিয়া ২০।২৫ জন কারিগর পাওট পাতিয়া বসিল। নীরব পল্লীকেন্দ্র হাতুড়ি-বাটালীর আঘাতে প্রাতঃকাল হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত শব্দিত হইত। এই কারখানাটিই হইল তরুণদের কর্ম্মক্ষেত্র—আমাদের সর্ব্বপ্রথম অর্থপ্রতিষ্ঠান।

একদিনের কথা মনে পড়ে—একখানা সুবৃহৎ চকোর কাঠ গঙ্গাতট হইতে কুলি-মজুরেরা টানিয়া আনিতে পারিল না। আমার মনে হইল—আজিকার এই অসমাপ্ত কর্ম্ম শেষ করিতেই হইবে। আমি তরুণদের লইয়া এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমার এক বয়োবৃদ্ধ বন্ধু এই অসাধ্য কর্ম্মে নামিতে দেখিয়া, নানা বিদ্রূপ-বাক্যে এই কার্য্যে যে আমরা অসমর্থ হইব—এই কথাই জ্ঞাপন করিলেন। আমাদের জিদ্ আরও বাড়িল। সেই কাষ্ঠখানির আয়তন এত বৃহৎ ছিল যে, ২০।২৫ জন কুলি যাহা পারে নাই, আমরা ১০।১৫ জনে তাহা পারিব—ইহা বিশ্বাস করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু কোন কর্ম্মই সেদিন আমার অসাধ্য বোধ হইত না। বিজ্ঞ বন্ধুর বিদ্রূপ-বাক্য আমায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ করিল। আমরা সেই সন্ধ্যায় বাঁশের টুকরা কাঠের তলায় রাখিয়া, ১০।১৫ জন মিলিয়া টানাটানি শুরু করিলাম। দেখিতে-দেখিতে কাষ্ঠখানি যন্ত্র-চালিতের ন্যায় আমাদের ১০।১৫ জনের আকর্ষণে সবেগে গোলায় আসিয়া প্রবেশ করিল। জয়গর্ব্বটা আমাকে চিরদিনই অনুভব করিতে হইয়াছে নিত্যসঙ্গিনীর মধ্যে। কোথাও ছোট হইলে, তাঁহারই চক্ষে মালিন্যের ছায়াপাত হইত ; আবার সাফল্যে জয়-দীপ্তি প্রকাশ পাইত। আজিকার এই দুঃসাধ্য কর্ম্মটাও সিদ্ধ হওয়ায় এবং প্রতিবাদীদের ধারণা উল্টাইয়া আমাদের জিদ-রক্ষা হওয়ায়, সর্ব্বাপেক্ষা তিনিই পুলকিতা হইয়াছিলেন। ছেলেরা বিজয়ী বীরের মত প্রাঙ্গণে

আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি নিজে আসিয়া খাদ্য পরিবেশন করিলেন। গোলা হওয়ার পর হইতে আমার গৃহ-প্রাঙ্গণে সমবেত তরুণেরা প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার হাতে রুটি, পরোটা, ব্যঞ্জন প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করিত। ভাব-প্রবণতাপূর্ণ সে তরল জীবন-যুগে আমাদের চক্ষে বিষাদের ছায়া ছিল না, নৈরাশ্যের অন্ধকারও ঘনাইয়া উঠিত না। শ্রমের পর জলযোগান্তে পরিপূর্ণ প্রাণে পল্লী কাঁপাইয়া, সেদিন এক নূতন সঙ্গীত আমাদের কণ্ঠ চিরিয়া বাহির হইল। সে সঙ্গীত বিজ্ঞ প্রতিবাদী বন্ধুদের শুনাইবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। সেদিনের শিশুসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিবার জন্য সেই সঙ্গীতটী এইখানে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

"ওরে ও অকেজোর দল,
তোরা কাজের মানুষ সাম্‌নে চল।
ওরা নাড়ে মাথা, কয় যে কথা,
ঐ ওদের সম্বল।
কোন্‌টা হবে, কোন্‌টা হবে না,
করার আগে জানা যাবে না,
বুদ্ধির গোড়ায় কোপ দিয়ে ভাই
কেলে দে-রে ফলাফল।"

গান গাহিতে-গাহিতে সে উদ্দাম নৃত্য ও ১০।১৫ জনের উচ্চকণ্ঠ বৃদ্ধকে বেসামাল করিয়াছিল। গৃহিণী মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে-হাসিতে চক্ষের ইঙ্গিতে বুঝাইতেছিলেন—খুব হইয়াছে, মানুষকে অত অপ্রস্তুত করা ভাল নয়।

কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করার জন্য এইরূপ প্রবৃত্তির প্রকাশ হইত না; ইহা সেদিন ছিল নূতন শক্তির স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত স্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ। হাসির মাত্রা ঠিক থাকিত না। কথা ছন্দোবদ্ধ ছিল না। আহার-নিদ্রার ঠিকানা রাখা যাইত না। কর্ম্ম আর কর্ম্ম। ভোরে উঠিয়া সঙ্গীত, উপাসনা, মন্ত্র-জপ। এমন 'ওঁ কালী' বলিয়া চীৎকার উঠিত যে, পাড়া-প্রতিবেশী চমকিত হইত। তারপর গোলায় কাঠ তোলা, কাঠ সাজাইয়া রাখা। অপরাহ্নে প্রাচীন হা-ডু-ডু খেলার নূতন সংস্কার করা হইয়াছিল, তাহাতে মাতিয়া থাকা। ফুটবল এসোসিয়েশনের মত এই দেশীয় খেলাটীকে নিয়মবদ্ধ করিয়া

"বঙ্গীয় ভেল-দিগ্-দিগ্ ঢাল প্রতিযোগিতা" নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা এইখানেই প্রথম হয়। আজ বাংলার অনেক ক্ষেত্রে এই খেলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া আমি তৃপ্তি অনুভব করি।

সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নূতন জীবনক্ষেত্রে কত ভাব, কত স্বপ্ন যে মস্তিষ্কে লীলায়িত হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সারা দিন সারা রাত্রি কি এক অদ্ভুত মাদকতায় চিত্ত-মন আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। গোলার কাজে আমার আর বেশী সময় দিতে হইত না। অবকাশের মাত্রা অন্তর-স্বপ্নে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীঅরবিন্দ চলিয়া যাওয়ার পরেই ১৯১১ ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে একখানি হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলাম। উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল "সনাতনী"। ইতঃপূর্ব্বে আর একখানি হাতের লেখা কাগজ বাহির করিয়াছিলাম। সেই সময়ে বিদেশ হইতে অনেক বৈপ্লবিক ইস্তাহার আমাদের নিকট আসিত। "তলোয়ার" বলিয়া একখানি ইংরাজী কাগজ আমার নিকট নিয়মিত ভাবেই আসিত। শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা ছিলেন ইহার সম্পাদক। আমার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ইঁহাদের চিন্তাধারার সহিত খাপ খাইত না। যে সকল তরুণ আমার ছাত্র-সভায় মানুষ হইতেছিল, তাহাদের মস্তিষ্কে পাছে এই সকল পাশ্চাত্ত্যপ্রভাবযুক্ত বৈপ্লবিক যুক্তিবাদ সংক্রামিত হয়, তাহার জন্য আমি একখানি হস্তলিখিত পাক্ষিক পত্র বাহির করি। উহার নাম ছিল "দেবভূমি"। এই কাগজখানির চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, এইজন্য গোপনে একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানা স্থাপন করার ইচ্ছা হইয়াছিল। প্রেসের ব্যাপার আমাদের কাহারও জানা ছিল না। কিন্তু কোন বিষয়েই আমাকে একজন পশ্চাৎপদ হইতে দিতেন না সর্ব্বক্ষেত্রে সাফল্য-লাভ না হইলেও, অভিজ্ঞতার্জ্জন হইতে বঞ্চিত হই নাই। শিশু যেমন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বে বার-বার ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, আমার অবস্থাও বহুবার এইরূপই হইয়াছে। প্রেসের চিন্তাও আমায় স্থির থাকিতে দিল না। কিছু টাইপ খরিদ করিয়া একটি কাঠের যন্ত্রে "দেবভূমি" ছাপিবার চেষ্টা করিলাম। এক পৃষ্ঠা অতি ক্ষুদ্র "দেবভূমি" টাইপ সাজাইয়া ছাপিতে ১০।১২ দিন সময় কাটিয়া গেল। এই কর্ম্ম হইতে বিরত হইলাম। কাঠের কারবারটী সুন্দরভাবে চলিতে আরম্ভ করিলে, এই প্রেরণা আবার আমায় উদ্বুদ্ধ করিল।

আমি আমার দীর্ঘজীবনে কামনা ও প্রেরণার মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ঈশ্বরের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিলে, সব কর্ম্মের মূলেই ঈশ্বরপ্রেরণা থাকে বটে, কিন্তু আধারগত অশুদ্ধির সহিত বিজড়িত হইয়া উহা প্রাণের সাহায্যে যখন মূর্ত্তি লইতে চাহে, তখন তাহা রোধ করা যায় না। অনিবার্য্য কর্ম্মযোগে অবিশুদ্ধ-রূপ লইয়াই তাহা প্রকাশ পায়। বেশ বুঝা যায় যে, কর্ত্তার হাত ফস্‌কাইয়া এই কর্ম্মবীজটী অতি অপরিণতাবস্থায় বিকৃতাঙ্গ হইয়া বাহির হইয়াছে। চেষ্টা করিয়া এইরূপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াও আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আজিকার যে অবস্থা, সেদিন অপেক্ষা তাহার অধিক উন্নতি বড় দেখি না। সেদিনের ঔদাসীন্য আত্মসমর্পণ-যোগবীজের পরিপুষ্টির কারণ হইয়াছিল—অবাধ সাধনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। আজ সতর্কতার চেতনামাত্র আছে; কিন্তু যে কর্ম্ম হয়, সতর্কতায় বা ঔদাসীন্যে তাহা অবরুদ্ধ হয় না। সেদিনের অবস্থার দায় বোঝা হইয়া শরীর ও মনকে পীড়িত করিত; কিন্তু আজিকার সঙ্ঘের জন্য পূর্ব্বের মত পীড়ার কাবণ নাই—সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহাকে বরণ করিয়া লওয়ার আকিঞ্চনই হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ রাখে। যখন যে অবস্থা, ভগবান্ তখন তদনুরূপেই আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। যোগসিদ্ধ জীবন সুনির্দ্দিষ্ট কালের সীমায় নিবদ্ধ নহে। সুদীর্ঘ জীবন শুধু নহে, কত জন্ম ইহার জন্য দিতে হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এই যোগ অন্যান্য যোগ-পদ্ধতির ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়মের অধীন নয়। আধার ও প্রকৃতিভেদে নানা ভঙ্গীতে ইহার সাধন চলে। আত্মসমর্পণ-যোগ নিয়মানুবর্ত্তী হয় না বলিয়াই আমার বিশ্বাস এবং সাধনক্ষেত্রে এইজন্যই অনেক ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মানুষ যাহাতে যোগপথ আশ্রয় করে, তাহার জন্য নিজের অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া অন্যকে আশ্রয় দিতে পারি, অপকারের ভয় হয় না—ভরসার বাণীই সকলকে শুনাই।

ব্যবসার প্রেরণা অধ্যাত্মজীবনক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভের প্রতীক্ষা করিল না—রূপ লইল। ধৈর্য্যের বাঁধন আমার মধ্যে খুবই শিথিল। কর্ম্ম-প্রেরণার সংযমে তাহাকে শোধন ও সাধনের অবকাশ দিতে আমি চিরদিনই অসমর্থ হইয়াছি। এমন আয়াস আমার কাছে মন ও বুদ্ধির অপচেষ্টাই মনে হইয়াছে। কাঠের কারখানাটি প্রবর্ত্তন করার পর

পত্রিকাপ্রচারের পূর্ব্ব-প্রেরণা নূতন আকারে আমায় চাপিয়া ধরিল। কারবারের বৈশাখী নূতন খাতায় কয়েক মাসের যে জের উঠিল, তাহাতেই বুঝিলাম—কারবার চলিবে ভাল। এই ক্ষেত্রে আমার কিছু আর করার নাই। প্রচার-ব্রত সুসিদ্ধ করার জন্যই চিন্তা সুরু হইল।

আষাঢ়ের আকাশ যখন ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন—বারিপাতে নিদাঘের ক্লান্তি হরণ করিতেছে, বর্ষণধারার ন্যায় উর্দ্ধলোক হইতে বাণীপ্রচারের স্নিগ্ধানুভূতি আমায় অভিষিক্ত করিল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে প্রায় সকলেই তখন স্কুল বা কলেজের ছাত্র। রবিবাসরীয় সভায় সাহিত্যচর্চ্চা কম হইত না। একখানি সাময়িক-পত্রিকা-প্রচারের সঙ্কল্প সকলেই সমর্থন করিল। পত্রিকাখানি পাক্ষিক করিতে হইবে, ইহাও সিদ্ধান্ত হইল। নামকরণ লইয়া সমস্যার অন্ত রহিল না। কেহ বলিল "দেশের এই ঘন-ঘোর দুর্দ্দিনে ইহা খদ্যোতের মত ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দু-স্বরূপ হইবে, অতএব ইহার নাম 'খদ্যোত' রাখা হউক।" একজন বলিল "দেশের ভণ্ডামী দূর করার জন্য এই পত্রিকাখানিতে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইবে, অতএব ইহার নাম 'সম্মার্জ্জনী' রাখা হউক।" কয়েকজন পূর্ব্ব-প্রেরণার সুর ধরিয়া জানাইল "নাম তো আছেই "সনাতনী" অথবা "দেবভূমি", এই দুটোর মধ্যে একটা দিলেই চলিবে।" 'সনাতনী' কথাটা অনেকের পছন্দ হইল না। উহার মধ্যে তাহারা প্রাচীনতার সংস্কার বাহির করিল। আর 'দেবভূমি' নামটা বড় বাড়াবাড়ি ধরণের হয়। নাম লইয়াই সারাদিন আলোচনা চলিল। আমার মধ্যে চিন্তার তরঙ্গ উঠিল।

সাধনার পথে জীবনচ্ছন্দের প্রকৃতি একটু অবহিত হইলেই ধরা পড়িয়া যায়। বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণ লইয়া অন্তর-চালনায় একটা অনুভূতি-ভেদ আছে। যখন অহমিকার ফাঁক দিয়া উপরের শক্তি ইহার উপর পড়ে, তখন চিন্তার যে আস্বাদ, আর উপরের রুদ্ধ আলোকে বুদ্ধিযন্ত্র স্তম্ভিত হইলে, উহার মধ্যে যে চিন্তার সংস্কার সঞ্চিত থাকে, বাহিরের তাগিদে উহা যখন স্বভাববশে নড়াচড়া করিতে থাকে, সে চিন্তাতরঙ্গের অনুভূতি স্বতন্ত্র ধরণের। বুদ্ধির উপরের ছিদ্রপথ কি করিলে মুক্ত হয়, কি না করিলে রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার বিজ্ঞান আমার কাছে জানা ছিল না; আর তাহা জানিলেও, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা উহা হয় না। আত্মসমর্পণের চেতনা যখন আধারের

সবখানি ভরিয়া ঘনাইয়া উঠে, তখন সকল অন্তর-যন্ত্রের আবরণগুলি সংস্কৃত হয়। আবার এই আত্মসমর্পণের রসানুভূতিতে অবগাহিত হওয়ার ইচ্ছা ও চেষ্টাও কাজের নয়। এখানেও সাধককে অসহায়ের মতই থাকিতে হয়—"যখন তোমার ইচ্ছা হবে, এই ভাবেতে বসিয়া থাকার" মত অবস্থায় ইহার অমৃতময় আস্বাদ মিলে। আধার-যন্ত্রে আত্মসমর্পণের বীর্য্য স্থান পাইলেই ইহা ক্রমে-ক্রমে পুষ্ট হইয়া যোগ-রহস্য প্রকাশ করে। দর্শনে, সাহিত্যে, কর্ম্মে, অনুষ্ঠানে, যত্নে ও চেষ্টায় অহঙ্কারেরই অনুশীলন হয়। আধারে যোগ-বীজ অবধৃত না হইলে, নিষ্ফল জীবন—উহা অহঙ্কারেরই লীলাভূমি।

পত্রিকা বাহির হইবে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু কি তাহার নাম হইবে, তাহা জানি না। তাহা ভগবান্ তখনও জানান নাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমার বুদ্ধি-যন্ত্র স্তব্ধ হইল। বন্ধুরা আলোচনার সুর রাখিয়া গেল। আমার বাহির-ভিতর কিন্তু মৌন-নিথর হইয়া পড়িল।

তাহার পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া ধ্যানে বসিলাম। রাত্রির শেষ অংশটী আমার নিকট অতি লোভনীয়। নিঝুম পৃথিবীর কোলে বসিয়া এই সময়ে ঊর্দ্ধলোক হইতে যে অমৃতের বর্ষণ হয়, তাহা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি। ধীরে-ধীরে পূর্ব্বদিকে আলোর ঝরণা ঝরে, পাখীর কণ্ঠে প্রথম বন্দনা-সঙ্গীত উঠে; পল্লীতে জাগরণের প্রথম সাড়া পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমিও অন্তর্জ্জগৎ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই। ইহা আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম। সেদিনও ইহার অন্যথা হয় নাই। একটী ক্ষুদ্র কক্ষে, নিস্তব্ধ সমাহিত চিত্তে অন্ধকারে বসিয়া আছি। অন্তর্জ্জগতের দুয়ার যেন উন্মুক্ত হইল। মুদিত চক্ষেই দেখিলাম—কয়েকটা জ্যোতির্ম্ময় অক্ষর। সেই অক্ষর কয়টা পর পর সাজান রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষর নহে, দেবনাগরী

প্রবর্তক

অক্ষরে, "প্রবর্ত্তক" এই শব্দটী আমি সুস্পষ্ট দেখিলাম। চমক ভাঙ্গিল। মনে হইল—আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু স্থির ঋজুভাবে বসিয়াছিলাম। হউক স্বপ্ন, অন্তর্দ্দেবতার নির্দ্দেশ এইভাবেই আসিয়াছে। আমি সেইদিন সাময়িক

পত্রিকাখানির নাম "প্রবর্ত্তক" হইবে, সকলকে জানাইলাম। কথাটা সকলেরই ভাল লাগিল, নূতন মনে হইল।

কথার সঙ্গেই কাজ। স্বার্থের হিসাব করিয়া আজ পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারি নাই। এই হিসাব উহ্যই রহিল। "প্রবর্ত্তক"-এর এক অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করিলাম। "রয়েল ৮ পেজী ১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ পাক্ষিক পত্র, বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাক-মাশুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য নগদ ⁄৹ আনা।"

অনুষ্ঠান-পত্রটী বাহির করিয়া বলা হইল—ইহা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টে বাহির হইবে। কিন্তু যথাসময়ে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না পাওয়ায়, উহা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে বাহির হয়। কাঠের কারখানায় রামেশ্বরের মন বসে নাই। রামেশ্বরকে এই পত্রিকার পরিচালক করা হইল। আমার আর এক সহকর্ম্মী চিরসুহৃৎ মণীন্দ্রনাথ নায়ককে ইহার সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করা হইল। কাগজ বাহির করিয়াই এই কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানাইলাম; আর আমি যে একেবারে 'তন্ত্র-সাধনা' ছাড়িয়া এখন 'বেদান্তে' প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি, এ কথাও জানাইতে ভুলিলাম না। তিনি কয়েকদিন পরে জানাইলেন—"You have done well in confining yourself to Vedantic Yoga......" "বেদান্তযোগে আপনাকে নিবদ্ধ করিয়া ভালই করিয়াছ।" "প্রবর্ত্তক"এর তৃতীয় সংখ্যা পাইয়া তিনি লিখিলেন—"The last number was very good"—ইহার উপর আরও জানাইলেন—"You must not mind, if you do not get always a written answer. The unwritten will always be there." "সর্ব্বদা লিখিত উত্তর না পাইলে ভাবিও না; ঐখানেই আমার অলিখিত উত্তর নিত্য পাইবে।"

দৃঢ় প্রত্যয়ে হাতের কলম চলিল। ভাবিতাম—আমি যন্ত্র, যন্ত্রী আমায় লিখাইতেছেন। সে ইতিহাস ক্রমে বলিতেছি।

আজ যে বীজ বপন করা হয়, সে বৃক্ষ যখন ফলিতে থাকে, তাহা সহজে নিঃশেষ হয় না। বিশেষতঃ, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিপ্লববাদিগণের উপর্য্যুপরি তাণ্ডবক্রীড়ার ফলে ভারত-রক্ষা আইন ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন

আইনের প্রয়োগে বাংলার বিপ্লবিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগত একদল শিখ ভারতের বিপ্লব-কর্ম্মে যোগদান করায়, অবস্থা খুবই গুরুতর আকার পরিগ্রহ করে। এই সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতায় ও কঠোর শাসনে ভারতব্যাপী বিপ্লবপ্রয়াস এক প্রকার স্তব্ধ হইয়া যায়। মাকড়শার জালের ন্যায় পুলিসের শৃঙ্খল-রচনার ফলে আমাকেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল। বিপ্লবীদের সংসর্গ হইতে আমি দূরে পড়িলেও, গুপ্ত পুলিস বিভাগের সংশয়-দৃষ্টি আমায় ছাড়ে নাই। ইহা আমার নূতন-কর্ম্ম-প্রেরণা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার উপক্রম করিতেছিল। বিধাতার অলক্ষ্য হস্তও যেন আমার অনুকূলে ছিল না। নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনা-সংঘটনে আমি ক্রমেই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম। দুই-একটী এরূপ ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া, আমার তৎকালের অবস্থাটা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

আমার বয়স তখনও যৌবনের সীমা ছাড়ায় নাই। শ্রীঅরবিন্দের অনুগ্রহে পূর্ব্ব-ধর্ম্মসংস্কারের বন্ধনমুক্ত হইয়া অধ্যাত্মসাধনার বর্ণমালা কণ্ঠস্থ করিতেছি মাত্র; দুর্ঘটনার আবর্ত্তে আমি প্রায়ই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতাম। এমন কেহ বিজ্ঞজন ছিলেন না, যাঁহার সহিত দুর্দ্দিনে পরামর্শ করিতে পারি। চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতী ভার্য্যাই ছিলেন আমার প্রধান মন্ত্রী। কর্ম্মের গুরুত্বে নিজেকেও যেমন বয়সের তুলনায় প্রবীণ মনে করিতাম, গৃহলক্ষ্মীর বয়সের প্রতিও তেমনি আমার লক্ষ্য ছিল না। যৌবনেই ত্যাগ ও সংযমের শাসনে তাঁহার সুকোমল শ্রীমণ্ডিত ললাট কঠিন তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে আমাকেও থতমত খাইতে হইত। সকল বিষয়েই তিনি সুগভীর-ভাবে আলোচনা করার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ আমায় মুগ্ধ করিত। তাঁহার গভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতাম। কিন্তু সকল বিষয় লইয়া মতামতের আলোচনা হইত মাত্র; তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত ধৈর্য্য আমার ছিল না। অনেক সময়ে বুদ্ধিতে দপ্ করিয়া যাহা ফুটিয়া উঠিত, তাহারই অনুসরণ করিতাম এবং এইরূপেই আমি অনেক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ফলও লাভ করিয়াছি। যেখানে নিজের অনুভূতির সহিত তাঁহার সিদ্ধান্ত মিলিত না, সেখানে আমি নিজের দায়িত্বেই কার্য্য করিয়া বসিতাম। এই মতানৈক্য

হইলে, তিনি দুই কারণে বিপন্না হইয়া পড়িতেন। প্রথম কারণ—এত করিয়াও, তিনি আমার সহিত মতৈক্য লাভ করিতে পারিতেছেন না; দ্বিতীয় কারণ—কার্য্যের পর বিপদের মাত্রা যদি বৃদ্ধি পাইত, তাহা জীবনের পথে অধিক বাধা সৃষ্টিই করিত। তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণচিত্তে বলিতেন "দাসীর কথা বাসি না হইলে, তোমার ভাল লাগিবে না।" আমি জানিতাম—বিপদ্ অথবা সম্পদ্, এই দুইয়েরই আগমন ঈশ্বরেচ্ছায় হয়। যদি ভুল করিয়া বিপদ্ ডাকিয়াও আনি, দুঃখের মাত্রা বাড়ে, তাহার জন্যও আমি দায়ী নহি। এইরূপ প্রত্যয় সহিবার শক্তি দিত। দুঃখ-ভারে কিন্তু উভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। তিনি সর্ব্বদা চাহিতেন স্বস্তি এবং শান্তি। আমি কিছুই চাহিতাম না। প্রবাহের মত বহিয়া চলাই ছিল আমার ধর্ম্ম। দুইজনের স্বভাব ছিল এইরূপ বিপরীতমুখী।

দোলের দিনে ফাগুয়া লইয়া উৎসবের আরম্ভ হইত, তিনি স্থিরচিত্তে দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তারপর রঙের পালা, এই সময়ে তিনি একটু সরিয়া দাঁড়াইতেন। ইহার পর যাহা হইত, সেখানে তাঁহার আর দর্শন মিলিত না। তিনি ঘরে খিল আঁটিয়া কাঁদিতেন, আর বাহিরে চলিত তাণ্ডব-লীলা। রঙ ফুরাইলে দোয়াতের কালি, তার পর গোময়; শেষে নর্দ্দমার পাঁক লইয়া হুড়াহুড়ি, মারামারি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইত। শত তরুণ লইয়া আমার দিন চলে। যৌবনের এই উত্তেজনায় আমি প্রতিবন্ধক ছিলাম না। বিচিত্রা প্রকৃতির বিচিত্র প্রকারের অভিব্যক্তি আমাকেও দশচক্রে ভূত করিয়া ছাড়িত। মারামারি, পেটাপিটির সময়ে ছেলেদের অতি সতর্কতা সত্ত্বেও, আমার বুকে-পিঠেও কিল-চড় যে না পড়িত, এমন নহে। স্নানের ঘাটে গিয়া গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া ছোঁড়াছুড়ির সময়ে একবার আমার চক্ষুঃ বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। অপরাহ্নে অবসন্ন দেহে স্নানান্তে বাড়ী ফিরিলে, তিনি বিষণ্ণ মনে ঘর হইতে বাহির হইতেন; উৎসবের দিনে তাঁর এই মলিন মুখ দেখিয়া আমি অপ্রস্তুত হইতাম। তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘর-দোর-উঠান ক্লেদমুক্ত করিতে নীরবে শ্রম দিতেন। পরিশ্রান্ত শরীর সন্ধ্যায় এলাইয়া পড়িত। পরদিন প্রকৃতিস্থা হইলে, তিনি বলিতেন "ঠাকুরের দোল এমন ভূতের লীলা নয়, তোমাদের অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হয়!"

বেশ বুঝিতাম—তিনি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাব ভালবাসেন না। তাঁর সবখানি ছিল শান্তি, প্রসন্নতা ও অনাবিল আনন্দে ভরপূর। স্থৈর্য্য ছিল তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্ম। বিপ্লব-চাঞ্চল্য আমার জীবন-ধর্ম্ম। তবুও ছিল অপার্থিব ঐক্য—অন্তরের এত প্রেম অন্য কোথাও আর খুঁজিয়া পাইব না।

উৎসব-পর্ব্বের আর একটী দিন ছিল বড় আতঙ্কের। কালীপূজার দিন তিনি করুণ নয়নে বলিতেন "দীপ-মালায় বাড়ী-ঘর সাজাইয়া মায়ের আরতি কর, দুম্‌-দাম্‌ আওয়াজে আর বারুদের কালি লেপিয়া ঘর-দোর অপরিচ্ছন্ন করিও না।"

সন্ধ্যা যখন নামিয়া আসিত কালো আঁচল দোলাইয়া, তিনি স্থির-ধীর চিত্তে শত-শত দুর্গাপ্রদীপে উজ্জ্বল-শিখা জ্বালিতেন বড় আনন্দে। আমরা দলে-দলে সে শোভা দেখিয়া পুলকিত হইতাম। কিন্তু বারুদের ধোঁয়ায় অঙ্গন না ভরিলে, আমাদের কালীপূজার নেশা জমিত না। আরম্ভ হইয়া যাইত দুম্‌-দাম্‌, তাঁর অনিচ্ছায় বাজি পুড়াইবার ধুম। তিনি খিল দিয়া ঘরে ঢুকিতেন। বাজি খেলা শেষ হইলে, আঁটি-আঁটি প্যাঁকাটির মশাল জ্বালিয়া ছুটাছুটি সুরু হইত। আনন্দের আতিশয্যে একবার মেজ-বৌয়ের বিশাল খড়ের স্তূপ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। আগুনের শিখা যখন লেলিহান-রসনা-বিস্তার করিয়া পল্লীগৃহ স্পর্শ করে, তখন আবার কলসী-কলসী জল ঢালিয়া সে আগুন নির্ব্বাপিত করা হয়। কত ক্ষয়-ক্ষতি, কত অনাবশ্যক কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া আমাদের শক্তি অপচিত হইতেছিল, সে হিসাব তখন কে করিবে? ভোরে উঠিয়া, তিনি কটু তিরস্কারের সঙ্গে পূজান্তের কালি-ধূলি মুছিয়া আবার গৃহাঙ্গন সুন্দর করিয়া তুলিতেন। তিনি চাহিতেন কাজে-কর্ম্মে উৎসবে-অনুষ্ঠানে নিয়ম ও ছন্দঃ। সৌন্দর্য্য ও অমৃতের ডালি সাজাইয়া, তিনি দেবতার আরাধনা কামনা করিতেন। আর আমার ছিল ছন্দোহীন, উন্মাদ, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-রঙ্গ। তরুণের প্রাণ ইন্ধন পাইয়া চতুর্দ্দিকে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিত। তাঁর বিনীত নিষেধ আমায় ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। একবার কালীপূজার রাত্রে চরম জব্দ হইয়াছিলাম।

সন্ধ্যার প্রদীপ হাজারে-হাজারে ছাদে, অলিন্দে, প্রাচীরে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সে শোভা দেখিয়া চিরদিনের ন্যায় কিছুক্ষণ আমাদের

স্তব্ধতা ; তারপর বাজির মাত্রা ছাড়াইয়া মহাবাজির বিকট আওয়াজে বাড়ী-ঘর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বন্ধ ঘরের জানালার ফাঁক দিয়া করযোড়ে আকুতি জানাইলেন "ওগো, থাম!" তখন আমরা কালীপূজার একটা বড় বোমার রজ্জুতে আগুন ধরাইয়া, একটা ক্যানেস্তারার বড় টিন চাপা দিয়া, তাহার উপর আবার একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর চাপাইয়া মজা দেখার উপক্রম করিতেছি। ব্যাপারটার মধ্যে ভীষণ কিছু ঘটার যে সম্ভাবনা আছে, এইরূপ ধারণা আমার মনে ঠাঁই পায় নাই। তাঁর হৃদয়ে একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে আসিয়া ঐরূপ কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য আমাদের মিনতি জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ নিবেদনেও ঐ কার্য্য হইতে কেহ প্রতিনিবৃত্ত হইল না। আমার ছাত্র-বন্ধুরা আমায় আড়াল করিয়া বোমার আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে ক্যানেস্তারাটা কত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা দেখিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

কর্ণ-বধিরকারী গগনভেদী শব্দে প্রাঙ্গণের যত আলো সব নিভিয়া গিয়াছে, শুধু অন্ধকার ; কাহারও মুখে কথা নাই, একপার্শ্বে কে একজন আর্ত্তনাদ করিতেছে। ধূমাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে অনবগুণ্ঠনে মহাবিপদাশঙ্কায় হ্যারিকেন হাতে জগদ্ধাত্রী আসিয়া চকিতা দৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথমেই আমার দিকে চাহিলেন। আমার উদরের দক্ষিণ অংশের কতকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। আমাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল যে তরুণ, তাহাকে অতিক্রম করিয়া সঙ্ঘের চিরসেবক কৃষ্ণচন্দ্রের বাহুমূল উর্দ্ধভাগে একেবারে ছেঁচিয়া রুধিরাক্ত হইয়াছে, স্থূল মাংসপেশী ঝুলিয়া পড়িয়াছে। রক্ত আর রক্ত—মহাকালীর তাণ্ডব-পূজা এইখানেই সমাপ্ত হইল। আজিও তাঁহার ইচ্ছামত কালীপূজার রাত্রে মন্দিরে-মন্দিরে দীপমালার শোভা ফুটে ; কিন্তু তাঁহার জীবনকালে এই সুস্থিরতা, সঙ্ঘের এই সৌম্য-শান্ত ভাব কোথায় লুকাইয়াছিল! দেবী কি আজ সান্ত্বনা পাইয়াছেন?

এই চরিত্র-চিত্র ভিতরের। সঙ্ঘের অঙ্কুরাবস্থায় বাহিরের দুরন্ত জীবন-রঙ্গ যে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে সকল উল্লেখ করায় লাভ নাই।

এই সকল শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনপর্ব্বেই চলিতেছিল। শক্তি ছন্দোহীন আধারে সেদিন অপরিচ্ছন্ন রূপ লইয়া আমাদের এমন করিয়াই নাচাইতেছিল। এইবার অন্য কয়েকটা বাহিরের ঘটনা বিবৃত করিব।

ভারত-রক্ষা আইনে চতুর্দ্দিকে ধরপাকড় চলিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ পুনঃ পুনঃ জানাইতেছেন—"I see people are interned, who have no connection at all with politics or have long cut off whatever connection they had. Owing to the war, the authorities are uneasy and suspicious and being ill-served by their police upon prejudicial and often false reports."

অর্থাৎ "আমি দেখিতেছি—যাহাদের সহিত রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নাই, অথবা যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাহাও বহুদিন পূর্ব্বে যাহারা ছাড়িয়াছে, তাহারা অন্তরীণ হইতেছে। কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের দরুণ অস্বস্তিপূর্ণ ও সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের পুলিস-বিভাগ সংস্কারদুষ্ট ও প্রায়শঃ মিথ্যা সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে।"

আমাকেও সতর্ক করিয়া তিনি বলিতেছেন:

"You have to sit tight, spiritually defend yourself and physically avoid putting yourself where the police can do you any harm and as far as possible, avoid also doing anything which would give any colour or appearance of a foundation for their prejudices."

অর্থাৎ "তোমাকে স্থির হইয়া বসিতে হইবে। অধ্যাত্মশক্তিতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং বাহ্যতঃ এরূপ কোন ক্ষেত্রে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করায় বিরত হইবে, যেখানে পুলিস ক্ষতি করিতে পারে। আর যত দূর সম্ভবপর, এমন কোন কার্য্যও করিবে না, যাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব-সংস্কারের রঙ ফলাইবার বা ঘুণাক্ষরেও উহার ভিত্তি-রক্ষার প্রশ্রয় দান করে।"

শ্রীঅরবিন্দের এই শুভেচ্ছা কার্য্যকরী করার জন্য আমি খুবই সচেতন ছিলাম। কিন্তু ঘটনার স্রোতঃ অতিক্রম করার সাধ্য তখনও আমার ছিল না। সেদিন শ্রীঅরবিন্দের এই সতর্কতা তত কার্য্যকরী হয় নাই; কিন্তু তাঁহার অমোঘ অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতেও আমি পারি নাই। এ জগতে শুভেচ্ছার দান কখন ব্যর্থ হয় না, ইহা আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিয়াছি।

ইউরোপে মহাযুদ্ধ আর ভারতে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সময়ে কি কঠোর রুদ্রভাব পরিগ্রহ করিয়াছিল, সেদিনের ভুক্তভোগী যাঁহারা, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ তাহা বুঝিবেন না। বিপ্লবী বলিয়া যাঁহারা ধৃত হন, তাঁহাদের লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। কলিকাতার উপকণ্ঠে জেলগুলিতে বন্দীদের স্থান-সঙ্কুলান হইত না। প্রসিদ্ধ 'দালান্দা হাউসে'র নাম আমাদের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঠিক এই কড়াকড়ির সময়ে পর-পর কয়েকটি ঘটনায় আমার এমনই হইল যে, প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের প্রতীক্ষায় আমায় বসিয়া থাকিতে হইত; আর ওষ্ঠে ওষ্ঠপুট চাপিয়া, আমার উপর কল্যাণদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আমাকে ভরসা দিতেন, আশা দিতেন দূরে শ্রীঅরবিন্দ আর নিকটে হৃদয়সঙ্গিনী তরুণী পত্নী। অপূর্ব্ব রহস্যময় জীবন আমার। পৃথিবীতে দুই নৌকায় পা দিয়া আমি যে চলিয়াছি, তাহা সেদিন উপলব্ধি করি নাই।

সে একদিন—এক জরুরী ডাকে রাত্রিশেষেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আমায় কলিকাতায় ছুটিতে হইল। ফিরিলাম অন্ধকারে-অন্ধকারে মধ্য রাত্রিতে। আসিয়াই শুনিলাম—আমার ছাত্র-বন্ধুরা অনেকেই "মাদাদেপো" হইয়াছে। "মাদাদেপো" ফরাসী কথা, ইহার অর্থ পুলিস-গারদে আটক থাকা। ঘটনার বিবরণ—আমারই এক নিকট প্রতিবেশী আমাকে গালি দিতে-দিতে সদল-বলে যাইতেছিলেন। আমার ছাত্র-বন্ধুরা প্রতিবাদ করায়, প্রথম মুখোমুখী, তার পর হাতাহাতি, শেষে রক্তারক্তিতে ঘটনাক্রম পর্য্যবসিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তরুণেরা ব্যতীত পল্লীর অনেকেই কারণে-অকারণে আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি তাহারই অভিব্যক্তি দিয়াছিলেন। প্রতিদানে উত্তম-মধ্যমের মাত্রাটা সীমা ছাড়াইয়া যায়। খণ্ড-যুদ্ধে আমার ছাত্র-বন্ধুদের জয়-লাভ হয়। ঘটনাটি পুলিস পর্য্যন্ত গড়ায়। তারপর ডাক্তার সাহেবের জোর সার্টিফিকেটের বলে আমার বন্ধুরা পুলিস-গারদে আটক পড়ে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অভিভাবকমণ্ডলী আমায় খোঁজাখুঁজি করিয়াছেন। আমি বাড়ীতে আছি, এ কথাও গৃহলক্ষ্মী বলিতে পারেন নাই; কেন-না কথাটা মিথ্যা হইবে। আবার বাড়ী নাই, এ কথাও বলিতে তিনি ভরসা করেন নাই; কেন-না, সে কথা শুনিলে পুলিস আমার ফেরার পথেই ধর-পাকড় করিতে পারে। সারা দিনের

দুশ্চিন্তায় তিনি অতিষ্ঠা হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমি নিরাপদে ফিরিয়াছি, ইহাতে তিনি অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিলেন। এইরূপ দুঃসময়ে ছেলেদের এইরূপ দুর্দান্ত ব্যবহার আমারই প্রশ্রয়ের ফল বলিয়া আমাকে তিনি কড়া-কড়া কথা শুনাইতে ছাড়িলেন না।

রাত্রিতে কিছু করার ছিল না। দুশ্চিন্তা আমার কম হইল না। পাড়া-প্রতিবাসী কেহ রাজনৈতিক ভয়ে, কেহ বা স্বভাবদোষে আমার হিতকামী নহেন। সকাল হইলে, অভিভাবকেরা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তুমুল আন্দোলন সুরু করিলেন। এই অবস্থায় ঘটনার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম।

প্রাতঃকালে সদর পুলিসে গিয়া বুঝিলাম—ব্যাপারটী নানা প্রকারের শত্রুপক্ষীয় চক্রান্তে বেশ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার সাহেব সার্টিফিকেটে লিখিয়াছিলেন "প্রহারের গুরুত্ব খুবই, ইহার ফলে মৃত্যুর আশঙ্কাও ছিল।" এই অবস্থায় ছাত্র-বন্ধুদের মুক্তির উপায় সোজা ছিল না। দোষ স্বীকার করাইয়া, তাহাদের দণ্ডভোগটাও অন্তর্দ্দেবতার সম্মতি-পূত বলিয়া মনে হইল না। দেখিলাম—সদর পুলিসের গেটের সম্মুখে বেশ ভীড় জমিয়াছে। পাড়ার দুই-একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এইবার আমাদের জব্দ করিতে পারিবেন মনে করিয়া বেশ উৎফুল্ল। ইংরাজ গোয়েন্দা-বিভাগের দুই-একজন কর্ম্মচারীকেও সেখানে দেখা গেল। আমি কর্ত্তব্য এক মুহূর্ত্তেই স্থির করিয়া লইলাম। কৌশলে স্থানীয় পুলিস-কমিশনার মঁসিয়ে ফ্রান্সিসের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ মিলিল। বিপদের সময়ে "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি" মন্ত্র মনে হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ শরণে শ্রীঅরবিন্দই মূর্ত্ত হইয়া উঠেন। বুকে বেশ ভরসা পাই। পুলিস-কমিশনারের পত্নীর সহিত কথাবার্ত্তা ভালই হইল। পুলিস-কোতোয়ালের নিকট আসামী ও ফরিয়াদীদের জবানবন্দী যথারীতি সম্পন্ন হওয়ার পর, পুলিস-কমিশনারের নিকট কাগজ-পত্র প্রেরিত হইল। তাহার পর পুলিস-কমিশনার সিগার মুখে দিয়া ঘন-ঘন ধূম উদগীরণ করিতে-করিতে এক প্রস্থ রিপোর্ট লিখিয়া, আসামী ও ফরিয়াদীদের স্থানীয় প্রকিয়োর‍্যারের নিকট কেস পাঠাইয়া দিলেন। ফরাসী চন্দননগরে ইঁহাকেই "পণ্ডিত সাহেব" বলা হইত। ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইবার হুকুম ইনিই দিয়া থাকেন। আসামী ও

ফরিয়াদী তাঁহার নিকট হাজির হইল। তিনি উভয় পক্ষের বিবৃতি গ্রহণ করিয়া ও পুলিস-কমিশনারের রিপোর্ট অনুধাবন করিয়া, পরিশেষে গম্ভীর মুখে গুরু-গর্জ্জনে বলিলেন "ক্লাসে" অর্থাৎ বেকসুর খালাস !

প্রতিপক্ষ যাঁহারা, তাঁহারা সবিস্ময়ে 'হাঁ' করিয়া রহিলেন। আর আমার ছাত্র-বন্ধুরা সগৌরবে কোর্ট হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল 'বন্দেমাতরম্'। অভিযোক্তা এই ঘটনার পর আমার হাতে-পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

এই ঘটনায় প্রতিবেশি-মহলে আমাদের একটু প্রতিপত্তি বাড়িল। আমাদের দলের বিরুদ্ধে এই সময়ে একটী বিরুদ্ধ-কথাও কেহ উচ্চারণ করিতে ভরসা করিত না। আমাদের অলক্ষ্যে কিন্তু বিপদ্ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং ইহার সঙ্কেত আমি বৎসরের প্রথমেই পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা আমলে না আনিয়া, প্রচণ্ড বেগে নূতন জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম।

যে সকল ছাত্র আমার সহিত একত্র হইয়া দেশসেবায় ব্রতী হইয়াছিল, যাহারা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে উপাসনার মন্দিরে বসিয়া পূজা করিত, বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিত, যাহাদের লইয়া আমি রবিবাসরীয়া সাহিত্য-সভায় পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মগ্রন্থাদির আলোচনা করিতাম, তাহারা সকলেই দেশ-জননীর কৃতী সন্তান হউক; শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাধনায় সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠুক— এই প্রার্থনা সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট করিতাম। যে রবিবাসরীয়া সভা কানাইলাল দত্তের সাহায্যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নানাবিধ ঘটনাবর্ত্তে উহা এখন পর্য্যন্ত আমারই তত্ত্বাবধানে চলিতেছিল। এই সাহিত্য-সভায় অগ্রণী ছাত্র শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র কানাইলালেরই এক জ্ঞাতিভ্রাতা। একনিষ্ঠ চিত্তে সে এই সভার শিক্ষা ও সাধনা নিয়মিত-ভাবে পালন করিত এবং সেই নির্দ্দেশ-মত জীবন গ্রহণ করিতেও সে কৃতসঙ্কল্প ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ও আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে রিপণ কলেজে যখন অধ্যয়ন করিতেছিল, সেই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের কলিকাতায় আগমনোপলক্ষে অরুণচন্দ্র পুলিস কর্তৃক ধৃত হয়। ইহার দুইদিন পূর্ব্বে মণীন্দ্রনাথ নায়েক এম. এস্. সি. পড়িতে-পড়িতে কলিকাতা হইতে স্বাভাবিকভাবে চন্দননগরে ফিরিয়াছিল, কিন্তু অরুণের

গ্রেপ্তারের পর একই প্রকার সংশয়ের ফলে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য সে এক প্রকার সহরবন্দী হইয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। অরুণচন্দ্রের বন্দী হওয়ার সংবাদ তাহার বিধবা জননী আমার নিকট আসিয়া যখন জ্ঞাপন করিলেন, মাথায় আমাদের যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিধবার সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ সন্তান—আমারই সংসর্গে আজ সে বিপন্ন হইয়াছে। অরুণের মাতাঠাকুরাণী করুণ-কম্পিত কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন যে, তাহার মুক্তির ব্যবস্থা যে কোন প্রকারে হউক, আমাকেই করিতে হইবে। খুব দুশ্চিন্তায় পড়িলাম। কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমাদের উপর পুলিসের অশুভ-দৃষ্টির কথা জানিয়া অরুণচন্দ্রের মাতুল আমায় শাসাইয়া গিয়াছিলেন—যেন আমি অরুণকে আর আমার নিকট আসিতে না দিই। অভিভাবকগণের এইরূপ শাসন-বাক্য আমার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। আমি বলিতাম—আমার বাড়ীর দুয়ার দিবারাত্রই মুক্ত থাকিবে, শত্রু-মিত্র সকলেরই অধিকার আমার বাড়ীতে। কিন্তু মণীন্দ্রনাথের পর অরুণচন্দ্রের বন্দিদশা সহিয়া লইবার মত অবস্থা আমার ছিল না। এই সংবাদে আমি বেশ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আমার স্ত্রীও এই কথা শুনিলেন। তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তোমার যে কাজ, পরের ছেলেপুলে লইয়া এইরূপ মাতামাতি ভাল নয়। তোমার জন্য পাড়াপ্রতিবাসী এত বিপদ্ মাথা পাতিয়া বহিবে কেন?"

সারা দিন আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "আমার কিন্তু মনে হইতেছে—তোমাদের কাহারও কিছু হইবে না। অরুণ নিরাপদেই ফিরিয়া আসিবে।" সারা রাত্রি কিন্তু ঘুম হইল না। পরদিন প্রভাতে আমার পূর্ব্বপরিচিত এক ব্যারিষ্টার বন্ধুকে অরুণের মুক্তির ব্যবস্থার ভার লইতে অনুরোধ করিব চিন্তা করিতেছি; নানা প্রশ্ন, নানা জনের পরামর্শ পূরা দমে চলিতেছে—হঠাৎ অরুণচন্দ্র আসিয়া আমাদের চমৎকৃত করিল। উল্লাসের সীমা রহিল না। "গুরু-মহারাজের" জয়ধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইল। আমরা সানন্দে অরুণকে লইয়া তাহার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম।

এই দুইটী ঘটনাই ভবিষ্য দুর্দ্দিনের সঙ্কেত জ্ঞাপন করিতেছিল। কিন্তু সে দূর-দর্শন সেদিন ছিল না। আজিকার দিন কাটিলেই ভাল, কাল কি হইবে,

সে চিন্তা করার অবকাশও আমার ছিল না। আজও এই স্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বিপ্লববাদের আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু রাজশক্তি সে কথা সহজে বুঝে না। শ্রীঅরবিন্দ আমায় ধর্ম্মতঃ ও কার্য্যতঃ এমন ভাবে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন, যাহাতে আমি পুলিসের ফাঁদে পা দিয়া না বসি। কিন্তু ভবিতব্যের অলক্ষ্য হস্ত আমায় অকারণে অভাবনীয় ভাবে বিপজ্জালে জড়াইতে উদ্যত হইয়াছিল।

বোধ হয়, সেটা শ্রাবণ মাস হইবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই আছে। সকালে উঠিয়াই শুনিলাম—ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে একখানি সাইকেল আর খান-দুই ভাল চেয়ার অপহৃত হইয়াছে।

ঘটনাটী শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। চুরির প্রতিকার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু এই ঘটনা আমার কর্ম্মের পথে কি ভীষণ অন্তরায় সৃষ্টি করিবে, সে কথা আমি তলাইয়া বুঝি নাই। আমাদের পারিবারিক ব্যবসার ক্ষেত্র হইতে আমার চলিয়া আসার পর ব্যবসাটী নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, অগ্রজের সংসার অচলপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে শিশুকাল হইতেই কাজের মানুষ করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমাদের রবিবারের সভার সেও একজন ছাত্র ছিল। কিন্তু মানুষের কর্ম্মই স্বভাব ও স্বধর্ম্ম হইয়া জীবনকে চালাইয়া লয়। আমার সকল প্রয়াস এই জন্যই এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। মন্দ সংসর্গে পড়িয়া সকল প্রকার গর্হিত কর্ম্ম করিতে তাহার বাধিত না। আমার শয়নগৃহে আমার একখানি বাঁধান ছবি ছিল। ছবিখানি একদিন অপহৃত হওয়ায়, আমার স্ত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রটীকেই দায়ী করিয়াছিলেন, আমি সে কথা উড়াইয়া দিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছি—গোয়েন্দা পুলিসের লোকেরা তাহার কৃতিত্বের পরীক্ষার জন্যই হউক অথবা অন্য উদ্দেশ্যবশতঃই হউক, আমার একখানি ছবি হস্তগত করার জন্য তাহাকে প্ররোচিত করিয়াছিল।

সাইকেল ও চেয়ার চুরি যাওয়ার পর ভ্রাতুষ্পুত্রটীকে নিখোঁজ হইতে দেখা গেল। সংশয় দৃঢ় হইল। চরিত্রহীন হইলেও, আমার প্রতি স্বভাবতঃ তাহার একটা শ্রদ্ধা ছিল। সে বাড়ী ফিরিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে সব বলিয়া ফেলিল। সে বলিল "সাইকেলটী বিক্রয় করিয়া

ফেলিয়াছি, আর চেয়ার দু'খানি এক গোয়েন্দা পুলিস-কর্ম্মচারী খরিদ করিয়াছেন।"

আজিকার মত সেদিন অহিংসা-নীতির এত সুব্যাখ্যা মিলে নাই। এই সূত্র ধরিয়া গোয়েন্দা পুলিসকে একটু শিক্ষা দেওয়ার প্রবৃত্তি সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীমান্‌কে ভরসা দিয়া পুলিসে ব্যাপারটী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে পুলিস কমিশনার সাহেবকে বলিলাম "বিষয়টী জানাজানি হইবে, অতএব বামাল সরাইবার আগেই গোয়েন্দা পুলিসদের বাড়ীটী খানাতল্লাসী করিতে হইবে।"

এই সময়ে যিনি ফরাসী পুলিস-কমিশনার ছিলেন, তাঁর নাম মঁসিয়ে পমেজ। তিনি একজন স্বাধীনচেতা রাজপুরুষ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। তিনি আমাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি বলিলেন "এখন অপরাহ্ণ, বড় সাহেবের নিকট হইতে হুকুমনামা বাহির করিতেই ৬টা বাজিয়া যাইবে, আজ খানাতল্লাসী সম্ভবপর নহে। কাল সকালে করিব।"

ফরাসী দেশে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের মধ্যেই খানাতল্লাসীর নিয়ম প্রবর্ত্তিত। কিন্তু কাল সকাল পর্য্যন্ত বামাল যে গোয়েন্দা পুলিস-কর্ম্মচারী রাখিয়া দিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি?

পমেজ সাহেব বলিলেন "আপনারা একটু নজর রাখুন, বামাল না সরাইয়া ফেলে।"

একজন রাজকর্ম্মচারীর এইটুকু ভরসার ইঙ্গিতই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। আমি গৃহে ফিরিয়া, আমার তরুণবাহিনীকে আহ্বান দিলাম। প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০ জন তরুণ একত্র হইল। গোয়েন্দা পুলিসকে জব্দ করার এই সুযোগ ছাড়িবার নয়। এমনি একটা রাজসবৃত্তি অবাধে আমায় যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ধরাইয়া দিবার গুরু-মূর্ত্তি আমার নিকটে নাই; কিন্তু পথের বাধা চিরদিনই যিনি, তিনি কথা শুনিয়া ইহাতে ঘোর অনর্থ বাধিবে বলিয়া, এইরূপ কর্ম্ম হইতে আমায় প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করিলেন। আমার হৃদয়ের রাজসী প্রকৃতি তখনও শোধনে ও রূপান্তরে বিশুদ্ধ সত্ত্বশ্রী ধারণ করে নাই—চক্ষের সম্মুখে ভাল মন্দ যাহা কিছু আসে, তাহাই আশ্রয় করিয়া এই প্রকৃতি ভীমবেগে আগাইয়া চলে।

এ-রকম একটা সম্মুখ-সংগ্রামে চিত্ত আমার প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিল না। আমরা বাঁশের লাঠি হাতে সন্ধ্যার অন্ধকারে দেড় মাইল দূরে গোয়েন্দা পুলিসের বাড়ীখানি ৫০ জনে ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম। সন্ধ্যার পর গুমট আঁধারে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া, তাহারা আমাদের দেখিতে লাগিল। এত বড় দুঃসাহসীকে তাহারা সেদিন ভীষণ মূর্ত্তিতেই দেখিয়াছিল; কেন-না, বুঝা গেল—অনেক জল্পনা-কল্পনার পর একজন অতি সন্তর্পণে বাইক লইয়া বাহির হইয়া গেল। আমাদের লক্ষ্য—কেহ না চেয়ার লইয়া পলায়।

ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল—চুঁচুড়া হইতে ছদ্মবেশে এক শত রিজার্ভ পুলিস আমাদের প্রতি জনের দুই পাশে দুই জন করিয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা তাহাতে আপত্তি করিলাম না। আমাদের দৃষ্টি বামালের দিকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল—একেবারে মিলিটারী সাজে আমাদের পুলিস কমিশনার পমেজ সাহেব জন-কয়েক বরকন্দাজের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। তিনি আমায় একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া, একটু রুক্ষ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"আপনি করিয়াছেন কি? রাজ্যটা কি আপনার?"

আমি বলিলাম "হইয়াছে কি! আপনিই তো বামাল না সরায়, তাহার জন্য দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন।"

সাহেব বলিলেন "বেশ দৃষ্টি রাখিয়াছেন! আপনার বিপ্লবীদের লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ-ঘোষণাই হইয়াছে। কিন্তু দেশটা এখনও আপনার হয় নাই। দেশটা আমাদের ফরাসী জাতির। বৃটিশ আমাদের মিত্র। আপনার জন্য ফরাসী জাতি বন্ধু-বিচ্ছেদ করিবে না। আপনি যে একটা আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ বাধাইবার উপক্রম করিয়াছেন, বুঝেন না কি?"

ব্যাপারটা যে কিরূপ গুরুতর হইয়াছে, সব কথা তিনি বুঝাইয়া বলিলেন—"বৃটিশ পুলিসের বাড়ী আপনারা এত লোকে ঘেরাও করিয়াছেন। হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, কলিকাতায় খবরাখবর চলিয়া গিয়াছে। ফরাসী রাজ্য, নতুবা এতক্ষণ আপনাকে উড়াইয়া দিত। আপনি মানে-মানে প্রস্থান করুন, বামাল দেখার ভার আমার উপর রহিল।"

আমি বলিলাম "তবে কি অপরাধীর শাস্তি হইবে না?"

সাহেব বলিলেন "কাল আদালতে তাহার বিচার হইবে। সকালে পুলিস আদালতে হাজির হইবেন।"

আমি "তথাস্তু" বলিয়া বন্ধুদের ডাকিয়া একত্র করিলাম; তারপর রাইট, লেফ্ট করিতে-করিতে উল্লাসে-উৎসাহে আমরা ফিরিলাম। অর্দ্ধ-পথে আমাদের কাণের পাশ দিয়া ঝটিকাবর্ত্তের ন্যায় রিজার্ভ পুলিস শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়া গেল। তাহাদের বক্র-দৃষ্টি যেন শাসাইয়া বলিতেছিল—লোকটার স্পর্দ্ধা তো কম নয়!

কি উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠিত চিত্তে, কি ব্যাকুল সজল-নয়নে প্রতীক্ষানিরতা দেবীমূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গ প্রার্থনাপূত, উর্দ্ধ হইতে করুণার ধারায় যেন তিনি অভিষিক্তা। আমাকে ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন "ফিরিয়াছ! এক কাজ কর, আমায় কিছু দাও, আমি খাই, প্রতিদিন একটা-না-একটা কাণ্ড, এর চেয়ে মৃত্যু আমার ভাল!"

আমি সস্নেহে সকল কথা বলিলাম। তিনি সান্ত্বনা পাইলেন না, বলিলেন "সামান্য দুইখানা চেয়ারের জন্য তুমি ঘুমন্ত বাঘকে খোঁচা দিয়া ভাল করিতেছ না!"

আমি এই নিরীহা ভীরুস্বভাবা নারীটির দিকে কঠিন চক্ষে চাহিয়া বলিলাম "আমায় লইয়া তুমিও যেমন বিব্রত, তোমাকে লইয়া আমার দুশ্চিন্তাও বড় কম নয়।"

এই কথায় তিনি আর্দ্র নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—যেন মুক্তি-প্রার্থনায়!

তার পরদিন পুলিস আদালতে গিয়া দেখিলাম—কাণ্ড গুরুতরই বটে! পুলিস সাহেবের ঘরে তখন মিষ্টার টেগার্ট, চুচুঁড়ার এস. পি. আরও অনেক বৃটিশ-রাজকর্ত্তৃপক্ষ মঁসিয়ে পমেজের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। আমি সেই ঘরের সম্মুখেই পাদচারণা করিতেছিলাম। তাঁহারা ঘন-ঘন কটাক্ষে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; পরে দেখিলাম—তাঁহারা মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেলেন।

মঁসিয়ে পমেজ আমায় ডাকিয়া বলিলেন "মকদ্দমা উঠাইয়া লউন।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "কেন?"

তিনি বলিলেন "আপনি কি পাগল? এই মকদ্দমায় কাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, বুঝিতেছেন না?"

আমি বলিলাম "আমি কোন এক অপরাধীর বিচারপ্রার্থী। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন কথা নাই। আসামী আপনার সম্মুখে; তাহার এজাহারে প্রকাশ হইবে—তাহার অপহৃত দ্রব্য কে খরিদ করিয়াছে। সে ব্যক্তি যে-ই হোক, আপনি কি তাহার বিচার করিবেন না?"

সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে তাঁহার সহকারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল। তাহার পর তাঁহাকে বিদায় দিয়া তিনি ধীরে-ধীরে বলিলেন "আমার পুলিস যথারীতি খানাতল্লাসী করিয়াছে, বামাল পায় নাই। আপনি কি করিবেন?"

আমি বলিলাম "আসামীর স্বীকারোক্তি কি কোন কাজেরই হইবে না?"

তিনি তারপর বুঝাইয়া বলিলেন "আপনি আমার উপদেশ গ্রহণ করুন, মকদ্দমা তুলিয়া লউন। আপনার কথা হয়তো সত্য; কিন্তু বিচারে উহা প্রমাণসিদ্ধ হওয়া চাই। বিচারে আপনি ঈর্ষ্যাবশতঃ ইংরাজ পুলিসের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, এই মকদ্দমা যদি চলে, আপনি পদে-পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন। বন্ধু হিসাবেই আমি ইহা বলিতেছি।"

আমি একটু ব্যথিত হইয়াই বলিলাম "ফরাসী রাজ্যে ফরাসী প্রজার কি সুবিচার-প্রার্থনা দুরাশা মাত্র?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "ফরাসী রাজ্যে আপনি নিরাপদ্। কিন্তু বৃটিশ রাজ্য না হইলে, আপনার দিন-গুজরান হইবে না, এই কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। এখন কি করিবেন, বলুন? মকদ্দমা যদি চালাইতে চাহেন, আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু বন্ধু-হিসাবেই বলি—এ মকদ্দমায় আপনার হার হইবে।"

ক্ষোভে, দুঃখে অভিমানে আমার কান্না পাইল। এত উদ্যম, এত উৎসাহের পর পর্ব্বতের মূষিক-প্রসবের ন্যায় এক প্রকার পরাজয় স্বীকার করিয়া বাড়ী ফিরিব, এ দুঃখ অহঙ্কারের। আমি এক প্রকার অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিলাম। তার পর মনে হইল—উত্তেজনার

কুহকে আত্মসাধন দূরে রাখিয়া, বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। আমি বলিলাম "মকদ্দমা তুলিয়া লইলাম।"

সাহেব প্রফুল্ল মুখে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "Bien! Bon jour!" (বেশ, প্রাতঃকালীন অভিবাদন গ্রহণ করুন।)

অসংখ্য প্রকারের অভাবনীয় ঘটনা-স্রোতঃ—কয়টা বলিব? কিন্তু নানা ঘটনার সংঘাতেই জীবন আমার নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ইহার সহিত গৃহদেবীরও ভাগ্যবিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সুখের কামনা তাঁহার ছিল না। স্বামীর নিরাপত্তার দিকেই তিনি দৃষ্টি রাখিতেন তাঁর সবখানি দিয়া। বিধাতার কৌতুক-রঙ্গ এইখানেই অধিক লীলায়িত হইত, চিত্ত তাঁর ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িত। বিপদের আশঙ্কা ছিল প্রতি পদে। দুর্ভাবনায় তাঁর ম্রিয়মাণ মুখচ্ছবি আমায় ব্যথিত করিত; ভাবিতাম—দুশ্চিন্তার বোঝা কেন তাঁহাকে বহন করিতে দিই? জীবনের সকল কথা তাঁহাকে না জানাইলেই তো হয়—অন্য অনেকের মত তিনিও তাহা হইলে হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইতে পারেন। অন্যেরও তো স্ত্রী আছে, সেবার অধিকারটুকু দিয়া পুরুষেরা স্ত্রীর সহিত অনেকখানি নিঃসঙ্গ হইয়াই চলে। আমি কেন তাঁহাকে আমার কার্য্যের সহিত জড়াইয়া, আমার ভাব ও স্বপ্নের সঙ্গিনী করিয়া তাঁহাকে ভাবাই, দুঃখ দিই!

এইরূপ চিন্তার মূল্য কিছুই ছিল না। জগতে এক অন্যকে সঙ্গে লইয়া এমন উদাসীন নিঃসঙ্গভাবে কেমন করিয়া চলে, তাহা আমি ভাবিতেও পারিতাম না। অন্য বলিতে আমার আর কেহ ছিল না; একান্ত কৈশোরে বালিকা-বধূর সহিত চিত্তবিনিময় হইয়াছিল; স্বভাব-সংস্কার অথবা পারিপার্শ্বিক ঘটনাবর্ত্তে ভাল-মন্দ যাহাই ঘটুক অথবা ঘটিবার যে কোনরূপ সম্ভাবনাই থাকুক, আমিও যেমন তাহা তাঁহার কাছে ব্যক্ত না করিয়া স্বস্তি পাইতাম না, তিনিও তদ্রূপ তাঁর সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে খুঁটিনাটি সকল বিষয় আমার কাছে প্রকাশ না করিলে হাঁপাইয়া উঠিতেন। সে কত ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ব্যাপার—বস্তু, ব্যক্তি, মানুষের সম্পর্কিত ভাবজগতের অব্যক্ত তরঙ্গ—অনুমানে ও প্রত্যক্ষে যাহা কিছু তাঁহার মনে উদিত হইত, তাহা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া তিনি চিত্ত লঘু করিতেন। জীবনের কোনখানে তিনি একটী ক্ষুদ্র বিষয়ও গোপন রাখিতেন না—ইহা আমি নিঃসংশয়ে জানিতাম; তিনিও জোর করিয়া আমার সকল অবস্থার কথা জানিয়া লইতেন। অন্তরের ঐক্য যেখানে, সেখানে একের কাছে অন্যের গোপন করার কিছু থাকিতে পারে, এ কল্পনা তিনি মনের কোণেও স্থান দিতেন না। এই মুক্ত স্বচ্ছ ভাবটী ছিল তাঁর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম; তাই তাঁর আপনাকে প্রকাশ করার সাবলীল ছন্দঃ কোথাও কুটিল অস্বচ্ছ ছিল না। আমি এমন মুক্ত প্রবাহে, স্বতঃ উৎসরিত ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিতাম না। তিনি কিন্তু ছাড়িতেন না। সুখের হউক, দুঃখের হউক, সব কিছু বরণ করিয়া, আমার প্রতি মুহূর্ত্তের অবস্থা ও ঘটনা তিনি জানিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। যেখানে ইহার অন্যথা হইত, তাঁহাকে বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় কাতরা দেখিতাম। স্বামীর সহিত কলহ বা অভিমান করার বিন্দুমাত্র ভান তাঁহার মধ্যে ছিল না। স্বামীর সোহাগ ও আদর আদায় করার কোনরূপ কৃত্রিম প্রয়াস তাঁহাকে কোনদিন করিতে দেখি নাই। বেশ-বিন্যাসে শোভনা হইয়া স্বামীর চিত্ত আকৃষ্ট করার কোনরূপ প্রসাধন তাঁহার ছিল না। বসনে, ভূষণে, সাজে-সজ্জায় দেহের প্রসাধন নারী-ব্যবহারের এক অপরিত্যজ্য অঙ্গ—ইহা আমি আজ দেখিতেছি। কিন্তু নারী বলিতে তিনিই ছিলেন আমার কেন্দ্র-লক্ষ্যে, তাই তাঁহারই ছন্দঃপূত নারী-চরিত্র দেখার ও তদনুযায়ী নারীকে গড়ার প্রেরণা আমায় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধা হইতেন, আমা হইতে বিমুখী হইতেন—কোন কিছুর অভাবে বা দাবীর দায়ে নহে; যেখানে তিনি দেখিতেন—আমি যেন কিছু লুকাইয়া চলিতেছি, কিছু জানাইতে কুণ্ঠা করিতেছি, আর তাঁর আপ্রাণ আগ্রহেও তিনি তাহা বাহির করিতে পারিতেছেন না, অমনি মনে করিতেন যে, আমা হইতে তিনি নিজে অনেক দূরে পড়িয়া যাইতেছেন, আর আমিই তাঁহাকে দূরে ঠেলিতেছি। সে দুঃখের আর সীমা থাকিত না। চক্ষে প্রাবৃটের বর্ষণ ঝরিত, হৃদয় তাঁহার শূন্য হইয়া যাইত। সংসারের কাজ-কর্ম্ম সবই তিনি করিতেন; কিন্তু সে কি উদাসিনী ব্যথা-মূর্ত্তি, তাহা আজও আমার চক্ষে

ভাসিয়া উঠে। শুধু আমার কাছেই তাঁহার এই করুণ নির্ব্বিকার ভাবটী ধরা পড়িত না, সকলেই ইহা লক্ষ্য করিতেন। এই অবস্থায় কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কথা কহিতে পারিতেন না। তাঁহার মুখের হাসি ফুটিয়া, শুকাইয়া যাইত। জীবনের প্রলয় ঘটিত কত তুচ্ছ কারণে, তাহা ভাবিলে আজও নয়ন আমার নিমীলিত হইয়া পড়ে। ভাবি—এক যেখানে অন্যকে অকপটে সবখানি দিয়া পাইতে চায়, সেখানে অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানও কত পীড়ার কারণ হয়! যে ইহা অনুভব করে নাই, সে বুঝিবে না। পতি-পত্নীর সম্বন্ধের কথা শুধু নহে—গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, সখার সহিত সখার পরিপূর্ণ ঐক্য সিদ্ধ করিতে হইলেও, দুই হিয়ায় কি অভেদবন্ধন যে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, আজ মৃত্যুর ব্যবধানে সেই পরম-যোগতত্ত্ব তিনি অশরীরিণী হইয়াই আমায় বুঝাইতেছেন। ঈশ্বর-সম্বন্ধ-লাভের প্রয়াস সফল হওয়ার সত্যতা যদি থাকে, পৃথিবীতে মানুষের সহিত মানুষের অভেদ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা না হইলে, উহা কল্পনাই হইবে—এ কথা দৃঢ়কণ্ঠেই আজ বলি।

সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এক যখন অন্যকে তার সবখানি দিয়া চায়, অন্যের কোথাও যদি ইহাতে বাধে, আর সেই এক যদি সত্য-সত্যই অনন্যাশ্রয়ী হইয়া থাকে, তবে তার যে কি মৃত্যু-যন্ত্রণা, তাহা সেদিন অনুভব করিতে পারি নাই। এমন হইলে, বোধ হয় তাঁহার মরা হইত না। এমন অপ্রাকৃত-সম্বন্ধ-সৃষ্টির স্বপ্ন তাঁহার মর্ম্মেই আলো হইয়া ফুটিয়াছিল। সেই জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্নের ধ্যানেই তিনি সতত নির্ব্বাক্, অচঞ্চল ধৈর্য্যময়ী হইয়া থাকিতেন। আর আমি এই যোগামৃত-প্রাপ্তি এত নিকটে থাকিতেও, অপ্রাপ্তির বেদনায় সম্মুখে যাহা পাইতাম, দুই হাত বাড়াইয়া বুকে তাহাই জড়াইয়া ধরিতাম। একজন অন্তরের পাওয়াকে বাহিরে প্রমাণ করার জন্য ব্যথার অশ্রু ফেলিতেন; আর একজন বাহিরের পাওয়াকে ধরিয়া ভিতরে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মাদের ন্যায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কত প্রলাপ বকিত—চঞ্চল চিত্তে কত ঠাঁই ঘুরিত, তাহার ঠিকানা ছিল না।

এই পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে অমৃত-ভাণ্ড নিজেদের আয়ত্তে থাকা সত্ত্বেও, বিষাদের ঘনচ্ছায়ায় আমরা পুনঃ-পুনঃ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতাম। অনেক সময়ে পরস্পরকে যেন খুঁজিয়াই পাইতাম না! এই অবস্থায় তিনি

বাহিরে অবসন্ন৷ হইয়া পড়িতেন ; কিন্তু অন্তরের সত্যকে ম্লান হইতে দিতেন না। আর আমি অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, বাহিরের স্নায়ুপেশীর যত শক্তি আছে, সব জাহির করিয়া বিজয়ীর মত উন্নত-শির হইয়া থাকিতাম। অপ্রাকৃত মিলনের সম্ভাবনা যত ঘনাইয়া আসিতেছিল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে সঞ্চিত যত অস্পষ্টতা সব ঘনীভূত হইয়া কি দুর্দ্দিন আনিবার সূচনা করিতেছিল, সে করুণ জীবনবিবরণ পরে বলিব।

যৌথ সংসার হইতে স্বতন্ত্র হইয়াই, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া, স্বাবলম্বনের সাধনায় পা বাড়াইয়াছি। শ্রীঅরবিন্দের অমোঘ প্রেরণাস্পর্শে অধ্যাত্ম-সাধনার দ্বার মুক্ত হওয়া মাত্র, আত্মসমর্পণ-মন্ত্রের প্রচার-কল্পে 'প্রবর্ত্তক' বাহির করিয়াছি। স্বচ্ছ, বিঘ্নহীন জীবনের রঙীন দিনগুলি চক্ষে নূতন আশা-প্রদীপ জ্বালিল। কিন্তু যেখানে আমার ঐক্য, যেখানে প্রাণ-সংযোগ হইলে জীবন বিদ্যুন্ময় হয়, সেইখানে ফাঁক রাখিয়া চলিতেছিলাম—এ ভুল বড় করুণ হইয়া ধরা পড়িল। জীবনযোগ আমার কাছে দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র ছিল না, উহা বস্তুতন্ত্র হইতে চাহিয়াছিল। উদাত্ত কণ্ঠে গাহিতাম :

"ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ,
গোবিন্দ আমার প্রাণ-রে—
ঐ হরিনাম যে করে
সেই আমার প্রাণ-রে !"

যাহাকে ভালবাসি, সাধনার গোড়ায় তাহাকেই প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। ঋষি বঙ্কিমের মাতৃবন্দনা-মন্ত্রের "ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে", এই বাক্যটী, কত উচ্ছ্বাসেই যে উচ্চারণ করিতাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। যাকে ভালবাসি, শুধু সেই আমার প্রাণ নয় ; তাঁকে যারা ভালবাসে, তাদের মধ্যেও একই প্রাণ অনুস্যূত করার স্বপ্ন দেখিতাম। কোন্ দিক্ দিয়া কোথা হইতে কোথায় আমায় পৌঁছিতে হইবে, তাহা বার-বার কল্পনায় স্থির করিয়াছি, বার-বার তাহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়াছে। আজ মরণের অর্ঘ্য দিয়া যে আমায় প্রতিষ্ঠা দিয়া গেল সত্যে, তাঁরই বন্দনাগীতি গাহিতে গিয়াই এত কথা !

সুখের স্বপ্ন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পূর্ব্বের ন্যায় আরও কয়েকটী অপ্রিয়

ঘটনাপাতে মসীময় হইয়া পড়িল। দুঃখের দিন যেন আর ফুরায় না! সান্ত্বনার বাণীমূর্ত্তি যদি সঙ্গে-সঙ্গে না থাকিতেন, দুঃখের সাগরেই আমি হয়তো ডুবিয়া মরিতাম। আমার অপ্রত্যক্ষে, অজ্ঞাতে যে-সব জটিল চক্রান্ত চলিতেছিল, তাহাই আমার জীবনের পথ রুদ্ধ করিতেছিল। ইউরোপের মহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের সহিত ভারতে বিপ্লব-সৃষ্টির যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহারই সম্পর্কে মালয়োপকূলের এক বন্দরে অস্ত্রশস্ত্র সহ জনৈক বিপ্লবী[১] এই সময়ে ধরা পড়িয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট রাজকর্তৃপক্ষ আমার নামধাম পাইয়াছিলেন। এই সব বিষয় তখন আমি জানিতাম না বলিয়াই গোয়েন্দা পুলিসের সহিত সংঘর্ষ বাধাইতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই; কিন্তু আমার এইরূপ ব্যবহারে তাঁহাদের স্বভাবতঃ আমাকে বিপ্লবী বলিয়া ধারণা আরও দৃঢ় হইয়াছিল—তাঁহাদের পক্ষে ইহা কিছু অসঙ্গত হয় নাই।

সে এক রাত্রির কথা। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইবে। বাতায়ন-পথে একটী অস্পষ্ট মনুষ্য-রূপ দেখা গেল। 'চোর'-'চোর' বলিয়া বন্ধুরা তাহার পশ্চাৎ অনুধাবন করিল। আমিও সংশয়াকুল চিত্তে তাহাদের অনুসরণ করিলাম। অর্দ্ধপথে গিয়া দেখি—একজন নহে, দুই-চারি জন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছে। তাহাদের মধ্যে দুই-একজনের জুতা পথেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। দেখিয়াই বুঝিলাম—ইহারা চোর নহে, পুলিসের অনুচর।

ঘটনাটী থানায় ডায়েরী করিয়া দেওয়া হইল। পরদিন পুলিস লোক সনাক্ত করার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল। অন্ধকারে কাহারও মুখ স্পষ্ট করিয়া চক্ষে না দেখিলেও, অনুমানে দুই জন গোয়েন্দা কর্ম্মচারীকে সনাক্ত করিলাম। ঘটনা অনেক দূর গড়ায় দেখিয়া, পুলিস-কর্ম্মচারীদের তাৎকালীন স্থানীয় কর্ত্তা আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সহিত মুখোমুখি পরস্পরের

১। জার্ম্মানীর প্রেরিত অস্ত্র-শস্ত্র সহ জাহাজের যাত্রী এই বিপ্লবীর নাম অবনী মুখার্জ্জী।

"......He (Abinash Ray) had been concerned in Shanghai, in German schemes for sending arms to India and asked Abani (Abani Mukherjee) to give a message to Matilal Ray at Chandernagore saying everything was all right and they must devise some means by which Ray could be got safely into India. Abani's note book contained the address of Matilal Ray and several other known revolutionaries of Chandernagore, Calcutta, Dacca and Comilla......"

Government of India, Sedition Comittee Report 1918 (Rowlatt Committee) P. 125.

আচরণ সম্বন্ধে এক চুক্তি করা হইল। এই চুক্তির ফলে আমি তাঁহাদের ফাঁকি দিয়া চন্দননগরের বাহির হই নাই। বিশেষ ভাবিয়া-চিন্তিয়া এইরূপ সর্ত্ত করা হয় নাই, হঠাৎ আমার মুখ দিয়া উহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহদেবীর কাছে ইহা গোপন রাখার উপায় ছিল না। তিনি শুনিয়া বলিলেন "সবই ভগবানের ইচ্ছায় হয়। তোমার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইয়াছে, তাহা ভগবানেরই ইচ্ছা। কলিকাতায় যাওয়া তোমার আর চলিবে না।" তার পর তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমার প্রার্থনাই ভগবান্ কাণ পাতিয়া শুনিয়াছেন। তোমার পিছনে এত শত্রু, আর তুমি এমন করিয়া বাহির হইয়া যাও! যতক্ষণ না ফিরিয়া আস, কি দুর্ভাবনা, কি যন্ত্রণা যে হয়, তাহা তুমি বুঝিবে না; ঠাকুর আমায় দয়া করিয়াছেন!"

স্বামীকে নিরাপদ্ রাখার জন্য তাঁর এইরূপ আকূতি সর্ব্বনিয়ন্তাই শুনিতেন। এই ঘটনায় তাঁর হর্ষোৎফুল্ল লোচনে আমার নিরাপত্তার ভরসা প্রদীপের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

দুঃখের দিন কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া ঘিরিয়া ধরিল। এবার আর নিজের ক্ষুদ্র সংসারের অভাব-অভিযোগ নয়, শ্রীঅরবিন্দের জন্য অর্থসঞ্চয়ের দুশ্চিন্তা নয়, "রক্ষিত-দে-ঘোষ" কোম্পানী নামে যে কাঠের কারবারটী চালু করিয়া আমাদের আর্থিক সংস্থান সচল করার ব্যবস্থা হইয়াছিল, দেখিতে-দেখিতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় জটিল ঘটনাসম্পাতে তাহা এক প্রকার অচল হইয়া পড়িল।

একদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই শুনিলাম "সাগরকালীবাবুর বাড়ী খানাতল্লাসী হইতেছে।"

বুকটা দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। এই অতি-নিরীহ ভক্ত-পরিবারটী আমার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার দায়েই এই বিপদে পড়িল, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইলাম। কালীবাবুর খবর লইয়া জানিলাম— তিনি বাড়ীতে নাই। কার্য্যস্থানে গিয়াছেন।

গঙ্গার অপর পারে একটা চটকলে ইনি উচ্চপদে চাকুরী করিতেন। একটা গৃহস্থ-সংসারের পক্ষে তাঁর উপার্জ্জন নিতান্ত কম ছিল না। আমাদের

কাঠের কারবারটি বড় করিয়া তোলার তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া দূরে যাক, আমি জানিতাম—তিনি অদিনের জন্যও বিশেষ অর্থসঞ্চয় রাখেন না। এই খানাতল্লাসের সঙ্গে আমাদের বৈপ্লবিক সম্পর্কে তিনি যদি বন্দী হন, তাঁহার সংসারটির অবস্থা কি হইবে? এই সকল দুশ্চিন্তায় আমি কিছু মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতার করুণায় সর্ব্বনাশের অর্দ্ধেকখানি মাত্র হইল। কালীবাবুকে ধরিবার জন্য পুলিস যখন চট-কলে উপস্থিত হয়, তিনি তখন বৃটিশ এলাকা পার হইয়া চন্দননগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

বিপদ্ ক্ষিপ্রতর ঘনাইয়া আসিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পুলিসের অনুসরণে খরিদ্দারেরা ভীতিগ্রস্ত হওয়ায়, "রক্ষিত-দে-ঘোষ" কোম্পানীর "দে" ও "ঘোষ" বসিয়া পড়ার পর "রক্ষিত"ও শেষে বসিয়া পড়িল। অনেকগুলি বন্ধু মিলিয়া আমরা যেন একটা নাতিবৃহৎ বেকার-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিলাম। কালীবাবু বলিলেন "আমার যেটুকু সংস্থান আছে, তাহাতে ছয় মাস চলিবে।" মাণিকলালের এই দায় ছিল না। রামেশ্বরেরও তাই। দুই-একজনের দায়ভার আমার মাথায় পড়িল। উপায়ের ক্ষেত্র ঐ কাঠের কারবারটি। এই দুঃসময়ে মাল কলিকাতায় প্রেরণ করা দুঃসাধ্য হইল। মাণিকলাল পুঁজি যোগাইয়া কারখানাটীকে কোনপ্রকারে জীয়াইয়া রাখিল। শত্রু-কর্ত্তৃক নগর অবরুদ্ধ হইলে, নাগরিকেরা যেমন হিসাব করিয়া চলে, শতাধিক শ্রমিক লইয়া আমরা কয়েকটা পরিবার সাধ্যমত তদনুরূপ জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। অন্তরে-বাহিরে মিল ছিল বলিয়া, দুঃখের দিনও সুখের হইল। কয়েকটী পারিবারিক জীবনের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল। কিন্তু অভাব যাইবে কেন? দুঃখ-দৈন্যের মসীচিহ্ন সকলের ললাটেই ফুটিল; কিন্তু দুর্ভাবনার মধ্যেও অন্তরে শান্তি ছিল, উৎসাহ পাইতাম। সেই শান্তি ও উৎসাহের অন্যতম উৎস ছিলেন আমার গৃহলক্ষ্মী।

বর্ষা কাটিল। আকাশে নীল রঙ ফুটিল। শরতের সোণার রৌদ্রে সারা দিক্ ঝলসিয়া উঠিল। স্নিগ্ধ রাত্রি জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসিল।

উজ্জ্বল প্রভাতে দ্বারে আসিয়া ভিখারীর কণ্ঠে আগমনীর সুর উঠিল; মহাপূজার ডাকে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইল :

"আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল,
বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি—
ও চাঁদ-মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে ॥"

অভাব ও দারিদ্র্য আমার চিরসাথী। মহাদেবীকে তাহার জন্য কোনদিন ফিরিতে হয় নাই, চিরদিন তাঁহাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছি। আমার নিকট-বন্ধুদের ঘরে-ঘরে অভাবের বিভীষিকা, আনন্দময়ীকে তেমন করিয়া বরণ করিতে বাধিতেছে। আমি দরিদ্র হইয়াই জন্মিয়াছি। রিক্ত, নিঃস্ব হইয়াই কিন্তু আনন্দ অনুভব করি। যখন সংসার-ধর্ম্মে ছিলাম, উপার্জ্জনকারী হইয়াও অর্থ আমি নিজ অধিকারে কখনও রাখি নাই। ইহা আমার চিরন্তন স্বভাব। ঈশ্বরেরই মহাদান, তাঁহার প্রসাদ-স্বরূপ পরম সম্পদ্ বলিয়াই ইহাতে আমি গৌরব অনুভব করি। আমার হৃদয়ের একনিষ্ঠা-শ্রদ্ধাই পূজার প্রধান উপাদান। চিরদিনের মত এবারও দেবী তাহাই গ্রহণ করিবেন। ভাবনা শুধু অন্যান্য গৃহস্থ-পরিবারগুলির জন্য। পরকে আপন করিতে গিয়া আজ তাহাদের দুঃখই দিলাম—সুখী করিতে পারিলাম না। এ দুঃখ তাহারা কল্পনা করে নাই। দুশ্চিন্তায় অবসন্ন-চিত্ত হইলাম। গৃহ-দেবীকে বলিলাম "যাহারা আমার হিতকারী প্রিয়জন, তারা আজ আমারই জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত। এবার পূজা দুঃখের ডালি দিয়াই সারিতে হইবে।" এই দুশ্চিন্তা কিন্তু অকারণ হইল। সহানুভূতির তরল উচ্ছ্বাসে লঘু স্বভাবের পরিচয় ছিল। আমি সবিস্ময়ে এবার এক নূতন ভাবের অনুভূতি লাভ করিলাম। অন্যান্য বৎসরের ন্যায়, এবারও মেজ-বৌ আসিল পূজার অর্ঘ্য হাতে। আমি বিষণ্ণ চিত্তে এই দুঃখের দিনে তার পূজা লইতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলাম। মেজ-বৌ বলিল "ঠাকুর, বলেন কি? শরীরের রক্ত এখনও শুকায় নাই; যতদিন প্রাণ, ততদিন পূজা আমার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

সে অবদান প্রত্যাখ্যানের নয়। এবারও মেজ-বৌ অষ্টমীর মধ্যাহ্নে

নিমন্ত্রণ জানাইল। কিন্তু গৃহকর্ত্রী আপত্তি তুলিয়া বলিলেন "মেজ-দিদি, এবার অষ্টমীর পূজা আমার।"

মেজ-বৌ স্থির দৃঢ়কণ্ঠে মাথা তুলিয়া বলিল "লোকে বলে ঠাকুরের সংসর্গে পড়িয়াই আমার স্বামীর সোণার চাকুরী নষ্ট হইয়াছে। এবার ছোটদিদি, তার প্রতিবাদ এই অষ্টমীর পূজায় হইবে। ঠাকুর তোমারই, আমি তোমার প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি।"

মেজ-বৌয়ের এই ভাব ও কথায় নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল। দৃঢ়তার কণ্ঠ শুনিয়া আমার স্ত্রী তাঁহার দাবী সময়োপযোগী হয় নাই বলিয়া লজ্জিতা হইলেন। মেজ-বৌকে বুকে জড়াইয়া তিনি বলিলেন "মেজ-দিদি, ঠাকুর তোমারই, তুমি আমায় ভক্তি-শ্রদ্ধার শিক্ষা দিলে; এবার ঠাকুরের সঙ্গে আমিও যাব।"

অপার্থিব আনন্দের অভিষেকে যথারীতি পূজা শেষ হইল। আড়ম্বরও কম হইল না।

পূজা-সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে নব অতিথি-সমাগমে বাড়ী আমার পূর্ণ হইয়া গেল। শ্রদ্ধেয় বন্ধু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আসিলেন—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কত পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধুর আগমনে পূজার উৎসব অবিচ্ছেদেই চলিল। অমরবাবুকে দেখিয়া শ্রীমতী বলিলেন "কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করিল যে, ইঁহাকে লুকাইবে কি প্রকারে?"

আমি বলিলাম "তোমার স্নেহাঞ্চল যদি সঙ্কীর্ণ না হয়, আমার ভাবনা নাই।"

ভারত-রক্ষা-আইনের দায়ে বাংলার আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা অতি স্বচ্ছন্দে একে-একে আসিয়া ক্ষুদ্র বাড়ীটি জনাকীর্ণ করিয়া তুলিল। তিনি প্রত্যেককে দেখিতেন আর বলিতেন "ইঁহার স্ত্রী আছে?" অমরবাবু ব্যতীত আর সকলেই অবিবাহিত শুনিয়া তিনি তৃপ্তি পাইতেন। অমরবাবুর স্ত্রীর মর্ম্মব্যথা কল্পনা করিয়া, তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়াছিলেন "অমরবাবুর এ পথে নামা ভাল হয় নাই।"

আমি বলিতাম "ফরাসী রাজ্য না হইলে, আমারও তো এই গতি হইত !"

তাঁর সমুজ্জ্বল চক্ষুঃ অব্যক্ত ভাষায় বলিত—"এ আশীর্ব্বাদ ভগবানের। আমি বড় ভাগ্যবতী !"

অন্তহীন শ্রমের সঙ্গে নিরন্তর অর্থচিন্তা ও অসংখ্য প্রকারের দুর্ভাবনায় শরীর অবসন্ন হয় ; কিন্তু গৃহদেবীর প্রসন্নমূর্ত্তি আমার বুকে আশা ও উৎসাহ সঞ্চার করে। এমন করিয়া নবাগত অতিথিদের দীর্ঘদিন রাখা চলে না ; কোনরূপ ব্যবস্থার দিকে মনোযোগী হইলাম। সেদিন যে সকল বন্ধু বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, আমার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ঋণ কেবল আমি নহি, আমার বিপ্লবপন্থী বন্ধুগণও ভুলিতে পারিবেন না।

বিপন্ন দেশব্রতিগণ নিরাপদ্ আশ্রয় মনে করিয়া যখন আমার দুয়ারে উপনীত হইতেন, তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে তুলিতাম। চতুর্দ্দিকে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সতর্ক-চক্ষুঃ, অগ্রজের পরিবারের লোকেরাও তাহাদের বশীভূত বা অনুকূলে, ভরসা মাত্র একজনেরই উপর ছিল ; এই সকল গোপনচারী তরুণদের সেবা দিতে, সুকৌশলে তাঁহাদের আত্মগোপনের সহায়তা করিতে তিনি সততই উদ্যতা থাকিতেন। লোকচক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তিনি প্রতি জনের সুখ-সুবিধার দিকে কেমন করিয়া দৃষ্টি রাখিতেন—তাঁহাদের স্নান, ভোজন, বিশ্রামের ব্যবস্থা কেমন করিয়া সম্পন্ন করিতেন, সে নিপুণ কর্ম্মকৌশলের সাধনা তিনিই জানিতেন। আমি এই উৎসব-যজ্ঞের আনন্দই উপভোগ করিতাম। এই কর্ম্মে তাঁহার শ্রম ও শক্তি-প্রয়োগের অন্ত ছিল না—ইহা ছিল তাঁর দেশ-জননীরই সেবাভঙ্গী।

যখন বন্যার ন্যায় এই সকল পরিচিত ও অপরিচিত বিপ্লবী বন্ধুদের আগমনে, বাহিরে জানাজানির কাণাঘুষা কাণে আসিয়া পৌঁছিল, তখন এই অবস্থার কথাটা শ্রীঅরবিন্দকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

পরিচিত বন্ধুদের আশ্রয় দিতে-দিতে, কত অপরিচিত অজানার সংসর্গেও যে জড়াইয়া পড়িতেছিলাম, সে কথা তিনি ভাল করিয়া দূর হইতে বুঝিতে পারেন নাই। দেশব্রতীদের সঙ্গে-সঙ্গে দেশদ্রোহীও আশ্রয় লইতেছিল, সে বড় নিষ্ঠুর হৃদয়-বিদারিণী কাহিনী ! সে কথা এক্ষণে নহে।

রাত্রে নিদ্রা ছিল না। প্রায় জাগিয়াই থাকিতাম। কখন কে আসিয়া দরজার কড়া নাড়ে, কে জানে? যদি আমি ঘুমাই তো আমার স্ত্রী কাণ পাতিয়া জাগিয়া থাকেন। কড়া-নাড়ার শব্দ শুনিলেই, শরীরে মৃদু আঘাত দিয়া, অতি কৌতূহলে হাসিতে-হাসিতে বলিতেন "ঐ গো আবার কে এল!" এই কর্ম্মটাকে ক্রমে তিনি একটা রঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সারা দিনের শ্রম-ক্লান্তি তাঁহাকে কাতর করিত না, অতি স্বচ্ছন্দেই এই গুরু কর্ম্মভার দিনের পর দিন তিনি বহন করিয়া চলিতেন।

সে এক-রাত্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। আমার স্ত্রীর কর-স্পর্শে জাগিয়াই শুনিলাম মৃদু কড়া-নাড়ার শব্দ। দরজা খুলিয়া দেখিলাম—দুইটী তরুণমূর্ত্তি![১] নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সংবাদপত্রে ইঁহাদের কথা পড়িয়াছি। বলিলাম "আসুন। বন্দী থাকিয়াও এই অধীনের অতিথিশালাটিকে জানিলেন কি প্রকারে?"

'ন' বাবু বলিলেন, "বন্দীশালায় আপনার অবারিত আশ্রয়ের কথা এমন কেহ নাই, যে জানে না!"

আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ দিয়া গৃহে তুলিলাম। স্ত্রী বিছানায় শুইয়া-শুইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা কারা গো?"

আমি বলিলাম "দালান্দার ফেরৎ।"

পরদিন প্রভাতে দালান্দার দুই জন বন্দী উধাও হইয়াছে কেমন করিয়া, তাহার চিত্ত-চমৎকারী সংবাদ বড়-বড় অক্ষরে সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম। গৃহিণী বলিলেন "কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ হইবে—কে জানে!"

আমি বলিলাম "ভয় হইতেছে?"

তিনি মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন "তুমি হয় তো বিশ্বাস করিবে না, এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে একটু তন্দ্রা গিয়াছিলাম—এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম।"

আমি বলিলাম "কি?"

তিনি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধের মধ্যে আর কিছু নাই, আছে আমার সকল কাজে

১। নলিনীকান্ত ঘোষ। প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত।

তাঁর সুস্থ শরীরের অপরিসীম শ্রম ; তাঁর অনাবিল চিত্তে আমার বিপন্মুক্তির শুভ সঙ্কল্প ; আর আছে চারি চক্ষে অন্তর-বাহিরের ঐক্যসূচক দৃষ্টিবিনিময়। যে দেহবল্লরী যৌবনের খর-উত্তাপ শীতল করার জন্য বেড়িয়া-বেড়িয়া, অঙ্গে জড়াইয়া সুখ-তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি, আজ তন্বীর সেই শ্যামস্নিগ্ধা শ্রী অতি সম্ভ্রমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া, নিমেষে অন্তর-বাহির কি এক অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, ভাষায় তাহা বলিতে পারি না। বুকের মধ্যে সত্তায়-সত্তায় দর্শনে, ধ্যানে, দুই জনে যেন এক হইয়া যাই—স্পর্শেরও প্রতীক্ষা রাখে না। যুক্তির এই অপূর্ব্ব আবেশে, এই তন্ময়তায় রক্তমাংসের ক্ষুধা থাকিতেও ক্ষুধা তাহারা ভুলিয়া যায়! এমনই মহিমময়ী মূর্ত্তিতে তিনি আমায় প্রাকৃত ভোগ হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন। রসে ও মহিমায় আমি তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক, স্নেহ-গর্ব্ব-মিশ্রিত দৃষ্টি-মধুটুকু সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া, নীরবেই তাঁর মহীয়সী মূর্ত্তিকে অভিনন্দিত করিলাম। বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল! তিনি স্বপ্নে শক্তিমূর্ত্তি দেখিয়াছেন ; আমি দেখিতেছি জাগ্রতে দক্ষিণাকালীর অভয়ামূর্ত্তি। আমার বিপদ্ নাই, আমি চিরমুক্তি, আমার কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন অচল হইলে হতশ্রী হয়, কারখানাটী সেইরূপ তুষের আগুনের মত ধুয়াইয়া ধুয়াইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল। "প্রবর্ত্তক" চলিতেছে নিজেরই আনন্দ ও উৎসাহের দাপটে। আর রাজনীতিক ক্ষেত্রে বাংলার যত সংশয়ভাজন তরুণ ছিল, তাহাদের জন্য চন্দননগরের স্থানে-স্থানে ক্ষুদ্র গোপন অতিথিশালা খুলিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছি। আর প্রতি রাত্রে আমার গৃহপ্রাঙ্গণে তাহাদের সভা বসিতেছে। সে কত প্রকারের আলাপ-পরিচয়, হাসি-কৌতুক, আবার কত বৈপ্লবিক আন্দোলনের আলোচনা! পরিকল্পনা। এত বড় বিপজ্জালে জড়াইয়া পড়িতেছি, বিন্দুমাত্র তাহার জন্য চিন্তা ছিল না। বৎসর প্রায় শেষ হয়—ইউরোপের রণক্ষেত্রে আততায়ী জর্ম্মাণীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে, বীর ফরাসী ও বৃটিশ জাতির সংগ্রামের সংবাদ পাই আর ভাবি—পঙ্গু ক্লীবের ন্যায় ভারতের জাগ্রৎ যৌবনের এই অবরুদ্ধ জীবনযাপন—গোপন ভূগর্ভে মূষিক বাসের ন্যায় অতিশয় দুর্ব্বিসহ নহে কি! পরিচ্ছন্ন ক্ষেত্রে, পরিচ্ছন্ন প্রাণ লইয়া, এই সব

উদীয়মান তরুণ যদি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, সে কি আশা ও আনন্দ জাগাইত জাতির প্রাণে!

ঠিক এই সময়ে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে, প্রজাতন্ত্র ফরাসী রাজ্যের তাৎকালীন রাষ্ট্রপতি মঃ পঁয়কার ঘোষণা করিলেন যে, ফরাসী ভারতের হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান প্রজামণ্ডলী স্বেচ্ছাসৈনিকের পদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

এই সংবাদ পড়িয়া মনে পড়িল—১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীরাম পাল প্রস্তাব উত্থাপন করেন "ভারতবাসী স্বেচ্ছাসৈনিক যাহাতে হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হউক।" মিঃ দাদাভাই নৌরোজী সেই কংগ্রেস সভার সভাপতি ছিলেন। সেদিন ৪৪০ জন প্রতিনিধি লইয়া জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু আমরা জানি—উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ঠিক ঐ সময়ে ফরাসী গভর্ণমেণ্টও ফরাসী ভারতে বাধ্যতামূলক রণবিদ্যা প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু চন্দননগরের অধিবাসিবৃন্দ সেদিন রোরুদ্যমান হইয়া ফরাসী প্রতিনিধিকে ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য কাতর অনুনয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেদিন বাঙ্গালীর বচনে আগুন ছিল; কার্য্যকালে কিন্তু তাহারা মাথা নীচু করিত। তারপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলার যৌবনের জাগরণ, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমারই প্রাঙ্গণে শত শত তরুণ স্বাধীনতার প্রেরণায় মৃত্যু উপেক্ষা করার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া উপস্থিত। বাঙ্গালীর হস্তে প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে অস্ত্র তুলিয়া দিতে পারিলে, জাতির জীবনে স্বাধীনতার যোগ্য-বৃত্তির স্ফুরণ হইতে পারে, এ স্বপ্ন আমি বিপ্লবযুগের সাধনায় তরুণদের মুষিক-নীতি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মনে করিলাম।

আত্মসমর্পণ-মন্ত্রে দীক্ষিত আমার প্রাণ-পুরুষ উপরোক্ত সংবাদের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্কেত পাইয়া, জীবনের আর এক নূতন অঙ্কপাত করিল—সে কথা পরে বলিতেছি।

কর্ম্মের পর কর্ম্ম। সে কর্ম্মে সংসার-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্র কে যেন তাহা হইতে আমায় বঞ্চিত করিল। সংসার সমাজ

ক্রমেই পিছাইয়া যায়। নিঃসঙ্গ হইয়াই কোন দূর লক্ষ্যে যাত্রা—হৃদয়ের কোন দায় নাই, সব গিয়াছে। পথের সঙ্গিনী একমাত্র গৃহলক্ষ্মী। তাঁহাকে ছাড়িতে পারি না। মনে হয়, তিনি বুঝি সঙ্গ ছাড়েন না। কিন্তু এইখানেই ছিল আমার দুর্ব্বলতা। বাহিরে এই অতীতের বন্ধন বিরক্তিকর মনে হইত; কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন অপরিত্যজ্যা। অন্তর তো প্রকাশ পাইত না, বাহিরের দিক্‌টাই রূঢ় আস্ফালনে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কত দিন তাঁর মুখে বাহির হইত মৃত্যু-যাজ্ঞা; আমি কিন্তু অন্তরে শিহরিয়া উঠিতাম। তাঁহাকে হারাইলে, অকূল পাথারে সত্যই আশ্রয়হীন হইব—খুব গভীরে এই ধারণাই ছিল।

প্রাতঃকাল হইতে উঠিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত নানা কাজে অতিবাহিত হইত, পতি-পত্নীর মধ্যে প্রাকৃত ভোগের সম্পর্ক ঘুচিয়াছিল। কর্ম্মের নেশায় এই বিষয়ে মাতালের ন্যায় ঔদাসীন্যে আমার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। যৌবন-যুগের সাড়া কিরূপ নিষ্ঠুর পীড়নে মনকে অভিভূত করে, সে চিন্তার আর অবকাশ ছিল না এবং ইহা ভাবিবার প্রয়োজনও মনে হইত না। আমার কচ্ছ্রতার মূলে এক অসাধারণ আদর্শই লক্ষ্য-রূপে থাকিত, আর নিয়ত কর্ম্মই এই অস্বাভাবিকতার মধ্যে আমার পরম সহায় ছিল। কিন্তু যাঁহার প্রতি স্বভাবের অত্যাচার অবাধে চলিতেছিল, তাঁর কি আশ্রয়? স্বভাবজীবনের ধর্ম্মে অকস্মাৎ দাঁড়ি টানিয়া চলার কি শিক্ষা, কি সান্ত্বনা তাঁহাকে আমি দিয়াছি, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতাম না। তাঁর জীবনের গুরুতর দায়িত্বটা বহিবার মত শক্তি তাঁহার ছিল কি না, সে হিসাব করিয়া চলা আমার উচিত ছিল; কিন্তু সে কর্ত্তব্যবোধ কর্ম্মের হিমালয়ে চাপা পড়িয়াছিল।

আমার লক্ষ্য ও আদর্শ বিরাট্‌। সে পথে পৌরুষ ছিল; ব্রহ্মচর্য্যসাধনে মনে জোর পাইতাম, কর্ম্মে অসাধারণ উৎসাহ পাইতাম। নিঃসঙ্গ সাধনের প্রয়োজনটা বেশ বড় হইয়াই আমাকে অস্বাভাবিক জীবনপথে সাহস দিত, উৎসাহ দিত। আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িলে, কর্ম্মের আসক্তি ভাঙ্গা মন যুড়িয়া দিত। যে নারীর জীবনের দায়িত্ব ব্যবহারতঃ ও ধর্ম্মতঃ আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল, সে কি প্রকারে দিনযাপন করে—অনেক দিনের ঔদাসীন্যের পর একদিন এ কথা মনে হওয়ায়, তাঁহার উপর নিষ্ঠুরভাবে এক পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজের দুর্ব্বলতাই কিরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল,

সে কথা না বলিলে তাঁর জীবনের গুরুত্ব ও মহিমা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইবে না।

কর্ম্ম আমার ছিল রুদ্রের ন্যায় শক্ত ও নিষ্ঠুর। স্বভাবটা বোধ হয় তদনুযায়ী প্রস্তুত করিতে পারি নাই। অন্তরে আমার এইরূপ ধারণা হইত। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে হইলে, সে দিনের আদর্শানুযায়ী যে অনুষ্ঠান ও বিধি, তাহা আমার প্রকৃতির অনুকূল মনে হইত না। তাই প্রতি পদে নিজের মধ্যে অক্ষমতা অনুভব করিতাম। যে সকল কর্ম্ম আমার দ্বারা কৃত না হইলেও, আমার অনুমোদিত ছিল, বিবেক তাহাতে অনেক সময়েই সায় দিত না। জাতির মুক্তি-কামনা অন্তরের সত্য বস্তু। কিন্তু তাহা সিদ্ধ করার জন্য যেন অন্য কোন পথ আছে, উপায় আছে—এইরূপ প্রেরণাই পাইতাম! এইরূপ মনোভাবের সমর্থন শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে পাইয়া, আত্মপ্রকৃতি কতকটা স্বস্তি পাইয়াছিল। তাৎকালীন মুক্তিপন্থীদের প্রতি তবুও আমি বিরূপ ছিলাম না। পথ-পরিবর্ত্তনের সন্ধান অন্তরে-অন্তরেই চলিতেছিল। যুদ্ধারম্ভে ভারত-রক্ষা আইনের দায়ে একে-একে অনেকেই আমার আশ্রয় লইলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের সহিত কার্য্যসূত্রে যে সময় অতিবাহিত হইত, তদ্ব্যতীত প্রচুর সময় এই অন্তর্যোগের জন্য মিলিয়াছিল বলিয়া অন্তরটা খোলসা হইয়া উঠিতেছিল। জীবনের গতি-মুখে যাহা অবজ্ঞাত হয়, অবকাশের ফাঁকে তাহার চাঞ্চল্য দেখা দেয়—আমার পক্ষেও ইহার অন্যথা হয় নাই। ঘটনার কথাই বলিতেছি।

বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে অন্তরটা মুক্তি পাওয়ায়, চিন্তাজগৎ যে গুরুভারে এতদিন রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ লঘু হইল। অভিনব চিন্তাস্রোতের সহিত অতীতের নিপীড়িত প্রবৃত্তিসমূহ জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অবকাশক্ষেত্রে গুরু-চিন্তার সঙ্গে অনেক সময়ে মাধুর্য্যের অনুভূতি কর্ম্মক্লান্ত মুক্ত হৃদয়টা রসাভিষিক্ত করিয়া দিতেছিল। "প্রবর্ত্তকের" পাতায়-পাতায় সাহিত্যের তুলিকায় সে ছবি যেমন আঁকিতেছিলাম পত্র-পুষ্পে, ভাগীরথীর পূত প্রবাহে, পারিপার্শ্বিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে শ্রী-সুষমার মধুর স্পর্শ তেমনি অনুভব করিতেছিলাম। সে দিনের অন্তর-পরিবর্ত্তনের স্মৃতি-চিহ্ন "প্রবর্ত্তকের" পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় এখনও কালির অক্ষরে লেপিয়া আছে। একটু লেখা উদ্ধৃত করিতেছি: "জীবনের

পথে চলিতে-চলিতে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই গতি-পরিবর্ত্তন করিতে হয়, আমাকেও আজ গতি-পরিবর্ত্তন শ্রেয়ঃ করিতে হইল। যাহার জন্য সর্ব্বস্ব-ত্যাগ, মাথায় কলঙ্কের ডালি, নির্য্যাতন, অপবাদ, দারিদ্র্য আভরণ করিলাম, সে যে ভীষণ বোঝা হইয়া মরণের পথেই লইয়া চলে! ক্লান্ত দেহ বিশ্রামাশায় শীতল ছায়ার সন্ধান করে, তবুও 'আগে চল, আগে চল' বলিয়া কে যেন ডাকিতে থাকে! আজ চাই শান্ত, সংযত তপঃপূত নবজীবন।"

"—অন্তরে-অন্তরে অভিনব-শক্তির ফল্গুপ্রবাহ বহিতেছিল; তাই সে দিন স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলাম—জড়শক্তির আশ্বাস পরিহার করিব, ভগবচ্ছক্তির আশ্রয় লইব। কামের আবর্ত্ত হইতে প্রেম-মন্দাকিনীতে অবগাহন করিব। জ্ঞান-শক্তি-প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইব। জ্ঞান-শক্তি-প্রেমেই দেশ আমার স্বর্গ হইবে, অমরার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইবে। সোণার দেশে সোণার গৌরাঙ্গ নাচিবে। আগুনের মত মর্ম্মভেদী আমার বাণী-মন্ত্রের প্রচার দেশব্যাপী হইবে। জাতি পরিগ্রহ করিবে নূতন জন্ম। মুক্তি-সাধনার এই নূতন ব্রতে জাতিকে দীক্ষা দিবে।" এই মর্ম্মে কত কথা "প্রবর্ত্তকের" ছত্রে-ছত্রে বাহির হইত! কত তরুণ নূতন স্বপ্নে বুক বাঁধিয়া নূতন আবেগে ছুটিয়া আসিত! চিন্তারাজ্যের ইহা এক দিক্। অন্যদিকে অগ্নিময়ী কর্ম্মপ্রেরণাকে আড়াল করিয়া, হৃদয়ের নিভৃত কোণে, কর্ম্মের কুলাল-চক্রে নিষ্পেষিতা, মূর্চ্ছিতা রিরংসার অগ্নিশিখা অনুকূল বাতাসে লেলিহান-রসনা-বিস্তারে কত সাঙ্কেতিক রূপ ধরিয়া আমায় সম্মোহিত করিত! আমি তখন মনে-মনে লোলুপ-দৃষ্টিতে দেখিতাম গৃহ-লক্ষ্মীর যৌবনশ্রী, আর তন্বীর সেই রূপ-লাবণ্যে অভিভূত হইয়া পড়িতাম। এমন করিয়াই তখন জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল।

সঙ্কল্পের শক্তি আছে। সঙ্কল্প—ব্রহ্মচর্য্যের। আমি পুরুষ—নারীর দেবতা! আমি কায়া; নারী সেবিকা। আমারই ছায়ামূর্ত্তি সে। তাহাকে আমি এই সাধনায় দীক্ষা দিয়াছি—এই গর্ব্ব ছিল; তাই অন্তর দুর্ব্বল হইলেও, তাহার কোন অভিব্যক্তি তাঁহার নিকট না প্রকাশ পায়—এদিকে আমি বিশেষ সতর্ক ছিলাম। লুব্ধচিত্ত চিরদিন চাতুর্য্যময়। আমার এই গতি-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর নমনীয় তরলভাবে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল—

সে ভাব গোপন করিয়া, দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে পরীক্ষকের মত পত্নীর সঙ্কল্পশক্তি যাচাই করার ভান করিলাম। সে এক-সন্ধ্যায়—হৈমন্তিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল; হঠাৎ বৃক্ষকাণ্ড আলোড়িত করিয়া ঝটিকাবর্ত্তে প্রকৃতি তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করিল। ম্লান অপরাহ্ণ অলস চিন্তাতরঙ্গে কাটিয়াছিল। সান্ধ্যোপাসনার পর ঘরে গিয়া দেখিলাম—এই দুর্য্যোগময়ী সন্ধ্যায় মেজ-বৌ আসিয়া ছোট-দিদির সঙ্গে গল্প যুড়িয়া দিয়াছে। বাদ্‌লা-রাতের ভিজা ঝাপ্‌টা বাতাসে মনের আগুন সে রাত্রি বুঝি নিভি-নিভি করিতেছিল। আমায় ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গৃহিণী প্রদীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন, আমিও যোগ দিলাম তাঁদের আসরে। মেজ-বৌর ভক্তি ও প্রীতি স্বতঃ-সিদ্ধ। তাই তাঁর কাছে ছিল না আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলার সতর্কতা। লঘু ও তরল হাস্যে ও আলাপে চিত্ত আমাদের পুলকিত হইল। অনেক-দিন পরে, উচ্ছ্বসিত মুক্ত কণ্ঠে লঘু হাস্য ও গল্প করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিলাম। সারা সন্ধ্যা হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রগল্‌ভ হাসি-তামাসায় কাটিয়া গেল। দীর্ঘদিনের যে শক্ত বাঁধন চরিত্রকে শক্ত করিয়াছিল, তাহা টুটিয়া যায়; আমার ব্যবহারে লঘুতার মাত্রা হয়ত কিছু সীমা ছাড়াইবার উপক্রম করিয়াছিল—নতুবা সংযম ও শাসনের কটাক্ষ গৃহিণীর দিক্ হইতে মুহুর্মুহু আমায় বিদ্ধ করিবে কেন? মেজ-বৌ চলিয়া গেল। এইবার সানন্দে প্রফুল্ল-চিত্তে তিনি আমায় বলিলেন "তোমার শক্ত কপালের কোঁচকান দাগগুলি যেন মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ তোমার হইয়াছে কি! হাজার হোক, মেজ-বৌ পর মানুষ—তোমার ছেলেমানুষী এমন বড় হইয়া উঠিতেছিল, ভয় হইতেছিল, মেজ-বৌয়ের কাছে তুমি না ক্ষুদ্র-তুচ্ছ হইয়া পড়!"

প্রাণখোলা হাসি, প্রাণখোলা কথা, স্বভাবের অবাধ লীলারঙ্গ! শরীর-মনের কঠিন গ্রন্থিগুলিকে আজ কে যেন শিথিল করিয়া দিয়াছে! আমি বলিলাম "মানুষের মুক্ত সরল আলাপ-আচরণ বাহিরের জগতে অভদ্র অশোভন মনে হয়। মেজ-বৌ আপনার জন, আমাকে সে ভুল বুঝিবে না।"

তিনি বেশ গম্ভীর হইয়াই বলিলেন "কিন্তু মেজ-বৌ আমি নই। আমার কাছে তোমার সব রকম চাঞ্চল্য-লঘুতা যতটা দোষের নয়, অন্যের কাছে তেমন কিছুতেই হবে না, এটা মনে রেখো!"

পর-নারীর কাছে আপন স্বামীর আত্মমর্য্যাদা ও শিষ্টাচার রক্ষা করার শিক্ষা দেওয়ার ভঙ্গী তাঁহার আকৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। পত্নীর শিক্ষয়িত্রীর আসন আমি পছন্দ করিতাম না। আমাদের যুগে কেহই হয়তো করিতেন না। পত্নীকে মনে করিতাম শিষ্যা, সেবিকা মাত্র। এই ভাব আমাদের কুলগত সংস্কার। বাহ্যতঃ তাঁর শাসন সর্ব্বদা অস্বীকার করিতাম; কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁর হিতকামী কশাঘাত অবজ্ঞা করা সাধ্যে কুলাইত না— তাঁহার শাসনে চিত্ত আমার সুসংস্কৃত হইত; শক্ত চরিত্র-গঠনের সুযোগ মিলিত। আমি তাঁর উপদেশ নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া অন্য প্রসঙ্গ পাড়িলাম; আত্মশ্লাঘার প্রলেপে স্বভাব পরিচ্ছন্ন করিয়া অনেক দিন পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সাধন তোমার কেমন চলিয়াছে?"

তিনি কুটিল কটাক্ষে সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাহিরে বৃষ্টিপতনের শব্দ, আকাশে গুরু-গুরু বজ্রধ্বনি হইতেছে। কথা জমাইবার জন্য আমি জাঁকাইয়া বসিলাম, বলিলাম, "অবাক্ হওয়ার কি আছে? একটা সাধন না থাকিলে, যে শক্ত জীবন আমরা লইয়াছি, তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে?"

তিনি যখন-তখন বড় হাসিতেন না। নিদাঘের থমথমে আকাশের মত তাঁহাকে বড় গম্ভীর দেখাইত। এই ভাবেই তিনি অধিক সময়ে থাকিতেন। কিন্তু যখন তিনি হাসিতেন, বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর ন্যায় কুলু-কুলু শব্দে দুই কূল উপচিয়া পড়িত। তিনি এমনই উচ্চ হাস্যে টানিয়া-টানিয়া বলিলেন "সা-ধ-না! সাধনভজনের কথা তোমরা খুবই বল, দূর হইতেই শুনি; আমায় কোনদিন কিছু বলিয়াছ কি?" ভাবিয়া দেখার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তিনি কোনদিন কিছু যদি জানিতে চাহিতেন, 'কাজ আছে' বলিয়া পাশ কাটাইতাম; কিন্তু সম্মুখে নারী-পুরুষ অন্য যে কেহ উপস্থিত হইত, তত্ত্বকথা বাধা মানিত না। এ স্বভাব আজ অনেকটা দায়ে পড়িয়া বন্ধ রাখিতে হয়। কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইলেও, আমি অনেক দূরেই থাকিতে বাধ্য হই। জগৎ ক্রমেই সরিয়া পড়ে দূরে-দূরে। সেদিন এমন ছিল না; এক কথা উঠিলে, হাজার কথায় তাহার সমাধান হইত। কিন্তু পত্নীর সহিত আমার কথা ছিল না, মোটেই না।

আমাকে কথা বলিতে হইল না। তিনি বলিলেন "হাসিতেছি, তাই

বলিয়া মনে করিও না—দুঃখ আমার নাই! নয় বৎসরে আমায় ঘরে আনিয়াছিলে; সংসারে আসিয়া শিখিয়াছিলাম গৃহকর্ম্ম। সে শিক্ষা কাজে লাগিল না।”

আমি বলিলাম “কেন? গৃহকর্ম্মই তো করিতেছ!”

তিনি একটু ম্লান হাসিলেন। কথায় যেন ব্যথার মূর্চ্ছনা উঠিল। তিনি বলিলেন “সে স্বপ্ন এ গৃহকর্ম্মে নাই।” তারপর বেশ স্বরের গাম্ভীর্য্য অনুভূত হইল। “যে কাজ করি, অন্ধের মত; এ কাজের অর্থ কি, প্রয়োজন কি বুঝি না; বুঝাইবার লোক তুমি, কিন্তু সে প্রয়োজন তুমি আমলে আন না। দুঃখ হয়, কিন্তু দুঃখ বুঝিবে কে? যতদিন বাঁচিব, খাটিতে হইবে; সাধনার আমি কিছুই বুঝি না!”

কেন জানি না, তাঁহাকে যে কিছু বুঝাইতে হইবে, এইরূপ তাগিদ আমার মনে পৌঁছিত না! বালিকা-বধূ ঘরে আসিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতেছিল, তাহাকে টানিয়া আনিয়া শুধু সেবিকার কাজে লাগাইয়া রাখিয়াছি; তাহার জীবনের প্রয়োজন বসন, ভূষণ, খাদ্য কিছুরই সন্ধান রাখি না। এই সপ্তবিংশতিবর্ষীয়া তন্বীর ওষ্ঠে, গণ্ডে, সর্ব্বাঙ্গে আজিও যে যৌবনের লালিমা, যে অমল সৌরভ, তাহার যোগ্য ব্যবহারের কোন সন্ধান তাঁহার জানা নাই। আমিও এক অস্বাভাবিক জীবন-তত্ত্ব লইয়া তাঁহার সহিত কোন আলোচনা করি না, করার প্রয়োজনও মনে করি নাই। একি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য! প্রেমে, করুণায় হৃদয় আমার দ্রব হইল। অবগুণ্ঠিতা, অন্তঃপুরচারিণী, অশিক্ষিতা এই অবলা—স্বামীই তার আশ্রয়; গৃহসুখে জলাঞ্জলী দিয়া, সে সন্ন্যাসীর সেবা-রতা; সে সেবা কেন, কিসের জন্য, এ প্রশ্ন তার মনে উঠিয়া মনেই লয় পায়। জিজ্ঞাসারও ভাষা নাই। আমার একি অত্যাচার! আমি আজ আত্মহারা হইলাম।

পত্নী আমার আজ্ঞাকারিণী দাসীর মত সর্ব্বকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দীপালোকে কমনীয়া মুখকান্তি আমায় স্মরণ করাইয়া দিল—কৈশোরে এই রমণীর দেহবল্লরী বাহুবন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়াছি, অর্দ্ধস্ফুট যৌবনের মধুময় আঘ্রাণ প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছি, বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই—এই মানুষটীর সবখানির উপর আজও আমার পরিপূর্ণ অধিকার। ধর্ম্মপত্নী, গৃহদেবী, শয্যাসঙ্গিনী—যৌবনের শুভ্রা কৌমুদী সারা অঙ্গে অপরূপ লাবণ্য লেপিয়া

রাখিয়াছে। রক্ত-মাংসের উচ্চ কণ্ঠ আমার কর্ণ বধির করিল। ইহারও তো মানুষের প্রাণ! পৃথিবীতে এমন কি কর্ম্ম আছে, যাহা অন্তরে-বাহিরে ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ সম্ভোগপিপাসা বর্জ্জন না করিলে সিদ্ধ না হয়? অনেক দিন পরে আমিই তাঁহার বুকের উপর এলাইয়া পড়িলাম। তিনি যুগল-করপল্লবে আমার চিবুক বেষ্টন করিয়া, মুখের দিকে অপলকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর আকাশের মেঘ নয়ন যুড়িয়া দেখা দিল। ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রুবিন্দু আমার ললাট-গণ্ড অভিষিক্ত করিল। তিনি চিবুক-বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া, অঞ্চলে চক্ষুঃ মুছিলেন। নিষ্ঠুর কল্পনাস্বপ্ন! যে আমায় ছাড়িতে চাহে না, তাহাকে আমি ছাড়িব কেমন করিয়া? অধ্যাত্মক্ষুধা এমন তীব্রা, এমন মধুময়ী নহে বুঝিলাম—প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গের জন্য কেমন করিয়া কাঁদিয়া মরে!

কথা কাণে প্রবেশ করিল "তুমি না ব্রতগ্রহণ করিয়াছ?"

আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম "আমি ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমি ভাঙ্গিব —সে অধিকার আমার আছে।"

তিনি দৃঢ় নিঃশঙ্ক চিত্তে একটু দূরে সরিয়া বলিলেন "না। ব্রত তোমার একলার নহে, আমারও। আমার দুর্ব্বলতার সময়ে তুমি যদি শক্ত না হও, সে আমার দুর্ভাগ্য। তোমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমি যদি শক্ত না হই, তোমার সে দুর্ভাগ্য আমি সহিতে পারিব না।"

বাক্যে অগ্নি ছিল, দাহ ছিল না। অমৃতময়ী মূর্ত্তি, অমৃত-বাণী! চিন্তা ও সংশয় জমিয়াছিল দীর্ঘ দিনের। দুর্ব্বলতা পরীক্ষকের ছদ্মবেশ ধরিল। আমি বলিলাম "এ জীবন অসাধারণ অপ্রাকৃত করার সাধনা আমার ব্রহ্মচর্য্য। সে অপার্থিব জীবনের মর্ম্ম আমি জানি। দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত জ্ঞানের মহিমায় আমি দূর করি। তুমি কেমন করিয়া এই দুঃসহ স্বভাব-সংস্কারের উপর উঠিয়া দাঁড়াও, বুঝিতে পারি না। আমি তোমায় ব্রত দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছি, কিন্তু তুমি তাহা পালন কর কোন শক্তিতে কিসের আশ্রয়ে?"

এই প্রশ্নের উত্তর আজিও আমার মর্ম্মে গাঁথা আছে। আমি যে তাঁহাকে কোন শিক্ষা দিই নাই, কিছু বুঝাই নাই, তাহার একমাত্র সান্ত্বনা—ইহার জন্য তাঁহার ব্যবহারিক মনে দুঃখের তরঙ্গ যতই উঠুক, তাঁর নারীসত্তা

আমার কর্ম্ম-জ্ঞানের ঊর্দ্ধে স্বতঃসিদ্ধা হইয়া আমার গৃহ আলোকিত করিয়াছে।

আমি উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম—এ নারী সামান্যা নহে ; অথবা নারীত্বের ইহাই মৌলিক মহিমা। তাঁর অনেকগুলি আচরণ নিগূঢ় অর্থপূর্ণ হইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। দেখিয়াছি—মাছের পেতে হাতে লইয়া আঁইস-ধোওয়া জলবিন্দুর পতনের দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন, পাছে তার এক ফোঁটা জল তাঁহার পদস্পর্শ করে ; তাঁর এইরূপ আচরণ কুসংস্কার বলিয়া কত বিদ্রূপ করিতাম। তিনি নিজের গাম্ভীর্য্যে ডুবিয়া থাকিতেন। অতিশয় পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলিতেন "কত সৌভাগ্যবতী সে নারী, যে চিরায়ুঃ মৎস্য-ভোজনের অধিকার পায় !" আমি বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দের নিকট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মৎস্য-মাংস-ত্যাগের ব্রত-বিসর্জ্জন দেওয়ার পরও মাঝে-মাঝে নিরামিষভোজী হইয়া পড়িলে, একাদশীর দিন তিনি এক প্রতিবেশিনী বান্ধবী কর্ম্মকার গৃহিণীর নিকট হইতে এক টুকরা মৎস্য কেন ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। বুঝিলাম—অক্ষয়তৃতীয়ার ব্রতাচরণের মূলে কি তাঁর মর্ম্মনিহিত উদ্দেশ্য ছিল। বুঝিলাম—এক শয্যায় দুইজনে শয়ন করিয়াও, কাহার সঙ্কল্প-শক্তি-প্রভাবে আমি স্থিরাঙ্গ হইয়া রাত্রি যাপন করি। বুঝিলাম—শত কর্ম্ম ঠেলিয়া ভোজনের সময়ে কেন তিনি খাদ্য-দ্রব্যের দিকে চাহিয়া, সম্মুখে বসিয়া থাকেন—কেন শত বাধা উপেক্ষা করিয়া স্নানের সময়ে তৈলের বাটি লইয়া তিনি আমার সর্ব্বশরীর স্বহস্তে চর্চ্চিত ও অভিষিক্ত করেন। অর্থ বুঝিলাম তাঁর বিরক্তির, যখন আমার এক ছাত্র-বন্ধু প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর কাছে ধ্যান করার নীতি আশ্রয় করিলে, তিন দিন পরে তিনি তাহাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন "এ সাধনায় তোমার কিছু হইবে না—সাধনা ঐ ওঁর কাছে !" মনে পড়িল—এই সুহৃৎ কোন এক পর্ব্ব-দিনে, তাঁর চরণ-পদ্ম ক্রোড়ে ধারণ করিয়া চন্দনলিপ্ত করায়, তিনি অতিশয় বিরক্তির সঙ্গে আমায় বলিয়াছিলেন "তোমার দায়ে আমায় আত্মহত্যা করিতে হইবে—যদি আমায় রাখিতে চাও, এই সব যেন না হয় !" আরও মনে পড়িল তাঁর পুত্রপ্রতিম এক অনুরাগী তরুণ নমস্কার করিয়া তাঁর করপল্লব স্পর্শ করায়, একেবারে উৎক্ষিপ্তা হইয়া তিনি তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। বুঝিলাম—মাতা বলিয়াও কেহ তাঁর কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দিলে,

সে গৌরবও তুচ্ছ করিয়া তিনি বলিতেন "ভক্তি দেখাইতে হয় উনি আছেন —আমি নহি।"

দর্শন-শাস্ত্রে পড়িয়াছি—পুরুষ শুধু চেতনাময়, সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির। এই নারী স্বামীর সহিত প্রাকৃত সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত নিত্য-সম্বন্ধ-স্থাপনে উদ্বুদ্ধা। তাঁর কথার মূল নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম। তিনি প্রায় বলিতেন "সতীর পতি বড়, তার উপর কিছু নাই।" তিনি নিজ হস্তেই তাঁর অভীষ্টদেবতাকে যেন গড়িয়া তুলিতেছিলেন; আমি হইয়াছিলাম উপাদান মাত্র। আমি জানিতাম বটে—ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শব্দ-স্পর্শাদি বড়, তদপেক্ষা মন বড়। মনের উপর বুদ্ধি, তাহার উপর মহান্ আত্মা। মহানের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর অমৃত। "অমৃতান্ন পরম্ কিঞ্চিৎ" অর্থাৎ "অমৃতের পর আর কিছুই নাই।" কিন্তু বুঝিলাম—এই সকল শাস্ত্র তাঁর আচরণেই মূর্ত্ত—শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্যই আমার!

পতি চাহিয়াছেন নূতন জন্ম, নূতন সৃষ্টি। সত্য তাহা গ্রহণ করিয়াছেন নিজের সবখানি দিয়া। পতির শ্রেয়ঃ তাঁহার শ্রেয়ঃ, তাহা ছাড়া অন্য কিছু কামনা তাঁহাকে করিতে নাই। আদর্শের দায়ে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার সম্মোহনে, অস্বাভাবিক অসাধারণ পথে চলে মানুষ কত কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করিয়া! আর এই নারীর রুচি ও নিষ্ঠা যে তত্ত্বে সেই তত্ত্বের উচ্চ অভিপ্রায় মাত্র মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্পে সে হৃদয় বাঁধিয়াছে—তত্ত্বের মাহাত্ম্য-রক্ষার জন্য; এখানে বৃত্তির উৎপাত পৌঁছায় না। এখানে অতীত সংস্কারের বিভীষিকা প্রকাশ পায় না। সেদিনের স্মৃতি আমার বুকে আগুনের অক্ষরে লিখিত আছে; তার সে দীপ্তিময়ী মুখশ্রী, জয়, সম্পদের সে অপূর্ব্বকান্তি আমি ভুলিতে পারিব না। সেদিন আরও শুনিয়াছিলাম "তুমি যাহা হাতে করিয়া দিবে, যদি বিষও হয়, সেও আমার অমৃত। তুমি দিয়াছ যে ব্রত, তাতে যদি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তার চেয়ে বড় ভাগ্য আর কি থাকিতে পারে পৃথিবীতে! তবে—"

তাঁহার কুণ্ঠিত কণ্ঠ এইখানে যেন বাষ্পরুদ্ধ হইল। "তবে কি"—শুনিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন "তবে কি জান? আমি তোমার জন্য সব করিতে পারি। আমার জন্য তুমি কিছু কর, সে আমি চাহি না—এমন দেখিলে ব্যথাই বাড়ে। আমি কি চাহি জান? তুমি

বড় হও, তুমি সত্য হও! যেখানে তোমায় হঠাৎ ছোট দেখি, নীচু হইয়া পড়িতেছ দেখি, আমার ভয় হয়, ভাবি—কোথাও কি ব্রত আমার ক্ষুণ্ণ হয়!"

জীবনের সে পুণ্যস্মৃতি আজও হৃদয়ে আমার শক্তি ও সাহস দেয়; কিন্তু অন্তর আমার যতই জাগ্রৎ ও জীবন্ত থাক, আমি যে আজ বড় নিঃসহায়! সমগ্রা পৃথিবী তাঁর তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে বিগতযৌবনা হতশ্রী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আমার প্রতি পদে পতনের আশঙ্কা যখনই হইয়াছে, তখনই তিনি আত্মক্রটির কষাঘাতে আপনাকেই ক্লিষ্টা করিয়াছেন—অনুতাপের তুষানলে নিজেকেই দগ্ধ করিয়াছেন। আজ এই নারী-প্রগতির যুগে সতীশক্তিই পতির উন্নতি-ভিত্তি বলিয়া কেহ কি স্বীকার করিবে? পুরুষের বীর্য্য-মূলে যে নারীর সতীত্ব, এ কথা কি কেহ মানিয়া লইবে? উচ্ছ্বাস প্রলাপ সৃষ্টি করে, ভাষা বিনাইয়া লাভ নাই; তবে সে রাত্রে সতীর পবিত্র ইন্ধনে প্রাণে আমার বিদ্যুৎ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সে উত্তাপ জীবনে আর দূর হইল না। উভয়ের সেই নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয় আমার সর্ব্বকর্ম্মে এখনও উৎসাহ দেয়—শক্তি আমায় কোনদিন দেউলিয়া করে না।

অন্তরের পরিবর্ত্তনের সহিত বাহিরের কর্ম্মজগতে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কর্ম্মের রূপেও যেন সে পরিবর্ত্তনের ছাপ পড়িল। বিপ্লবের ভাঙ্গন-ধর্ম্ম যেন ক্রমে ঘুরিয়া চলিতে চাহিল গঠন-মুখে। বলিয়াছি—এই সময়ে ইউরোপের মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী-পল্টন-প্রেরণের ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছিল চন্দননগরে—বিশেষভাবে আমার কাণেই। শ্রীমান্ হারাধন বক্সী সেদিন আমারই অনুগত। তার ছাত্রজীবনের আদর্শ আমি। তার ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য আমারই চরণে প্রতিদিন অর্পিত হইত। হারাধনের উন্নতিকামনায় অন্তর আমার সদা জাগ্রৎ থাকিত। সে আসিয়া জিদ ধরিল—ইউরোপের মহাযুদ্ধে বাঙ্গালীকে যোগদান করিতেই হইবে। সেনাবাহিনী গঠনের জন্য সে আমায় উদ্বুদ্ধ করিল। আমার প্রাণে সংগঠনী অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল, আমি এই কর্ম্মে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। যে সকল তরুণ সেনাদলভুক্ত হইতে আসিল, তাহাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশিমণ্ডলী আমার উদ্দেশ্যে গালি

পাড়িতে লাগিলেন ; কিন্তু আমার অন্তর বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। এই সেনাবাহিনীর প্রথম প্রবর্ত্তকদের প্রতিদিন আমারই প্রাঙ্গণে সমবেত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাহাদের বুকে ভরসার আগুন জ্বালাইতে লাগিলাম। বীরত্বের ইতিকথা শুনাইয়া, রণরঙ্গের মহিমায় তাহাদের চিত্ত প্রবুদ্ধ করিলাম। অন্তঃপুরে মাতৃমূর্ত্তিও সেদিন যেন রণরঙ্গিণী—উল্লাসে, উৎসাহে অন্নথালী হস্তে তিনিও এই নব-বীরজাতির মুখে শক্তিপ্রসাদ তুলিয়া দিলেন। তন্দ্রাতুর বাঙ্গালী ক্রমে চক্ষুঃ উন্মীলিত করিল। বিদায়-দিনে এই রণযাত্রী বীরপুত্রগণের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া দিলেন আমার গৃহ-দেবীই সর্ব্বাগ্রে, তারপর আসিলেন তাহাদের জনক, জননী, ভ্রাতা, ভগ্নী, পত্নী একে-একে। আমার দুয়ারে সেদিন বাঙ্গালীর জয়োৎসবের মেলা বসিয়া গেল। এই ভীড়ের মধ্যে একজনের পুণ্যস্মৃতি মুছিতে পারিব না। তিনি "অমৃতবাজার পত্রিকার" প্রাণস্বরূপ পরলোকগত পরম শ্রদ্ধেয় মতিলাল ঘোষ। তিনি বার্দ্ধক্য-পীড়িত শীর্ণকলেবর লইয়া বাঙ্গালীর এই জয়যাত্রার উৎসতীর্থ দেখিতে আসিয়া, আমায় ভুজপাশে বাঁধিয়া যে আশিস্ ও স্পর্শ দিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। সেদিন মহাত্মা শিশিরকুমারের স্পর্শও যেন তাঁহার মধ্য দিয়া আমি পাইয়াছিলাম। তাঁর পরলোকগমনের পরও, যিনি জাতীয়তার জয়চ্ছত্ররূপে "অমৃতবাজার পত্রিকা"র ভার মাথা পাতিয়া ধরিয়াছিলেন, সেই শিশিরবাবুর আত্মজ পীযুষকান্তির ও তৎপরে তদাত্মজ শ্রীমান্ তুষারকান্তির স্নেহবন্ধন "অমৃতবাজার"-প্রবাহের সহিত আমায় চির-যুগ যুক্ত রাখিয়াছে। দেশবরেণ্য মতিলাল সেদিন গৃহদেবীর স্বহস্ত-রচিত ভোজ্য গ্রহণ করিয়া আমার এই "অন্নপূর্ণার মন্দিরে" তাঁর পুণ্যস্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

২৫ জন বাঙ্গালী সৈনিক ভার্দুন যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। যেদিন হারাধন প্রমুখ এই প্রথম বাঙ্গালী সেনাবাহিনী জন্মভূমির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে, সেদিন সহস্র-সহস্র নরনারী সে দৃশ্য দেখিতে সমাগত হইয়াছিল। নগরপথের উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাশ্রেণী হইতে শুভ শঙ্খধ্বনির সহিত পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল। হারাধনের সহতীর্থদের অভিভাষণ-কণ্ঠ এখনও আমার মর্ম্মস্পর্শী করিয়া রহিয়াছে। হৃদয় ছিঁড়িয়া তাহারা হারাধনকে বিদায় দিতে গিয়া বলিয়াছিল "শেষ কথা—স্মরণে রাখিও আমাদের, স্মরণে

রাখিও এই ত্যাগ, প্রেম। হৃদয়ে গাঁথিয়া লইও আজিকার এই ঘটনা। এই প্রাঙ্গণের ধূলি-কণার উপর, আমরাও যেন ইহার স্পর্শে জীবন কৃতার্থ করিতে পারি।" সন্তানেরা মাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল "আজ ডাক আসিয়াছে বিশ্বের। মায়ায় বশীভূত না হইয়া মঙ্গল-কর্ম্মে উৎসাহ দিন—আমরা যেন উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারি।" চন্দননগরের সীমায় দাঁড়াইয়া, এই বীর-বাহিনীকে বিদায় দিয়া বিরহিণী মাতা ও পত্নীদের সান্ত্বনা দিলাম। একদিকে বাঙ্গালীর গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ: অন্যদিকে পতি, পুত্র, ভ্রাতার বিরহে ঘরে-ঘরে অবসন্নতা। এই স্বেচ্ছাবাহিনার পুনরাগমন পর্য্যন্ত এই উভয় ভাবই বুকে করিয়া আমায় বহিতে হইয়াছিল। ঘটনা ঈশ্বর-প্রেরণা; এই কর্ম্মের নিমিত্তমাত্র আমি হইয়াছিলাম। বাঙ্গালীর প্রাণ ইহাতে কিরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা লর্ড সিংহের[1] কথা হইতে বুঝা যায়। তিনি এই স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনীর বিদায়োৎসব স্বনামধন্য খলিসানির জমিদার যোগেন্দ্রনাথ বসুর বাটী হইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি আমায় বিপ্লব-যজ্ঞের একজন নামজাদা পাণ্ডা বলিয়া জানিতেন; কিন্তু এই রণবাহিনী-গঠনে আমায় উদ্যোক্তা জানিয়া সেদিন প্রশংসাসূচক বাক্যে যোগেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন—"I wish to see the lion of Bengal"—কিন্তু এ অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি নাই। 'সুরভির রাজ্য' চন্দননগরের গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হওয়ার অধিকার সেদিন আমার ছিল না। আমি সার্থক হইলাম শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব্ববাণী ফলবতী হইল বলিয়া। তিনি বাংলায় সেনাবাহিনী-গঠনের আন্দোলন উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন "সেবাশিক্ষার সুযোগ আমাদের যথেষ্ট আছে, বাঙ্গালীর অস্ত্রশিক্ষার সুযোগ চাই। সে সুযোগ যদি কখন আসে, বিনা সর্ত্তে, বিনা দাবীতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।" তাঁহার এ নির্দ্দেশ সফল হইল জীবনে, তাই আনন্দের আতিশয্যে ও যুক্তির মহিমায় আমি মুগ্ধ হইলাম।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে—আমার "জীবন-সঙ্গিনী"র কথা লিখিতে গিয়া, বাঙ্গালীর ইতিহাসে এই স্মরণীয় দিনটী উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৃত্যুঞ্জয়ী মিলনতীর্থ ফরাসী রাজ্যেই প্রথম

১ লর্ড এস্. পি. সিংহ

ভিত্তিপাত করিল। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধ পক্ষ জর্ম্মণী ও অষ্ট্রিয়ার পরাজয়-সঙ্কল্পে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করার সঙ্কল্প বাঙ্গালী চন্দননগরবাসীই প্রথম লইল। বাঙ্গালী সেদিন অস্ত্রধারী হইয়া বলিয়াছিল "বাঙ্গালী সেনাদলের ইহাই জীবন-স্বরূপ হউক; অস্ত্রই আমাদের বন্ধু, সুহৃৎ, আত্মীয়।" ফরাসী সেনাপতি এই উক্তি সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন "বন্ধুগণ, অস্ত্রই এক্ষণে তোমাদের পরম বন্ধু। স্বীয় শরীরের ন্যায় এই অস্ত্রের আদর-যত্ন করিও। কে জানে এক মাস পরে কে কোথায় থাকিবে? কিন্তু এই অস্ত্রই থাকিবে শেষ দিনের সাথী-রূপে। এই অস্ত্রই শত্রুর আক্রমণ হইতে তোমাদের রক্ষা করিবে। যদি অস্ত্রের অনাদর কর, তুর্কী ও জর্ম্মণীর এই আক্রমণে তোমরা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।"

তারপরে অস্ত্রের ন্যায় সেনাদল ও সেনানিবাসের মর্য্যাদা-রক্ষার উপদেশ দিতে গিয়া সেনাপতি বলিয়াছিলেন "যখন তোমরা সেনাদলে যোগদান করিয়াছ, তখন তোমাদের আর কেহ নাই। বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ী সবই তোমাদের এই সেনানিবাস। এই সৈনিক বন্ধুগণই তোমাদের সর্ব্বস্ব। ইহাদের সহিত একত্র অবস্থান করাই তোমার স্বর্গবাস।"

বাঙ্গালীর দুর্নাম রটিয়াছিল—তাহারা ভেতো, স্ত্রী-পুত্র-গৃহের আসক্তি ছাড়িয়া কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে না। এই ঘটনায় সে কলঙ্ক ঘুচিয়াছিল। ২০শে জুন বাঙ্গালী সেনাবাহিনী পণ্ডিচেরী হইতে মার্সাই যাত্রা করে। পদাতি সেনাদলের সেনাধ্যক্ষ মঁসিয়ে এ. জিলে তৎপূর্ব্বে আমায় যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার অনুলিপি বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকিবে। তিনি লিখিয়াছিলেন:

"মহাশয়, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার নিকট আমি অপরিচিত, তত্রাপি অতি আনন্দের সহিত চন্দননগরের সৈনিকদিগের সংবাদ আপনাকে জানাইতেছি। তাহারা সকলেই শারীরিক কুশলে আছে এবং পণ্ডিচেরীতে আসিয়া অবধি তাহারা যেরূপ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। এই অল্পবয়স্ক যুবকগণ সকলেই সৎ—তাহাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনও দোষই দেখি নাই। ইহারাই আমার সকল সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল, এই কথায় একটু মাত্রও অত্যুক্তি নাই।

"এই মাত্র সংবাদ পাইলাম—আমাদের ভিবুতির পরিবর্তে ফ্রান্স দেশের মার্সাই নগরে গমন করিতে হইবে। আমি আপনাকে ইহাই জানাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি যে, সেখানেও আমিই ইহাদের অভিভাবক-স্বরূপ থাকিব —আমার ইউরোপীয় সেনাদিগের প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার করি, ইহারা বাঙ্গালী হইলেও, ইহাদের প্রতি আমি তদ্রূপ আচরণই করিব এবং ইহাদের পিতার ন্যায় স্নেহ করিব। ইহারা সকলেই ফ্রান্সে দাঁড়াইয়া মাতৃভূমির সেবার জন্য লালায়িত এবং ইহাতেই ইহারা সুখী। আপনি সৈনিকগণের পরিবারবর্গকে জানাইবেন যে, পুত্রের মত আমি ইহাদের সতত দেখিব এবং রক্ষা করিব। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসা জানিবেন।"

(স্বাঃ) এ. জিলে

লেফ্‌টেন্যাণ্ট, পদাতি সেনাদল, পণ্ডিচেরী।

"পুনশ্চ—এই মাসের শেষাশেষি যাত্রা করিতে হইবে।"

জীবনের পট-পরিবর্ত্তন হইল। অতীতটা যেন আমার কাছ হইতে মুছিয়া যাওয়ার উপক্রম করিল। যে কর্ম্মযজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী সৈন্যদল-গঠনের প্রেরণায় তাহাতে পূর্ণাহুতি পড়িল। অতীতের ভাব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে অতীতের উপেক্ষিত বৃত্তিসমূহ কোথাও বর্জ্জনে, কোথাও শোধনে নব-মূর্ত্তি ধরিতে লাগিল। জীবন-সাধনার সমুদ্র-মন্থনে, বাসুকীর মত আমি নিপীড়িত-বিধ্বস্ত হইতেছিলাম। মন্দারের ন্যায় অটল গিরিবক্ষে অমৃতোত্থানের প্রতীক্ষায় জীবন-সঙ্গিনীও সেদিন অপরূপা মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। জীবনের কত দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত একটী অবগুণ্ঠনবতী নারীর প্রহরা-দৃষ্টিতে শক্তি ও স্বাস্থ্যের কারণ হয়, জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহা বুঝিয়াছি, সে কথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিব।

সে এক ভরা সন্ধ্যা। বসন্তের বাতাস বাতায়ন-পথ দিয়া অবাধে গৃহময় লুকোচুরি খেলিতেছিল। গৃহখানি আধা-আলো, আধা-আঁধারে কুহেলিকাপূর্ণ। মনের আনন্দে নিজেরই বাঁধা গান গাহিতেছিলাম :

ওগো ও-হৃদয়চন্দ্র,
হৃদয়-মাঝারে বিহার করিতে এস।
আমার সজ্জিত এই হৃদয়-কুঞ্জে
নৃপতি হইয়া বস !!"

গানের গলা নয়, কিন্তু গান গাহিতাম বুক চিরিয়া ; গাহিতে-গাহিতে নয়ন অশ্রুবিগলিত হইত। মুদিত নয়নে গান গাহিতাম, সময়ের হিসাব থাকিত না। গান গাহিয়াছি বহুক্ষণ হইবে ; কেন-না, সন্ধ্যার পর রাত্রির পদসঞ্চারে নিশাচর কীট-পতঙ্গের কলরব বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছে। ঘরখানি আমার আলোকিত। ধূপ-ধুনার গন্ধে চিত্ত পুলকিত হইল ; বুঝিলাম—গৃহিণী সন্ধ্যার প্রদীপ দিয়া গিয়াছেন, আমার তন্ময়তা-ভঙ্গ করেন নাই। নিঝুম পল্লী। সঙ্গীতের রেশ গৃহ-মধ্যে থমকিয়া-থমকিয়া তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কি এক অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উথলিয়া উঠিল। গৃহগাত্রে অনেকগুলি ছবি ছিল, তাহার মধ্যে ঠাকুর

রামকৃষ্ণের ছবিটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। হঠাৎ সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম—ছবিটির চক্ষের পাতা ঈষৎভাবে নামিতেছে-উঠিতেছে। আমি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া, ছবির দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। চক্ষের ভ্রম কি না, বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বিস্ময়ের সীমা রহিল না, দুইটি আয়ত নয়নের দৃষ্টি আমার দিকে অপলকে চাহিয়া রহিয়াছে; আর অনেকক্ষণ পরে তাহাতে আবার পলক পড়িল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, দৃষ্টিভ্রম মনে করিয়া দুই হাতে চক্ষুঃ মার্জ্জন করিলাম, কিন্তু তবুও ছবির চক্ষুঃ-পলক পূর্ব্বের মতই জীবন্ত মানুষের মত মনে হইল। উন্মাদের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম; এমন অদ্ভূত কাণ্ড কখন কল্পনা করি নাই। ছবির দিকে অগ্রসর হইলাম, অতি নিকটে আসিয়া বুঝিলাম—চক্ষুরই ভ্রম, সাদা কাগজে কালির আঁচড়ে ঠাকুরের ইহা ছবি ভিন্ন অন্য কিছু নহে! কিন্তু মাথার ভিতর কেমন এক প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিলাম, মস্তিষ্কের ওলটপালট হইতেছিল। বিহ্বলচিত্তে অকারণ ঘরের ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; যেন ঘরে আর কেহ আছেন, এমনই মনে হইতেছিল। মানুষ এমন করিয়াই কি উন্মাদ হয়! ঘরের সব ছবিগুলি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। সবই ছবি—জীবনের স্পন্দন কোনটিতে নাই! কিন্তু ছবিগুলি অন্য দিনের মত শুধুই রঙের আলিপনা মনে হইল না। শ্রীগৌরাঙ্গ দুই বাহু তুলিয়া চলিয়াছেন, পশ্চাৎ আচার্য্য অদ্বৈত, শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ছুটিয়া আসিতেছেন—যেন সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে সজীবতার আভাস ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মহামানব বুদ্ধ নিমীলিত নয়নে বসিয়া আছেন; জ্যোতিশ্ছটায় আজ যেন তাঁর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর একখানি ছবিতে—আচার্য্য শঙ্কর এক বনস্পতির মূলে আসন করিয়া বসিয়াছেন। উভয় পার্শ্বে মুণ্ডিতমস্তক তাঁহার শিষ্য-চতুষ্টয় বসিয়া আছেন। মনে হইল—আচার্য্য শঙ্করের মুখের বাণী একটু কাণ পাতিলেই শুনা যাইবে। মিঃ পিয়ার্সনের প্রদত্ত দুইখানি খৃষ্টের ছবির দিকে দৃষ্টি পড়িল—একখানি আনত-নয়ন, সুদীর্ঘ-কেশ, শান্ত-সমাহিত খৃষ্ট-মূর্ত্তির; আর একখানিতে এই মহামতি যীশুই ভক্তমণ্ডলীর পদপ্রক্ষালণ করিয়া দিতেছেন। খৃষ্টের নয়ন করুণার্দ্র, ভক্তেরা কুণ্ঠিত, লজ্জিত, তাহারা অধোবদনে বসিয়া আছেন। আর

একটি ছবি, উহা বিপুলকায় গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের প্রতিকৃতি। গৃহ-মধ্যস্থ সমস্ত প্রতিকৃতিই জীবনের অতি নিকট আত্মীয় বলিয়া বোধ হইল। নিজেকে আর একা মনে হইল না ; এই সব সঙ্গীদের লইয়া সে রাত্রিতে বুক অপার্থিব আনন্দে ভরিয়া উঠিল। অলক্ষ্য, অপ্রাকৃত জগৎ এইদিন হইতেই আমার অতি নিকটে নামিয়া আসিল। অন্তরে এক অলৌকিক অনুভবের তরঙ্গ-সৃষ্টি হইল। সে কথা যথাসম্ভব পরে বলিব। সাধন-জগতের ইতিহাসে এই জাগ্রৎ জীবনের পশ্চাৎ অপ্রাকৃত জীবনের সাড়া আমি ভাল করিয়াই পাইয়াছি ; প্রমাণসাপেক্ষ না হইলেও, এই দৃষ্টি দিয়াই অনেক কিছু দেখিয়াছি—উহা এইজন্য অস্বীকার করিতে পারি না।

কিছুক্ষণ পাগলের মত গৃহময় ছুটাছুটী করিলাম। মহাপুরুষগণের প্রতিকৃতি ব্যতীত আর একখানি বড় ছবি দেওয়ালের এক অংশে লম্বিত ছিল। এই ছবিখানি অপসারিত করার তাগিদ বহু জনের নিকট হইতে আসিয়াছে, আমি তাহাতে রাজী হই নাই। ছবিখানি রোমীও জুলিয়েটের। প্রণয়িনী দ্বিতলের বারান্দায় আবক্ষ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, পুষ্পিতা লতাবল্লরী চতুর্দ্দিকে ছাইয়া আছে ; আব প্রণয়প্রার্থী রোমীও একটি দড়ির সোপান বাহিয়া কতকটা উচ্চে অরোহণ করিয়াছেন মিলনের আকুতিতে। এই ছবিটীও আমার চিত্ত আকৃষ্ট করিল। সে রাত্রিতে চক্ষে আমার ঐন্দ্রজালিক অঞ্জন যেন লেপিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় আর কোন ছবিরই অঙ্গসঞ্চালন চক্ষে পড়িল না বটে, কিন্তু এই সব চিত্র জীবন্ত সঙ্গী বলিয়াই মনে হইল। বিভোর চিত্তে আমি আবার গান সুরু কবিলাম। গাহিতে-গাহিতে এক প্রকার বাহ্য-চৈতন্য লোপ পাইল। আমি মুদিত নয়নেই গাহিতেছিলাম :

"কি আর বলিব নাথ,
বলিব তোমায়-হে !
তুমি হৃদয় রতন-মণি
আনন্দ-নিলয়-হে ॥"

অকস্মাৎ নাসারন্ধ্রে তাজা বেল-মল্লিকার সুবাস অনুভূত হইল। চাহিয়া দেখিলাম—টেবিলের উপর একরাশ প্রস্ফুটিত ফুলদল। সবিস্ময়ে আরও দেখিলাম—বিস্ফারিত নয়নে একা রমণী আমার দিকে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া

আছেন। আমি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই মহিলা আমার একান্ত অপরিচিতা ছিলেন না; তবে কুলবধূ বলিয়া আমার সম্মুখে তিনি এমন করিয়া কোনদিন বাহির হন নাই। তাঁর অবগুণ্ঠনবতী মূর্ত্তিই আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

আমায় অধিক ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হইল না, তিনিই ধীরে-ধীরে কথা বলিলেন। কথাগুলির মধ্যে এমনই একটী সারল্যের মধু-মূর্চ্ছনা ছিল, যাহা আমাকে এক মুহূর্ত্তে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। এক মুহূর্ত্তেই ব্যবহারিক ব্যবধান দূর হইয়া গেল, অতি-পরিচিতার ন্যায় তাঁর বিস্ফারিতা-দৃষ্টির দিকে আমিও অকপটে নয়ন রাখিয়া, তাঁর কথাগুলি শুনিলাম। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার ভাবার্থ—তিনি গৃহকোণে থাকিয়া আমার কর্ম্মাদি গভীরভাবেই পর্য্যবেক্ষণ করেন, আমার গতিবিধি লক্ষ্য রাখেন; সর্ব্বোপরি আমার গান তাঁর মর্ম্ম স্পর্শ করে—আজ আর তিনি কোন বাধা মানেন নাই; লজ্জা, ঘৃণা, ভয়ের হিসাব রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। প্রেমের অনাবিল সম্বন্ধ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করার নির্ভীকতা আজ তিনি পাইয়াছেন, এইজন্যই এমন করিয়া ছুটিয়া আসা।

আমার হৃদয় যেন কাঙ্গালের ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত মনে হইল। তাঁর এই প্রেমের অবদান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এই ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করার মত বুদ্ধি আমার লোপ পাইল। মুখে আমার কথা ছিল না। নয়নেরও ভাষা আছে; সে অব্যক্ত ভাষায় আমি তাঁর এই আচরণ সমর্থন করিলাম। এই প্রথম পরিচয়ের যে মাদকতা, তাহাতে বাহ্যতঃ বিন্দুমাত্র গ্লানি না থাকিলেও, উভয়ের অন্তরে উহা যে সম্বন্ধের গ্রন্থি সৃজন করিল, তাহা পরে ব্যথার সূচনাই করিয়াছিল। দেহের অবৈধ স্পর্শ হইতে মুক্ত থাকিলেও, আমি নিষ্কৃতি পাই নাই। নয়নেরও অবৈধ বন্ধন আছে। মন বৃন্দাবন না হইলে, নারী-পুরুষের মধ্যে কোন সম্বন্ধেই অন্তরের আলো ও শান্তি নাই। সেই মুহূর্ত্তে এতটা তলাইয়া দেখার বুদ্ধি জাগিয়া থাকে নাই। আমি এই মহিলার আত্মনিবেদন অধ্যাত্ম-সম্বন্ধেরই প্রথম সাধন বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তত্রাপি কেন জানি না, শঙ্কিত হৃদয়েই তখন তাঁহাকে বিদায় লইতে বলিলাম। আমার প্রতি তাঁর এই অনাবিল আকর্ষণে যে আত্মপ্রসাদ ও গৌরব, তাহার সমর্থন আমার বিবেক

করে নাই; তাই তাঁহাকে ভয়ে-ভয়ে বিদায় দেওয়ার পর অন্তরে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া অতর্কিতে আমায় কিছু অবসন্ন করিল। হৃদয়ের স্বচ্ছতা সন্ধ্যা-সমাগমে যেমন ভাস্বর হইয়া উঠিতেছিল, তাহা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মনে হইতে লাগিল—এখন আর উদাত্ত কণ্ঠে সঙ্গীতেরও শক্তি নাই। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ভিজা কাঠ নিক্ষেপ করিলে উহা যেমন সহসা ধূমাচ্ছন্ন হয়, এই ঘটনায় আমারও সেইরূপ অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। অসংযত হইয়া যেন কি একটা অপরাধ করিয়া বসিয়াছি; কিন্তু সান্ত্বনার মন্ত্র আমার সঙ্গেই ছিল। ঘটনা তো আমি সৃষ্টি করি নাই। যাহা হয়, তাহা তৃতীয় হস্তের লীলা। এই তৃতীয় শক্তিই আমায় কাপট্য শিখাইল। ঈশ্বরের চরণে আত্ম-নিবেদনের পথে মনের এই দস্যুবৃত্তি-দমন বহু তপস্যায় হইয়াছে। সব কথা কি গুছাইয়া বলিতে পারিব?

প্রফুল্লমুখী চির-সঙ্গিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন। কত হাসি তাঁর ঠোঁটে উপচাইয়া পড়িতেছিল, কত কথার ঝরণা কণ্ঠে উদ্গতা হইতে চাহিতেছিল। শ্রম-জলে তাঁর ললাট অভিষিক্ত। গৃহকর্ম্ম সারিয়া কিছুক্ষণ আলস্য-ভঙ্গের পর, নিঝুমপুরী হইতে আমি বাহির হইয়া গিয়াছি কিনা, তাহা তিনি ধীর চরণে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছেন, তারপর কাছে আসিয়া, হাসিয়া কথা কহিয়া উৎসবময়ী আনন্দের ঝরণা ঝরাইতে আমার মুখের দিকে চাহিয়াই স্তম্ভিতা হইলেন। আমি তখন যেন অখাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া পরিপাক চেষ্টায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভিতরে দ্বন্দ্বযুদ্ধও চলিয়াছে। ঘটনার শেষ হইয়াছে, বিবেকের বিচার তখনও শেষ হয় নাই; তিনি আসিয়া যেন সুর খুঁজিয়া পাইলেন না। অনুভূতির তারে বেসুরা সঙ্গীত বাজিল। কেন এমন হয়, তাহা তো বুঝা যায় না; তাই মনে করিলেন—বুঝি আমি সুস্থ নহি, বুঝি আবার কোন নবাগত দুর্ঘটনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছি। হায় পুণ্যতোয়া-জাহ্নবি, সরল-ঋজু প্লাবনে তুমি আমায় নিত্য অভিষিক্ত করিয়া রাখিতে চাহ, আর আমি কুটিল বন্ধুর পথে তির্য্যক্ রেখাসূত্র টানিয়া সমস্যার পর সমস্যাই সৃষ্টি করি। তোমার অন্তর অস্বস্তির কারণ সন্ধান করে, আমার একটি কথায় তাহা মিলে; কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করিতে কেন আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়? অবৈধ দৈহিক ভোগাকর্ষণ তো রাখি নাই, অন্তরে প্রেমের নামে এমন অলীক মিথ্যা আকর্ষণ আমায় মজায় কেন?

বেশ বুঝিলাম—অকারণে চোর সাজিলাম। ঘটনাটি অপ্রকাশ রাখার প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম পাপেরই লক্ষণ ব্যতীত আর কি বলিব? আমার এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণই তাঁহাকে বার বার ক্ষুণ্ণ করে, তাঁর কাছে অনেক কারণই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। কত অহৈতুকী বৃথা চিন্তায় তাঁর প্রশস্ত চিত্ত সঙ্কুচিত হয়! এত ধর্ম্মসাধনার ভিতরও এই একটি পুরুষ ও একটি নারীর হৃদয় সংযুক্ত হয় না! প্রেম ও ঐক্যের মহিমা রক্ষায় তাহারা সমর্থ নয়। এ মর্ত্ত্য কি অভিশপ্ত?

প্রবঞ্চনার কিছুই ছিল না। আমার গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে চিন্তান্বিত করিত। আমার জন্য বৃথা এই দুর্ভোগ, আমি কেমন করিয়া সেই সরলাকে এমন করিয়া দুঃখ দিতাম? ঘটনার আগাগোড়া তাঁহার কাছে গোপনই রহিল, আর আমার এই অস্বচ্ছ মনের তলে-তলে অপ্রাকৃত সম্বন্ধের নামে সেই পর-নারীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধের বিষ-লতা অলক্ষ্যে বাড়িয়া চলিল। এই দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা আমি, কোন্ অপরাধে গৃহদেবীর দুঃখ-ভোগ—কে তাহা নির্ণয় করিবে? দুঃখের পাষাণ-ঘর্ষণ না হইলে, বুঝি প্রেম-চন্দনের সৌরভানুভব হয় না?

নিয়ম, সংযম সবই বিসর্জ্জন দিয়াছি। নিজের কোন ইচ্ছাও নাই, চেষ্টাও নাই। আত্মসমর্পণের মন্ত্র পাইয়াছি; কিন্তু তাহার যে একটা বিজ্ঞান আছে, তাহা সেদিন ধরা দেয় নাই। দুর্গতির দিনে ঈশ্বর-স্মরণে সান্ত্বনা পাই; অপ্রিয় ঘটনাঘটন ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া অবসাদ দূর করি। পুরাতন স্বভাবের সহিত নূতন স্বভাবের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে। প্রতি কর্ম্মে বিচার সুরু হইয়াছে—কোন্‌টি ঈশ্বর-কর্ম্ম; আর কোন্‌টি অহঙ্কারের? আমি আর নাসাপান করি না, প্রাণায়াম করি না, পূজার্চ্চনা ছাড়িয়া দিয়াছি; একাদশী অস্বীকার করি, শিব-চতুর্দ্দশী মানি না, দেবদেবীদের বিদায় দিয়াছি, গলার উপবীতটাও গঙ্গার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। সঙ্গিনী একবার প্রশ্ন তুলিলেন "কিছুই তো কর না, তোমার ধর্ম্মটা কি?"

সোজা উত্তর দিতে বাধে না,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। তিনি প্রশ্ন করেন "সেই এক কে?"

আমি বলি "শ্রীঅরবিন্দ"। তিনি অবাক্ হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকেন। খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া আবার তিনি জিজ্ঞাসা করেন "তুমি যাহা কিছু করিতেছ, সবই কি তিনি করাইতেছেন? ভাল-মন্দ সবের জন্য তিনিই কি দায়ী?"

ইহার উত্তর দিতে বাধিত। নিজের মনেও সংশয় ছিল। কর্ত্তা আমি নহি বটে, কিন্তু সে তো আমার মনের কথা! যখন যাহা হয়, করিয়া যাই; মনকে বলি—সবই শ্রীঅরবিন্দ করাইতেছেন। আবার ভাবিতাম—তাহাই কি সত্য? আমার সকল কর্ম্ম কি তিনি দেখিতেছেন? প্রত্যয় ঠিক হইত না, কিন্তু সাধনের তিনটি ভিত্তির কথা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছিলাম।

বিশ্বাস, ধৈর্য্য আর সাহস। মন স্বীকার করুক, আর নাই করুক, আমি ইহা বিশ্বাস করি; তাহার জন্য যাহা হয় হউক, ধৈর্য্যচ্যুতও হইব না, ভরসাও ভাঙ্গিব না। এইভাবে চলায় মনের সম্পূর্ণ সায় না পাইলেও, কোথায় একটা জোর পাইতাম। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিই।

"প্রবর্ত্তক" লিখিতাম—মনের একদিকে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইত যে,

শ্রীঅরবিন্দই লিখাইতেছেন। সংশয় উপনীত হইয়া বলিত—না, ইহা তুমিই লিখিতেছ। এই সংশয়াত্মক মনের দিক্‌টা আমার মনের মধ্যে বেশী আশ্রয় পাইত না। মনের এই অংশ ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছিল।

ফ্রান্সে ভলান্টিয়ার পাঠাইয়াছি; তাহারা অক্ষত শরীরেই ফিরিয়া আসিবে। শ্রীঅরবিন্দ তাহাদের রক্ষা করিবেন। ঘটনা এমনও হইয়াছে, একজন হয়তো রক্ষা পাইল না! বিশ্বাসী মনের অংশ জানাইয়া দিল—সে রোগে মরিয়াছে, যুদ্ধে মরে নাই; শ্রীঅরবিন্দ সংগ্রামার্থীদের যুদ্ধ-কালে রক্ষা করার জন্যই দায়ী।

বিপ্লব-কর্ম্মে ভয়ের অন্ত ছিল না, কিন্তু আমি রক্ষা পাইবই। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেছেন "মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি"। আপনার জন কেহ যদি মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হইত, শ্রীঅরবিন্দকে 'তার' করিতাম তাহার প্রাণরক্ষার জন্য। নিশ্চয় জানিতাম—শ্রীঅরবিন্দ তাহাকে রক্ষা করিবেন। আত্মসমর্পণের সাধনা তৎকালে এইরূপই চলিয়াছে। গুর্জ্জরের একটি বালক[১] আমার নিকট থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। ছেলেটি কঠিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার বাঁচিবার আর কোন আশা নাই। শ্রীঅরবিন্দের তারের উপর তার করিতেছি; ছেলেটী মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল, শ্রীঅরবিন্দের জয় দিলাম। গৃহদেবী আমার এই কথার প্রতিবাদ করিতেন না। আবার সমর্থনসূচক কোনরূপ ইঙ্গিতও তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত না।

সত্যনারায়ণ-বিগ্রহ শিকায় উঠিলেন, কাশীর শিব শুকাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মীপূজা বন্ধ হইল। বার-ব্রতাদি কিছুই রহিল না। গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা-পার্ব্বণে যত কিছু দেয় ছিল, সব নাকচ হইয়া গেল। তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিতেন "এটা কি হবে?" আমি বলিতাম "তাঁর ইচ্ছা"; সে ইচ্ছা কোন পর্ব্বানুষ্ঠান সমর্থন করিত না। সমাজে আমাদের আর হিন্দু নাম রহিল না। এই সময়ে আমাদিগকে প্রতিবেশীরা ব্রাহ্ম বলিত।

আচারানুষ্ঠানের বালাই ঘুচিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু পর্ব্বদিনের প্রভাব আমায় পরিত্যাগ করিত না এবং এই প্রভাব মনের জগতেই কেবল কার্য্যকর ছিল না, সমস্ত শরীরে তাহা অভিব্যক্ত হইত। আমার স্ত্রী এই সময়ে খুব কাছে-কাছে থাকিতেন। বাহিরের সহিত সম্পর্ক এই সময়ে কমিয়া

১ পণ্ডিত গোবিন্দানন্দের ছোট ভাই তুলজাশঙ্কর

আসিয়াছে। চন্দননগরের নানা স্থানে বিপন্ন রাষ্ট্রসেবিগণ নিরাপদে আশ্রয় পাইয়াছেন। একান্ত অপরিচিত জন আসিলে, আমাকে প্রথমটা কিছু ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত। এই সকল বিপন্ন তরুণকে নিরাপদ্ ক্ষেত্র দান করার ব্যাপারে হৃদয়বান্ এক ধনকুবেরের নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি নির্ভীকভাবে তাঁর বিশাল প্রাসাদভবনে ইংরাজাধিকৃত স্থান হইতে বিতাড়িত তরুণদের যদি স্থান না দিতেন, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখের অবধি থাকিত না। এই উদার দেশপ্রাণ ভদ্রলোক স্বনামধন্য রূপলাল নন্দী ও তাঁর বাটীর নাম প্রসিদ্ধ "গালাকুটী"।

যাঁহারা অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা আমার এই যুগের অবস্থা কিছু-কিছু বুঝিবেন। শ্রীঅরবিন্দের নামে আপনাকে ছাড়িয়া একটা নিঃসঙ্গাবস্থার সাধনা চলিতেছিল। নিজের শরীর ও মনের উপর যত অধিকার ছাড়িয়া দিই, ততই মনে হয়—শ্রীঅরবিন্দ আমায় অধিকার করিতেছেন। কিন্তু সেদিনকার কথা আজ স্মরণ করিয়া দেখি—এই অন্তর্ম্মুখাবস্থায় অলৌকিক জগতের অনেক ভাল-মন্দ শক্তিই আমায় পাইয়া বসিতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, নিকৃষ্টা শক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টা শক্তির প্রভাব উন্নতিই অধিক পরিমাণে পাওয়ায়, অহিতের অপেক্ষা আমার অধ্যাত্মজগতের উন্নতিই অধিক হইয়াছিল। কোন শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমি তাহা অনুভব করিতে পারিতাম। এই 'আমি'-বস্তুটি আত্মসমর্পণের সাধনায় নিজের শরীর ও মন সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন হইয়া থাকার ফলেই যে কোন শক্তি আমার মধ্যে আশ্রয় লওয়ার সুযোগ পাইত। আমি অসহায়ের মত শুধু তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতাম এবং দেখিতে-দেখিতে আমার মনের সহিত সমস্ত শরীরটাও অভিভূত হইয়া পড়িত। এই অশরীরিণী শক্তির অধিষ্ঠানে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নানা ভঙ্গীতে সাময়িকভাবে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আমি তাহা অনুভব করিতাম। যাহারা আমার কাছে থাকিত, তাহারাও বিস্মিত হইত। গৃহকর্ত্রীর সে কি উৎকণ্ঠার দিন গিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ভাবপ্রবণতা বলিয়া বস্তু ছিল না এবং কোন কারণেই তিনি আত্মহারা হইতেন না, অতি বিচক্ষণতার সহিত আমার ভাবান্তর ও অবস্থান্তরের সময়ে আমার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। প্রথমটা তিনি বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন—ইহা ছল কি

না! মিথ্যাকে তিনি বড় ঘৃণা করিতেন। কিন্তু যখন বুঝিতেন—এইরূপ অবস্থার উপর আমার কোন হাত নাই, স্বতঃই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, তখন তিনি আমার প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বয়ং স্থির ধৈর্য্যে আত্মস্থা হইয়া কখন নিকটে, কখন দূরে থাকিয়া আমার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন।

রাত্রে নিদ্রা ছিল না। গান গাহিতে-গাহিতে একটা অনন্ত হাসির সমুদ্রে যেন ডুবিয়া যাইতাম। উদরের মাংসপেশী ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম করিত, কিন্তু হাসি নিবারণ করার সাধ্য হইত না। অকস্মাৎ এই ভাব দেখিয়া আমার সহতীর্থেরা স্তম্ভিত হইয়া থাকিতেন। আর তিনি ভীড়ের মধ্যে সঙ্কোচবশতঃ না আসিলেও, এমন একটি স্থানে গিয়া দাঁড়াইতেন, যে স্থান হইতে আমার চক্ষের উপর তিনি চক্ষুঃ রাখিতে পারিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহুঁস হইয়া হাসিতাম, আবার চক্ষে জলধারা বহিত। হঠাৎ দীপ্তা দীপশিখার ন্যায় তাঁহার দুটি চক্ষুঃ-তারকার দিকে দৃষ্টি পড়িত। আমার হাসির মাত্রা বাড়িয়া উঠিত; কিন্তু সে দীপ-নির্ব্বাণের পূর্ব্বে ঔজ্জ্বল্যের মাত্রাধিক্যের ন্যায় উপসংহারসূচক হাস্য। আমি পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া নীরব হইতাম। তারপর তিনি আমায় ডাকাইয়া, নিজের ঘরে লইয়া যাইতেন; কি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত চক্ষের জলধারা মুছাইয়া, বক্ষে ও পৃষ্ঠে চারু-শীতল কর সঞ্চালন করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে সে সুখ-শীতল স্পর্শ-লালসায় চিত্ত আমার এখনও চঞ্চল হইয়া উঠে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন "এমন হয় কেন?" আমি বলিতাম "কেমন করিয়া জানিব? আমি নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াই থাকি—শ্রীঅরবিন্দ হাসান, আমি কি করিব?"

তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বলিতেন "শরীরের কষ্ট হয় না?"

আমি বলিতাম "ভিতরের আনন্দের আতিশয্যে আমার আত্মা উৎফুল্ল হয়। কিন্তু শরীর মুচড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। এ শরীর এ বেগ সইতে পারে না।"

কথা শুনিয়া তিনি চিন্তিতা হইতেন। তাঁহার অপ্রসন্ন মুখভাব দেখিয়া বুঝিতাম—তিনি ঠিক এমনটা ভালবাসেন না। তাঁহারও ইহাতে কিছু হাত নাই। তিনি নীরবে প্রার্থনা করিতেন—এই অবস্থা হইতে যাহাতে আমি শীঘ্র মুক্তি পাই।

আর একদিন—রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে। আমরা কয়েক জন বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম, পৃষ্ঠে কে যেন ভীম চপেটাঘাত করিল! আমি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সে ধ্বনি আর্ত্তনাদের ন্যায় সুপ্ত পল্লীবক্ষ সন্ত্রাসিত করিয়াছিল। এই চীৎকারে আমার স্ত্রীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় শয়নগৃহ হইতে আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—কেহ আমায় আঘাত করিয়াছে; কেন-না, তাঁহার এ আতঙ্ক অকারণ ছিল না। তিনি আসিয়া আমায় সান্ত্বনা দিবেন কি, আমি দেখিলাম—ঘরের এক কোণে সমুজ্জ্বল পাতলা ধূম্ররাশি! বিস্ফারিত নয়নে সবিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত সেই দিকে চাহিয়া থাকার পর দেখিলাম—গৈরিক-বস্ত্র-পরিহিতা এক অসামান্যা রূপসী দেবীমূর্ত্তি! নয়নে তাঁহার বিদ্যুৎ ঠিকারিয়া পড়িতেছে। তন্বীর সে অনিন্দ্য রূপ ও শ্রী আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই। তাঁহার হস্তে এক অপূর্ব্ব পতাকা ছিল। সেই মাতৃমূর্ত্তির দিকেই আমার সবখানি দৃষ্টি আকৃষ্টা ছিল। পতাকার বর্ণ আমার মনে নাই, তবে অগ্নিময় অক্ষরে তাহাতে লেখা ছিল "ভারতের স্বাধীনতা।" একটা বৎসর-সংখ্যাও তার নিম্নে লিখিত ছিল। কিন্তু কোন অক্ষরই সুস্পষ্ট ছিল না। সে অক্ষর ঠিক বাংলা অক্ষর নহে, কিন্তু আমার মানসপটে লিখিত অক্ষরগুলি এই অর্থেই উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সে মূর্ত্তি দেখিতে-দেখিতে মিলাইয়া গেল, আমিও হতচেতন হইয়া লুটাইয়া পড়িলাম। এই সব অলৌকিকাবস্থা বহু-জন-সমক্ষে ঘটিত। এই সকলের প্রধান সাক্ষী ছিলেন আমার গৃহদেবী।

একবার ফাল্গুনের পূর্ণিমায় হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি দর্শন করি। সঙ্গে-সঙ্গে আমার সমস্ত হৃদয় প্রেমে ও নতিতে অভিষিক্ত হইয়া উঠে। প্রাঙ্গণের মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিয়া, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। ছোট-বড় জ্ঞান রহিল না; কাহার পায়ের ধূলি না লইয়া, সেদিন প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই। কর্ত্রীঠাকুরাণী বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন "আমায় পায়ের ধুলো দাও, তবে নিও।" তাঁর সঙ্গে ছিল এক ঘটি জল, তিনি চরণতলে তাহা ঢালিয়া দিলেন, আমার আর পায়ের ধূলি লওয়া হইল না।

সেও আর একদিন—গভীর রাত্রে, একটি ক্ষুদ্র গৃহে, আমরা তিন-চারি জন ধ্যান করিতেছি। হঠাৎ মনে হইল—গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ প্রবেশ

করিলেন। তাঁহার বিরাট বপু, দীর্ঘ-শ্মশ্রু-গুম্ফ-বেষ্টিত প্রসন্ন-মুখ—আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিব কি, যেন তিনি আমাকে তাঁহার মধ্যে ডুবাইয়া দিলেন। আমি সেদিন অপূর্ব্ব সুরে গান করিয়াছিলাম ও বহু কথা বলিয়াছিলাম। আমার সহতীর্থদের মুখে শুনিয়াছি—আমার তখনকার গুম্ফ-শ্মশ্রু-মণ্ডিত মুখমণ্ডল গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের যেন অবিকল প্রতিরূপ ধরিয়াছিল। তাহাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এক দেহে অশরীরী অন্য দেহী এমনভাবে আবিষ্ট হয়—ইহা আমি অনুভব করিয়াছি, অন্যেও প্রত্যক্ষ করিয়াছে—তাই ইহা অবিশ্বাস করিতে পারি না।

এই অবস্থায় মানুষ বুঝি পাগল হয়! কিন্তু আমায় পাগল হতে দেয় নাই যাঁর জাগ্রৎ-কল্যাণদৃষ্টি, তিনি আমার স্ত্রী। জীবনের নানা প্রকার দুর্দ্দিনের মধ্যে ইহা এক প্রকার আত্মপরীক্ষারই সন্ধিযুগ। এই সময়েই পুলিস-প্রহরায় আমি এক প্রকার গৃহ-বন্দী; কিন্তু আমার প্রাঙ্গণে এই সময়েই অসংখ্য অশরীরী মহান্ অতিথি সমাগত হইয়া আমায় ধন্য করিয়াছেন।

আমি নবদ্বীপ, হালিসহর, নান্নুর, দক্ষিণেশ্বরের তত্ত্ব ঘরে বসিয়াই পাইয়াছি এই অন্তরীণাবস্থায়। কেশবচন্দ্র গৈরিক বসন পরিধান করিয়া একতারা হাতে গান করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কত অপরিচিত সন্ন্যাসী, বৈরাগী, দরবেশ, বাউলের যে সাক্ষাৎকার পাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে এক অলৌকিক যুগ আমার জীবনে সুপ্রভাত আনিয়াছিল। এই সময়ে অতি ভীষণা প্রেতমূর্ত্তিও দেখিয়াছি। তাহার দু-একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

সেদিন কালীপূজার রাত্রি। আমার এক ছাত্র-বন্ধু বাজী প্রস্তুত করিতেছিল; হঠাৎ বিস্ফোরণে গুরুতর দুর্ঘটন ঘটে। তাহাকে দেখিবার জন্য সকলেই চলিয়া যায়, আমার স্ত্রীও সেই সময়ে উহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমি রহিলাম একা। একটা অপ্রাকৃত জগৎ এই সময়টায় আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে এই জগৎটার সহিত পাকাপাকি সেতু-রচনায় আমি খুব ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক হিপ্নোটিষ্ট বন্ধুর প্ররোচনায় এই সময়ে কয়েক দিনের জন্য সম্মোহন-বিদ্যার অভ্যাসেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ইহার জন্য এক তরুণ আমার খুব

অনুগত হইয়াছিল; অবকাশ পাইলেই তাহাকে এক নির্জ্জন ঘরে ধ্যানে বসাইয়া, আমি অশরীরী আত্মাকে তাহার মধ্যে আবাহন করিতাম ও তাহার মধ্য দিয়া অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিতাম। এই তরুণের মুখে ইউরোপের সংগ্রামক্ষেত্রের যে সব কথা বাহির হইয়াছে, পরবর্ত্তী দিনের সংবাদপত্রে ঠিক সেই সব কথাই প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি। আমার এই নূতন অনুশীলনে আমার সঙ্গীরা বেশ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কালীপূজার রাত্রে সমস্ত বাড়ীটি নীরব, নিস্তব্ধ; ঘরটি নিঝুম অন্ধকারপূর্ণ। এই স্বচ্ছন্দ অবকাশে সেই তরুণটিকে লইয়া অভিনব রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য ধ্যানে বসিলাম। যথারীতি প্রক্রিয়ার পর এই বালকটির কণ্ঠে অন্য দিনের ন্যায় শব্দ উচ্চারিত হইলে, ঘরে বাতি জ্বালিলাম। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া অন্য দিনের ন্যায় চিত্ত আমার প্রসন্ন হইল না। কি এক অভাবনীয় আতঙ্কে আমি বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম; দেখিলাম—এ মুখ মানুষের নহে। উহা এমন বীভৎস, বিকৃত আকার ধরিয়াছে, যাহা দেখিলে ভয় তো হয়ই, পরন্তু একটি নিরীহ মানবের প্রতি ইহা কঠোর অত্যাচার বলিয়া মনে অতিশয় কষ্টও হইল। তাহার চক্ষুঃ দুইটি অস্বাভাবিকরূপে বিস্ফারিত হইয়াছে, অক্ষিগোলক অতি বৃহৎ ও সবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। বদন বিস্তারিত, দন্তগুলি যেন বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য একটা ঝাঁকুনী দিলাম। ভয়ে আমার সমস্তখানি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইচ্ছা হইতেছিল পলাইয়া যাই; কিন্তু এই ছেলেটিকে এইরূপ দুর্দ্দশায় রাখিয়া পলাইবার ইচ্ছা রোধ করিলাম। সে ঝাঁকুনী খাইয়া এমন বিকট আর্ত্তনাদ তুলিল, তাহাতে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আমি নিজেকে অতিশয় অসহায় মনে করিলাম। এমন কেহ নাই, যাহাকে দেখিয়া বুকে সাহস পাই। অগত্যার মধুসূদন "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি" জপিতে সুরু করিলাম, আর মিডিয়মকে এই বিকৃতি-মুক্ত করার সর্ব্বপ্রকার বিধি অবলম্বন করিলাম। কিছুই হইল না। সে বিকৃত কণ্ঠে হুঙ্কার করিতে-করিতে আমার দিকে দুই-পা আগাইয়া আসে, আবার পিছাইয়া দাঁড়ায়। মাঝে-মাঝে তাহার পদতল ভূমি হইতে যেন ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। অতি বিকৃত স্বরে সে বলিল "আমায় ডাকলি কেন? ডাকলি তো খেতে দে!" এই কথায় সুবিধা পাইয়া আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা

করিলাম। সে যে পরিচয় দিল, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। আমার বাড়ীর পার্শ্বেই এক বর্ষীয়সী বিধবার দারুণ বসন্ত-রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি স্থূলাঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার লোক মিলে নাই; আমাকেই শব-বহন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ভীষণ মৃতদেহটি আমার মনে পড়িল। আমি তাঁহাকে প্রশান্ত করার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম "কি খাইতে চাও বল।" সে বিকট হাস্যে বলিল "কচি ছেলে, কচি ছেলে!"

তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে তরল-লালসা বস্তুতন্ত্র হইয়া দেখা দিল। আর কিছুক্ষণ ইহার সম্মুখে একা থাকিলে, হয়তো আমি হতচেতন হইতাম। ঠিক এই সময়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দুই-একজন ছাত্রবন্ধু আসিয়া পড়িল। তাহারাও আমার কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। আমার এই ভূতাবিষ্ট তরুণটী মুখভঙ্গী করিয়া বার-বার কচি ছেলের মাংস চাহিতে লাগিল। তাহার এই কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন "সত্যিই তো এই মাত্র একটী নধর কচি ছেলে বুকে লইয়া কয়েক ব্যক্তি ঘাটের দিকে গেল!" ভূতাবিষ্ট তরুণ বিকট উচ্চ হাস্য করিল। তাহাকে লইয়া সে রাত্রি কি উৎপাত যে সহিয়াছি, তাহা আর বলিবার নহে। অনেক কষ্টে এই প্রেতিনীর হস্ত হইতে ছেলেটীকে রক্ষা করি। তাহার পর কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জিদে এই কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিব, প্রতিশ্রুতি দিই। যেমন করিয়া অন্যান্য ঘটনা-প্রবাহ আসিয়াছে, গিয়াছে—এ অবস্থাও সেইরূপ স্বতঃই আসিয়াছিল এবং ইহা হইতে এক মুহূর্ত্তেই প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। আমি প্রেততত্ত্ববিৎ নহি; ইহা মনের বিকার অথবা প্রেত-প্রভাব, অভিজ্ঞ জনেরা বিচার করিবেন। তবে আমার মনে হয়—মানুষের অন্তঃকরণ নিজের আয়ত্তাধীন না হইলে, বিশ্বের অনেক শক্তি তাহা আশ্রয় করিয়া অনেক কিছুই করিয়া যায়। মানুষের ভাল-মন্দ সব কিছু কর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন নহে; ইহার জন্য দায়ী অনেকেই। বাহ্যতঃ জাগতিক দায় আমাদের লক্ষ্যে পড়ে; কিন্তু অনেক কর্ম্মের পশ্চাৎ অলক্ষ্যশক্তির হাত থাকে। এই সকল ঘটনার ভিতর দিয়া তাহা আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আমার লিখিবার ও বলিবার শক্তি আমি অনেক সময়েই নিজের বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। শ্রীঅরবিন্দ যখন বলিয়াছিলেন "শক্তিকে

ভগবান্ আমার ভিতর দিয়া লিখাইতেছেন", আমি তাহা বিশ্বাস করিয়াছি। সাধনার পথে করণগুলির সন্ধান যখন পাইলাম, তখন কর্ত্তার সন্ধান করিতে গিয়া দেখিলাম—কর্ত্তাটী আমি নহি। আমিও শরীর-প্রাণ-মনের মত একটী করণ মাত্র। কর্ত্তার হাতে করণগুলির সমর্পণ-ক্রিয়াই আত্ম-সমর্পণযোগ নামে আখ্যাত। আত্মসমর্পণ-যোগে করণগুলির কর্ত্তৃত্ব-সংস্কার যখন বিলুপ্ত হইতে থাকে অথচ এই যোগ যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তখন সেই ঔদাসীন্যের যুগে ঈশ্বরের নামে করণগুলিকে আশ্রয় করার অনেক শক্তি প্রত্যক্ষে ও অপ্রত্যক্ষে লোলুপ ব্যাঘ্রের মত অপেক্ষা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে করণগুলি ঈশ্বরের হাতে না পড়ায়, তাহাদের উপর রাহাজানি হইয়া যায়। এই হেতু সকল শিক্ষার মত এই যোগশিক্ষার কর্ণধাররূপে প্রত্যক্ষ গুরুর প্রয়োজন। সে কথা এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

আমার এই সব ভূতুড়ে কাণ্ড দেখিয়া সঙ্গীদের মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় দুইয়েরই উদ্রেক হইত। কিন্তু আমার স্ত্রী বলিতেন "আমি লেখাপড়া জানি না বটে; কিন্তু আমার মনে হইতেছে—এই সব ভূত-প্রেতের কাণ্ড ধর্ম্ম নহে।"

কথা আমার ভাল লাগিত না। ঈশ্বরের হাতে সব কিছু ছাড়িয়া দিয়াছি। সাধনার সঙ্কেত—করণগুলিকে ঈশ্বরের আশ্রয়ে তুলিয়া দেওয়া; এবং সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরকে স্মরণে রাখা। এই দুই নীতি ভিন্ন আত্মসমর্পণ-যোগীর অন্য পথ নাই। আমি সেই যুগের কথাই বলিতেছি। এই ক্ষেত্রে আমাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে জাত্যাভিমান, জন্মগত ধর্ম্মসংস্কার, আসন, প্রাণায়াম, নেতি, ধৌতি প্রভৃতি যোগাচার; আর এই ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখিয়াছি—আমি অসহায় নহি। একটা মানুষের জীবনযাত্রার দায়ও তো আছে! আমারও যে তাহা ছিল না, এমন নহে। কিন্তু আর তাহা নাই, ইহা কাহার করুণা? ঈশ্বরযাত্রীর পথে ঈশ্বরপ্রসাদই একমাত্র পাথেয়। আমি ভোরে উঠি। কোন কর্ম্ম নাই, তবুও নিরলস। যাহা অধীত হয়, অধ্যাপনায় তাহাই বিলাইয়া দিই। অর্থসংগ্রহের ন্যায় জ্ঞান-সংগ্রহেরও দায়-মুক্ত আমি—একেবারে পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল, সুন্দর। কে যেন আমায় পাইয়া বসিয়াছে! সে-ই যেন সব করাইয়া লয়। আমি দেখিতাম—অবন্ধুর ঋজু পথে চলিয়াছি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হৃদয়ে রাখিয়া।

একটু অশোভন কিছু হইলেই, গৃহকর্ত্রীর কটু সমালোচনা আমায় দংশন করিত ; আমি বিরক্ত হইতাম। বিরক্তির সময়ে তিনি কিছু বলিতেন না ; কিন্তু সময় বুঝিয়া তিনিই স্মরণ করাইয়া দিতেন "ঈশ্বর শুধু তোমার কর্ত্তা নহেন, সকলেরই। তবে আমার মুখ দিয়া তোমার অপ্রিয় কথা বাহির হইলে, বিরক্ত হও কেন ?"

এই কথায় আমি চমকিয়া উঠিতাম। ঈশ্বর সর্ব্বভূতেশ্বর। কর্ত্তা তিনি। করণ এই পৃথিবী। জীব-জন্তু তাঁরই হস্তের ক্রীড়ণক। স্তুতি-নিন্দা, প্রিয়াপ্রিয় তুল্যরূপে পরিগৃহীত হইবে তখনই, যখন চিত্ত ঈশ্বরে দৃঢ়স্থিতি পাইবে। সুযোগ বুঝিয়া গৃহদেবী যে বাণী উচ্চারণ করেন, তাহা তাঁহার জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বর-প্রসাদের ন্যায় আমার জ্ঞান-পুষ্টি করে। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় সমতা লাভ করিতে হইবে, সে যুগে এইরূপ ভাব-সাধনার প্রয়োজন ছিল ; এইজন্য শিক্ষা-সঙ্কেত যে দিক্ দিয়াই আসুক, তাহা সাধনজীবনে অস্বীকৃত হইত না। তিনি শুধু শয্যা-সঙ্গিনী হইলে, তাঁহার নিকট হইতে এই অমৃত আহরণ করা সম্ভবপর হইত না। তিনি ছিলেন প্রকৃতই ধর্ম্মসঙ্গিনী।

আত্মসমর্পণ-যোগের প্রকরণ নাই—এইজন্য এই যোগের পথ যেমন সহজ, আবার তেমনই দুর্গম। বিধি-নিষেধের বালাই নাই বলিয়া ইহা সহজ মনে হয়। কিন্তু বিধি-নিষেধ না থাকায়, প্রতি পদে ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কাও অত্যন্ত অধিক। সতর্ক অথবা অসতর্ক সকল অবস্থাচক্রেই অতি ক্ষুদ্র-ঘটনাও বীভৎস রূপ ধরে। তাই এ পথ বড় দুর্গম, বড় বিপজ্জনক। এ পথে বিশ্বাস চাই, ধৈর্য্য চাই ; সব চেয়ে বড় কথা, সাহস চাই। শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, অমনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। কলুষপূর্ণ ক্ষেত্রে মন বিচরণ করে, ভয়ে বিহ্বল হই। অপযশের ক্লেদে ডুবিয়া যাই—প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। অজ্ঞান হইলেও, এ পথে বিপদ্ ; জ্ঞানী হইয়াও পরিত্রাণ নাই। বিচারেও ঈশ্বর মিলে না ; আবার নির্ব্বিচারে চলিলেই যে ঈশ্বর হাত ধরিয়া লইয়া চলেন, এরূপও নহে। নির্ভীক কণ্ঠে বলিতে হইবে—এ পথের সহায় একমাত্র ভগবান্। যেমন পঞ্চবটীর মূলে বসিলেই সকলের ভাগ্যে সিদ্ধি মিলে না, তেমনই আত্মসমর্পণ-যোগ আশ্রয় করিলেই আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হয় না। এই যোগ সাধ্য নহে। তাই দানে, তপস্যায়, ক্রিয়ায় ইহা সিদ্ধ হয় না। "আমায় কৃপা কর" বলিয়া

যে জন্ম-জন্মান্তরের আত্মোৎসর্গের চেতনায় ঈশ্বর-কৃপার পাত্র হইতে পারিয়াছে, সেই এই ঈশ্বরপ্রসাদের অধিকারী হয়। আমি আজিও এই যোগমহিমার কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করি। কৃপা পাই আর নাই পাই, কৃপার ভিখারী যে আমি, এই আ-নতির মধ্যে যে প্রসন্নতা, তাহার মধ্যেই যে তৃপ্তি ও আনন্দ, তাহা ভাষায় বুঝান যায় না।

স্বচ্ছন্দ অবকাশের যুগ, ঈশ্বরকৃপা বৈকি! কোন দায় যখন নাই, তখন মানুষ কি নিশ্চিন্ত হয়? আমি বলি—না। মানুষ যখন চিন্তা ছাড়ে, ঈশ্বর সুরু করেন চিন্তা এই মস্তিষ্ক-যন্ত্রের আশ্রয়ে। নূতন মেধার গঠন তাহাতেই। ধৃতি কি সাধনায় হয়? উহা ঈশ্বরস্পর্শেরই অপার্থিব গুণ। কিন্তু এই সকল কথা এই ক্ষেত্রের নয়। আমি বলিতেছি সেই সাধনযুগের কথা। কখন আমি আর কখন তুমি, এই লইয়া কোন্দল চলিয়াছে। তোমার-আমার সম্বন্ধ-পরিচয় পাই না বিচারে, পাই শান্তি ও আনন্দে। যখন আমি, তখনই বিষ, তখনই যন্ত্রণা। এই পথে দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু অসাধারণ সহিষ্ণুতাগুণও সহায়রূপে এই পথেই মিলে।

কথা বলি; যাহারা শুনে, তাহাদের আমি চিনি। কিন্তু এই চক্ষের তারকায় বুঝি আর এক প্রস্থ দর্শন-শক্তি আছে, যাহা অশরীরী রূপ অথবা সূক্ষ্ম অপরিচিত আবির্ভাব দর্শন করে। যাহারা পরিচিত, দলে-দলে তাহারা সম্মুখে বসিয়া আছে। অকস্মাৎ লক্ষ্যে পড়ে এই অপরিসর প্রাঙ্গণে অসংখ্য মানুষের ভীড়। স্থানের পরিমাণে এই ভীড়ের সঙ্কুলান অসম্ভব। দৃষ্টিভ্রান্তি বলিব! কিন্তু এমন দর্শন বার-বার হইয়াছে। দুইজন পরিচিত প্রত্যক্ষ বন্ধুর সঙ্গে অসংখ্য অপরিচিত অশরীরী সঙ্গীর সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়াছি। গৃহ-মধ্যে কেহ নাই। কিন্তু অকস্মাৎ দেখি—পাশে-পাশে অনেকগুলি ছায়ামূর্ত্তি ধ্যাননিরত। মূর্ত্তিগুলি পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইতাম না, ছায়ার মত সব ভাসিয়া বেড়াইত। আমি চক্ষের ব্যাধি মনে করিয়া বার-বার চক্ষুঃ মার্জ্জনা করিতাম। বার-বার সেই প্রকারের মূর্ত্তিই দর্শন করিতাম। এই অবস্থায় মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটা অসম্ভব নহে।

সেই অবস্থায় আর একটি অস্বাভাবিক দর্শনের কথা বলিব। ঘটনাগুলি অপ্রামাণিক হইবে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ-জগৎটা অতীত হইলে। তাই প্রত্যক্ষ-দর্শীদের জীবন-কালেই কথাগুলি বলা ভাল। আত্মসমর্পণের সাধনায়

এইরূপ একটা অবস্থায় আমায় আসিতে হইয়াছিল। তাহার পরিচয়টুকু রাখিবার জন্যই কয়েকটা কথার অবতারণা করিতেছি।

জীবন-মৃত্যু, এই দুইয়ের মধ্যে সেদিন সেতু রচনা করিতে পারি নাই। জীবনের সহিত মরণের যুক্তি-কল্পনা বাতুলের মনে হইত। কিন্তু মরণ আজ জীবনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে; সে কথা পরে বলিব।

যে সকল তরুণ যুগপ্লাবনে আমার নিকট উপনীত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নলিনচন্দ্র রক্ষিত অন্যতম। নলিনচন্দ্র কিশোর বয়স হইতেই আমার প্রতি অনুরক্ত ছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সে মস্তেশ্বর গ্রামে গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারিরূপে প্রেরিত হয়। দুর্জ্জয় ম্যালেরিয়া-রোগে জর্জ্জরিত দেহে সে বাড়ী ফিরিয়া আসে। সেই কাল-ব্যাধির হস্ত হইতে সে মুক্তি পাইল না। দিবারাত্রি তার সেবা করিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তুমি বাঁচিবে কি?" সে বলিয়াছিল "আমি যোগী, আমার মরিতেই ইচ্ছা।" এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য—সে আমার মুখেই শুনিয়াছিল যে, যোগীর ইচ্ছামৃত্যুই হয়। নলিনচন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সজ্ঞানে ছিল। সে উজ্জ্বল আলো দেখিতে-দেখিতে মহাপ্রয়াণ করিল। আমার বুকে মাথা রাখিয়া সে বলিয়া গেল "আবার আসিব, নূতন শরীর, নূতন উৎসাহ আনিব।"

তিন দিন আমি নলিনের চিন্তায় অবহিত রহিলাম। নলিন মৃত্যুকালেও বলিল "আবার আসিব"; মরণে পর এই চেতনা কি রক্ষা করা যায়? মৃত্যুর পর আর কি কাহারও অস্তিত্ব থাকে? এমনই সংশয়ে চিত্ত আমার অভিভূত হইয়াছিল। অতীন্দ্রিয় জগতের সহিত আমার এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়, নলিনচন্দ্র সেখানে কোথায়? সবই কি কল্পনা? মনে এমনই চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছিল, পড়িতেছিল।

সন্ধ্যার পর মেজ-বৌয়ের বাড়ী গেলাম। দ্বিতলের দীর্ঘ বারান্দায় মিট্‌মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মেজ-বৌ কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। চক্ষু: চাহিয়া অথবা মুদিত করিয়াই থাকি, আমি যে বহু-জন-সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ চেতনা হইতে মুক্তি পাই না। আমি একা হইতে পারি না। হঠাৎ দেখি—দ্বিতলের অন্য প্রান্তে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নলিন আসিয়া দাঁড়াইল। তিন দিন পূর্ব্বে এই চক্ষু: তাহার নশ্বর

শরীর চিতাভস্মে পরিণত হইতে দেখিয়াছে। আজ নলিন পূর্ণাঙ্গ শরীর ধরিয়া সম্মুখে উপস্থিত। শুধু তাই নহে, সে এক-পা, এক-পা করিয়া আমার দিকেই আগাইয়া আসে। হয়তো চক্ষের ভ্রম; কিন্তু সে এত কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, বিস্ময় আতঙ্করূপে আমায় বিহ্বল করিল। আমি বিকট চীৎকার করিয়া নলিনের নাম উচ্চারণ করিলাম। আমার উচ্চগ্রাম কণ্ঠস্বরে নিকটবর্ত্তী অনেকেই চমকিয়া উঠিল। একটা অস্বাভাবিক ঘটনাঘাতে হৃদয় তখনও দুরু-দুরু কাঁপিতেছিল, কিন্তু নলিনচন্দ্র নাই!

এই ঘটনা আমার স্ত্রীর নিকট সমাদর পাইল না। তিনি বলিলেন "তোমার কাজে থাকাই ভাল। সারা জীবন দেখিতেছি—কাজ হইতে অবসর পাইলেই একটা-না-একটা কাণ্ড বাধাইয়া তোল।"

অতীত যুগে বাউল, কর্ত্তাভজার দলে পড়িয়া আমি যাহা করিতাম, তিনি সেই সব কথা তুলিলেন। তিনি আমায় গোলার কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমারও মনে হইল—অলস মস্তিষ্কে এই সব অপ্রাকৃত-ঘটনাই ঘটে। কর্ম্মেই আত্মনিয়োগ করিব। কিন্তু আমার মালিক যে আমি নহি; আমি যাহা মনে করিব, তাহা হইবে কেন? আত্মহারা পথিক—দিশারী লইয়া চলিয়াছেন যে পথে, আমার তো উহা হইতে বিমুখ হইবার সাধ্য নাই! অবশ শরীর-মন লইয়া বরং প্রেতক্রীড়া ছিল ভাল। অতঃপর মানুষের হস্তে উহা ক্রীড়ণক হইয়া আমায় নাস্তানাবুদ করিল।

যোগ বলিতে ষট্‌চক্র-ভেদের কথা উঠে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আর দ্বিদল, এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তি সহস্রারে পৌঁছিলে জীবের সমাধি হয়। ধর্ম্মামৃত ও আনন্দলাভের ইহাই চিরপ্রচলিত পথ। এই পথ লক্ষ্যে রাখিয়া সাধন সুরু হইয়াছিল গোড়ায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের নিকট শিক্ষালাভের পর, প্রাচীন চক্রগুলি সম্বন্ধে আধুনিক গুরুর ভাষায় ও সংস্কারে নূতন জ্ঞানালোকপাত হইল। মেরুদণ্ডের শেষাংশ মূলাধার নামে শাস্ত্র-কথিত; সমস্ত জড় দেহটা হইল মূল আশ্রয়কেন্দ্র, এবং এই আধার আশ্রয় করিয়া স্বাধিষ্ঠানে প্রাণশক্তি, মণিপুরে চিত্তবৃত্তি, অনাহতে হৃদয়, বিশুদ্ধ চক্রে বুদ্ধিবৃত্তি ও দ্বিদলে জ্ঞানভূমির চৈতন্যকেন্দ্র অবস্থিত। এইগুলি ঈশ্বরের শরণে যেমন-যেমন দোষমুক্ত হয়, জীবনপ্রকাশ তদনুরূপা বিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহ ধরে। এইগুলিকেই আমি করণরূপে উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের হাতে তুলিয়া দিতে একাগ্র হইলাম। শরীরের উপর আসক্তি দূর করার জন্য এক প্রকার যথেচ্ছাচারী হইলাম। প্রাণ হিতাহিতবোধের বন্ধমুক্ত হইল। চিত্ত ও মন পূর্ব্বের বিচার-সংস্কার হারাইল। বুদ্ধির কর্ম্ম হইল—পূর্ব্বোক্ত করণগুলি অতীতের ন্যায় অহংযুক্ত অথবা ঈশ্বরযুক্ত হইয়া চলিতেছে, তাহাই অবধারণ করা। বুদ্ধিযন্ত্রকে জ্ঞানানুগত করার যে নিরন্তর-প্রেরণা, উহাই ঈশ্বরপ্রসাদরূপে সাধনজীবনের উৎসাহ ও আনন্দ।

আমি যেন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িলাম। এক 'আমি' বলে—"এরূপ হইলে, অনাচারী হইয়া পড়িব; অতি গর্হিত কর্ম্ম ঈশ্বরকৃত বলিয়া স্বীকার করিতেও বাধিবে না।" অন্য 'আমি' বলে—"ভাল-মন্দের বিচার মানবশাস্ত্র, উহা ঈশ্বরবিধান নহে। যাহা কিছু হইবে, ভাল অথবা মন্দ, সবই ঈশ্বর-কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ চেতনায় দীর্ঘদিন চলার পর ঈশ্বরচৈতন্য ঘনীভূত হইয়া দ্বন্দ্ব দূর করিবে।" ঘটনার উল্লেখ না করিলে, বিষয়টা স্পষ্ট হইবে না। স্নানের সময় হইল, কিন্তু স্নান করিবে কে? আমি? না ভগবান্? পূর্ব্বের ন্যায় স্নানের সময়ে স্নান করিব, ভোজনের সময়ে

ভোজন করিব, তবে আর প্রাণ, মন, দেহ ঈশ্বরে নির্ভর করিল কৈ? এক 'আমি'র এই চিন্তা। অন্য 'আমি' বলে—"ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, অতএব ঈশ্বর ভৃত্যের ন্যায় তোমায় স্নান করাইবেন, খাওয়াইবেন, ইহা দুর্ব্বুদ্ধি নহে কি?" এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে বিস্ফারিত নেত্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমি; মূর্ত্তিমতী দয়া উপস্থিত হইয়া দ্বন্দ্বের দায় হইতে মুক্তি দিত। দেখিতাম—স্নানের সময় অতিক্রান্ত হয় দেখিয়া, তাড়ার পর তাড়া দিয়া, গৃহদেবী শেষে বিরক্তচিত্তে চারুহস্তে স্বয়ং আমার সর্ব্বাঙ্গ তৈলসিক্ত করিতেন। ইহা কেমন ধর্ম্ম, এ প্রশ্ন আমার নাই। যদি এমনটি না হইত, তাহা হইলেও যে কোন অবস্থা বরণ করিয়া লওয়ার মত ধৈর্য্য ও বিশ্বাস আমার ছিল। আমার কাছে ভগবান্ প্রেম ও সেবার মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিতেন বলিয়াই সকলের পক্ষে এই সুবিধা নাও হইতে পারে। আত্মসমর্পণযোগীকে সর্ব্বপ্রকার অবস্থাই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। শরীরের দিক্ দিয়া নির্ভরতার সাধনায় হয়তো ভগবানের প্রসন্নমূর্ত্তি অনুভূত হইত; মনের ক্ষেত্রে এই নির্ভরতাই আবার রুদ্রকে অনেক সময়ে ডাকিয়া আনিয়াছে। এইজন্য আত্মসমর্পণের সাধক সুখ অথবা দুঃখ কোনটীই লক্ষ্যে রাখে না। যাহা ঘটে, তাহাই ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। দীর্ঘ দিনের সাধনায় জীবনে একটা নূতন ছন্দঃ আবিষ্কৃত হয়। অন্যের চক্ষে আত্মসমর্পণযোগীর জীবন সাধারণ কর্ম্মনীতি-নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে হইলেও, সাধক সর্ব্বকর্ম্মে এক অপ্রাকৃত তৃতীয় হস্তের সঙ্কেত ধরিয়াই চলে। অন্যের ন্যায় সেও ভূপৃষ্ঠে চরণ চালন করে বটে; কিন্তু সাধকের চলার মধ্যে যে চেতনা, তাহা ঈশ্বরচেতনা, সঙ্কীর্ণ অহং-চেতনা নহে। আত্মসমর্পণযোগীর প্রতি শ্বাসটীও আপনার ইচ্ছায় বহে না; ঈশ্বরচেতনার সহিত ইহা যেন সংজড়িত। জীবনের সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া চলে। এ চেতনা রক্ষা না করিলে জীবন যে অচল হয়, তাহা নহে। তবে আত্মসমর্পণযোগীর সমস্ত জীবনটাই ঈশ্বরযুক্তির সাধনা বলিয়া তাহাকে রামপ্রসাদের ন্যায় বলিতে হয়:

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করি মাকে ধ্যান,
নগর ফিরি, মনে করি প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।"

আত্মসমর্পণযোগীর ইহাই সাধনা। দেহেন্দ্রিয়, মনপ্রাণ স্বভাবনিয়ন্ত্রিত হইয়াই চলে; কিন্তু স্মরণে রাখিতে হয়—সবই ঈশ্বরকৃত। যাহার এই

চেতনা যত নিরন্তরা, সে তত এই সাধনার নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধি করে। শক্তি-সাধকের গানের ভাষাতেই বলি :

"সে না যায় তীর্থপর্য্যটনে,
কালী কথা বিনা না শোনে কাণে,
সন্ধ্যা, পূজা, কিছুই না মানে—
যা' করেন কালী, এই সে জানে।"

এই অবস্থায় চলিয়াছি। একদিকে আমার যোগের প্রবাহ, আর অন্যদিকে ঈশ্বরের দয়া নামিয়া আসিতেছে আমার স্বকীয়ায়—ভগবান্ যেন এক ঢিলে দুইটী পাখী মারিতেছিলেন।

তিনি চালান, আমি চলি। তিনি কথা বলান, আমি বলি। তিনি লিখান, আমি লিখি। তিনি স্নানাহারাদি করান, তাই স্নানাহারাদি হয়। সব কাজই যে অপরের সাহায্যে হয়, তাহাও নহে; নিজের হস্ত-পদাদিও ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া চলে, ফিরে। এমন দিনও হয়, হাত-মুখ প্রক্ষালন করা হয় না, বাসিমুখেই দিন যায়। এমন দুই-তিন দিন পরে দন্তগুলি একান্ত অপরিচ্ছন্ন দেখিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ইহাই হইল মুখপ্রক্ষালনের সঙ্কেত। এমনই জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি কর্ম্মেও তৃতীয় হস্তের সঙ্কেত পাইবার জন্য বিস্ফারিত নয়নে বসিয়া থাকিতাম, উৎকর্ণ থাকিতাম।

প্রাঙ্গণে শীতের দিনে বসিয়া আছি, অঙ্গে নূতন শীতবস্ত্র। ভিখারী আসিয়া উহা চাহিয়া বসিল। ভিখারীর কণ্ঠে ঈশ্বরের দাবী, উহা সে অবাধেই লইয়া গেল। আমি তিরস্কৃত হইলাম। মনে হইল—সর্প হইয়া দংশন, ওঝা হইয়া ঝাড়ন, কথাটা মিথ্যা নহে। এমন করিয়া আত্মসমর্পণের সাধনার জ্ঞান-সঞ্চয় হইতেছিল।

সে এক জ্যোৎস্না-রাত্রি। গঙ্গাতীরে দলবল লইয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। কত গান, কত কথা, কত হাসি, সে কত আনন্দ ইয়ত্তা করিতে পারি না! গৃহে ফিরিব, দুয়ার আমার চিরমুক্ত; কখন ভগবান্ কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া অতিথি হইবেন, কে জানে? ঘরে গিয়া দেখিলাম—ধর্ম্ম-সঙ্গিনী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। বাহিরের আকাশে ফিন্‌কি দিয়া চাঁদের ধারা ঝরিতেছে। বাতাসে মগন্ধ ধুভাসিয়া আসিতেছে। গৃহ হইতে

বাহির হইলাম। সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণ—জ্যোৎস্নাবিধৌত হইয়া অপরূপা শ্রী ধরিয়াছে। দালানের থাম দুটার কালো ছায়া পরিষ্কৃত মেঝের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। চিত্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। দালানে উঠিয়া বসিলাম। সম্মুখের গৃহের ছাদ ছাড়াইয়া একটী আম্রবৃক্ষের শাখা-পল্লব চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া হেলিতেছিল, দুলিতেছিল, মাথা নাড়িতেছিল। কথা তাহার অব্যক্ত। তবুও তাহা ফুরায় না। আমি অপলক-দৃষ্টিতে তাহার বক্তব্য উপলব্ধিগম্য করিতেছিলাম; সবিস্ময়ে দেখিলাম—প্রাঙ্গণে সেই পূর্ব্বোক্তা পল্লীবধূ যেন অভিসারিকার বেশে ধীর পদসঞ্চারে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবার মনে হইল—ইহা প্রেতলীলা। কিন্তু প্রেতের এমন সঘন শ্বাসপ্রশ্বাস শব্দময় হইয়া বহিবে কেন? বুঝিতে বাকী রহিল না—মূর্ত্তি রক্তমাংসময়ী। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। নিঃসঙ্কোচে চাহিলাম। চাহিবার মানা নাই; বুঝি সমর্থন ছিল ভগবানের, তাই তো চাহিলাম! নির্দ্বন্দ্বে চাহিলাম। চারি চক্ষুঃ যেন এক হইয়া গেল। মানুষের হিয়ায় যে অনুরাগ জমাট হইয়া থাকে, তাহাই বুঝি চক্ষের দীপ্তি হইয়া তাহাকে এমন মাতাল করিয়া তুলে। চাহিয়া-চাহিয়া সে যে কত তৃপ্তি, তাহা বলিতে পারি না!

কথা বলিলেন তিনি ধীরে-ধীরে। সে স্বরে কত যে আকুতি, তাহা প্রকাশ করার ভাষা নাই। সে মিনতির সুর উপেক্ষা করিলেন না আমার ভগবান্। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম; তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন, আজ আমার উৎসব।"

কোথায় যাইব? আমার হাতখানি তাহাকে ধরিতে দিল কে? ভগবান্ নহেন কি? কিন্তু আমি নিষ্পন্দ পুত্তলিকা-যন্ত্র। আমার চক্ষের সম্মুখে শয়নকক্ষের মুক্ত বাতাস, দেবীর কি নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই? বাতায়ন-পথে দৃষ্টি রাখিলেই তিনি দেখিবেন—এই নীথর নিশীথে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অলিন্দে এক কুলনারী আমার হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে। আমি অসহায়; চরণ যদি চলে, বাধা দিবার অধিকার তো আমার নাই!

কু-কর্ম্ম করিতেছি? কৈ না! কামনা নাই, লালসা নাই, বাঞ্ছা নাই। ঐ আম্রশাখার মর্ম্মকথা শুনিতেছিলাম; নয়ন এখন পুলকিত হইয়া উঠিতেছে

—এই অপ্রত্যাশিতা নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া। আবার আকুল কণ্ঠ—"আসুন, আমি কত রাত্রি সুযোগের প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছি। আজ সুযোগ আসিয়াছে—।"

কথার উত্তর দিবার ভরসা পাইলাম না। উত্তর দিলাম না। আমার হাত ছাড়িয়া তিনি আবার বলিলেন "আসুন।" তিনি আগাইলেন। আমি যন্ত্রচালিতের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

গলিপথ শেষ হইল। হতজ্ঞান নহি। দ্বন্দ্ব তো আসে না! ঈশ্বরের প্রাণ, সে প্রাণ এই অগ্নিপরীক্ষায় ঈশ্বরই তো রক্ষা করিবেন! আমি মুক্ত-স্বচ্ছ দেহ-মন লইয়া সেই গভীর রাত্রে চোরের ন্যায় পরগৃহে প্রবেশ করিলাম। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—সম্মুখের দ্বিতল কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। ধূপ-ধূনার গন্ধে ঘর পুলকিত। কেহ জাগিয়া নাই। চিত্ত বিস্ময়পূর্ণ হইল।

এইবার বলিলাম "আমায় কোথায় লইয়া যাইতে চাও?"

তিনি বলিলেন "আমার ঘরে।"

আমি বলিলাম "তোমার স্বামী?"

তিনি বলিলেন "তিনি ভিন্ন ঘরে গভীর নিদ্রায়।" আমার চমক হইল! এক 'আমি' বলিয়া উঠিল—"ঈশ্বর-নির্ভরতা কোথায় আনিয়াছে, অনুধাবন কর।" অন্য 'আমি' বলিল, "যাহা হয়, সবই ঈশ্বরকর্ম্ম। কোন কর্ম্ম অশুভ নহে, অকল্যাণ নহে।" এতক্ষণ দ্বন্দ্ব ছিল না। অন্তরে দ্বন্দ্বের ঝড় উঠিতেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইল। দেখিলাম—মূর্ত্তি মানবীর বটে এবং তাহার আকৃতি কাপট্যশূন্যা; কিন্তু হৃদয়াবেগ তাহাকেও প্রগল্‌ভা করিয়াছে, আর তার আকিঞ্চনের প্রতি আমার হৃদয়ের নমনীয়তা কর্ত্তব্যের সীমা রক্ষা করে নাই। সে এক পর-নারীর বাঞ্ছাপূর্ত্তির অনুসরণে আমায় এক জটিলতর সমস্যা-জালে জড়াইয়া দিতে চাহে। আমি এতক্ষণ এই মহিলার হস্তে যন্ত্রচালিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা অন্তর-যন্ত্র কে যেন বিপরীতমুখী করিয়া ধরিল। আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম "তোমার স্বামী কিছু জানেন না? তাঁহাকে লুকাইয়া আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছ?"

কথা শুনিয়া তিনি হাসিলেন। হাসির মধ্যে ভাষা ছিল, সে ভাষা আমাকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিল—স্বামীকে জানাইয়া নারী আর কাহাকেও

ভালবাসে না। আর তাহাই যদি হইবে, তবে এই গভীর রাত্রে অভিসারিকার বেশে তোমার নিকট উপনীতা হইব কেন?

আমি কিন্তু অস্থির হইয়া উঠিলাম। ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। মহিলাটী আমার হাত জোর করিয়া ধরিলেন। এক প্রকার টানাটানি সুরু হইল। তিনি বলিবার চেষ্টা করিলেন—কোন মন্দ অভিসন্ধি তাঁহার নাই। বড় সাধ করিয়া ঘরে তিনি আসন বিছাইয়াছেন, একবার সেখানে যাইতেই হইবে। আমার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। এক প্রকার তাঁহার হাত ছিনাইয়া আমি প্রস্থান করিলাম। তিনি ভিখারিণীর ন্যায় আমার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত আসিলেন। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে তাঁহার ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছিল। আমি সেদিকে মুখ না ফিরাইয়া, একেবারে শয্যাগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জীবনের এই এতখানি অভিনয় যে 'আমি' ঈশ্বরের বলিয়া স্বীকার করিল না, সে-ই আজ জয়ী হইল! অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল! কৈ, ভগবান্ আজ আমায় রক্ষা করিলেন না! বিজয়ী 'আমি' বলিয়া উঠিল—ঈশ্বরই রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা অনর্থ আরও বাধিত। অন্তরে ঝড় বহিতেছিল। শয্যোপরি প্রশান্তা স্বর্ণকমলিনী নিদ্রাভিভূতা। এই নীরব নিশীথে কি যন্ত্রণা-কণ্টকিত পথে গতি আমার; কৈ দেবি, তুমি তো তাহা অনুভব কর না! অন্তরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিল, সে কত বিচিত্র প্রশ্ন! সে সকল প্রশ্নের উত্তর নাই। জীবনের অঙ্ক যত ভুল করি, উহা বার বার নির্ভুল করার তাগিদ নিরস্ত হয় না। কত ব্যথা সহিয়া যে দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ-মন ঈশ্বরযুক্তি পায়, সেদিন তাহা কি বুঝিয়াছি! কবি সত্যই বলিয়াছেন—আঘাতের পর আঘাত দিয়াই যন্ত্রী যন্ত্র বাঁধিয়া লয়। সে আঘাত অনেক সময়ে স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যন্ত্রীরই উহা যন্ত্র-শোধনের জন্য উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নিষ্ঠুর আঘাত; এতদিনে তাহা বুঝিয়াছি। এক্ষণে সেদিনের আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়া অন্যকে অকারণে কত যে পীড়িত করিয়াছি, তাহাই বলিব। হিন্দুশাস্ত্রে বলে—পতির অনর্থ পত্নীকে বহিতে হয়! পত্নীর অনর্থ পুরুষ কেন বহন করিবে না? নারীকে এ জাতি এমন হীন চক্ষে দেখে নাই। ভারতের নারী সতীমূর্ত্তি—আকাশের অকলঙ্ক চন্দ্র-প্রতিমা।

অন্য দিনের ন্যায় সেদিনও প্রভাত যথাসময়ে আসিল। ভোরে উঠিয়া গৃহদেবীর অজ্ঞাতে যদি বাহির হইয়া যাইতাম, সেদিন তাঁর মুখে হাসি ও কথা, দুই-ই থাকিত না। আমারও দম বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইত। সারা দিনের কর্ম্মে তিনিও শৃঙ্খলাবক্ষা করিতে পারিতেন না। তাহার কারণ বলিবার মত কথা নহে; না বলিলেও, তাঁহার মৌন নীরব চরিত্রটী অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যায়। কথা আর কিছু নহে, রাত্রির অন্ধকার অপসারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বে আলোর ঝরণা যখন প্রথম নামিয়া আসিত, তাঁহারও দিবারম্ভের প্রথম দৃষ্টিটী আমাকেই অভিষিক্ত করিত। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার জীবননীতির অন্তর্গত এই ব্রতটী তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল।

যদি এমন হইত, ঔদাসীন্য অথবা কোন জরুরী কর্ম্মবশতঃ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে আমায় বাহির হইতে হইয়াছে, তাহার জন্য নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার-করা-রূপ শাস্তি লইতে হইত। আমার এই অপরাধের জন্য তিনিই কিন্তু অধিক শাস্তি সহিতেন; কেন-না, প্রতিদিন প্রভাতে আমাকে না দেখিয়া অন্য কিছুব দিকে তিনি চাহিবেন না, ইহা ছিল তাঁর আত্মকৃত ব্রত। এই ব্রত ভঙ্গ না হওয়ার জন্য এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া গৃহমধ্যে অনেক বেলা পর্য্যন্ত নত শিরে পায়চারী করিতে দেখিয়াছি। গৃহকর্ম্ম অধিক বেলা পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকার জন্য তাঁহার ক্ষোভ ও রোষ, দুইই হইত; কিন্তু আমি যখন সলজ্জ কণ্ঠে আমার ঔদাসীন্যের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতাম, তিনি কখন-কখন সজল নীরব নয়নে ঘরের বাহিরে গিয়া বহুক্ষণ পূর্ব্বে যে কর্ম্ম সাধ্য ছিল, তাড়াতাড়ি তাহা সারিবার জন্য প্রচেষ্টা করিতেন, কখনও বা বিষণ্ণা হইয়া বলিতেন—"এমন হয় কেন? আমারই বা এমন অসঙ্গত জিদ্ কেন? অপরাধী তুমি নহ, আমি।"

এ অনুতাপ অভিমানপ্রসূত। এই ব্রত লইয়া চোর-দায়ে ধরা পড়ার ন্যায় দায়ী যে শুধু তিনি নহেন, তাঁর এই পবিত্র ব্রতরক্ষার জন্য স্বামীরও যে একটা দায়িত্ব আছে, এ কথা তিনি খোলসা করিয়া না বলিলেও, তাঁর আচরণে ও বাক্যে এই ভাবটাই আমায় পীড়িত করিত। ক্রমে যত প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করি, তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় ললাটে করস্পর্শ করিয়া

আমি যে বাহিরে যাইতেছি, এই কথা বলা অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তিনিও নিদ্রা-নিমীলিত আঁখি ধীরে উন্মীলিত করিয়া প্রতি প্রভাতে দৃষ্টিসুধাবর্ষণে আমার মধ্যে নবশক্তি সঞ্চার করিতেন। তাঁহার নয়নে নিষ্ঠাপ্রীতির নির্ঝর ঝরিত। অন্তরের বন্ধন প্রতিদিনই দৃঢ় হইত। নিঃসঙ্গ পতি-পত্নীর প্রেমের সম্বন্ধ অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে নূতন মূর্ত্তি ধরিতেছিল। দেহভোগের বহু দূরে দাঁড়াইয়া শুধু বাণী আর নয়নের দৃষ্টি অমৃতের ন্যায় উপভোগ্য ছিল। কিন্তু পূর্ব্ব-রাত্রির ঘটনায় হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আজ আর প্রভাতের প্রথম আলো সহ্য করিতে পারিলাম না। তাঁহার ললাট স্পর্শ করিয়া প্রতি দিনের ন্যায় আজিও তাঁহাকে অভিনন্দিত করার সাহস হইল না। এক প্রকার তাঁহাকে এড়াইবার জন্যই বাহির হইয়া পড়িলাম।

আজিকার ব্যবহার খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রাত্যহিক কর্ম্মে কোন বিশেষ ঘটনা না হইলে, সহজে ব্যত্যয় হইত না। চিরদিনই আমার জীবন নিয়মবদ্ধ হইয়াই চলিয়াছে; এবং সেই নিয়ম রক্ষা করার জন্য গৃহদেবীরও যত্নের সীমা ছিল না। আত্মসমর্পণের সাধন যে জমিয়া উঠিতেছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার সহযোগিতা কম ছিল না।

বহুক্ষণ বাহিরে থাকা সম্ভবপর হইল না। গৃহে ফিরিয়া এই অবস্থায় যাহা হয়, তাহাই দেখিলাম। গৃহের দুয়ার বন্ধ। অতি প্রত্যূষে প্রতিদিন গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কৃত হয়, আজ তাহা হয় নাই। রাত্রির পর্য্যুষিত খাদ্যদ্রব্য লইয়া বায়সেরা উৎসব আরম্ভ করিয়াছে। অনেকেই মনে করিয়াছে—হয়-তো ছোট-বৌ অসুস্থা হইয়া পড়িয়াছে, ইতস্ততঃ পরিবারমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ কাণাঘুষাও চলিয়াছে। এই অবস্থায় আমি মুক্ত বাতায়নপথে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দুয়ার খুলিয়া কাজে লাগিলেন। সকলেই বুঝিল—ছোট-বৌ অসুস্থা নহে, একার সংসার—নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে।

আমার স্বস্তি ছিল না। গুরুতর দ্বন্দ্বে বুকে ঢেঁকির পাড় পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল—ইহা কি সাধনা? যাহা কিছু হয়, ভগবান্ কি তার জন্য দায়ী? যদি তাহাই হইবে, তবে অনুশোচনা কেন? ইহা মনের দুর্ব্বলতা বলিব কি? কিন্তু বিবেক তো তাহাতে সায় দেয় না! সকালের অপরাধ

এক কথায় মিটিয়া যাইত ; কিন্তু ভোরে তাঁহাকে না জানাইয়া, বাহির হইয়া যাওয়াটাই তো অপরাধ নহে ! পূর্ব্ব-রাত্রির ঘটনা যদি অপরাধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সে বড় গুরুতর অপরাধ।

সারা দিন মনে ঝড় বহিল। গৃহদেবী প্রথমটা ক্ষোভে, অভিমানে নীরবতাই শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার গাম্ভীর্য্যের মাত্রা গুরুতর দেখিয়া, তিনি দুশ্চিন্তাকাতরা হইলেন। অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত পুনঃ-পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"তোমার কি হইয়াছে ?" তাঁর অভিমান করাটাই যেন অপরাধের বলিয়া তিনি তাহার জন্য মার্জ্জনা চাহিতে লাগিলেন। আমার যদি বাধা হয়, এমন ব্রত তিনি ছাড়িয়া দিবেন, এ কথাও তিনি জানাইলেন। স্বার্থপর পুরুষ—নারী তাহার মুখ চাহিয়া থাকিবে, অনুগ্রহ-প্রার্থিনী হইবে, এ সুখের অধিকার সে ছাড়িবে কেন ? পত্নীর পতি-নিষ্ঠা অন্তরে যে গৌরববোধ জাগ্রৎ করে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে কোন পুরুষই চাহে না। নারীর একপতিত্বের আদর্শ নারী অপেক্ষা পুরুষকে অধিক জয়ী করে। পুরুষের একপত্নীত্বের দাবী ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু কয়জন পুরুষ একনিষ্ঠ পত্নী-প্রীতি রক্ষা করে ?

নারীর স্বভাব আমি যতদূর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হইয়াছে—নারীর আশ্রয়-তত্ত্বে চিত্তের যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা, পুরুষ তাহার প্রতিদান দিতে অনেক সময়েই সমর্থ হয় না ; ক্ষত-বিক্ষত নারীহৃদয় ঐকান্তিক চিত্তে আত্মনিবেদন করিয়া শেষ হয়। পুরুষের চিত্ত এরূপ একাগ্র নহে। উচ্ছৃ-প্রবৃত্তির দায় না থাকিলেও, ধর্ম্ম ও আদর্শের দায়েও সে হয় উন্মার্গগামী। গার্হস্থ্যজীবনে শান্তি ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা এইজন্যই ক্ষুণ্ণ হয়। পতি-পত্নী যদি একাগ্রচিত্ত হইয়া পরস্পরকে ভজনা করিত, এই দুঃখের সংসার-সমুদ্রে অমৃত উথলিয়া উঠিত।

আমার রক্ত-মাংসের ক্ষুধা ছিল না। আবাল্য নৈষ্ঠিক আত্মসাধনে উচ্ছৃ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার স্বভাব হইতে ক্রমে মুক্তি পাইয়াছিলাম। হৃদয়কে আপাত পাপ হইতে বিরত রাখার সাধ্যলাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই পাপ ছদ্মবেশ ধরিয়া যদি প্রেমের অপ্রাকৃত সম্বন্ধের আকৃতি প্রকাশ করিত, আমি আর আত্মস্থ থাকিতে পারিতাম না, বন্ধনহারা হইয়া এই ক্ষেত্রে হৃদয় আমার উধাও হইয়া ছুটিত। হৃদয়ের এই শৈথিল্যে ক্ষতির সঙ্গে লাভের সঞ্চয় কিছু

যে পাই নাই, তাহা নহে; কিন্তু এই পথে যে দুরারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরাময় করার জন্য নিজের অনেকখানি আয়ুঃ শেষ করিয়াছি; আমাকে যে অকপটে ভালবাসিয়াছে, তাহাকেও দুঃখ দিয়াছি। দুঃখের পাথারে আমি সাঁতার কাটিয়া পার হইয়াছি। অন্তে হয়তো ডুবিয়া মরিয়াছে! আত্মসমর্পণের নাম ও ভাব আমায় উদ্বুদ্ধ করিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিত। তাহার জন্য নিজের অন্তর্দ্দাহ সাধনার অঙ্গ বলিয়া সান্ত্বনালাভ করিতাম; কিন্তু অন্যের প্রতি ইহা অত্যাচার বলিয়া মনে হইলে স্থির থাকিতে পারিতাম না। আত্মবলি দিয়াও যদি সে ত্রুটির পরিশোধ হয়, তাহাতে বুঝি কুণ্ঠিত হইতাম না। দিবারাত্রি কেবল এই চিন্তাই হইল। সকলের অসাক্ষাৎ নির্জ্জন রাত্রে একজন কুলনারীর সঙ্কেতে ঈশ্বরের নামে আমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার বাড়ীতে উপনীত হইলাম—এই ঘটনা এই পর্য্যন্ত গিয়াই সমাপ্ত হইয়াছে। মূলে আর কোন উদ্দেশ্যই নাই। চরিত্রের এই খেয়াল যদি ঈশ্বর-কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে ইহা তো গোপন রাখার প্রয়োজন নাই। আবার ভাবি—নিজের জন্য এই প্রয়োজন থাকিতে না পারে, কিন্তু এ কথা প্রকাশ পাইলে, কুলাঙ্গনার লাঞ্ছনার যে সীমা থাকিবে না। অপরাধিনী সে যদি একাই হইত, কোন কথা ছিল না। কিন্তু আমিও তো তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছি। শাস্তির সবখানি এই অবস্থায় আমি মাথায় বহিতে চাহিলেও, তাহা সম্ভবপর হইবে না। দুই দিন কি যে অন্তর্দ্দাহ ভোগ করিলাম, তাহা মনে রাখিবার মত ঘটনা নিজেই সৃষ্টি করিয়াছিলাম। ঈশ্বরেরই চক্রান্ত; যন্ত্রকে যন্ত্রী এমনইভাবে বাঁধিয়া লইতেছিলেন। যন্ত্রী নির্ব্বিকার; কিন্তু যন্ত্র-চৈতন্যের দুঃখ অবর্ণনীয়।

সকল সাধনার একটা সার্ব্বজনীন বিধি ও পথ আছে। আমি যে যোগের পথে পা বাড়াইয়াছিলাম এবং অশেষ অশুদ্ধি ক্ষয় করিয়া আজ তাহাতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতে বলিতে পারি—এই সাধনা আধার-ভেদে ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দে চালিত হয়। একে অন্যের অভ্যুদয় ও শ্রেয়ঃ দেখিয়া যদি অন্যের পথ অনুসরণ করে, তবে তাহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। সমর্পণের মন্ত্র এক ও অদ্বয়। কিন্তু প্রকাশের ছন্দঃ প্রত্যেকের প্রকৃতিগত হইবে। এক যে ছন্দে সিদ্ধির পথে চলে, অন্যের ছন্দঃ তাহা হইতে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র ধরণের হইবে। সিদ্ধযোগী ভিন্ন আত্মসমর্পণের পথিককে কেহই আশা ও উৎসাহ দিতে পারে না।

আত্মসমর্পণযোগ দেহীর অধ্যাত্মসাধনা। বাহ্যতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান লক্ষিত না হইলেও, অন্তর্যোগের ছন্দঃটি সাধকের ব্যাপক জীবনকর্ম্মে প্রকাশিত হয়। অন্তর্দ্দর্শী আত্মসমর্পণযোগীর জীবন-রঙ্গ অন্যে ধরিতে পারে না।

যোগসিদ্ধ জীবনের যে সকল লক্ষণ প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে, আত্মসমর্পণযোগীর জীবনে তাহা অবধারিত ফলিবে। আত্মসমর্পণযোগীর সাধন বড় দুর্জ্ঞেয় সূত্র ধরিয়া পরিচালিত হয়। নিজের দৌর্ব্বল্য ঢাকিয়া রাখিবার যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হউক, উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আত্মসমর্পণযোগী সত্যকে গোপন রাখিতে পারে না। নিজের খ্যাতি ও সম্মান-রক্ষার জন্য তাহার কোনই সতর্কতা নাই, অধ্যবসায় নাই। ভগবানে অনন্যচিত্ত হওয়ার আকুল আগ্রহ যে ক্ষেত্রে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, প্রকৃতির জন্মার্জ্জিত অসংখ্য কদর্য্য সংস্কার তাহাতে পুড়িয়া ছাই হয়, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ন্যক্কারজনক সঞ্চিত প্রবৃত্তিপুঞ্জ বীভৎস-রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। সাধক চায় আত্মখ্যাতির আবরণে সব কিছু মানে-মানে মিটাইতে। কিন্তু আত্মসমর্পণের মন্ত্রশক্তি অহঙ্কারের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া যে স্তরের যে মূর্ত্তি, তাহা প্রকাশিত করিয়া দেয়। সাধক কখনও হতমান হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাথা নত করে, কখনও ঈশ্বরপ্রসাদে আনন্দবিগলিতচিত্ত হইয়া উন্নতশিরে ঈশ্বরের জয় দেয়। "উঠা-নামা প্রেমের তুফানে"—এ টান কোথায় লইয়া চলে, সাধনার কালে তাহার নিরাকরণ চলে না।

আমি ভাবিলাম—যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য নিশ্চয়ই আমি দায়ী নই। যখন ঈশ্বর দায়ী, তখন উহা অহিত কর্ম্ম কি হেতু হইবে? এবং তাহা ঘোষণা করিতেই বা দোষ কি? এই উক্তি কাহার? ঈশ্বরের—না অহঙ্কারের? এই দ্বন্দ্ব বিচার-বুদ্ধিতে যায় না। আমি এক অমোঘ তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছিলাম। আজও সেই তত্ত্ব অধিকতর তাৎপর্য্যময় হইয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে। এই তত্ত্ব হইতেছে—যাহা হয়, তাহা ঈশ্বরেচ্ছা না হইলে, হইতে পারে না। উহার নাম যদি পাপ ও অন্যায় হয়, তাহাও অনিবার্য্য জানিতে হইবে। কেন-না, ঈশ্বরের যন্ত্র কর্ম্মপ্রকাশ করিবেই; যন্ত্র যদি

অনির্ম্মল হয়, বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রকাশ কেমন করিয়া হইবে? আর বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত যন্ত্র কর্ম্ম বন্ধ করিয়া থাকিবে, এমনও হইতে পারে না। ঈশ্বরের হাতে ইহা চলিতে-চলিতেই বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রকাশের উপযোগী হইবে; অতএব যাহা হইয়াছে, তাহার কর্ত্তা ঈশ্বর। কর্ম্মের রূপ যন্ত্রের অশুদ্ধিতে হয়তো অশুদ্ধ কদর্য্য রূপ লইয়াছে। হৃদয়-দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তির উপায় —যাহা হইয়াছে, তাহা অন্ততঃ ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিয়া, যন্ত্রকে অনুশোচনার যাতনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে; নতুবা জীবনের স্বচ্ছতা থাকে না।

ঈশ্বরের নিকট ভাল-মন্দ নিবেদন তো নিত্য করা হয়, তাঁহার গ্রহণের কোন লক্ষণ তো অনুভূত হয় না! নিবেদনের মন্ত্রটা একটু উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে দোষ কি? এই আবৃত্তি কাহার কাছে করিব? নির্দ্দেশ সঙ্গে-সঙ্গেই পাইলাম। যাহাকে ভালবাস, যে তোমায় ভালবাসে—যাহাকে প্রত্যয় কর বা যে তোমায় প্রত্যয় করে, তাহারই কাছে। এমন মানুষ আমি তখন দুই জন পাইয়াছিলাম। অন্ততঃ আমার ইহাই মনে হইত। এক শ্রীঅরবিন্দ, আর এক আমার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীঅরবিন্দকে পরে বলিব— তিনি বহু দূরে। শ্রীমতীর কাছেই ঘোষণাটি করিয়া ফেলি। অন্তর্দ্দাহ সহ্য হইতেছিল না।

কথাটা বলি-বলি করিয়া দিনমান কাটিয়া গেল। শয়নকালে কথা পাড়িলাম। নানা কথার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিলাম। ইহার পরিণাম যে এতখানি হইবে, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। প্রথমটা তিনি সব কথাগুলি স্থিরভাবে শুনিয়া লইলেন। তারপর নিষ্ঠুর জেরা আরম্ভ হইল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রত্যাগমন-কাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক আমি বলিয়াছি কি-না, এই সংশয় তাঁহার জেরার মধ্যে নিহিত ছিল। আমি অকপটে সকল কথা বলা সত্ত্বেও, তিনি আমায় সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এত বড় গর্হিত কর্ম্ম আমি কেমন করিয়া করিতে পারি, এইভাবে তিনি জেরা করিতে-করিতে কটু ভর্ৎসনা শুরু করিলেন। তারপর তাঁহার অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতে লাগিল। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, তিনি নিজের বুকে বার-বার আঘাত করিতে লাগিলেন—সে কি করুণ দৃশ্য, তাহা ভুলিতে পারিব না! সারা রাত্রি

তিনি কাঁদিয়াই কাটাইলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন না। এই তুচ্ছ ঘটনায় তাঁহার প্রাণে যে এত ব্যথা লাগিতে পারে, তাহা যদি বুঝিতাম, কথা গোপন রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করিতাম।

সমাজে পতি-পত্নীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা কি পুরুষের অথবা নারীর এইরূপ আচরণে ব্যাহত হয়? ঘটনাটী উল্টাইয়া ধরিয়া, তাঁহার অন্তর্-ব্যথার কথা অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম। কোন গভীর রাত্রে আমার অজ্ঞাতে আমার প্রিয়া যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্যেও কাহারও অনুসরণ করিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আসে, অন্যের হস্তে হস্ত রাখিয়া নির্জ্জনে আলাপ করে, অভিসন্ধি যতই মহৎ হউক, স্ত্রীর এ আচরণ পুরুষ কি মার্জ্জনা করিবে? স্বামীর অজ্ঞাতসারে পত্নীর এরূপ আচরণের মধ্যে দুরভিসন্ধির সন্ধান কি পুরুষ করিবে না! কিন্তু এতটা ভাবিয়া তো সব ক্ষেত্রে কাজ হয় না। আমি যদি আমার হইতাম, হয়তো বিচারবুদ্ধি এমন করিয়া লোপ পাইত না। ঈশ্বরের কাছেই করযোড়ে প্রার্থনা করিলাম—"প্রভো, এই দুর্গতি হইতে আমায় রক্ষা কর।"

দেহভোগই একমাত্র পাপ নয়। যাহা আপনার-জনকে লুকাইয়া করা হয়, তাহাই পাপ। প্রেম শরীরগত হইলে কামের আকার ধরে; কিন্তু মনকে আচ্ছন্ন করিলে, তাহাও কি কাম নহে? যদি সে রাত্রির কর্ম্ম পাপ না হইবে, এই পতিপ্রাণা নারীর প্রাণে ব্যথা বাজিবে কেন? আমিই বা অসহায়ের ন্যায় দুই চক্ষে অন্ধকার দেখি কেন?

সারা দিন-রাত্রি তিনি আর শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন না, আমার মুখের দিকে চাহিলেনও না। মনের অন্ধকার সমস্ত বাড়ীখানিকে ঘিরিয়া ধরিল। দুঃখের পাষাণভারে হৃদয় আমার যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অসুস্থ হইয়াছেন বলিয়া, কলঙ্কের দায় হইতে নিজেকে রক্ষা করিলাম কিন্তু যেখানে নিজেকে আড়াল করিয়া সাধু সাজি, সেইখানেই অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠে। নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইল।

আমার মনে হয়—আঘাতে-আঘাতে তাঁহার হৃদয় বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল, সারা দিন-রাত্রি উপবাসে হৃদয়কে তিনি বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেন-না, প্রভাতে উঠিয়াই বিনা বাক্যে তিনি বাড়ী হইতে

বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সুগম্ভীরা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মুখে কথা বাহির হইল না। মনে হইল—দুঃখে ও কষ্টে অতিষ্ঠা হইয়া তিনি আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে ; শ্রীভগবান তাঁহার ভিতর দিয়া আমার উলঙ্গমূর্ত্তি সেদিন লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া দিলেন। আমি দেখিলাম—তিনি সেই মহিলার বাড়ী স্বয়ং গিয়া এই গোপন-ঘটনার কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া আসিলেন। প্রতিবিধিৎসার অগ্নিশিখা যেন তাঁহার নয়নে জ্বলিতেছিল। তিনি বাড়ী ফিরিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহার কাছেই আমার কুকীর্ত্তির কথা অবাধে প্রচার করিলেন। স্ত্রী হইয়া স্বামীকে লোকচক্ষে এতখানি হেয় করাব প্রবৃত্তি তাঁহাব কোথা হইতে আসিল? তিনি তো কোনদিন আমার অশুভ যাহাতে হয়, এমন কর্ম্ম দূরে থাক, এমন চিন্তা করিতেও শিহরিয়া উঠিতেন। আজ এমন উগ্রপ্রবৃত্তি তিনি কোথা হইতে পাইলেন? স্ত্রীর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি পুঞ্জীভূতা হইয়া অন্তরে গরিমাবোধের সৃষ্টি কবিয়াছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাব কথা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বিশ্বাস করিল না। কেহ-বা ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়া আমার চরিত্রে মসী লেপন করিল। মানুষের চরিত্র কখনও তির্য্যক্, কখনও ঋজু রেখায় চলে। কত ঘটনাবিজড়িত হইয়া মানুষের জীবন কত বৈচিত্র্যময় হয়। কত মিথ্যা, কত সত্য পরস্পর সংমিশ্রণে কত রূপ ধরে—তাহা কে নিরূপণ করিবে? আমার জীবনের একটী মুহূর্ত্তও যে অপ্রকাশ থাকে না। যাহা অগোপন রাখিলে সুনাম হয়, তাহা হয়তো গোপনই থাকিয়া যায় ; আব যাহা প্রকাশ পাইলে দুর্নাম রটে, তাহা গোপন রাখিতে পারি না, প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জমাখরচের খাতায় লোকসমাজে সুনামের অঙ্কই বেশী ছিল। এই ঘটনায় তাহা কাটাকুটি হইয়া সুনাম ফাজিল হইয়া গেল। মিত্রপক্ষের মাথা নীচু হইল, শত্রুপক্ষ উচ্চহাস্তে পাড়া মাথায় করিল। ধন্য এই মহীয়সী নারী—এই অপবাদের মসীলাঞ্ছিতা সেই পল্লীবধূ আপন পরিজনের নিকট ঘটনার প্রতি কথাটি লিখিতভাবে উপস্থাপিত করিলেন। ইহাতে এই ফল দাঁড়াইল—যাহারা আমার এইরূপ কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া আমার স্ত্রীর আচরণ হঠকারিতা বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারাও বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—মহিলার একটি ছত্রও অতিরঞ্জিত

নহে ; এবং তাঁহার মনোভাবের একবিন্দুও তিনি গোপন রাখেন নাই। আমার প্রতি তাঁর এইরূপ আকর্ষণের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া, তিনি যে এক প্রকার অবশেন্দ্রিয়া হইয়া অভিসারিকার বেশে আমার কাছে উপনীতা হইয়াছিলেন এবং আমার আচরণের প্রতি ভঙ্গীটি তিনি যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—যদি পাপ হইয়া থাকে, যে কোন শাস্তিই তিনি লইতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি নারী বলিয়া তাঁহার এই ইষ্টবোধ বিকৃত করিয়া গৃহীত হইলে, তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইবে। আমি আজিও এই নারীর আকুতির অকপটতা অনুভব করি। সে বহুদিনের কথা, রক্ত-মাংসের মনুষ্যের স্বভাব সেদিনও হয়তো নিঃশেষ হয় নাই, সেদিনের আচরণ অধিকতর সংযত হওয়াই উচিত ছিল। আমি কিন্তু ঈশ্বরের নিকট এই মহীয়সী মহিলার চিরদিন শুভ কামনাই করিব। তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ লাভ করিয়া পরম প্রেমের অধিকারিণী হউন, এই প্রার্থনাই আমি করিতেছি।

এই ঘটনায় বুঝিলাম—নারী ও পুরুষের মধ্যে বিধাতৃ-কৃত যে ব্যবধান, তাহা উল্লঙ্ঘন করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। আরও বুঝিলাম—মানুষ যে ঘোষণা লইয়া লোকসমাজে পরিচিত, উঙ্ককামনার দায়ে অথবা অধ্যাত্ম-সাধনার নামে সে ঘোষণার বিপরীত কর্ম্ম সে যেন না করে। নারী যেখানে এক-পতিত্বের জয়-সিন্দুর সীমন্তে ধরিয়াছে, সেও যেন পর-পুরুষের সংসর্গ হইতে নিজেকে সতর্ক রাখে ; আর যে পুরুষ এক-নারী গ্রহণ করিয়া সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, পর-নারীর গোপন সঙ্গ হইতে সেও যেন বিরত থাকে। এ কথা অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর পক্ষেও প্রযুজ্য। বিধবা বিপত্নীকেরও যাহা ঘোষণা, তাহার বিপরীত কর্ম্ম সে ক্ষেত্রেও না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু গৃহের শান্তি নহে, সমাজ ও জাতির শ্রী ও বীর্য্য এই সত্যরক্ষার মধ্যে নিহিত।

আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত-সৃষ্টির প্রবৃত্তি, উহাও চিত্তবৃত্তির অসম্পূর্ণ পরিচয়। লাঙ্গুলে অসাবধান পথিকের পদস্পর্শে উন্নতফণা ভুজঙ্গ আঘাত-কারীকে দংশন করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই ঘটনায় গৃহদেবীর অবস্থাও তাহাই হইল। নিদারুণ প্রতিক্রিয়াবশে তিনি অবসন্না হইয়া পড়িলেন। আমাকে শাস্তি দিয়া, তিনিও তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ছাড়িলেন না।

আমার অন্যায় তিনি মার্জ্জনা করিলেন। তাঁহার অন্যায়ের মার্জ্জনা তিনি চাহিলেন না। বুঝি তাঁর অপরাধের মার্জ্জনা করার সাধ্যও আমার ছিল না। তিনি যাহা করিলেন, অপরাধীকে দণ্ড দিয়া তাহাকে পুনঃ মুক্তি দেওয়া, তার জন্য তাঁহাকে আমি দোষী করি না। কিন্তু স্বামীকে অপরাধী প্রমাণ করিয়া তিনি শান্তি পাইলেন না। স্বামীর আচরণ নির্দ্বন্দ্বচিত্তে সহিয়া, অন্য কোন সদুপায় আবিষ্কার করার পথ ছাড়িয়া, সাধারণের ন্যায় অতি স্থূল পথ আশ্রয় করার অনুতাপে তাঁর চিত্ত আচ্ছন্ন হইল। আমার আচরণ তাঁহাকে গুরুতর আঘাত দিয়াছিল। তার উপর তাঁর নিজের আচরণ তাঁহাকে অতিশয় মর্ম্ম-পীড়িতা করিল। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে অহিত কিছু করিতে দেখিলে, নিজের হৃদয় বলি দিয়াই তো সে কর্ম্ম হইতে তাহাকে বিরত করিতে হইবে। তাহাকে শাস্তি দিবার নীতি তো প্রেমের নহে! তিনি এই ঘটনার পর আপনাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া শেষ করিতে চাহিলেন। তাঁহার মৃত্যুপণ, আর আমার তাঁহাকে ধরিয়া রাখার আকূতি। সে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে দুই জনেই নিরুপায় হইলাম। দুই জনের চোখের জল একত্র হইয়া বিশাল সমুদ্র সৃষ্টি করিল। কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? তিন দিন অনাহারের পর আমার মিনতি তিনি শুনিলেন; কিন্তু স্নায়বিক উত্তেজনা-বশে তাঁর সর্ব্বশরীর এমন বিকল হইয়া গিয়াছিল যে, একবিন্দু জলও তিনি মুখে দিতে পারিলেন না। ডাক্তার আসিল, কবিরাজ আসিল—রোগের প্রতিকার হইল না। সে কি ব্যথাব অশ্রু উভয়েরই নয়নে। সাত দিন অতিবাহিত হইল। তিনি হতাশ চিত্তে পড়িয়া রহিলেন, আমিও তাঁহার জীবনের আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিলাম।

নারী আর পুরুষ। প্রেম অপার্থিব স্বর্গের অমৃত। প্রেম—বন্ধন যেখানে দুইটী হিয়া যুক্ত করে, সেখানে অপার্থিব আচরণ সত্য সুস্পষ্ট হইলেও, নারী চাহিবে না তার প্রিয়তম অন্যার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হয়—পুরুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। তবে প্রেম কি এমনই সঙ্কীর্ণ? না, প্রেম সঙ্কীর্ণ নহে। আচরণ-বিকৃতি চিত্ত ক্ষুণ্ণ করে। প্রেম যে পুষ্টি ও বৃদ্ধি হৃদয়কে দেয়, হৃদয়ের তাহা বিতরণ করার ছন্দঃ যদি দিব্য হয়, বোধ হয় নারী-পুরুষের প্রেমবন্ধন তাহাতে শিথিল হয় না। সে প্রমাণও জীবনেই পাইয়াছি, কিন্তু সে কথা এখন নহে।

মুমূর্ষু পত্নী শয্যাপার্শ্বে। কত বার তাঁহার মুখে পানীয় প্রদান করিলাম, কিন্তু একবারও উদরে কিছু তলাইল না। বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় যাহা কিছু তিনি গলাধঃকরণ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহার বমন হইয়া যায়। বড় উৎক্ষিপ্তচিত্ত; ঈশ্বরেচ্ছা সেই চরম যদি হয়! কেন এই চিত্তদৌর্ব্বল্য? তাঁর শীর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রাত্রে বিদায়ের বাণীই কণ্ঠে জড়াইয়া উঠিতেছিল। তিনিও অপলকে আমার দিকে চাহিয়া বিদায়-প্রার্থনাই জানাইতেছিলেন। এমনই কাল-রাত্রি আমাদের সম্মুখে।

মাথায় লঘু করসঞ্চালন করিতে-করিতে তিনি তন্দ্রাতুরা হইলেন। আমি নিঃশব্দে প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলাম। মুক্ত বাতায়ন-পথে কৃষ্ণবর্ণ আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কয়েকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। প্রাণ স্তব্ধ। শ্বাস বোধ হয় রুদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। কুণ্ডলিনী উৎসর্গের থালি শিরে লইয়া, রন্ধ্র বাহিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছিলেন। প্রসন্ন বিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে কি দেখিলাম? সেই মসীমাখা ঘন মেঘের গায়ে একটা তারকা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া, আলো লেপিয়া দিল অন্ধকার-পটে; আর দেখিলাম—এক ছায়াময়ী মূর্ত্তি জানালার লোহার গরাদ উভয় হস্তে বিস্ফারিত করিয়া গবাক্ষ-পথ দিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। স্থির অবিচল চক্ষে সেই ছায়া-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে সে ধীর পদ-বিক্ষেপে আমার দিকে অগ্রসর হইল। সে যত নিকটে আগাইয়া আসে, ততই আমার শরীর শিহরিয়া উঠে। আর তো ব্যবধান নাই; শয্যাধার যে এইবার স্পর্শ করিল! আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অতি ভয়ার্ত্ত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কে তুমি?" সে বজ্রধ্বনি নিঝুম রাত্রির আকাশে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিল। আত্মীয়-স্বজন জাগিয়া উঠিলেন, দুই-একজন নিকট প্রতিবেশীও সাড়া লইলেন। ভ্রম বুঝিলাম। সকলকে জানাইলাম—"স্বপ্ন, ভয় নাই।"

বিস্ময়ের কথা! তার পরদিন প্রভাতে গৃহলক্ষ্মীর প্রসন্ন-মূর্ত্তি নয়নে ও হৃদয়ে আনন্দের প্রলেপ মাখাইয়া দিল। অলৌকিক রহস্য! সাতদিন পরে তিনি সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অন্ন গ্রহণ করিলেন। ইহার পর যে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিকশিত হইল, তাহা আর অতীতের নহে। এইদিন হইতে তাঁহার মুখে একটা অপূর্ব্ব মহিমা ও লাবণ্য বিকশিত হইয়াছিল।

সংসার-পথে যাত্রা। পথের পরিচয়ে আমি, তুমি, সে—সকলে। পরিচয় ঘনাইয়া উঠে যেখানে, সেখানে স্বর্গ অবতরণ করে। সম্বন্ধের নিবিড়তায় মানুষ অমৃত আস্বাদ করে। সংসারে রস-সৃষ্টি এই সম্বন্ধের বন্ধনে।

বাল্যকাল হইতে স্বভাবগত ঔদাসীন্যে আপনার জন বলিয়া পরিচয় হইয়াছে অতি অল্প ক্ষেত্রে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু চক্ষের দেখা মাত্র। হৃদয়ের গ্রন্থি কোথাও পড়ে নাই। পরকে আপন করার স্বভাব-ধর্ম্মে নানা ঘটনাসৃষ্টিতে জীবন বৈচিত্র্যময় হইয়াছে। আশা পূর্ণ কোথাও কি হয় নাই!

হৃদয়ের আকর্ষণ সম্বন্ধ-রচনার সঙ্কেত অবিচারে অনুসরণ করে, কোথাও বাধা মানে না। অন্য কেহ তাহা লক্ষ্য করে না। কিন্তু একজনের হৃদয়ে প্রতি পদে টান ধরে। আমার হৃদয়ের অনুধাবনে একজনের প্রাণে বেদনায় সঞ্চার হয়। এত বড় আঘাতে সেই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝিয়া লইলাম। কিন্তু মানুষ কি জন্মিয়াছে কোন এক সঙ্কীর্ণ বন্ধনের আবেষ্টনে গলরজ্জুবদ্ধ হইয়া স্থির থাকিবার জন্য? তার জীবনগতি কি প্রচণ্ডবেগে সহস্র-সহস্র আশ্রয়ে সম্বন্ধের পদচিহ্ন স্থাপন করিবে না? অন্তরের এইরূপ প্রগতিশীল প্রেম, বাহিরে কিন্তু বৃন্দাবনচন্দ্রের মত আমাকে সেদিন স্বীকার করিয়া লইতে হইল—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

পৃথিবীতে সকল সম্বন্ধের সার কান্তা-প্রেম। সে প্রেমের সাধনা বৈষ্ণব-কবিগণের ভাষায় অপূর্ব্ব বর্ণনে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তবুও পুরুষকে নারী বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। "আপন বঁধুয়া আন বাড়ী যায়", "মাটিতে পড়িয়া লুটায় কান্তা।" সে অশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার ভাষা তো জগতে মিলিল না! সে যুগ এ যুগের মত হইলে, কি হইত বলা যায় না। পুরুষের চিত্ত মত্ত কুরঙ্গের মত ইতস্ততঃ বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত হয়। নারীর একাগ্র চিত্ত ক্ষত-বিক্ষত-রুধিরাক্ত হইয়া অবসন্ন হয়; এ প্রমাণ এক বার, দুই বার নয়, বহু বার পাইয়াছি। কিন্তু তবুও বাঁধন স্বীকার করিবার মত হৃদয়ের নতি হইল না। কেন এমন হয়, সে বিচারের শেষ হইতেছিল না।

যে পুরুষ কাম-কন্দুকের ন্যায় নারীর ক্রীড়ণক, আমি তাহার কথা বলিতেছি না; পুরুষ-হৃদয়ের প্রেরণা যেখানে "অহং বহুস্যাং", সেখানে আপনাকে কোন এক সুনির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ক্ষেত্রে চির বন্দী করিয়া রাখা সম্ভবপর কি? নারী পুরুষের প্রতি অনন্যচিত্তা হয়; পুরুষের পক্ষেও তার যথার্থ

প্রতিদান—অনন্যচিত্তে এক নারীরই ভজনা করা। এই ঔচিত্যবোধকে আমি সশ্রদ্ধায় অভিনন্দিত করি। আমি সমাজ-জীবনে ইহাই শ্রেয়ঃ ও শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ বলিয়া স্বীকার করিব। আমার স্বভাব কিন্তু অন্যরূপ। আমি পত্নীর প্রতি অকপট হইয়াও, বহুর আকর্ষণকে উপেক্ষা করিতে পারি নাই। অসংখ্য পুরুষকে আপনার করার ন্যায়, অসংখ্য নারীকেও আপনার করার তীব্র আকুলতা আমায় উদ্বুদ্ধ করিত। কিন্তু পুরুষের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ দৃঢ়বদ্ধ করার আচার ও রীতি নারীকে আপনার করার ন্যায় নহে। উহা কার্য্যকরীও হয় নাই, বরং তাহা ব্যর্থই হইয়াছে।

নারী আপন হয় স্বতন্ত্র বিধি ও ভঙ্গীতে। নারীর জীবনচ্ছন্দঃ পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। কাজেই তদনুকূল আচার করিতে গিয়া হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অশোভন ব্যবহার প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা কতকটা দৃষ্টিকটুও বটে। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, নারীকে আপন করার আচার স্বতন্ত্র ধরণের হইলেও, উহা সঙ্কীর্ণ ভোগ-কামনা-দুষ্ট নহে। উপভোগই বন্ধন। যে সম্বন্ধে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়, তাহা বেদনা সৃষ্টি করিবে কেন? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় এ প্রশ্নের উত্তর অবধারণ করিয়াছি।

ঘর পর করিয়াছি। পর আপন হইয়াছে। স্বপ্নে নয়, কল্পনায় নয়—ইহা জীবনে বস্তুতন্ত্র মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের ন্যায় নারীও নূতন নগরে ঘর বাঁধিয়াছে—পুরাতন পড়শী ছাড়িয়া নূতন পড়শী পাইয়াছে। কিন্তু ইহা সিদ্ধ হইয়াছে একজনের রক্তাক্ত আত্মদানে। ইহার জন্য নিজেকে যোগ্যা করিয়া লইতে গৃহদেবীকে প্রাণান্ত হইতে হইয়াছে, ইহা আমায় বলিতেই হইবে। যে ঘর সেই আত্ম-তর্পণের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, সে শুধু নিঃসঙ্গ বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত পুরুষেরই জন্য নহে। নিষ্কাম-চিত্তা নারীর অবদানও সেখানে নির্ভয়ে আশ্রয় পায়। এই যুগ-নারীর সংহতি-সৃষ্টির উদ্যোগপর্ব্বে হৃদয়ের টানাটানি অবশ্যম্ভাবী। দুঃসহ যন্ত্রণাভারে এই জন্য উভয়কে বেশ নিপীড়িত হইতে হইয়াছে।

নারী-পুরুষ অতি সঙ্কীর্ণ স্থান আশ্রয় করিয়া তৃপ্তি পায়, রসানুভব করে। নারীহৃদয়ের বিস্তৃতি পুরুষের চক্ষুঃশূল। কিন্তু নারীর পক্ষে কি তদ্রূপ নহে? কোন্ পুরুষ চাহে নিজ পত্নীর প্রসারিত হৃদয়ে অন্য পুরুষের আশ্রয়; নারীও কি চাহে তাহার স্বামীর মনের নিভৃত কোণে অন্য নারীর স্থান? ইহার

ব্যত্যয় হয় যেখানে, অথচ যেখানে উপদ্রব-ঝঞ্ঝা নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, হয় দুইজনেই হৃদয়ের জুয়াচুরি করে, নতুবা উভয়ে উভয়েরই মনের খবর রাখে না। ব্যবহারিক জগতে নারী-পুরুষের মিলন গভীর অনুভূতি-রাজ্যে প্রায় ঘটে না; তাই মিলনের মধ্যে দরদীর সূক্ষ্মানুভূতি যে কি বস্তু, তাহা অনেকে বুঝিবে না।

এমনই অনন্যহৃদয় দিয়া তিনি আমায় পাইতে চাহিয়াছিলেন। আমিও অনন্য হইয়া তাঁহাকে যে পাই নাই বা পাইতে চাহি নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে আমার দরদপ্রকাশের ভঙ্গী ঔদাসীন্যব্যঞ্জক ছিল। তিনি দরদী হৃদয়েব অভিব্যক্তি দিতেন সুগভীর আকুতি-রূপে। আমার দরদ তুলনায় ক্ষুদ্র না হইলেও, তাঁর মত অমন সুকরুণ আকুতিময় আবেদন আমার ব্যবহাবে প্রকাশ পাইত না। তিনি তাহা বুঝিতেন। তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা আমার হৃদয়ে তুল্যভাবেই বেদনা সৃষ্টি করে, তাহা তিনি অনুভব করিতেন। অন্তরের দরদ গোপন করিয়া বাহ্যতঃ আমার এই ঔদাসীন্য তিনি পুরুষেব ধর্ম্ম বলিয়াই মনে করিতেন। পতি তাঁহার শ্লাঘার বিষয় ছিল। কেবল একটী ক্ষেত্রে তিনি আমায় বুঝিতেন না। আমার স্বভাব ও স্বধর্ম্মে যে অন্যা নারীব প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, সেই আকর্ষণের মধ্যে যে সংহতিসৃষ্টির কল্পমন্ত্র ছিল, ইহা তিনি অনুভব করিতেন না।

আমি যখন পীড়িত হইয়াছি, তাঁহার হৃদয়ের কাতর আত্মনিবেশ আমার পীড়া উপশম করিয়াছে। তিনি যখন পীড়িতা হইয়াছেন, আমার ঔদাসীন্যই তাঁহাকে শক্তি দিয়াছে, স্বাস্থ্য দিয়াছে। কিন্তু আমায় যখনই তিনি কোন নারীর ভক্তির আতিশয্যে আকর্ষিত হইতে দেখিয়াছেন, সেখানে তিনি ভীমা রুদ্রাণীর বেশে আমায় শাসন করিয়াছেন। সে শাসন সর্ব্বত্র স্বীকার করিতে পারিতাম না—এই জন্যই নিদারুণ দুঃখে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িতেন; ইহার প্রতিকার করার সাধ্য আমারও ছিল না। এইখানে আমার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা দিত না। এইখানেই তিনি নিজের জন্য মৃত্যু-দেবতাকে শনৈঃ-শনৈঃ ডাকিয়া আনিতেন। কিন্তু আমাকে প্রত্যাঘাত করার প্রতিবিধিৎসা তাঁহার অন্তরে কখনও বেশীক্ষণ ঠাঁই পায় নাই। এই অলৌকিক অপার্থিব গুণে মৃত্যুর মূল্য দিয়া তিনি আমায় চিরদিনের জন্য ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এক-পত্নীত্বের অলৌকিক স্বর্গীয় সাধন কি কঠোর

তপঃসাধ্য, তাহা অনাঘ্রাতা নারীর উৎসর্গ যে পুরুষ লাভ করে নাই, সে বুঝিবে না। নারী সতীমূর্ত্তির বিগ্রহ হইয়াছে যুগে যুগে। পুরুষও সত্য-সুন্দরের সাধনা করিয়াছে। তার সে সিদ্ধ রূপ বৈরাগ্যের উত্তরীয় উড়াইয়া বিঘোষিত হইয়াছে। সংসারে, সমাজে সতীনারীর ন্যায় অনাঘ্রাত সৎ-পুরুষের আবির্ভাব আমি অতিশয় দুর্লভ বলিয়াই মনে করি।

সত্যই কি নারী প্রেমকে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ করিয়াই রাখিতে চাহে? কাম ও আসক্তির আবর্ত্তে যে একেবারে সাঁতার না কাটিয়াছি, এমন নহে—তবে সতীর শুভদৃষ্টি আমায় এই সম্বন্ধে এক নূতন অভিজ্ঞতা-দান করিয়াছে। অসংখ্য পুরুষের মধ্যে অকাতর হৃদয় বিতরণ করিয়া যে আত্মীয়তার বন্ধন, নারীকে কি তিনি ইহা হইতে বঞ্চিতা করিয়াছেন? না, তাহা হইলে ভক্তিময়ী মেজ-বৌকে লইয়া তিনি নূতন সমাজ-সৃষ্টির অপার্থিব স্বপ্ন দেখিলেন কি প্রকারে? তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা পরিবাবকে স্বপরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন মেজ-বৌয়ের প্রতি আমার অকৃত্রিম অনুরাগ আশ্রয় করিয়াই। আমরা এক শয্যাধারে উপবেশন করিয়া কত প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছি। এক পাত্রে মেজবৌয়ের সহিত পরমানন্দে তিনি ভোজ্য গ্রহণ করিয়া জাতিভেদ ঘুচাইয়াছেন। দুই অর্থ-ভাণ্ডার একত্র করিয়া তিনি পরস্পর সমস্বার্থে দুইটি স্বতন্ত্র পরিবারকে একান্নবর্ত্তী করিয়াছেন। নিজের অলঙ্কার তিনি মেজ-বৌয়ের অঙ্গভূষণ করিয়াছেন। মেজ-বৌয়ের অলঙ্কার নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি আপনার ও পর, এই ভেদ রাখেন নাই। এই সকল সাময়িক ব্যবহার হইলে কথা ছিল না। মেজ-বৌয়ের অলঙ্কার প্রয়াণকাল পর্য্যন্ত তাঁর অঙ্গে ছিল। মেজ-বৌও ছোটদিদির কণ্ঠহার গলায় দোলাইয়া মহাযাত্রা করিল। এই ক্ষেত্রে আমার প্রণয় এমন অকুণ্ঠচিত্তে আমারই মত অখণ্ডানুভবে তিনি গ্রহণ করিলেন কি প্রকারে? ভাবিয়া দেখিয়াছি।

নারী-হৃদয় সঙ্কীর্ণ নয়। পুরুষের হৃদয়-বিস্তৃতির সে প্রতিবন্ধক নয়। পুরুষের চেয়ে নারীর এই ক্ষেত্রে ঔদার্য্য বরং অনির্ব্বচনীয়। নারী পুরুষকে ভালবাসে—সে ভালবাসা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাবারি-বর্ষণের ন্যায় প্রেমেরই সাধনা। প্রেমের সাধনায় প্রেমই লক্ষ্য। সতী স্ত্রী কামের দুর্গন্ধ সহিতে পারে না। পুরুষের প্রেম কামগন্ধহীন হইলেও, ইহা যে ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়, সেই ক্ষেত্রে যদি কামচাঞ্চল্য ঘটে—সতীনারী পতির এই

প্রেমক্ষয় সহিতে পারে না। সাধ্বী পত্নীর স্বামী এই জন্য "পর্ব্বতের চূড়া" বলিয়া প্রখ্যাত। সতীর পতি বীর্য্যক্ষয়ে বাধা পায়। ভারতের নারী এই জন্য পতির শয্যাসঙ্গিনী নহেন, ধর্ম্মপত্নী। তিনি আমার বীর্য্যক্ষয় রোধ করিয়াছিলেন, প্রেমক্ষয়ের পথে অন্তরায় হইয়াছিলেন। নারী প্রেম নিজের জন্যই প্রার্থনা করে না, জগৎপালিনী মহাশক্তিরূপা সে এই প্রেমের মন্দাকিনী-ধারায় ধরা অভিষিক্ত করিতে চাহে। কাম-কুক্কুর পুরুষ নারীর প্রতিবন্ধকতায় বিক্ষুব্ধ-বিরক্ত হয়। সতী তাহাতে বিচলিতা নয়। পতি-পত্নীর অপার্থিব সম্বন্ধই সৃষ্টিকে অমৃতে পরিণত করে।

আলো ও শান্তির আবহাওয়ায় দিন অতি স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইতেছিল। উৎসব ও আনন্দে গৃহ সতত মুখরিত থাকিত। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, আবার রাত্রি-সমাগম হইতে রাত্রি-প্রভাত পর্য্যন্ত নিয়মিত-জীবনযাত্রা সুছন্দঃ ও শান্তির নির্ঝর সৃষ্টি করিয়াছিল। মনে হইত—মর্ত্ত্য-জীবনে এত আনন্দ আর কোথাও নাই।

পুত্রপরিজনহীন আমি। দাসদাসীপরিবৃত নহি। কিন্তু দিবারাত্রি মনের মানুষ লইয়া উৎসবময় জীবন কত যে তৃপ্তির ঝরণায় আমাদের দুইজনকে অভিষিক্ত করিত, তাহা স্মরণ করিলে আজিকার এই নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যে অসংখ্য প্রকার কর্ম্মের ভীড়ে আপনাকে হারাইয়া আছি বলিয়াই মনে হয়। সে সুখের নির্ঝর শুকাইয়াছে; আছে কঠোর কর্ত্তব্যপালনের জাগ্রৎ বিবেক। আজ মস্তিষ্ক পাইয়াছি; কিন্তু হৃদয় খুঁজিয়া পাই না। সেদিন পদে-পদে বিপৎ-সম্ভাবনা ছিল; তবুও নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবকাশ ছিল না। বিপদ বহিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছিলাম; কিন্তু দুর্নীতি সহিতে পারিতাম না। অসতর্ক হইয়া নিজের ত্রুটিও আমি লঘু মনে করিতাম না। অন্যের দুর্নীতিতে অসহ্য-বোধ হইত। এমনই একটী দুর্নীতির পঙ্কিল-স্মৃতি-রেখা এই সুখের দিনে আমার অন্তরে বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। সে ক্ষত তাঁহাকেও পীড়িত করিয়াছিল। সে এক বৈপ্লবিকের জীবন-কলঙ্কের কাহিনী। অতি দুঃখের সহিত সে কাহিনী আমায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোন প্রসিদ্ধ বিপ্লবসমিতির প্রধান নেতা বন্দী হইলে, আমার এক বন্ধু ও

সহযোগী দেশকর্ম্মী ইহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজাবাজার বোমার মামলার আসামী অমৃতলাল হাজরা আমার নিকট উপস্থিত হন। সমিতির নেতা আমায় অনুজের ন্যায় স্নেহ করিতেন, আবার অন্য দিকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্যে আমার হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিতেন। যে কোন কারণেই হউক, তিনি উক্ত সমিতির সহিত বিযুক্তসম্পর্ক হইলে, সেই সমিতির কয়েক জন তরুণ কর্ম্মী আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন। প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্যচরণ চক্রবর্ত্তী, রমেশচন্দ্র আচার্য্য প্রভৃতি ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহাদের বৈপ্লবিক কর্ম্মে আমার সহায়তা পূর্ণভাবে না পাইলেও, আমার সঙ্গ তাঁহারা ভালবাসিতেন এবং ভারতরক্ষা আইনের শাসনে এই সকল কর্ম্মী নিজেদের বিপন্ন বোধ করিলে আমার আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিরাপদ ক্ষেত্রে স্থান করিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় এক অপরিচিত আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বেশভূষা ও আকৃতি-প্রকৃতি আমার ভাল লাগিল না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম—ইনিও বৈপ্লবিক-সমিতির একজন নায়ক। পরিচিত বন্ধুগণের অনুরোধে তাঁহাকেও আশ্রয় দিতে লইল। ইহার জন্য একটী নূতন স্থান সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। এই কর্ম্মটি আমার জীবনে বিপ্লবযুগের ইতিহাসে একটি কলঙ্ক-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

আমার সকল পরিচিত ক্ষেত্রেই পুলিসের সংশয়দৃষ্টি ছিল। এই হেতু আমার এক বিহারী বন্ধু বংশীধরের সহিত ব্যবস্থা করিয়া, তাহার আশ্রয়ে এই ব্যক্তির স্থান করিয়া দিই। অকস্মাৎ একদিন রাত্রে বংশীধর আসিয়া আমায় সংবাদ দিল—তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার রোরুদ্যমান কণ্ঠ চাপা দিবার নহে। তাহার করুণ ক্রন্দন-স্বর শুনিয়া আমার স্ত্রী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা দুইজনেই তাহার কাতরোক্তি শুনিলাম। সেই দুরাচার আশ্রিত ব্যক্তি বংশীধরের অনুপস্থিতিতে তাহার পত্নীর প্রতি নাকি অবৈধ অত্যাচার করিয়াছে! বংশীধরের পত্নী আত্মহত্যার জন্য কৃতসঙ্কল্প। প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া বংশী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উদ্যতফণা ভুজঙ্গিনীর মত গ্রীবা উত্তোলন করিয়া সাধ্বী সগর্জ্জনে বলিলেন "এ কি দেশের কাজ? এ কি স্বাধীনতার সাধনা?"

ক্রোধে তাঁহার অধর স্ফুরিত হইতেছিল। এই ঘটনার অনেক দিন পরে

কোন-কোন তরুণের মুখে শুনিয়াছি—স্বাধীনতার কামনা-সিদ্ধির সহিত চরিত্রের সম্পর্ক নাই। এমন ধারণা আমার সেদিনও ছিল না, আজিও নাই। স্ত্রীর ক্রুদ্ধ স্ফুরিত অধরে অভিসম্পাতের বজ্র উচ্চারিত হওয়ার উপক্রম হইতেছিল; আমি তাঁহাকে নিরস্তা করিয়া বংশীধরকে সান্ত্বনা দিলাম। পরদিন সমস্ত সংবাদ লইয়া বুঝিলাম—দুরাচারের বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই; কিন্তু ইহা কি অকথ্য বিশ্বাসঘাতকতাচরণ নহে? পবিত্র আশ্রয়ের প্রতি গুরুতর অত্যাচার নহে? স্বাধীনতাকামী তরুণদের মধ্যে এইরূপ চরিত্র কি নিন্দার্হ, ঘৃণার্হ নহে? অপরাধ প্রমাণিত হইলে, বন্ধুরা এই দুর্ব্বৃত্তের বধাজ্ঞাই দিলেন। বিচারের ভার নিজের হাতে লওয়ার সাধ্য অথবা বিবেকের সায় আমার ছিল না। একদিকে সহধর্ম্মিণীর অনুযোগ, অন্য দিকে অকৃত্রিম সুহৃদের প্রতি এই অন্যায় আচরণ আমাকে অতিশয় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। কথাটা প্রচারের বস্তুও নহে; কেবল মনে হইল—দেশ কি স্বাধীন হইবে শুধু পশুবল-প্রয়োগে, চরিত্রের নৈতিক-শক্তিই কি স্বাধীনতার প্রধান ভিত্তি নহে? সংযমহারা, পশুবলদৃপ্ত জাতি দস্যুতা করিতে পারে, বিপ্লব আনিতে পারে, কিন্তু ভারতের ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাহারা কখনও সফল করিতে পারিবে না।

ঈশ্বরে সমর্পিত-চিত্ত হইয়া আমি প্রতিদিন যে জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলাম, তাহাতে এই ধারণাই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল—ফুল ফোটে, সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, সৌরভ বিলায়, ইহা ফুলের কর্ম্ম নয়, বৃক্ষের জীবনীশক্তিরই অনিবার্য্য প্রকাশ। জীবন যদি অপার্থিব সৌন্দর্য্য-রসে পূর্ণ হয়, তার প্রকাশ সুষমাময় হইবে, অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিবে। ভারতের স্বাধীনতা ভারতের জাতিগত চরিত্রের অনিবার্য্য অভিব্যক্তি স্বরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই জাতি যদি পবিত্রতা ও মহত্ত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া না উঠে, তাহার অর্জ্জিত স্বাধীনতা-গৌরব ভারতের আত্মাকে তৃপ্ত ও সার্থক করিবে না। এই ঘটনায় জীবনের গতি আমার নিঃসংশয়ে ভিন্নমুখী হইল। অতঃপর যে পথে আমার গতি মোড় ফিরিল, সে পথে বিন্দুমাত্র সংশয় অথবা ইতস্ততঃ ভাব আর আমার রহিল না।

আমি অপরাধীকে বিদায় দিলাম। বিপ্লবক্ষেত্র হইতেও আমি সেই দিন চিরবিদায় লইলাম। সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম গগন হইতে অস্তগামী রবির

রক্তকিরণ ভাগীরথী-বক্ষে রেখায়-রেখায় বিচিত্র রূপ ধরিয়াছে। বালুচরের উপর দিয়া গঙ্গা-গর্ভে শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রের সহিত চিন্তাকুল চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যথার কথাই বলিতেছিলাম। ভারতের মুক্তিকামনায় অন্তরে যে সৃষ্টি-প্রেরণা ঐ গঙ্গা-বক্ষে সুলিখিত লোহিত-কিরণাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই বলিতেছিলাম। অকস্মাৎ দুইজন তরুণ সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা নবদ্বীপ হইতে আসিতেছে, আশ্রয়হীন—দেশের মুক্তি-কামনায় উদ্বুদ্ধ। এই দুই তরুণের উৎকণ্ঠিত বিবর্ণ মুখ দেখিয়া করুণায় হৃদয় ভরিয়া গেল। কিন্তু এ স্রোতঃ আজ না হয় কাল তো বন্ধ করিতেই হইবে! যে পথে তরুণেরা চলিয়াছে, সে পথ তো মুক্তির পথ নহে! এ পথের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু আজ এ কথা কেহ বুঝিবে না। বুঝাইতে চাহিলেও, কেহ শুনিতে চাহিবে না। যাহারা দেশকে ভালবাসিয়াছে, দেশের ভাল বলিয়া যাহা তাহারা বুঝিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের বিমুখ করার সাধ্য আমার নাই। আমায় যদি কেহ ভালবাসিয়া থাকে, আমার হৃদয় দিয়া কেহ যদি দেশ ও জাতির প্রতি দরদের অনুভূতি চাহে, আমি সেইখানেই সুস্পষ্ট বিশদ করিয়া মুক্তির সুনির্দ্দিষ্ট পথের কথা বলিতে পারি। আমার জীবনে কেহ কি জন্ম লইতে চাহে? সফলতার এই অভিনব-নীতি আমি কি কাহাকেও বুঝাইতে পারিব? এই দুইজন আত্মগোপনকারী দেশপ্রেমিকের আমি কেহ নহি। বাহিরের প্রয়োজন তাগিদের মত পরস্পরকে সংযুক্ত করে। এ তাগিদ ফুরাইবে—আমরা আজিও যেমন পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহারও নহি, সেদিনও তাহাই হইবে। অন্তর-প্রেরণা আর তাই ক্ষুণ্ণ করিব না। আমি ব্যথিত কাতর হৃদয়কে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, তাহাদের সেদিন প্রত্যাখ্যান করিলাম। এই ঘটনার বিবরণ বিকৃত হইয়া আমার বিপ্লবী বন্ধুদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে এক গ্লানিকর প্রচারের সূচনা করিয়াছিল; সে সাময়িক বিক্ষোভ ও ক্ষুণ্ণতা সত্যের সম্পর্ক-শূন্য। উহা সুস্থ ও চিন্তাশীল মানুষের হৃদয় চির মসীময় করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাই সে যুগের পরিচিত বিপ্লবী বন্ধুদের প্রীতিময় হৃদয় হইতে বোধ হয় আমি আজিও মুছিয়া যাই নাই।

ইহার কিছুদিন পরে এক নিদাঘ-প্রভাতে যথারীতি বাহির হইতে গিয়া দেখি—শুধুই আমার বাড়ীখানি নহে, সারা পল্লীটী ঘিরিয়া গোরা সৈন্য

বিরাজ করিতেছে। নানা কথাই কাণে আসিয়া পৌঁছিল। চন্দননগরের প্রত্যেক আশ্রয়ক্ষেত্র পুলিসের আগমনে শান্তি হারাইয়াছে। তারপর যথাকালে অনেক মাননীয় অতিথি আমার ভবনে শুভাগমন করিলেন। আমার সহাস্য অভিনন্দন তাঁহারা কিছু বক্র হাসির সহিত গ্রহণ করিয়া, খানাতল্লাসী সুরু করিলেন। স্যার চার্লস্ টেগার্ট আমায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। মিঃ করবেট, মিঃ ডিক্‌সন, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় এই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ফরাসী পুলিস কমিশনার মঁসিয়ে পমেজ আমার সম্ভ্রমহানি যাহাতে না হয়, তাহার দিকে সতর্ক-দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কলিকাতার পুলিস কমিশনার মিঃ কল্‌সনও এই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। যুগান্ত পরে তাঁহার সহিত আমার আবার দেখা হইয়াছিল। সেদিন যিনি আমার ভবনে আসিয়াছিলেন সংশয়ী, প্রতিপক্ষের বেশে—পরে তাঁহারই ভবনে সুহৃদের মতই আমি অভিনন্দিত হইয়াছিলাম। ইহাই ভাগ্যচক্র!

টেগার্ট সাহেবের প্রশ্নবাণে আমি জর্জ্জরিত হইলাম। বুঝিলাম—প্রশ্নচ্ছলে তিনি আমার চরিত্র-চিত্র তৈয়ারী করিয়া লইতেছেন। আমার বিদ্যা-বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, বন্ধু-বান্ধব, কৃষ্টি ও আদর্শ তাঁহার প্রশ্নে কিছুই বাদ পড়িতেছিল না। তারপর "যুগান্তরের" যুগ হইতে সেইদিনের বৈপ্লবিক প্রতি অনুষ্ঠানের সহিত আমার সংযুক্তি ও পরিচিত এবং অপরিচিত বৈপ্লবিক বন্ধুদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগের হেতু—এমন কত সওয়াল জবাব তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। মঁসিয়ে পমেজ ফরাসী নাগরিকের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অতিশয় সতর্কতার সহিত আমাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন।

অবশেষে টেগার্ট সাহেব হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "চন্দননগর বলিয়া রেহাই পাইবেন না; হাতে না পারি, ভাতে মারিব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "সবই করিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিবেন—ঈশ্বরেচ্ছা না হইলে, কিছুই হয় না।" সাহেব মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন "ধর্ম্মটা আপনার ছদ্মবেশ। আসলে আপনি রাষ্ট্রবিপ্লবী।"

এমন সময়ে ঘরের বাহিরে, প্রাঙ্গণে কিছু কড়া কর্কশ কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। মঁসিয়ে পমেজ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন; আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ঘটনাটী বিশেষ কিছু নহে।

মিঃ ডিক্‌সনের সহিত রামেশ্বর বচসা করিতেছিল। আমি ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁদের সান্ত্বনা দিলাম।

টেগার্ট সাহেব বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে দরজা দেখাইয়া দিলাম। তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আড়াল হইতে দেখিলাম—অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা আমার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছেন। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃ নিরীহ-প্রকৃতির ছিলেন। বিশেষতঃ পুলিসকে তিনি বড় ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু আজ তাঁহার আর এক মূর্ত্তি দেখিলাম। সীমন্তের সিন্দুর অগ্নিশিখার ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি সরল ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া অতিশয় তেজস্বিনী রমণীর ন্যায় বিস্ফারিত নয়নে পথ আগুলিয়া বলিতেছেন "আপনি এই ঘরে প্রবেশ করিবেন না। ইহা আমার পবিত্র রন্ধন-গৃহ।"

আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—দীর্ঘকায় স্যার চার্লস্ টেগার্ট অবনত শিরে তাঁহাকে সম্ভ্রমসূচক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া, অন্যদিকে ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ এদিক্-ওদিক্ করিয়া, বিদায়কালে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ মহিলাটি আপনার কে হয়?"

আমার উত্তর শুনিয়া হাত বাড়াইয়া করমর্দ্দনপূর্ব্বক তিনি সহাস্যে বলিলেন "গুড্ বাই মতিবাবু।"

ইহার কিছুদিন পরে আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম—রংপুরের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এক বড় রকমের ফার্নিচারের অর্ডার আসিয়াছে। তবে কি স্যার চার্লস্ টেগার্ট আমার সহিত কথোপকথনে অন্তরে প্রসন্ন হইয়াছিলেন? এতদিন আমার কাঠের কারবার প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু এই সময় হইতে বাহিরের বাধা অপসারিত হইল। ভাবিলাম—ঈশ্বরপ্রসাদ কেমন করিয়া কোন্‌দিক হইতে আসে, মানুষ তাহা বুঝিতে সমর্থ নহে।

যাঁহারা আমায় শত্রু মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ আলাপে, আমায় কি তাঁহারা মানবতার সেবক বলিয়াই ভালবাসিলেন?

বুঝিয়াও এই কামনাপূর্ত্তির জন্ত অতি করুণ কণ্ঠে আকূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আজ মনে হইল—আমি দরিদ্র। আজ মনে হইল—আমি বেকার, স্ত্রী-গ্রহণের অযোগ্য। দৈন্য, দুঃখ, ক্ষুণ্ণতা সব যেন কটু করতালি দিয়া আমায় ঘুরিয়া নৃত্য যুড়িয়া দিল। আমি বলিলাম "ওরে ভিখারীর পত্নি, এক মুষ্টি অন্ন আর কটিতটে বস্ত্র ছাড়া আর যে কিছু চাহি নাই। এমন-কি প্রাকাম্য সিদ্ধি আমার আছে যে, তোমার এই আকস্মিক কামনা পূরণ করি?"

মনে কত ঝড় উঠিল—এই যে তরুণী ভার্য্যাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি, এই যে তাঁহাকে নিরাভরণা রাখিয়া সুমহান্ আদর্শের লক্ষ্যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি; আর তাঁহার এই অলঙ্কার-প্রার্থনার মত কত প্রার্থনাই না অন্তরে গুমরিয়া মরিতেছে; কত অব্যক্ত-বেদনাপুঞ্জ বুকে চাপিয়া অসহায়া বাঙ্গালী বধূ বাধ্য হইয়াই আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে—ইহা কি স্বাস্থ্য? ইহা কি আনন্দ? ইহা কি পতি-পত্নীর সত্য যুক্তি? এই জীবন কি শক্তিতে অভিষিক্ত হইবে? কল্পনাতীত সংশয়ে আমার মুখ যেন কাল হইয়া গেল। কোথায় কোনদিন তাঁর অতর্কিত চরণ-চিহ্ন অনাবশ্যক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, তাঁর আনতা দৃষ্টি কোথায় যেন কোন্ দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, আমায় দেখিয়া চকিত হইয়া গেল; কোন সন্ধ্যার বিষাদচ্ছায়ায় ছাদে বসিয়া সেই যে অনন্যমনে কিসের চিন্তা করিতে-ছিলেন, সবের মধ্যেই মনে হইল যেন অতৃপ্ত-কামনাব অভিব্যক্তিই ছিল; আমি তাহা উপেক্ষা করিয়া আদর্শের মোহে পত্নীকে ধর্ম্মসঙ্গিনী করিয়া সমুচ্চে স্থান দিয়া চলিয়াছি। আশার স্বচ্ছ নীল আকাশে প্রাবৃটের ঘন-ঘটা ঘিরিয়া ধরিল। দীনতার ম্লানিমা ও অক্ষমতার মসীচিহ্নে বোধ হয় আমার ললাট লেপিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আমার প্রতি এমন উপেক্ষা তাঁহার কোনদিন দেখি নাই। সেই অনাহত করুণ সুরে অলঙ্কারের আকাঙ্ক্ষা—আমায় বড় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

নিষ্করুণ হইতে পারিলাম না, কুটিল কটাক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তাঁহার মুখাবয়বে এক বিন্দু সঙ্কোচ নাই; দৃষ্টি অভাবের ক্ষুধায় কাতর নহে; সরল শিশুর মত সুনির্ম্মল কম্পিত ওষ্ঠপুটে আধ-আধ প্রার্থনা "নিরলঙ্কারা হইয়া তিনি আজ রণজয়ী বীরবৃন্দকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবেন না।"

বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম "কোথায় পাইব এই মুহূর্ত্তে সোণার কঙ্কন তোমার হাতে দিতে, গলায় গজমুক্তার মালা! একেবারে যাহা আমার অসাধ্য, তাহার জন্য জিদ্ যে কত বড় অত্যাচার, বুঝিবার বুদ্ধি নাই কি তোমার?"

আশ্চর্য্য, এমন অবুঝ মনের অবস্থা তাঁহার হইয়াছিল যে, কোন কথাই তিনি শুনিতে চাহিলেন না। নিজের নিরুপায় অবস্থা বার বার জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও তিনি জিদ্ ছাড়িলেন না, বরং বলিলেন "নিরাভরণা হইয়া আজ আমি ঘরের বাহিরে একটি পাও বাড়াইব না।"

ক্রোধে, দুঃখে মনে হইল—চুলের ঝুঁটি ধরিয়া দুই ঘা বসাইয়া দিই। অসংখ্যা ভদ্রমহিলা দলে-দলে সমাগতা। বহু স্থান হইতে বহু ব্যক্তি আজ সমাগত, আর আত্মজের অধিক বীরেরা মরণ জয় করিয়া আমারই বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করিবে, মায়েরা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে গন্ধমাল্য, খাদ্য-দ্রব্যাদি লইয়া কত আনন্দে আজ এইখানে আসিতেছেন, আমার সহধর্ম্মিণী এই উৎসবদিনে তুচ্ছ অলঙ্কারের দাবী ধরিয়া আমার সহিত অসহযোগ করিবে—ইহা যেন ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। আমারও চিরদিনের দুর্ব্বলতা—সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁহাকে পার্শ্বে না দেখিলে, কোন কর্ম্ম সমাধা হইল বলিয়া মনে হয় না। একবার মনে হইল—থাক গৃহ-বন্দিনী হইয়া; বাহিরে অনেক মাতা, ভগ্নী আসিয়াছেন, কাজ সারিয়া লইব। কিন্তু দীর্ঘ প্রবাসের পর সৈনিকদের চক্ষুও চাহিবে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের 'কাকিমাকে'। বুঝি আমার চেয়েও অলক্ষ্যে থাকিয়াও, ছেলেদের চিত্ত জয় তিনিই অধিক করিয়াছিলেন। নিজেকে বড় অসহায় মনে হইল, কিন্তু উপায় কি? কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া শাসাইয়া বলিলাম "আজ এই চির বিদায়। আর তোমার মুখ-দর্শন করিব না।" হায়-রে মুখের কথা যদি হৃদয়ের হইত, তাহা হইলে এক কথায় অনেক পূর্ব্বে সব গোলই মিটিয়া যাইত। এত বড় সাঙ্ঘাতিক শব্দগুলিও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল না; হৃদয়টা এমন করিয়াই জানা ছিল বলিয়াই আমার রোষ ও আস্ফালন তাঁহাকে অস্থির করিত না। তিনি বেশ নিঃশঙ্ক নির্ব্বিকার চিত্তেই, অকপট সরল কণ্ঠে বেমালুম বলিলেন "যাই বল, আজ আমি শুধু হাতে আর শ্মশান গলা লইয়া তোমার উৎসবে যোগ দিব না।"

মেয়েরা কণ্ঠহার না পাইলে, একটা কারে ঝুলাইয়া মাদুলীও গলায় পরে। সধবা নারীর নিরলঙ্কার কণ্ঠ শ্মশান বলিয়া প্রবাদ আছে। এ বালাই এ যুগে নাই। সে যুগে ছিল। কিন্তু আজ ৬।৭ বৎসর ভিখারিণীর বেশ তাঁহাকে তো আজিকার মত এমনভাবে পীড়ন করে নাই! আমাকেই তিনি সাজাইয়া রাখিতে ভালবাসিতেন, নিজে তো কোনদিন সাজিতে চাহেন নাই! আজ এ কি ভাববৈচিত্র্য!

নিজের পায়ে দুর্ম্মূল্য স্লিপারের দিকে দৃষ্টি পড়িল। ফরাসডাঙ্গার দেশী ধুতিখানি আমার পরিধানে। আদ্দির পাঞ্জাবী, সোণার বোতাম, কাশীসিল্কের চাদর, অঙ্গুলীতে হীরার আংটী। জবাকুসুম-চর্চ্চিত মাথার দীর্ঘ কেশ সুবিন্যস্ত। এ সবের তিনি একটুও ব্যত্যয় হইতে দিতেন না—আর নিজে সারা দিন একবস্ত্রে কাটাইতেন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিলে, একখানি খাটো বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া, পরিহিত বস্ত্রখানির এক পাশ ধরিয়া একবার ঝাড়িয়া লইতেন, পুনরায় অপর ধার হাতে উঠাইয়া, ঝাড়িয়া-ঝাড়িয়া কাপড়খানিকে শুদ্ধ করিয়া লইতেন। কোনদিন দাবীর কণ্ঠ তো শুনি নাই! কেশবিন্যাস করার বিলাসও তাঁহার ছিল না, চুল পরিষ্কার করিয়া সিঁথিতে সিন্দুরবিন্দু দেওয়াই ছিল তাঁর বিলাস; আর দেখিতাম চরণ অলক্তরঞ্জিত করার দিকে মনের ঝোঁক। আমি কোনদিন ভাবি নাই—ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনের দাবী তাঁহার থাকিতে পারে।

তাঁহার দাবী বুঝিবার আমার অবকাশ ছিল না। আমার সাজসজ্জা, খাদ্যাদি না চাহিতেই তিনি পূর্ণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দৈন্য-বেশ ঘুচাইবার জন্য আমি কি করিয়াছি!

চৈত্রের প্রচণ্ড খরকরোজ্জ্বল চন্দননগর সেদিন হাস্যমুখর, জন-কোলাহলে উৎসবময়। পথে-পথে পল্লব-পুষ্প-শোভিত তোরণ-দ্বার। ফুলদল করে নর-নারীর মহামেলা। দেবমন্দিরচূড়ায় নহবতের মধু-রাগিণী বাজিতেছে। কিন্তু হৃদয়ের উৎসাহ-প্রদীপ আমার যে নিবিয়া যায়! আমার উৎসবময়ী আজি কি গৃহ-বন্দিনীই থাকিবেন!

এমনই হয়, আদর্শের চেয়ে আত্মার দাবীই বড়; অন্তর্য্যামীর দাবী বুঝি তিনি শুনিতে পাইতেন। ভবিষ্যতের সন্ন্য-জননীর অন্তরপ্রেরণায় এই যে ঐশ্বর্য্য-লক্ষণ-ধারণের দাবী, তাহা পূর্ণ করার প্রাকাম্যসিদ্ধি কিন্তু দূরে ছিল

না। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু অরুণচন্দ্র সোমের মাতাঠাকুরাণী সেদিনের এই ঐশ্বর্য্যপ্রেরণার পূজা দিয়াছিলেন অকাতরে। রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র সোমের তিনি বিধবা পত্নী। তিনি লৌহসিন্দুক খুলিয়া থরে-থরে স্বর্ণালঙ্কার, মুক্তার মালা, হীরক-বিজড়িত বিচিত্র ভূষণরাজী আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন "বৌমাকে আজ নিরাভরণা থাকিতে নাই; তাঁহার যাহা পছন্দ, গ্রহণ করুন।"

আমি পুলকিত, বিস্মিত হইলাম। কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় কাহার সহিত সম্বন্ধ সৃষ্টির স্রোতঃ তাঁহার মধ্যে বহিত, আমি বুঝিতে পারিতাম না। আজ বলিব—অপরাধী আমি নহি, তিনি আমায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেন। তিনি এই অলঙ্কাররাশির মধ্য হইতে পান্না-খচিত দুই গাছি চুড়ি, হীরক-খচিত দুই গাছি অনন্ত, আর বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত একগাছি সোনার হার তুলিয়া লইলেন। তারপর যাহা দেখিলাম, তাহা বড় অপূর্ব্ব। রাজলক্ষ্মীর সে অপরূপা মূর্ত্তি আমার আজ ধ্যানের বিষয় হইয়াছে। সে স্বর্ণপ্রতিমা চক্ষে দেখিবার নয়, ধ্যানের সামগ্রী।

* * * *

ভাবিতেছিলাম—মানুষের বুকে মানুষ ছুরি বসাইয়া ফিন্‌কি দিয়া রক্ত-প্রস্রবণ খুলিয়া দেয়; সে তপ্ত ফেনিল রক্ত-তরঙ্গে সমরপ্রিয় জাতি চিরদিন প্রমত্ত হইয়াছে; মানবের এই রক্ত স্নানের পরিণাম ভাবিয়া ভবিষ্যৎ শিহরিয়া উঠে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হয়। এই রক্ত-রঙ্গে দীক্ষিত বাঙ্গালী বীর ইউরোপে মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় নাচিয়া বাড়ী ফিরিল, তাদের ঐ আকাশের আস্‌মানী রঙের বীরসজ্জা, গৌরবদীপ্ত বজ্রকঠোর ললাটে স্বেদাশ্রু ঝরিতেছে, বীরোচিত প্রশস্ত হৃদয়, প্রতি পদক্ষেপে কি এক অসাধারণ জীবনপরশে নাচিয়া-নাচিয়া, দুলিয়া-দুলিয়া শোভাযাত্রীদের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। বীরপূজার সংস্কার বাঙ্গালীর মজ্জায়-মজ্জায়; আজ তাই রণজয়ী বীরবৃন্দের সম্বর্দ্ধনায় সহস্র-সহস্র নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবার উৎসাহ-প্রদীপ্ত নয়নের আলো দেখিয়া মনে হইল—সংগ্রাম চিরস্থায়ী হউক। মানুষের রক্তে এমন প্রলয়-ঝঞ্ঝা মাঝে-মাঝে না উঠিলে, মানুষ যে ভীরু লঘু হইয়া পড়িবে! ইউরোপের গগনে রক্তপতাকার বিদ্যুৎ-শোভা মানবতার জয়ধ্বজাই উড়ায়। ভারতের হিয়ায়ও সেদিন দেখিলাম রণচণ্ডীর তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চলা করালিনী

মূর্ত্তি—প্রসন্না ভগবতী বুঝি এমন মহাকালীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই জগতের স্থিতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে নব-নব প্রেরণা সঞ্চার করেন!

বিধাতার ভীষণ ভ্রূকুটী কটাক্ষের সঙ্কেতে, মঘবানের নিদারুণ বজ্রবর্ষণের মরণক্ষেত্রে, বাঙ্গালী বীরেরা দেশগত, জাতিগত, সংস্কারগত সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, নিখিল মানবজাতির সহিত অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কোন সুদূর প্রবাসে অপার্থিব প্রেমের রাজ্যগঠনেরই সূত্রপাত করিয়া আসিল। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান, ফরাসী, বাঙ্গালী, সেনোগেলিস, ইন্দোচীনা—কিছুর ভেদ ছিল না। রাজশক্তির সহায় হইয়া, বিশ্ব-মানব-জাতির সহিত একাত্মতার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এই যে বাঙ্গালীর আত্মদানের সঙ্কল্প, ভারতের এই যে নিঃস্বার্থ আত্মবলির উৎসবশোভা আমার সম্মুখে—ইহা কি ভারতের সৌভাগ্যযুগেরই দ্যোতনা নয়?

এক অপূর্ব্ব অনাগত স্বপ্ন এই সৈনিকদের চক্ষের দৃষ্টিতে আমায় অভিভূত করিল। জনে-জনে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের আবার ঘরে তুলিয়া লইলাম। এই বিজয়ী বীরবৃন্দকে ধান্যদূর্ব্বাদলে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া কুললক্ষ্মীগণ উলুধ্বনি দিল। কেহ শঙ্খ বাজাইল। আর ইহারই মাঝে একজনকে দেখিলাম—সালঙ্কারা দেবীপ্রতিমা হর্ষোৎফুল্ল লোচনে প্রতি জনের ললাটে জয়টীকা পরাইয়া, কণ্ঠে মল্লিকার মালা দোলাইয়া দিতেছেন। বাংলার বীর-জাতির সূচনা-পর্ব্ব আমারই প্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। আমি সে ধূলা আজিও তাই সশ্রদ্ধচিত্তে ললাটভূষিত করি।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিল। বাজিয়া-বাজিয়া নহবতের সুর বাতাসের গায়ে অবসন্ন হইয়া নিদ্রাভিভূত হইল। সৈনিকদের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পত্নী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রসন্ন দৃষ্টি লইয়া উৎসবক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন। পথের ধূলা পথে পড়িয়াই বিশ্রাম লইল। জনশূন্য প্রাঙ্গণে নৈশ ভোজের আয়োজন। প্রীতির উৎস-মুক্ত আনন্দ-ঝরণায় আমরা অভিষিক্ত। কোন সুদূর রণাঙ্গনের স্মৃতি-বৈচিত্র্য বহিয়া সৈনিকেরা ঘরে ফিরিয়াছে! কত গিরি-নদী-প্রান্তর, কত পল্লী-নগর অতিক্রম করিয়া তাহাদের রণক্ষেত্রে যাত্রা ও প্রত্যাবর্ত্তন। পল্লীনারীগণের জয়কণ্ঠে মধুর সম্বর্দ্ধনা-রব—পথের দুই ধারে ফরাসী নরনারীগণের সোৎসাহ অভ্যর্থনা-আবাহন—সে কত ঘটনার বিচিত্র বিবরণ-চিত্র। কত গোপন-প্রণয়-কাহিনী, সৈনিক-জীবনের

কৌতূহলপূর্ণ অসংখ্য ঘটনারাজি! প্রণয়ের আকর্ষণে কেহ নদী পার হইয়া, আপেল বৃক্ষের বনে ক্ষুদ্র কুটীরে কৃষকরমণীর অন্বেষণে চলিয়াছে; কেহ আঁধারে অঙ্গ ঢাকিয়া, মরু-তুষারের যবনিকা ভেদ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে গ্রামাভিমুখে। বিদেশী সৈনিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে গিয়া ফরাসী রমণীর প্রণয় যাচ্ঞা সে ভুলিতে পারে নাই, কোন আহত সৈনিক হাসপাতালে অবস্থান-কালে কোন কিশোরী নার্সের স্নেহচুম্বনে অভিভূত হইয়া বুকে তার চিরস্মৃতি আঁকিয়া লইয়াছে। রণজয়ী হইয়া সে কৃতজ্ঞতার শোধ লইবে, হৃদয়ে আশার উৎসাহ। শত্রুর গুলীবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া সে ছুটিয়াছে, ট্রেঞ্চের পর ট্রেঞ্চ অধিকার করিয়া। উৎসবের দিনে পরস্পর রক্তপিপাসু প্রতিদ্বন্দ্বী নিরস্ত্র হইয়া, এই দুর্দ্ধর্ষ-সংগ্রাম-পিপাসার অন্তরালে মানব-প্রীতির ঝরণা-ধারা উৎসরিত করিয়া একে অন্যকে অভিনন্দিত করিয়াছে—ট্রেঞ্চ হইতে ট্রেঞ্চে ফুল, ফল, রুমাল, রুটির টুকরা উপহার দিয়া। পরক্ষণেই শত্রুবোধে যাহাকে নিধন করিতে হইবে, তাহার সহিত ক্ষণিকের এই প্রেম-বিনিময় মানবচরিত্রের অপরূপ লীলাভঙ্গী। এমন কত কথা! রাত্রির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আলাপ-আলোচনায় কাটিল।

তারপর শয়ন-কক্ষে গিয়া আর এক অভিনব দাবী গৃহদেবী জানাইলেন। সবিস্ময়ে দেখিলাম—আবার তিনি নিরাভরণা। অলঙ্কারগুলি সযত্নে একটি হস্তিদন্তনির্ম্মিত কৌটায় রাখিয়া, তিনি বলিলেন "কাজ মিটিয়াছে, এইবার ফেরৎ দিয়া এস।"

এত শীঘ্র সাধ মিটিবে, এমন প্রত্যয় হইল না। আমি বলিলাম "উহা ফেরৎ দিব না। তোমার ভাল লাগিয়াছে, তুমি উহা গ্রহণ কর।"

তিনি বিরক্তা হইয়া বলিলেন "পরের জিনিষ, প্রয়োজন শেষ হইলে ফেলিয়া রাখিতে নাই। তুমি এইগুলি শীঘ্র ফেরৎ দিয়া এস।"

বিরক্তির মাত্রা আমারও বাড়িয়া উঠিল। উৎসবের ক্লান্তি—শরীর বড় ভাল ছিল না, খুব অবসন্ন মনে হইতেছিল। আমি বলিলাম "তোমার গহনার সাধ পূরণ করিব বলিয়াই এইগুলি আনিয়াছি, উহা আর ফেরৎ যাইবে না।"

তিনি বার-বার বলিতে লাগিলেন "পরের জিনিষ কাজ শেষ হইলে, ঘরে রাখিতে নাই"; আমিও বার-বার বলিতে লাগিলাম "উহা তোমার জন্যই আনিয়াছি, উহা আর ফেরৎ দিব না।"

কথা-কাটাকাটি ঝগড়ায় পরিণত হইল। "আজ উহা পরের জিনিষ, ব্যবস্থা করিলে কাল আবার ঘরের জিনিষ হইবে।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন "তবে তোমার টাকা আছে, আমাকে ভিখারিণী করিয়া রাখা তোমার ছল!"

আমি বলিলাম "না, আমি স্বামী হইয়াছি, তোমার দাবী পূরণ করা আমার কর্ত্তব্য।"

বেশ মনে পড়ে—ফুটন্ত যুঁইয়ের রাশি হাসির ফাঁকে যেন ঝরিয়া পড়িল; যেন বিদ্রূপ করিয়াই তিনি বলিলেন "আরও তো অনেক দাবী আছে, সব কি পূরণ করিতে পার?"

কথা শুনিয়া বুকটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল; যেন মনে হইল—ধর্ম্মের নামে কিশোরী পত্নীর প্রতি সর্ব্বক্ষেত্রেই অত্যাচার করিতেছি। ধর্ম্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আমি, তিনি নহেন। আমার দায়েই তিনি তপস্বিনী। মুখে আমার বোধ হয় বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছিল। তিনি একটু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "এইবার নিজের লেজে পা পড়িয়াছে। কিন্তু অতটা গুরু-চিন্তার প্রয়োজন নাই; গহনাগুলি দিয়া এস।"

আমি বলিমাম "কিন্তু গহনার সাধ আমি তোমার অপূর্ণ রাখিব না।"

তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারিলাম না। তাঁর স্বভাবের মধ্যেই ছিল—প্রয়োজন হইলে, পরের জিনিষ চাহিয়া আনিতেন; প্রয়োজন শেষ হইলে, এক মুহূর্ত্ত তাহা ঘরে রাখিতেন না। সে গহনা কেন, বাজারের ঝুড়ি, চুপড়িটি পর্য্যন্ত কাজের বাড়ীতে নানা স্থান হইতে জড় হইলে, কাজের শেষে সেইগুলি যথাস্থানে ফিরাইয়া দিবার জন্য তিনি অস্থিরা হইয়া পড়িতেন। আমায় সেই রাত্রেই গহনাগুলি পৌঁছাইয়া দিতে হইল।

এই ঘটনা তাঁহার নিকট স্বচ্ছসলিলা তটিনীর ন্যায় সহজে আসিয়াছিল, সহজেই চলিয়া গেল। এ একটা আকস্মিক অন্তরপ্রেরণায় তাঁহার উদ্বুদ্ধতা; আমায় কিন্তু উপার্জ্জনের প্রেরণায় তাহা উদ্বুদ্ধ করিল। আমি শ্রীঅরবিন্দের সম্পূর্ণ ব্যয় সঙ্কুলান করার সুব্যবস্থা করিয়াছিলাম। পতি-পত্নীর ক্ষুদ্র সংসারটি চলিয়া যাওয়ার মত একটি ব্যবসাও ফাঁদিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। স্ত্রীর সহিত সম্পদের, সত্যের সহিত জয়ের একটা অনিবার্য্য সঙ্কল্প আমায় পাইয়া বসিল। এইদিন

হইতেই আমার মনে হইল—আমি যে সাজি, আমার যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ইহার মূলে আছে আমার গৃহদেবীর শুভেচ্ছা; আমার তাই কিছুতে অভাব-অনুভব নাই। আমি পুরুষ—নারী যদি প্রসাধন চাহে, আমার ধর্ম্ম, আমার প্রতিশ্রুতি, কিছুর ব্যত্যয় না করিয়া তাহার সে সাধ পূর্ণ করিব। কোন দিক্ দিয়া কি হয় কে জানে! সৃষ্টির দেবদূত এমনই সঙ্কীর্ণ পথে আমায় যুগশঙ্খ বাজাইয়া আহ্বান দিয়াছিলেন। আমি অর্থ-সৃষ্টির পথে পা বাড়াইলাম। লক্ষ্য ছিল গৃহলক্ষ্মী, তাঁর পূর্ত্তির উপলক্ষ্যে এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিল। বিশ্বকর্ম্মা বিউগল্ বাজাইয়া আমায় অর্থ-সংগ্রামে আহ্বান দিলেন। অন্নক্ষেত্রের জন্য বিশাল কৃষিক্ষেত্রের রচনা, আর বস্ত্রসমস্যাপূরণের ব্যবস্থা হইল সুবিশাল তাঁতশালানির্ম্মাণে। সঙ্ঘের কর্ম্মসূত্র আমায় হাতে করিয়া ধরাইয়া দিলেন চিচ্ছক্তি—এমনই তুচ্ছ উপলক্ষ্য আশ্রয় করিয়া। যাহা অভিধেয়, তাহার অনুবাদ হয় ভাষায়, সকলের তাহা উপলব্ধিগম্য হয় না।

বাঙ্গালী সৈনিকেরা ঘরে ফিরিল। হৃদয়ে নবানুভূতি নূতন-রূপে প্রকাশ পাইতে চাহিল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাংলার তরুণ যে যুগে দলে-দলে কারাবরণ করিতেছিল, সেই যুগে একদিকে বিপন্ন বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী অশ্রুসিক্ত নয়নে যেমন মর্ম্মন্তুদ সুরে "প্রবর্ত্তক"-এর বুকে আঁকিতেছিলাম, তেমনই এ কথাও সেদিন ঘোষণা করিতে বাধে নাই যে, ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রবিধাতা বৃটিশ জাতির আশ্রয়ে দাঁড়াইয়াই আমাদিগকে শক্তিশালী সঙ্ঘ রচনা করিতে হইবে। এই দুঃসাহসের কথা সেদিন বলা সহজ ছিল না। চন্দননগরের ষড়বিংশতি জন যুবক ফরাসী রণাঙ্গনে তাৎকালীন বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ ফরাসীর বিখ্যাত সেভেন্টি-ফাইভ সেন্টিমিটার কামান পরিচালনা করিয়া, সেদিন জার্ম্মাণ জাতির হৃৎকম্প সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ষড়বিংশতি জনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেণ্টমিহিএনের নিকটস্থ কতক স্থান-রক্ষার ভার ইঁহাদের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক ফরাসী জাতি সেদিন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিত-বুদ্ধি ও সাহস-দর্শনে প্রীত হইয়া ফরাসী গোলন্দাজ-বাহিনীর অধ্যক্ষ আমায় লিখিয়াছিলেন "বাঙ্গালীর মত যদি ফরাসী জাতির আরও কয়েকটা ব্যাটেলিয়ান থাকিত, তবে আজ আমরা ফরাসীর সীমারেখায় এক অদ্ভুত যুদ্ধাভিনয় দেখাইয়া শত্রুবাহিনীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতাম।"

এই ঘটনায় আমার মনে হইয়াছিল—ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে হইলে, রাজশক্তির সহিত বিরোধ না করিয়া, অতি স্পষ্টতার সহিত, সৎসাহস ও অসাধারণ ধৈর্য্য লইয়া, শক্ত চরিত্রের সঙ্ঘবদ্ধ দেশবাসীকে তাঁহাদের সহায় হইয়াই রাজ্য-শাসনের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হইবে। রাজশক্তির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখিয়া আমরা সংহতিবদ্ধ হইতে চাহিলেও, তাহা নানা কারণে কার্য্যকর হইবে না; আবার অন্তরে তাঁহাদের উচ্ছেদ-কামনা রাখিয়া যদি ছল-পূর্ব্বক এই

সহায়তার পথে অগ্রসর হই, অন্তর-বাধায় আমরা এই পথেও সিদ্ধকাম হইব না। আমাদের মানুষ হইতে হইবে—অতএব মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া প্রবলের সহায়তা-গ্রহণ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল হইবে। ফরাসী জাতি চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিকদের এইরূপ চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছিলেন ; তাই তাঁহারা বাঙ্গালী সৈনিকের একটা চিরস্থায়ী ব্যাটেলিয়ান গড়ার প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই কার্য্য ফলপ্রসূ করার সাধ্য আমার ছিল না—সে আশা সেদিন হৃদয়ে অঙ্কুররূপে উদ্গত হইয়া অঙ্কুরেই শুখাইয়া গিয়াছিল !

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রগামী হইয়া যে প্রাণশক্তির সন্ধান পাই নাই—সতত গোপননীতির আশ্রয়ে মুষিক-স্বভাবই তাহাতে বড় হইয়া উঠিতেছিল—দেশের মতবাদ সেদিনও আমার পরিপন্থী ছিল—দেশ-প্রীতির সঙ্কীর্ণ আদর্শবাদ সেদিনও অনেকের ওষ্ঠপুটের সামগ্রী ছিল। উহা লঙ্ঘন করিয়াই আমি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের অকপট সহায়রূপে চন্দননগরে সেনাবাহিনী গড়ায় সফলকাম হই ; আর এই সেনাবাহিনীই এ যুগে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী গোলন্দাজ-বাহিনী। এই ঐতিহাসিক সত্য স্মরণ রাখিবার জন্যই এই কয় ছত্র লেখা এই ক্ষেত্রে সংযোজিত করিলাম।

চন্দননগরের বাঙ্গালী সেনার এই গৌরবকাহিনী বৃটিশ ভারতেও নূতন জীবনের সাড়া তুলিয়াছিল। মেসোপটেমিয়ায় বাঙ্গালী সৈনিক-দল-প্রেরণ তাহার প্রমাণ। বীর মনোরঞ্জন রায় সর্ব্বপ্রথম সঙ্ঘের সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া পরে ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিল ; সেও ছিল মেসোপটেমিয়া-প্রত্যাগত একজন বীর সৈনিক।

সেদিন রাজশক্তি প্রতি পদে বলিতেন—'বাঙ্গালীর চরিত্র বস্তুতঃ বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তাহাদের অন্তরে রাজবিদ্বেষের হলাহল পরিপূর্ণ রহিয়াছে।' হোমরুল আন্দোলনে শ্রীমতী এনী বেসান্ত কারারুদ্ধা হইলে, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য যে প্রবল আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনের উত্তরেও বাঙ্গালী সেনাবাহিনী গঠনের প্রতিপক্ষে রাজপুরুষগণের মুখে আমরা উক্তরূপ কথা শুনিতাম। পরে ইউরোপের কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামে ইংরাজ বিজয়ী হইলে, বৃটিশ জাতির কর্ণধারগণ মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষকে নূতন শাসনসংস্কার

দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু অন্য দিকে ইংরাজের কারাগারে রাজবন্দিগণ অনাহারে-উৎপীড়নে একের পর এক আত্মহত্যা করিয়া চলিতেছিল। এই অবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে রাজশক্তির সহযোগিতায় আমরা সংশয় ও অস্পষ্টতার বাহিরে, দেশে এক শক্তিশালী সংগঠনপরায়ণ সংহতি-জীবন গড়ার প্রচেষ্টা করিতেছিলাম। এই আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ দেশের বৈপ্লবিক-সংস্থার মধ্যে সংসিদ্ধ হইতে পারে না, আবার ভারতের জাতীয় সমিতির অন্তর্গত হইয়াও ইহা সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে—এই ধারণা আমার সেদিন ছিল, এখনও আছে। এই সংগঠন-সংহতি স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবেই গড়ার প্রচেষ্টায় তাই আমি উদ্বুদ্ধ হই। আজ এ নীতির প্রশংসা-বাক্য আমার কর্ণগোচর হয়; সেদিন উহার প্রতিকূলতা কম ছিল না। "প্রবর্ত্তক"-এর ছত্রে-ছত্রে বিশদ করিয়া গঠননীতির কথাই বাহির হইতেছিল। শ্রীঅরবিন্দকে আমি এই সংহতি-সৃষ্টির কথা জানাই। ইহার জন্য আমার দুইটি প্রস্তাব ছিল। প্রথম প্রস্তাব—এই সংহতি স্বাবলম্বী হইবে এবং স্বাবলম্বনের সাধনা-স্বরূপ তাহারা নিজেরাই অন্নক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবে ও স্বহস্তে বস্ত্রশিল্পের উদ্ধার করিবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই সংহতি যোগপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহাদের অর্থভাণ্ডার এক হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আমার দীর্ঘ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া উহা সমর্থন করেন এবং "প্রবর্ত্তকে"-এ এইরূপ সংহতি "সঙ্ঘ" নামে অভিহিত হওয়ায়, শ্রীঅরবিন্দ "সঙ্ঘ" নামটিও সমর্থন করেন। ইহার পর হইতেই আমরা প্রকাশ্যে "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" নাম প্রকাশ করি।

"প্রবর্ত্তক"-এর পাতায় এই সময়ে লিখিয়াছিলাম:

"ধর্ম্মই সঙ্ঘের সহায়। ভগবচ্ছক্তিই আমাদের অবলম্বন। অহমিকার কঠিন বন্ধন ঈশ্বরবিশ্বাসে খণ্ড-খণ্ড করিয়া বাংলার চরিত্রগত বলের অদ্ভুত নিদর্শন প্রদর্শন করিব। আমরা মুক্ত স্বচ্ছন্দ, কোন বন্ধন আমাদের নাই; মানবজাতির মঙ্গল-সাধনের ব্রতধারী আমরা হইব। কালধর্ম্মের প্রবল বাধা আমরা অতিক্রম করিব। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার পথে যে সকল অন্তরায়, তাহা পশুবল প্রয়োগে দূর করা সঙ্ঘ-চরিত্রের উপযোগী অস্ত্র নহে। নৈতিক বলের দ্বারাই উহা দূর হইবে। বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও চরিত্রবল লইয়া আমরা

কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। সকল অন্তরায় সূর্য্যপ্রকাশে কুয়াশার মত অন্তর্হিত হইবে।"

এই সময়েই আমার প্রিয় সুহৃৎ নলিনীকান্ত গুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "প্রবর্ত্তক"-এ লেখনী ধারণ করিয়া সঙ্ঘের যৌগিক আদর্শকে তেজস্বিনী ভাষায় দিনের পর দিন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছিলেন। ইউরোপে শান্তির ডঙ্কা বাজিয়া উঠিলে, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সর্ব্বপ্রথম বীর সৈনিক শ্রীমান্ হারাধনকে বাংলার তটপ্রান্তে সুন্দরবনে ফ্রেজারগঞ্জে কৃষিক্ষেত্র নির্ম্মাণের কার্য্যে পাঠাইয়া দেয়। আর আমাদের অকৃত্রিম সুহৃৎ সাগরকালী ঘোষ "মৃণালিনী বস্ত্রবয়নশালা" গঠন করিয়া একটি কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেন। বাংলার এই নিভৃত ক্ষেত্র চন্দননগরে বাঙ্গালী সৈনিকদল-গঠনের যেমন প্রথম সূত্রপাত হয় ও এই চন্দননগরের তরুণ বাহিনীই কামান-পরিচালনায় যেমন প্রথম অধিকার লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ বাংলার স্বাবলম্বন-সাধনায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে সর্ব্বপ্রথম হলস্কন্ধে মাঠে দাঁড়াইল চন্দননগরেরই তরুণ; আর খাদিবস্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টাও চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেই প্রথম সূচিত হয়। ভার্দুন-যুদ্ধের ইতিহাস, সুন্দরবনের কৃষিক্ষেত্র এবং প্রবর্ত্তক খাদিবিভাগ—বাঙ্গালীর সংগঠনাভিযানেরই সাক্ষ্য বহন করিবে।

সেদিন সমবেত বন্ধুদের মধ্যে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ প্রতিশ্রুতি লইলাম—স্বহস্তে কার্পাস চাষ করিয়া, উহা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রনির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি একই বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিব। বৈরাগ্যের উৎকট অনল এমন করিয়াই নানা উপলক্ষ্যে আমার অস্থি-পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইতে চাহিত; কিন্তু সে অগ্নিকে আবরণ দিবার সুধা-হস্ত আমায় সতত বেষ্টন করিয়া থাকিত, বৈরাগ্যমূর্ত্তি আর প্রকাশ পাইত না। আমার এই সঙ্কল্প-মন্ত্র সহসা উচ্চারিত হওয়া মাত্র গৃহদেবী হা-হা করিয়া উঠিলেন। তাঁর অন্তরের আকুতি বিধাতাও শুনিতেন। সেদিন আমার এক ভক্ত তরুণ[১] ভূনত হইয়া আমার এই ব্রত-পালনের ইচ্ছা স্বয়ং ভিক্ষা চাহিয়া লইল। গৃহদেবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় বটে, কিন্তু তিনি যে অসহায়া! ইষ্টমূর্ত্তির যে রূপ ও আকৃতি তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে পূজার আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহার অন্যথা হইতে না

১। দুর্গাদাস শেঠ। ইনি চন্দননগরের দেশশ্রী হরিহর শেঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

দেওয়াই ছিল তাঁর স্বভাব ও স্বধর্ম্ম। যে তরুণ আমার ব্রতভার বহন করিয়া সম্বৎসর এক বস্ত্রে কাটাইল, তাহার প্রতি স্নেহ-মমতার কি অমৃত-বন্ধন তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত, তাহা আমরা তিনজনেই অনুভব করিলাম। যুগ-প্রভাব হ্রাস পাইলে, বাহ্যতঃ ঘটনার আবর্ত্তনে কালচক্রে সে প্রেম ও ঐক্যের সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু 'কাকিমা'র পুণ্য স্মৃতি সে তরুণ আমৃত্যু মুছিতে পারে নাই, ইহা মুছিতে পারা যায় বলিয়া আমিও বিশ্বাস করি না।

এইরূপে কাঠের কারবারের সহিত সুন্দরবনের সুবিপুল কৃষিক্ষেত্র এবং 'মৃণালিনী বস্ত্রবয়ন কার্য্যালয়' সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিল।

আমার পূর্ব্বোক্ত যুবক বন্ধু ইতিপূর্ব্বে একটি 'হ্যাণ্ডপ্রেস' খরিদ করিয়া আমারই অনুরাগী আর এক বন্ধুকে পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ প্রেস পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায়, উহা আমারই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা হইলে, "প্রবর্ত্তক" পত্রিকা অতঃপর নিজস্ব প্রেসে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। "প্রবর্ত্তক" আত্মশক্তির দ্বারাই এইরূপে আপনার প্রকাশ-পথ সুগম করিয়া লইল। কর্ম্মক্ষেত্র-প্রসারণের সহিত ঝঞ্ঝাটের মাত্রা বাড়িল। সংসার তিনটি প্রাণী লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, নূতন অতিথি-অভ্যাগতের আগমনে রন্ধন-শালার কার্য্য আরও বাড়িয়া গেল। দিবারাত্র পরিশ্রমে গৃহলক্ষ্মীর শরীর ভাঙ্গিল। কর্ম্ম বাড়িয়াছে, কিন্তু অর্থের মুখ দেখা যায় না; একমাত্র কাঠের কারবার হইতে জীবন-যাত্রানির্ব্বাহের যে কয়টা টাকা প্রতি মাসে লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁতশালার কাজ আরম্ভ করা হইল। সুন্দরবনের চাষে প্রচুর ব্যয়ই হইতে লাগিল। "প্রবর্ত্তক" চলিল কতক গ্রাহকদের অনুগ্রহে এবং প্রেসের অন্যান্য আয় হইতে। সংসার-যাত্রানির্ব্বাহের সুব্যবস্থা নাই, অথচ সংসারের খরচ বাড়িয়া চলে; কেমন করিয়া চলে, সে খবর রাখার স্বভাব আমার নাই। তাই তাঁহাকেই শ্রমের সহিত দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইল। দুশ্চিন্তার দায় হইতে যথাসময়ে রক্ষা পাইলেও, শ্রমের হাত হইতে তাঁহার মুক্তি নাই। সাধ্যের একটা সীমা আছে; একদিন যে সাধ্যের সীমার বাহিরে তাঁহাকে দেখিলাম। সে কাতর-ক্লান্ত মুখচ্ছবি স্মরণ হইলে আজিও চক্ষে জল আসে।

আমরা ৫ ৭ জন মধ্যাহ্ন-স্নান সারিয়া যথারীতি ভোজনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; ভোজনের আহ্বান প্রতিদিনের ন্যায় শোনা গেল না। বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—রন্ধন শেষ করিয়া তিনি রন্ধনশালার বাহিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধূলিধূসরিতা হইয়া পড়িয়া আছেন। চক্ষের দৃষ্টি স্থির, অপলক। ওষ্ঠপুট কালিমাময়। মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত ছিন্নবল্লরীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিত। পদযুগলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুটি ধীরে-ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিয়া আমি হতভম্ব হইলাম। অনেক শুশ্রূষার পর তিনি চক্ষুঃ উন্মীলিত করিলেন। মুষ্টিবদ্ধ হস্ত শিথিল হইল, তিনি ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিলেন।

ভোজনব্যবস্থা নিজেরাই করিবার জন্য উদ্যত হইলে, তিনি কাতর কণ্ঠে তাহা নিষেধ করিলেন। স্বহস্তে পরিবেশন করা তিনি ব্রতরক্ষা মনে করিতেন। রন্ধনশালাকে তিনি দেবমন্দিরের ন্যায় পুণ্যক্ষেত্ররূপে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁর রন্ধনের মৃন্ময় পাত্রগুলি দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হইলেও, সর্ব্বদা নূতনের ন্যায় দেখাইত। চাউল একবার ধৌত করিয়া তিনি রন্ধনের উপযোগী মনে করিতেন না; বার-বার ধৌত করিয়া যখন দেখিতেন জলে আর কোন আবিলতা নাই, তখন তিনি তাহা রন্ধন করিতেন। অন্নগুলি থালিতে শুভ্র মল্লিকার ন্যায় শোভা পাইত। কুটনা কোটাতেও তাঁহার একটি বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য ছিল। প্রত্যেক আনাজটী তিনি সমান পরিমাপে কুটিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন। রন্ধনের এইরূপ পারিপাট্য রক্ষা করিতে গিয়া, তাঁর শ্রমের অবধি থাকিত না; তদুপরি রন্ধন ব্যতীত এই নূতন বেহিসাবী সংসারটির যাবতীয় কর্ম্মভারও তাঁহাকে বহন করিতে হইত। তিনি বলিতেন—রন্ধনশালায় তাঁহার যেন দম বন্ধ হইয়া যায়, মনে হয় তিনি জ্ঞান হারাইবেন। সে কথা শুনিতাম মাত্র; তিনি যে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহার কথার এই অর্থ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু সেদিনের সেই তাঁর দুঃখ-মূর্ত্তি আমায় বিচলিত করিল।

বাড়ীতে দাসী টিকিত না, ভৃত্য দুই-চারি দিন কাজ করিয়া পলাইত। তাহার কারণ—তিনি সব কর্ম্ম এমন নিখুঁতভাবে করা পছন্দ করিতেন, যাহা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার এমন নিপুণ-দৃষ্টি ছিল যে, সংসার হইতে কিছু যে অপসারিত হইবে, তাহার

পথ ছিল না। হিসাবের কড়িও তিনি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেন। মেছুনী আধ সের মাছ ওজন করিতে বসিয়া অর্দ্ধ ছটাকও যে কম ওজনে দিবে, সে পথও তিনি আগুলিয়া ধরিতেন। তিনি ফাঁকি নিজেও দিতে জানিতেন না, কাহারও ফাঁকি দেওয়া বরদাস্ত করিতেন না ; কাজেই বাহিরের লোকের নিকট তিনি খুব সমাদৃতা হইতেন না। রামেশ্বর ছিল এই সকল বিষয়ে 'মামীমা'র পুরাপুরি সমর্থক ; এই দুইজনের মধ্যে ঘর-সংসার লইয়া অদ্ভূত ঐক্য পরিলক্ষিত হইত।

তাঁর শ্রম লাঘব করার জন্য আমারই প্রস্তাবে আমার এক বিধবা শ্যালিকাকে পুত্রকন্যা সহ বাস উঠাইয়া আনাইলাম। সংসার বাড়িল, কিন্তু তিনি একজন সহকারিণী পাইয়া কিছু অবকাশ পাইলেন। আমার সংসারের সীমারেখা এইখানেই যদি শেষ হইত, তিনি আসান পাইতেন। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র সংসার-চক্র সঙ্ঘচক্রে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। স্বামীগৃহে আসিয়া এই বৃহত্তর সংসারক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রীত্বের ভার যে তাঁহাকে বহিতে হইবে, এ স্বপ্ন তিনিও মনে-মনে দেখেন নাই, আমিও কল্পনা করি নাই ; এই হেতু তাঁর কর্ম্মসীমা যতই বিস্তৃত হউক, কর্ম্মের সুবিধা যতই করিয়া দিই, সংসার বৃদ্ধির প্লাবনে তাহা নস্যাৎ হইয়া যায়। তিনি নূতন সংসার করিতে বসিয়া আত্মশক্তির আর হিসাব পাইলেন না। এই অভাবনীয় সংসার-গঠনের মধ্য দিয়া তিনি একপ্রকার উন্মাদিনীর ন্যায় সঙ্ঘের সেবা দিয়া গিয়াছেন।

সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃতির পথে শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন আমার ইষ্টস্বরূপ লক্ষ্য। ইষ্টশক্তি মৃণালিনী দেবীকে "মা" বলিয়া আমি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। তাঁহারই পবিত্র নামে বস্ত্রবয়ন কার্য্যালয়ের নামকরণ হইয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে, ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ, মঙ্গলবার, পূর্ণিমা তিথিতে মাতা মৃণালিনীর পরলোকগমনের সংবাদ আমাদের হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিল। দেবী মৃণালিনীর সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে নাই ; কিন্তু ভারতীয় জীবনসাধনায় ইষ্টের সহিত ইষ্টশক্তির আবির্ভাব আমার হৃদয় আলো করিয়াছিল। তাঁহার তিরোধান-সংবাদে আকুল হইয়া 'প্রবর্ত্তক'-এ লিখিয়াছিলাম "দেবী কালের অতল তলে নিমজ্জিতা হইলেন। সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জিতা হইল। সহস্র সন্তানের হাহাকার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে—মা, মা, জগতের অন্তরায় হইতে মুক্তা অজস্র ধারায় শক্তি

তোমার পৃথিবী ছাইয়া ফেলুক; ভারতের যে অশুদ্ধ-শক্তি উৎসবময় জনপদ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করে, তাহার বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ ঘোষণা কর; কোটী-কোটী সন্তান হর্ষে, আনন্দে তোমার অনুসরণ করিবে।”

১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ দেবী মৃণালিনীর পাণিগ্রহণ করেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ স্বামীসোহাগিনী হওয়ার কঠোর তপস্যাই দেবী করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গিনী হওয়ার জন্য তাঁর যে আকূতি, উহা পূর্ণ হওয়ার কাল আসন্ন হইলে, তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন। বিধাতার এই দুর্জ্ঞেয় বিধানের মধ্যে কি রহস্য নিহিত আছে, সে বিচার আজও আমার শেষ হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ আই. সি. এস. হইয়াও অতি সস্তায় বরোদারাজ্যের নিকট যখন বিকাইয়া গিয়াছিলেন, তখন কে জানিত দেশাত্মার জাগরণ-যুগে অকস্মাৎ বাংলা দেশ হইতে আসমুদ্র-হিমাচল তাঁর বিদ্যুৎচ্ছক্তিপ্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে! দেশহিতব্রতী পরম যোগী শ্রীঅরবিন্দ বাংলার অন্ধযুগের আবরণ দূর করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়া, ধীরে-ধীরে সমগ্র ভারতে এক অসাধারণ রাষ্ট্রজাগরণের আন্দোলন আনিলেন। রাজসম্মান, আরাম, ঐশ্বর্য্য, রূপলাবণ্যময়ী যুবতী ভার্য্যার আসক্তি তিনি পরিত্যাগ করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রে তিনি দেশ-প্রীতির অমৃত ঢালিয়া দিলেন। ধর্ম্ম ও ভাগবত-বিশ্বাসের অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া, তিনি জাতির আত্মাকে জাগাইয়া তুলিলেন। মাতা মৃণালিনী শ্রীঅরবিন্দকে স্বামিরূপে যতবার ধরিতে গিয়াছেন, নাগাল পান নাই। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তিনটি পাগলামির কথা উল্লেখ করিয়া পত্নীর নবজন্ম চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পাগলামি—‘তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন তিনি পাইয়াছেন, সবই ভগবানের; নিতান্ত আবশ্যকীয় যাহা, তাহা ব্যয় করার অধিকার তাঁহার আছে, বাকী সবই ভগবান্‌কে ফেরৎ দিতে হইবে।’ তাঁহার কথা “যে ইহা না করে, সে চোর। হিন্দুশাস্ত্রে ভগবানের ধন লইয়া ভগবান্‌কে যে দেয় না, তাহাকে চোরই বলা হইয়াছে। ভগবান্‌কে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া সাংসারিক সুখে মত্ত আছি; জীবনের অর্দ্ধেক চলিয়া যায়, পশুও এমন করিয়া কৃতার্থ হয়।

"এইরূপ পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি বুঝিতেছি; বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, এ পাপ আর নয়। ভগবান্‌কে দেওয়া মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। সরোজিনীকে যাহা দিয়াছি, তাহার জন্য অনুতাপ নাই; পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিত-রক্ষা মহাধর্ম্ম। কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিয়া হিসাব চোকে না, আজ দেশ আমার আশ্রিত। ত্রিশ কোটী ভাই-বোন এই দেশে আছে; অনেকে অনাহারে মরিতেছে, কষ্টে-দুঃখে জর্জ্জরিত, কোন মতে বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরও হিত করিতে হয়।"

এই প্রথম পাগলামির কথা বলিয়া তিনি এই পথেই পত্নীকে আহ্বান দিয়াছিলেন। মাতা মৃণালিনী একবার নাকি অনুযোগ করিয়াছিলেন "আমার কোন উন্নতি হইল না।" শ্রীঅরবিন্দ উন্নতির ঐ একটা পথ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "তুমি এই পথে যাইবে কি?"

তিনি আর এক পাগলামির কথা পত্নীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাই তাঁহার দ্বিতীয় পাগলামি। তিনি লিখিয়াছিলেন "যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শনলাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পথও থাকিবে, সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে—নিজের মধ্যেই সে পথ আছে, যাওয়ার নিয়মও দেখাইয়া দিয়াছে। আমি তাহা পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিলাম—হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়; যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে, সে সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা—তোমাকে সেই পথে লইয়া যাই। ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে আসিতে পারিবে না, কারণ তোমার তত জ্ঞান নাই। কিন্তু আমার পিছনে-পিছনে আসিতে বাধা নাই। সেই পথে সিদ্ধি সকলেরই হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেহ তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না; যদি ইচ্ছা থাকে, এ সম্বন্ধে আরও লিখিব।"

শ্রীঅরবিন্দ তৃতীয় পাগলামির কথা বলিতে গিয়া স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন "লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ—কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে। আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত মনে আহার করে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করে,

না যাকে উদ্ধার করিতে দৌড়ায়? আমি জানি—এই পতিত জাতির উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক লইয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষাত্রতেজঃ একমাত্র তেজঃ নয়, ব্রহ্মতেজঃও আছে। সেই তেজঃ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নয়, এই ভাব লইয়া আমি জন্মিয়াছি, এই ভাব আমার মজ্জাগত। ভগবান্ এই মহাব্রত সাধন করিতে আমায় পাঠাইয়াছেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজ অঙ্কুরিত হয়, ১৮ বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। তুমি ন' মাসীর কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে, কোথাকার বদ্ লোক তোমার সরল ভালমানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভাল মানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত-শত লোককে কুপথে বা সুপথে হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল; আরও সহস্র-সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবে। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না; কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।"

মাতা মৃণালিনীর মৃত্যুসংবাদে শোকের তীব্র কষাঘাত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। আমরা সেদিন শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ লইয়া কত কথা আলোচনা করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে" লিখিয়াছিলেন "সতীর পতি বড়, তার চেয়েও পতির ধর্ম্ম বড়।" শ্রীঅরবিন্দ ধর্ম্মপত্নীকে তিনটি পাগলামির ভিতর দিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। এই সকল কথার আলোচনায় আমার গৃহদেবীর মুখশ্রী নির্ম্মল উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিজের জীবনধর্ম্মে আস্থা ও প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল। আমারও বেদনাবিধুর জীবন-বেণু মুখর হইয়া উঠিল; শ্রীঅরবিন্দের মর্ম্মস্পর্শা জীবন-বেদ সারা রাত্রি ধরিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম। ধর্ম্মের জন্য, ভগবানের জন্য শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ ত্যাগের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন "শ্রীঅরবিন্দের অনুগ্রহ-প্রসাদে তুমিও ধন্য হইলে।" শ্রীঅরবিন্দের আমার বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁর স্থির-সৌম্য-শান্ত-মূর্ত্তির স্মরণ করিয়া তিনিও বলিলেন "এই তিনটী পাগলামির নেশায় তাঁহার বিভোরতা আমিও দেখিয়াছি।" সে রাত্রি আর আমাদের নিদ্রা হইল না। তিনিও খুঁটিয়া-খুঁটিয়া শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে নূতন কর্ম্ম-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। পুরাতন কর্ম্মজীবনের যেন অক্ষপাত হইয়া গেল। সাধনারও করিবার কিছু রহিল না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত এই চৈতন্যই প্রাণকে সঞ্জীবিত রাখিল :

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

হৃষীকেশের সঙ্কেতে সেই যে যাত্রা সুরু হইয়াছে, আজিও তাহার পরিসমাপ্তি হয় নাই। যাহা হয়, তাহার জন্য দুশ্চিন্তা নাই। কত প্রিয় বস্তু অন্তর্হিত হয়, কত অপ্রিয় ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ি, সুখের সীমা ছাড়াইয়া দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাই, শান্তি ও স্বস্তির প্রার্থী হই। হৃষীকেশের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, কিন্তু অশান্তি ও অস্বস্তিও বাড়ে। নয়নকোণে অশ্রু উথলিয়া উঠে। তবুও সান্ত্বনা—ঈশ্বরেচ্ছাতেই জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, দায়ী কেহ নহে। দাবী কাহারও উপর করিবার নাই। অপ্রিয় আশ্রয় হইতে মুখ ফিরাইবার চেষ্টাও বৃথা হয়। অতএব :

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

দিন চলিল। কালস্রোতঃ কোন বাধাই মানে না। কর্ম্ম হয়, ভাল-মন্দ দুই-ই। ভাল-মন্দ কিছুই প্রশ্রয় ও আশ্রয়ে ইতরবিশেষ হয় না। যাহা করি, কে যেন করিতে বাধ্য করে; সব-কিছু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কর্ম্ম নির্দ্বন্দ্বে হয়। সেখানে কোন বাধাই নাই। চিন্তার জগৎ কিন্তু সেদিন দ্বন্দ্বহীন হয় নাই। ভাল-মন্দ লইয়া বিচারের দরবার চিন্তাজগতেই অধিকতর জাঁকাইয়া উঠিল। কর্ম্মক্ষেত্র সে বিচার-শক্তির বাহিরে; সেখানে বিচারকের রায় কোন কাজেই আসে না। রাষ্ট্র ছাড়িয়া স্বাবলম্বী হওয়ার প্রবৃত্তি একের পর আর এক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছিল। রাষ্ট্রকর্ম্মে যে উৎকণ্ঠা ছিল, আশঙ্কা ছিল, দুশ্চিন্তা ছিল, এখন আর এই সকলের কোনই প্রয়োজন রহিল না। কর্ম্ম অতিথির ন্যায় প্রতিদিন উপনীত হয়; আমার শরীর-মন তাহার যথোচিৎ সৎকার করিয়া ধন্য হয়। বিবেক চীৎকার করিয়া মরে। আমার দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির উপর কিন্তু তাহার প্রভাব স্পর্শ করে না। এই সময়ে

কেহ বিষ দিলে, বিষ খাইতেও কুণ্ঠা হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্য, যাহা অহিত, যাহা অমঙ্গল, তাহা সম্মুখে দেখা দিত বটে; আমার বিচার না থাকিলেও, ঐগুলি জীবনে সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত হওয়ার সুবিধা পাইত না। আমি ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণের মন্ত্র-সাধনায় এই কথাই ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, ভাল-মন্দের বিচার ও বিবেক মানুষের স্বভাবসংস্কারে স্বরূপ হারাইয়া আচার-ব্যবহারগত যাহা ভাল ও মন্দ বলিয়া সমাজে প্রচলিত, তাহাতেই অভিভূত হইয়াছে। জীবনযন্ত্র যখন ভগবানের সঙ্কেতে চলিতে থাকে, তখন পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ বিচার-বিবেক কর্ম্মের সহিত যুক্তি না পাইয়া কিছুদিন চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হয়; তারপর ঐগুলিও ভাগবত-কর্ম্মের সূত্র ধরিয়া নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর ঈশ্বরকৃত কর্ম্মের অভিব্যক্তির সহিত অন্তরের অমিল চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়। সাধক মুক্তি পায় অন্তর-দ্বন্দ্বের পীড়ন হইতে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের কর্ম্মপ্রেরণায় জীবনসঙ্গিনী যেন হারাইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের যেন কোন সুযোগ বিদ্যমান রহিল না। তবুও ছায়ার ন্যায় তিনি চিরসঙ্গিনী; কিন্তু তাঁহার কায়ার সহিত শুধু দেহগত নয়, অন্তরের সম্পর্কও যেন ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রফুল্লমুখী গৃহদেবী সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই আত্মস্থা হইয়া আমার অনুসরণ করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই অতি অল্প বয়সেই তাঁহার ভাবগম্ভীর-প্রতিমায় প্রবীণতার ছায়াপাত হইয়াছিল। ইহা বার্দ্ধক্যের শিথিলতা নহে, ভাবগাম্ভীর্য্যের ঘনিমা ও আতিশয্য। এই ২৯ বৎসর বয়সেই তিনি এমন গুরু-প্রকৃতির হইয়াছিলেন, যাঁহার সম্মুখে অতি প্রগল্ভ নরনারীও মাথা নত করিতে বাধ্য হইত।

কাজের অন্ত রহিল না। জীবনসঙ্গিনীর সহিত বাহ্যতঃ সম্পর্ক না থাকিলেও, সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে এমন একটা সুদৃঢ় জীবন-নীতি আমাদের উভয়কেই অভিভূত করিয়াছিল, যাহা স্বতঃই নীরব ভাষায় এই কথাই ব্যক্ত করিত "তাঁরই কাজে আজি রত, আর কিছু জানি না রে!" জীবননিয়ন্ত্রণের ভার ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া অবধি এমন দিন কখনও আসে নাই, যেদিন নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইয়াছে। কে যেন অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠাইয়া দেয়, উপাসনা করায়, "প্রবর্ত্তক"

লেখায়, অসংখ্য কর্ম্মের হিসাব রাখায়। সে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মে অবসন্নতা নাই। যথাসময়ে শয্যাগ্রহণ করি, আবার উঠি যথাকালে। এইভাবে জীবন চলিয়াছে।

প্রাঙ্গণে উষার আলো বিচ্ছুরিত হয়, শেফালির ডালে-ডালে শিশিরসিক্ত ফুলের হাসি, বাতাসে মধু-সৌরভ ভাসিয়া আসে। ঝলমল সূর্য্যকিরণে গৃহচূড়া উদ্ভাসিত হয়। দুয়ারে আসিয়া ভিখারীর পর ভিখারী কেহ খঞ্জনী, কেহ একতারা, কেহবা বেহালা বাজাইয়া গান গাহিয়া যায়। মুষ্টিভিক্ষায় কেহ বঞ্চিত হয় না। সঙ্গীত নীরব হয়; অর্থ তার ভাসিয়া বেড়ায় অনেকক্ষণ, মনে গাঁথিয়া যায়:

"বাহির-ভিতর দুই সমান রেখ ভাই,
মানুষ যদি হতে চাও।"

এমন কত গান!

"প্রবর্ত্তক"-এর সুর-সঙ্কেতে তরুণের আনাগোনা বাড়িল। বাণীর নেশায় চক্ষে যাহাদের রঙ ধরিয়াছিল, তাহাদের দেখিয়াই চিনিতাম। ইহার মধ্যে কাঁচা-পাকা রঙ দুইই ছিল। আমি ইচ্ছা করিয়া পাকা রঙের চেয়ে কাঁচা রঙে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতাম। কাঁচা রঙ গায়ে ছোপ দিত, দেখাইত ভাল। সেদিন ছিল এমনই অবস্থা। স্বেচ্ছায় প্রবঞ্চিত হইতাম। পাকা রঙের লোকেরা সমালোচনা করিত, হয় ত আমার ভ্রান্ত-দৃষ্টির জন্য দুঃখ-সংশয় দুই-ই প্রকাশ করিত। আমার আচরণের জন্য দায়ী যে আমি নহি, অনেক দিন সে কথা তাহারা বুঝে নাই।

ভগবান্ যখন অন্তর অধিকার করেন, তখনই জ্ঞানের অফুরন্ত উৎস বিকশিত হয়। সে জ্ঞানধারার নানা ভঙ্গী আছে। হৃদয়ের ধর্ম্মেও ঈশ্বর-প্রকাশের প্রেমঘনরূপ—তারও এক ছন্দঃ নহে, বিচিত্র ভঙ্গী। প্রাণের কর্ম্মপ্রেরণায় ঈশ্বরের আলো যখন প্রকাশ পায়, তাহাও এক-বর্ণ নহে, ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করে। এমনই শরীরটাতেও তাঁর রূপের আভা প্রকৃতির বিলাসের ন্যায় নানা মূর্ত্তি ধরে। কেহ আসিলেই ঈশ্বরের প্রকাশ-মূর্ত্তি দেখার জন্য তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম। দুইজনের মুখেই যদি হাসির রেখা ফুটিত, মনের মানুষ বলিয়া জড়াইয়া ধরিতাম। এই স্পর্শটা দেহের চেয়ে মনেরই বেশী হইত। মনের মানুষ খোঁজাও ছিল এক বড়

কাজ। মনের মানুষ খুঁজিতে-খুঁজিতে কত গানই বাঁধিতাম, গাহিতাম! অনেক জনের ভীড় ঠেলিয়া দুই-একজনই মিলিত। ভীড়ের সময়ে এই দুই-একজন উপেক্ষিত হইয়াই থাকিত; ভীড় কমিলে ইহাদের আনন্দ ও মহিমা ভাবে ও ভাষায় চিত্ত আমার পুলকিত করিত। এই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই এক, দুই, তিন করিয়া এমন 'মনের-মানুষ' লাভ হইয়াছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ তাই সংহতি নয়, এই সব মনের মানুষেরই মিলন-তীর্থ।

ভাবের ঘোরের সঙ্গে কর্ম্মের সামঞ্জস্য ঈশ্বরই রাখিতে পারেন, মানুষ পারে না। মানুষ হয় ভাবে থাকে, নয় কর্ম্মে মাতাল হয়। ভাব ও কর্ম্ম, দুই-ই পুরাদমে চলিল ভগবদিচ্ছায়। ভাবের কথা ছাড়িয়া দিই, কর্ম্মের কথাই বলি।

প্রথম যুদ্ধ-শেষের কথা। কথাটা প্যারিসের। "প্রবর্ত্তক"-এর জন্মদিন হইতেই এই যুদ্ধ-পর্ব্ব ভাবতঃ আমায় খুবই পাইয়া বসিয়াছিল। আত্মীয় ও বন্ধুদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ-হেতু সেদিনের ইউরোপের কুরুক্ষেত্রের সহিত সংযোগ-রক্ষা করিবার সুবিধা হইয়াছিল। যুদ্ধ-শেষে এক ফরাসী মহিলার অনুভূতি বর্ত্তমান পাঠক-পাঠিকার মন্দ লাগিবে না। অতি সংক্ষেপেই তাঁহার কথা উল্লেখ করিব। তিনি লিখিয়াছিলেন: "শান্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তোমরা কত কি মনে করিতেছ! কত নাচ, কত গান, কত আনন্দই না হইতেছে! * * * হয়তো মনে করিতেছ—দেশপ্রেমিক আনাতল নূতন উপন্যাস-রচনার বিষয় সংগ্রহে মত্ত! কবি রিশ্‌প্যাঁ নব-প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ। সমাজতন্ত্রী তমাস আশ্বস্ত। কিন্তু কিছুই নাই। নাচ-গানের অভাব নাই বটে; গালে মাখার লাল রং চতুর্দ্দশ লুইয়ের সমস্ত রাজ্যকালে বোধ হয় অত বিক্রয় হয় নাই, কিন্তু তবুও যেন উৎসাহ নাই! * * একটা নৃত্যামোদ-নিমন্ত্রণে যোগ দিয়াছিলাম। নৃত্যযুদ্ধ শেষ হইলে, একজন সৈনিক তাঁহার প্রণয়িনীকে আরাম-কেদারায় বসিয়া চুপি-চুপি বলিতেছে শুনিলাম "সারেন (প্রিয় সম্ভাষণ), আনন্দের কি আছে? যাদের শিরঃ-কঙ্কালের উপর এই নৃত্য, তারা আমারই মত ছিল, তাদেরও প্রিয়জন ছিল, আজ তারা এই আমাদের আনন্দ দেখিয়া কি অভিশাপ দিতেছে না?"

পত্রলেখিকা একখানি ছবি পাঠাইয়াছিলেন; ছবিখানির উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন "এক সঙ্গে দুই-তিন শত মড়ার মাথা, তার উপর কাঠের

ক্রশ পড়িয়া গিয়াছে; উপরে শ্যামাঘাস লক্ লক্ করিতেছে, এদের মাথার খুলির ভিতর তাহার শিকড় পৌঁছিয়াছে। মৃত কঙ্কালগুলি কি তপস্যা করিতেছে? তপস্যা করুক আর নাই করুক, তাদের জীবনের উদ্দেশ্য পদদলিত করিয়া যে অকৃতজ্ঞ-জাতি আজ আনন্দমগ্ন, কবরের ভিতর হইতে এই সুখের অন্নে বালি দিতে তারা এক ছেদহীন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের সেই ইচ্ছা আরও করালিনী মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইবে। * * ডাচেসল্যাণ্ড-কবরে যে সকল সৈনিক বীর শয়ন করিয়া আছে, তাহারা দূরের আকাশে ধূমায়মান কলের চিম্‌নির দিকে তাকাইয়া, ধনিকের আবার শ্রমিককে পিষিয়া মারার আগুন জ্বালা দেখিতেছে। এই সব ভাবিয়া আনন্দের ধূম স্তম্ভিত।

"২৮শে জুন সন্ধিপত্রে যখন স্বাক্ষর হয়, বঁনভ্যালের রেষ্টুরেণ্ট ৩০।৪০ জন মিত্র ও নিরপেক্ষ জাতির প্রতিনিধি লোকচক্ষুর অন্তরালে পরস্পর ঐক্যসূত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন। বাহিরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কামানশ্রেণী বজ্র-নিনাদ করিতেছিল। বন্দুকের ফট্-ফট্ শব্দে কাণে তালা ধরিতেছিল। তখনও রণবাদ্য বাজিতেছে ঝন্-ঝন্-ঝন্, আর আকাশে রণ্-রণ্ করিয়া ব্যোমযান উড়িতেছে। দিগ্‌দিগন্তে ইথর-তরঙ্গে শান্তিবার্ত্তা-প্রেরণের ব্যবস্থা চলিয়াছে।

"বঁনভ্যালের সভাভঙ্গ হইল। সভার ফলাফলের কথা কেহ জানে নাই। কিন্তু সভাপতি চালস্‌গিদ্ বলিতে ভুলেন নাই 'আজিকার সন্ধিসর্ত্ত বোধ হয় স্থায়ী হইবে না। রাজ্যের আদানপ্রদান, অর্থবিনিময় দুই বৎসরের মধ্যেই বদ্‌লাইয়া যাইবে। সন্ধির কোন সর্ত্তই তাহার থাকিবে না।' গিদের এই নৈরাশ্যের মধ্যেও আত্মপ্রসাদ ছিল। যে নিঃস্বার্থ-সাধনায় ইউরোপের শান্তিপ্রতিষ্ঠা, তাহা আমরা ব্যর্থ হইতে দিব না এই কথায়।

"মিত্রপক্ষের বুকে এই আশাটুকুই ছিল সান্ত্বনা। সমস্ত পৃথিবীই বুঝিয়াছে—ইউরোপের কুরুক্ষেত্র উপস্থিত ধামা চাপা রহিল।"

সেদিন যুদ্ধারম্ভ মাত্র; অন্তরে যে প্রেরণা পাইয়াছিলাম, তাহাতে বাংলায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলাম। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এম্বুলেন্স-কোর গঠনের সূত্র অবলম্বন করিয়া আমার প্রচেষ্টার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফরাসী দেশে বাঙ্গালী সেনাবাহিনী গড়ার সুযোগ পাইয়া,

আমার সে প্রয়াস প্রতীকচ্ছলে সিদ্ধ হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বযুদ্ধের সামরিক পরিস্থিতির আলোচনায় কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যুদ্ধের তিনটী সম্ভাবনীয়তার কথা তাঁহার পত্রে উল্লিখিত ছিল, সেইগুলি এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত পত্রখানির এই অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম :

I. "Those bringing about the destruction of the two Teutonic Empires—German and Austrian.

This may happen either by an immediate German defeat—its armies being broken and chased back from Belgium and Alsace-Lorraine to Berlin, which is not possible or by the Russian arrival at Berlin and a successful French stand near Rheims or Compiegne or by the entry of Italy and the remaining Balkan States into the war and the invasion of Austro-Hungary from two sides.

II. Those bringing about the weakening or isolation of the British Power.

This may be done by the Germans destroying the British Expeditionary Force and entering Paris and dictating terms to France, while Russia is checked in its march to Berlin by a strong Austro-German force operating in the German quadrilateral between the forts of Danzig, Thoren, Posen and Konigsburg. If this happens, Russia may possibly enter into a compact with Germany, based on a reconciliation of the three Empires and a reversion in the old idea of a simultaneous attack on England and a division of her Empire between Germany and Russia.

III. Those bringing about the destruction of British Power.

This may happen by the shattering of the British fleet and a German landing in England."

যুদ্ধের এই তিন সম্ভাবনী পরিণামের মধ্যে সেদিন তাঁর প্রথমোক্ত সম্ভাবনাটীই ফলবতী হইয়াছিল এবং বৃটনের জয়ে আমরা সেদিন বিশেষভাবে আশান্বিত হইয়াছিলাম।

সেদিনকার "প্রবর্ত্তক" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে অনবগত নহেন। ইউরোপীয় যুদ্ধে বৃটেনের জয় হইলেও, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের বিপুল প্রস্তুতির কথা আমরা বরাবর লিখিয়াছি। বৃটেনে বাধ্যতামূলক সামরিক-বিধির প্রবর্ত্তন এবং মিশর ও ভারতের সহিত যথাযোগ্য মৈত্রী স্থাপন করিয়া বৃটন বিপুল শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে, বৃটনের ইহাই উত্তম ভবিষ্যৎ; কেন-না, বিজয়ী বৃটনকে সুদূর ভবিষ্যতে উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে, পরকীয় অন্য বৈদেশিক-শক্তির আনুকূল্য অপেক্ষা ভারত ও মিশরের সম্মিলিত শক্তি অধিক সুখ ও শ্রেয়ের কারণ হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া সুস্পষ্টভাবে "প্রবর্ত্তক"-এর ভাব ও কর্ম্মে উহাকেই রূপ দিবার জন্য আমি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ভগবান্ আমায় এই সময় হইতে বিশ্ব-মানবতার মঙ্গল লক্ষ্যেই সুনির্দ্ধারিতরূপে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমার চিন্তার জগৎ ও কর্ম্মের জগৎ এক হইয়া গিয়াছিল। আমার লক্ষ্য সুস্পষ্ট ছিল; শ্লথগতি হইলেও, সে লক্ষ্য হইতে আমি কোনদিন সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হই নাই।

বিশ্বমানবতার হিতসাধন করিতে হইলে, ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার সুস্পষ্টতা দরকার। এই কর্ম করিতে হইলে, কংগ্রেসের ন্যায় একটা বিপুল সংহতি ইহার অনুকূল হইবে না, এ বিষয়ে আমার কোনই সংশয় ছিল না। তথাকথিত একটা বৃহত্তর সংহতি-চক্র গড়িলেও, এই কর্ম্মের জন্য তাহা উপযোগী হইবে না। হৃদয়-বীণায় অন্তর্য্যামীর যে মধুময় সঙ্কেত ঝঙ্কৃত হইত, সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যে সমর্থন-বাণী শব্দে ও অনুভূতিতে পাইতাম, তাহাতে আমি আমার লক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হই নাই। গতি ক্ষিপ্র না হইলেও, লক্ষ্য অমোঘ, অব্যর্থ হইয়াছিল।

রাষ্ট্রবিপ্লবের ভিতর দিয়া জাতির অভ্যুত্থান ও মুক্তির জন্য বিপুল কর্ম্মি-সংহতি, অর্থ ও অস্ত্রবলের প্রয়োজন। আমার পথ বিপ্লবাত্মক নহে, এমন কি প্রতিবাদের কণ্ঠও সেখানে প্রয়োজনীয় হয় না। মানবতার মুক্তি ও

শান্তির উদ্দেশ্যে ভারতের আত্মাকে জাগ্রৎ করাই প্রথম কাজ। কিন্তু সে বৃহত্তর কর্মসাধনার পূর্ব্বে বাংলার সুপ্তায় বক্ষপুটে শতাব্দী-শতাব্দী কাল ধরিয়া যে অধ্যাত্মজাতিগঠনের ধ্বকৃধ্বনি উঠিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া, তাহার জাগ্রৎ অনুভূতি লইয়া এক বিশেষ সংহতি-সৃষ্টির প্রয়োজন। "প্রবর্ত্তক"-এর বাণীমন্ত্র ইহার জন্য কয়েক জন চিহ্নিত সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের পরিচয় পাইলাম। পটভূমিকার উপর সুরঞ্জিত চিত্র যেমন ক্ষেত্রটিকে আড়াল করিয়া ধরে, সেদিন আমার গৃহলক্ষ্মীর সেই অবস্থাই হইয়াছিল। পতি-পত্নীর মধ্যে এই ব্যবধান সুখের নহে। আমি ঈশ্বর-প্রেরণা-মুগ্ধ, তিনি পতিসোহাগিনী। আমার উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট ছিল না। তিনি অল্পই বুঝিতেন। তবে তিনি মনে করিতেন যেন তিনি দূরে পড়িয়া যাইতেছেন। এইরূপ অনুভব করিয়া তিনি হাঁপাইয়া উঠিতেন—কত প্রশ্ন তুলিতেন; তাঁহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তোলার শিক্ষা দিবার অবকাশ পাইতাম না; সময়ের অভাবে নহে, প্রবৃত্তিই ছিল না। এই নিষ্ঠুরতার জন্য আমি কি দায়ী হইব?

আমার কর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত অনুসরণ; অতএব সে যুগের ঘটনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও পাঠকদের গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জীবনযাত্রার নূতন সূত্রপাত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিদারুণ অঙ্কপাত। সেই কথাই জীবনসঙ্গিনীর চরম কথা। আজ এই সূত্রেই জাতির অপ্রকাশিত কয়েক পৃষ্ঠা ইতিবৃত্ত রচনা করিতেছি।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ শুধু বিপ্লবী হইবে না, তাহা নহে; অপ্রতিবাদী হইয়া কার্য্য করিবে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতি নারীপুরুষ ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত হইবে। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে নিখিল মানবজাতি এই একই অন্তর্য্যামীর সঙ্কেতে চলিয়াছে; প্রতিবাদ করিবে কাহাকে? শূন্যে ফুৎকার নিক্ষেপ করিয়া ইহাতে যে নিজেকেই কলঙ্কিত করা হইবে!

কিন্তু বিনা সংঘর্ষে কি কর্ম্ম হয়? বিনা ধ্বংসে কি সৃষ্টির শতদল বিকশিত হয়? অরাতিদমন না হইলে কি সাধু পরিত্রাণ পায়? এ প্রশ্ন, এ বিচার আত্মসমর্পণযোগীর নহে। ঈশ্বরের যন্ত্র যে, সে কি শুধু নিজেই এই অধিকার লাভ করিয়াছে? এ জগৎ কি মহাযন্ত্রশালা নহে? এক অদ্বয় যন্ত্রী ব্যতীত

অন্যের কর্ত্তৃত্ব আত্মসমর্পণযোগী কি স্বীকার করিতে পারে? তবে কর্ম্ম হইবে কি প্রকারে? প্রতিদিনের পদক্ষেপ প্রমাণ করিয়া চলে যোগীর অপ্রতিবাদী গতিচ্ছন্দঃ। পৃথিবীর ধূলি-ক্ষেত্র হয়তো বিমর্দ্দিত হয়, বায়ুসাগর সন্ত্রাসিত হইয়া উঠে—পথিকের চিত্তে এই সংঘর্ষ স্পর্শ করে না। ধূর্জ্জটির শির হইতে নামিয়া আসিতেছে ভাগীরথী—কানন-কান্তার, অচলস্তূপ সম্মুখে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে। জাহ্নবীর বিরোধ নাই; সে আঁকিয়া-বাঁকিয়া বিপত্তিসঙ্কুল পথে আপনার আনন্দে হিল্লোলিত হইয়া চলিয়াছে। বাধার সহিত সংগ্রাম নাই, প্রতিবাদ নাই। গতি যে তার অনাহত; অনন্ত সাগর-বক্ষঃ তার লক্ষ্য। পথের কোন্দলে সে কখনও লক্ষ্যচ্যুতা হয় না। এইরূপ সঙ্ঘের সংগঠনস্রোতের আবিষ্কার করিয়া অতি ক্ষীণ তটিনীর ন্যায় যাত্রা আমাদের সুরু হইয়াছিল বিনা আড়ম্বরে—আত্মার অনুপ্রেরণায়। প্রবাহের প্রাণ—অফুরন্ত আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মস্থ যোগীর সঙ্ঘই বাংলায় নববেদ মূর্ত্ত করিয়া, নিখিল ভারতাত্মার জাগৃতি-সঙ্গীত গাহিতে-গাহিতে বিশ্বমানবের সম্মুখে মুক্তি ও শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিবে। এ অমৃতময় আদর্শ স্বপ্ন বা কাহিনী মাত্র বলিয়া সেদিন যাহারা ফিরিয়া গেল না, তাহাদেরই লইয়া গড়িয়া উঠিল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ স্বাবলম্বী হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, প্রেম ও ঐক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে না; ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না। এই স্বচ্ছ নিরাপদ্ যাত্রাপথে সহসা ঈশ্বরের সতর্কবাণী কর্ণ বধির করিল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম—অতীতের সাথী যারা, তারা যে আজ বন্দী! সহযাত্রীদের শৃঙ্খলিত জীবন উপেক্ষা করিয়া এই যে নব-যাত্রা, তাহা কি তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা নহে?

বৃটনের যুদ্ধজয়ে ভারতের প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। ভারতে নূতন শাসনসংস্কার-প্রবর্ত্তনের আব্‌হাওয়া বিলাতের পার্লামেণ্ট হইতে ভারত পর্য্যন্ত হিন্দোলিত হইতেছিল। এই অবস্থায় বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি আসন্ন হওয়া উচিত ছিল; তাহা না হইয়া কুখ্যাত রাউলাট বিল প্রবর্ত্তিত হওয়ার আয়োজন দেখা গেল। যুদ্ধকালে অন্তরীণ আইনে এই চারি বৎসর যাহারা বন্দী, তাহারা মুক্তি না পাইয়া কারাবন্দী থাকিবে, আর দেশ নূতন শাসন-সংস্কার লইয়া তাহাদের ভুলিয়া যাইবে? আর আমরাও বাহিরের রাষ্ট্র-সংস্কারের প্রতি অনপেক্ষ হইয়া আত্মার গতি ধরিয়া চলিব?

ইহা যেন বিসদৃশ মনে হইল। বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য "প্রবর্ত্তকে" শুধু আলোচনা নহে, অনাড়ম্বরে ও অবিজ্ঞাপনে ইহার জন্য ব্যবস্থায় ও আয়োজনে জীবন অবকাশহীন হইয়া পড়িল। অন্তরীণদের মুক্তি-আন্দোলনের সে অপ্রকাশিত অধ্যায় আজ প্রকাশ না করিলে, বাংলার জাতীয় ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় অস্পষ্ট বা মিথ্যারঞ্জিত হইয়া থাকিবে। মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে সত্যগোপনস্পৃহা সুদৃঢ় শিকড় গাড়িয়া আছে, তাহাই ইতিহাসের পৃষ্ঠা মিথ্যায় ভরায়। সত্য স্তব্ধ মৌন হইয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের খোরাক যোগায়। আমি সাধ্যমত সে যুগের এই ঐতিহাসিক অবস্থার সত্য বিবরণ বলিবার প্রয়াস করিব।

যে পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন লইয়া মাত্র পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে এক নবমবর্ষীয়া বালিকাকে বধূরূপে ঘরে আনিয়াছিলাম, বাহ্যতঃ স্বদেশীযুগের অভ্যুদয়ে এবং পারিবারিক জীবনক্ষেত্রে আমার সর্ব্বপ্রথমা কন্যা বৎসর পূর্ণ না হইতেই কালগ্রাসে নিপতিত হওয়ায়, বিধাতা সে স্বপ্ন জীবনক্ষেত্র হইতে একটি রেখা না রাখিয়াই মুছিয়া দিয়াছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহাতে পারিবারিক জীবনের পূর্ব্ব-সুখস্মৃতি চিরদিনের জন্য মুছিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। অনাঘ্রাত কুসুমের মত দিগ্দেশ হইতে তরুণেরা আসিয়া আমায় ঘিরিয়া ধরিল। তাহারা ভুলিতে চাহিল পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, গৃহ, পরিবার ; আমি স্ব-ধামে বসিয়া পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন-সুখে কেমন করিয়া মগ্ন থাকিতে পারি ? ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত হইয়া, আমি স্বতন্ত্র সংসার-জীবন গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই সংসারে আপনার বলিতে ছিলেন শুধু জীবনসঙ্গিনী। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইত—ইনিও তো আপনার জন! যাহারা সর্ব্বহারা হইয়া "প্রবর্ত্তক"-এর স্বপ্ন সফল করিতে চাহে, তাহাদের নেতৃরূপে আপন জন লইয়া দাঁড়াইতে পারি কি প্রকারে ? এই সময়ে এই দ্বন্দ্বে আমার চিত্ত সতত বিচলিত হইত। স্ত্রীর প্রতি বিরক্তি নয়, কর্ত্তব্যের দায়েই তাঁর নিকট হইতে যত দূরে থাকিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতাম।

আমার আচরণে ও ব্যবহারে যে ভাব প্রকাশ পাইত, তাহা যে তাঁহাকে কিরূপ মর্ম্মপীড়া দিয়াছে, তাহা আজ স্মরণ করিয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিষাদের শিহরণ উঠে ; কিন্তু সে ব্যথার প্রতিকার আজ আর হইবার নহে। কেবল মনে হয়—"আসিবে আবার তুমি, আসিবে আবার !"

আমি চাহিতাম পরকে আপন করিতে, আপনাকে পরের ন্যায় দেখিতে। এই নীতির আশ্রয়ে যারা আপন ছিল, তাহারা একে-একে পর হইয়া গেল ; কিন্তু একজনকে আর ছাড়া গেল না—তিনি যেন আমার জীবন-গতির মর্ম্ম বুঝিয়া পর হইয়াই আপন-রূপে সঙ্গে-সঙ্গে রহিলেন ! পরকে আপন করার তপস্যার চেয়ে আপনকে পর করার যে কি ব্যথা, কি কঠোর সাধনা, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো বলিতে পারিতেন, আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে তাহা অনুভব করিয়াছি।

আমার লক্ষ্য বহুদূরপ্রসারী। গতিপথে প্রতি পদে নিজের সঙ্কীর্ণ সংস্কার ধ্বংস করিতে-করিতে পথ চলিয়াছি ; আর একজন আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা হইয়াও, আমার পায়ের দাগের উপর পা বাড়াইয়া চলিয়াছেন অতিশয় আশঙ্কায় ; কেন-না, তিনি বুঝিয়াছিলেন পথের এদিক্-ওদিক্ পা পড়িলেই তিনি সঙ্গহারা হইবেন। আমার জীবনের সঙ্গে আপনাকে সম্মিলিত কবিয়া দেওয়ার সে করুণ আকুতি-মর্ম্ম ভাষায় ব্যক্ত হইবে না।

পৃথিবীতে সম্বন্ধ-তত্ত্বের মহিমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আর কিছু নাই। গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, প্রভু-ভৃত্য, সখা-সুহৃৎ, পতি-পত্নী—এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে ইতরবিশেষ বিচার চলে না। সর্ব্বত্র সম্বন্ধের অমৃতই ঝরিয়া পড়ে। সম্বন্ধের নাম ও প্রকার ভেদে এই অপার্থিব রসের তারতম্য হয় না। আমি সে যুগে পতি-পত্নীর সম্বন্ধের বাহিরে রস-প্রত্যাশী হওয়ায়, এইখানে কিছু অন্ধ-দৃষ্টি ছিল। তাই দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই। অমৃত-প্রবাহ কত যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন এই পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের অমৃতাস্বাদে নূতন দৃষ্টি লাভ করিলাম, সেইদিনই দেখিলাম—বিগ্রহের অন্তর্দ্ধান। কিন্তু হৃদয় আমার শূন্য নহে। আত্মা যে অবিনাশী, তার প্রমাণ আমি স্বয়ং পাইয়াছি। সম্বন্ধের অমর বন্ধন মরণ জয় করে। সে অনুভব প্রতিমা-বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়াই উপলব্ধিগম্য হইয়াছে ; কত প্রশ্ন দিবা-রাত্রি তাঁর কণ্ঠে শুনিয়াছি ; প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ মিলে

নাই, অথচ আমার কথার বিরাম নাই, লেখার বিরাম নাই। অবকাশ নাই শুধু স্ত্রীর প্রশ্নোত্তর দিতে, তাঁকে দুই দণ্ড সঙ্গে রাখিতে। কেন এত বিমুখতা তাঁর প্রতি? অনেক পীড়াপীড়ির পর হয়তো উত্তর দিয়াছি—কৈ না, তোমার তো কোন অভাব নাই; ভালই আছ প্রভৃতি। বাহিরে অনাড়ম্বর ঔদাসীন্যময় এই আচরণ; অন্তরের আকর্ষণে কিন্তু এক অনৈসর্গিক বিধানে হিয়ার পশ্চাৎ যে হিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাতে অবিভাজ্য-যুক্তির রসায়নই লেপন করিতেছিল—নতুবা পরবর্ত্তী যুগের বৈপ্লবিক বিবর্ত্তনেও দুইটি হিয়া শাশ্বত যুগের জন্য এক হইয়া রহিল কেমন করিয়া? মরণের ব্যবধানেও যুক্তির আনন্দ হইতে কি হেতু বঞ্চিত হইলাম না? প্রেমই মানুষকে অমর করিয়া রাখে—রূপ নয়, আচার-ব্যবহার নয়।

শরীর অসুস্থ হইয়াছে, আমি তো খেয়াল করি নাই, ধর্ম্মপত্নী সে খবর রাখিয়াছেন। তাঁর চক্ষুর সঙ্কেত না পাইলে, নিজের অসুস্থতাও তো বুঝিতে পারি না! কি খাইলে কি হয়, কি করিলে সুস্থ থাকি, কেমনটি থাকিলে শান্তি ও আনন্দ লাভ করি, ভিন্ন-দেহা হইয়াও, সে নির্ভুল দৃষ্টি কেমন করিয়া তিনি লাভ করিয়াছিলেন? এ রহস্যের মর্ম্মভেদ কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়, জানি না। তবে একজন যে একজনের জীবন-ভার লঘু করিতে পারে, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে লঘু হয়, সে সত্যই ভাগ্যবান্। যে লঘু করে, সে যে কতখানি আপনহারা হয়, তাহা বুঝিয়াছি বলিয়াই ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, এমন না হইলে, একজন অন্যে অম্বিত হয় না; পরকে আপন করার অপার্থিব বিধান চরিতার্থ হয় না এবং এইরূপ যেখানে হয়, সেইখানে যে অমৃতোৎস বিকশিত হয়, তাহা রুদ্ধ হয় না জীবন-মরণের কোন ব্যবধানে। একের সঙ্গে অন্যের এই প্রেম, এই ঐক্য আমার জীবনে শুধু বাক্য নয়, বস্তুতন্ত্র সত্য।

আমায় যে কেহ মলিন বসনে, মলিন পরিচ্ছদে দেখে নাই, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। শুধু আমার বেশ-ভূষা নহে; আমার কণ্ঠাস্থি যে বাহির হইয়া পড়ে নাই, চক্ষের কোলে যে মসীচিহ্ন স্থান পায় নাই, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের শান্তি কিছুর জন্য আমি দায়ী ছিলাম না; ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, ইহাই জানিতাম। ঈশ্বরের শক্তি যে বিগ্রহরূপে আমার সঙ্গে-সঙ্গে—এ কথা কি সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম?

কর্ম্মক্লান্ত হইয়া যদি দেখিতাম গৃহদেবীকে—নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়-প্রাণ স্নিগ্ধ হইত। আমার অনাদরে সে সোণার কমল বিন্দুমাত্র মলিন-মূর্ত্তি ধরিত না ; কোন অলক্ষ্যে ঐক্যের নির্ঝর ঝরিত। নয়নে বিকশিত দেখিতাম করুণার অলৌকিক-জ্যোতিঃ, অধরে অনিন্দ্য হাসির তাপহীন বিদ্যুৎ, কণ্ঠে অমৃত-শীতল-বাণী। আর কোমল করপল্লবে সর্ব্বাঙ্গে পরশ দিয়া, তিনি স্বাস্থ্য ও আনন্দের মধু লেপন করিতেন। মনে হইত—আমি চির-বিজয়ী। দৃঢ়প্রত্যয় হইত—আমার মৃত্যু নাই, আমার পতন নাই।

কোথা হইতে এই জয়-বার্ত্তা আমার হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিত! আজ নিঃসংশয়ে বলিব—জাতির গৃহে-গৃহে একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের বিজয়িনী সতীমূর্ত্তি বিরাজ করুক। তবেই বিপত্নীক হইলেও, পুরুষ বুঝিবে—সে হৃদয়হারা নহে, আর নারী বুঝিবে—বৈধব্য-মূর্ত্তি পতির দেহান্তরের চিহ্ন-ধারণ মাত্র, অন্তর তার শূন্য নহে।

পতি-পত্নীর এই অপার্থিব সম্বন্ধই পুরুষ ও নারীকে বিজয়িনী শক্তি দিতে পারে। সম্বন্ধের এই অমৃতই দিয়াছে নূতন জন্ম—সঙ্ঘের পুরুষ ও নারীকে। সঙ্ঘের ভিত্তিতলে এই মহাশক্তিই অশরীরিণী হইয়াও চিরায়ুঃ হইয়া রহিয়াছেন।

কর্ম্ম তখন ভীম প্লাবনের ন্যায় আমার জীবনে অবতরণ করিয়াছে। আমার কিছু দেখিবার ও ভাবিবার সময় নাই। শুধু আমার নহে, আমাকে ঘিরিয়া যে সমষ্টি গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহারও সবখানি 'তাবানস্য মহিমার' ন্যায় তাঁহাতেই বিধৃত হইতেছিল, আজিও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই।

অতএব আমার জীবন-কাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে অলক্ষ্যে যে শক্তির অনুসরণ, তাহাই জীবন-সঙ্গিনীর সত্য-কাহিনী। হিন্দু নারীর পতি যদি দেবতা হয়, তবে নারীর আবার স্বতন্ত্র জীবন-প্রবাহ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? সে যে তাহার সমস্ত অস্তিত্বের উৎসর্গে তাহারই দেবতাকে গড়িয়া তুলে। দেবতার আয়ুঃই তাহার আয়ুঃ, তাই সতী চিরায়ুষ্মতী।

বিপ্লব-যুগের সঙ্গীদের মুক্তি চাই। প্রতিবাদ আমার ধর্ম নহে। মুক্তির ইচ্ছাই সম্বল। তাহার ধ্যান-মূর্ত্তি যথাসম্ভব "প্রবর্ত্তক"-এর পাতা চিত্র-বিচিত্র করিল। ইউরোপের সংগ্রাম শেষ হওয়া মাত্র মাননীয় কিংস্ বেঞ্চের বিচারপতি মিষ্টার রাউলেটের নেতৃত্বে মাননীয় স্যার বেসিস্কট্, মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী, মাননীয় স্যার ভারনিলভেট্ ও বাংলার প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রধুরন্ধর প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সহযোগে রাউলাট বিল পাশ হইয়া গেল। এই সময়ে ভারতসচিব মিষ্টার মণ্টেগু এই বিলের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—বিলটী সত্যই ভারতের অপ্রিয়ভাজনক হইয়াছে; কিন্তু ইহা অরাজকতা ও বিপ্লবমূলক আন্দোলনের দমন ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ব্যবহৃত হইবে না। এ কথায় ভারতবাসী কোনই সান্ত্বনা পায় নাই। ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর রাষ্ট্রপন্থিগণ এই বিল কার্য্যকর হওয়ার পূর্ব্বে ও পরে তুমুল আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। এই রাউলাট বিল অবলম্বন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে নব রাষ্ট্রযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। একদিকে রাউলাট বিলের আন্দোলন, অন্যদিকে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড নূতন শাসনসংস্কার-প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টায় ভারতের রাষ্ট্রপ্রাণ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই রাউলাট বিলের বিষয়-বিশ্লেষণ করিতে-করিতে বাংলার রাজবন্দীদিগের মুক্তি-প্রসঙ্গ লইয়া "প্রবর্ত্তক"-এ বিস্তৃত আলোচনা সুরু করিলাম। "প্রবর্ত্তক"-এর বাণী যেমন দেশনেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনই রাজকর্ত্তৃপক্ষ-দিগকেও বিচলিত করিয়াছিল। সে পরিচয় আমরা পরে পাইয়াছি।

কলিকাতার টাউন হলে রাউলাট বিলের প্রতিবাদে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সময়ে মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী রাজবন্দীদের মুক্তিকামনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি এই সভাটির অধিনায়কত্ব করেন। এই সভায় মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জি রাউলাট বিলের প্রতিবাদ করিয়া তাৎকালীন একখানি পাক্ষিক "প্রবর্ত্তক" বাহির করিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করেন—"এই কাগজখানির নাম

'প্রবর্ত্তক'। বাংলায় এমন কাগজ আর একখানিও নাই। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।" তারপর ১৩২৫ সালের ১৫ই পৌষে 'আমাদের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটী তিনি আগাগোড়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রবন্ধটী শ্রবণ করেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, তিনি বলেন "আমার বিশ্বাস—দৃঢ় বিশ্বাস—এ লেখা আর কাহারও কলম দিয়া বাহির হয় নাই। এ লেখা—শ্রীঅরবিন্দের।" সংবাদপত্রে ইহার পর সভার বিবরণ এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল: "On the mention of Aurobinda's name there was loud and prolonged cheers which lasted for minutes together."

অর্থাৎ অরবিন্দের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র জনগণের কণ্ঠে উচ্চ আনন্দধ্বনি কয়েক মিনিটের জন্য শুনা গিয়াছিল। একজন পত্রপ্রেরক আমায় লিখিয়াছিলেন —সে হর্ষধ্বনি নয়, সহস্র-সহস্র নবীন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-সূচক এক অস্ফুট মহাসঙ্গীত...। যেন কোন অশরীরী আত্মা সকলকে আনন্দ-স্পর্শে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সমস্ত লোক মুগ্ধ কর্ণে শুনিতেছিল "প্রবর্ত্তক"-এর বাণী।' রাজবন্দীদের মুক্তি-সঙ্কল্পে সেদিন যে লেখাটুকু "প্রবর্ত্তক"-এ বাহির হইয়াছিল, তাহার এক অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি: "দেশের সম্মুখে আজ বড় কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি করিতে কত হাজার-হাজার দেশভক্তের যে প্রয়োজন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না এবং দেশের উন্নতি ঘটিলে, রাজশক্তিরও যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে। এইজন্য অতঃপর যুবকগণ যাহা করিবেন, খুব সম্ভবতঃ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত-রাজবিধির সহিত কোনই সংঘর্ষ হইবে না। এই অবস্থায় আমরা আশা করি—দেশের হাওয়া বুঝিয়া গভর্ণমেণ্ট যদি সাধারণভাবে একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে দেশের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়া বিদ্বেষ-প্রচার হইতেছে, তাহা অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

"যুদ্ধকাল এবং তাহার পর ছয় মাস এই ভারত-রক্ষা আইন প্রচলিত থাকিবে। এক্ষণে রাউলাট রিপোর্ট পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, শীঘ্রই এই আইন অন্যভাবে চিরস্থায়ী করিয়া তোলা হইবে। গভর্ণমেণ্টের শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। যে নীতি রাজা ও প্রজাবর্গ স্বীকার করিয়া লইবেন, তাহা সমগ্র দেশবাসীকেই মানিয়া চলিতে হইবে।

রাউলাট-রিপোর্টানুসারে নূতন আইন দেশ যদি গ্রাহ্য করিয়া লয়, সেইভাবেই দেশকে চলিতে হইবে। কিন্তু যে সকল উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দেশের যুবকগণ পাশ্চাত্ত্য মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিল, সেই সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিয়া তুলিতে আজ বৃটিশ-জাতিও যখন নূতনভাবে কার্য্য করিতে উন্মুখ হইয়াছেন এবং এই আশাই ভারতবর্ষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তখন রাজনীতিক বন্দী ও অপরাধীদের ছাড়িয়া দিতে দোষ কি? তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যখন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র পাইবে, নূতন আশায় নূতন পথে চলিতে যাইবে, তখন হিন্দু-চরিত্রের বিরোধী কর্ম্মে তাহারা আর আপনাদিগকে কখনই লিপ্ত করিবে না, এ কথা আমরা খুব জোর করিয়া বলিতে পারি।

"এতখানি অনুগ্রহও যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দেখাইতে কৃপণতা করেন, তাহা হইলে সমগ্র দেশকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য অন্যায়কারীকে প্রচলিত আইনে দণ্ড দেওয়া হউক। যাহারা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহারা তাহা হইলে মুক্তি পাইতে পারে। কিন্তু দেশের এই নূতন প্রভাতে যদি আইনই প্রবর্ত্তিত কবিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, একবার সমস্ত রাজনীতিক বন্দী ও অপরাধীদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। সাধারণ চোর, ডাকাত, হত্যাকারীর মত ইঁহারা পশু প্রকৃতির নহে। বিদ্যায়, চরিত্রে, বুদ্ধিমত্তায় ইঁহাদের অনেকেই প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ নগরবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তবে যদি কেহ-কেহ তাঁহাদের পূর্ব্ব-স্বভাবের পরিচয় দেয়, রাজশক্তি তো দুর্ব্বল নহে, শাসন-দণ্ড তো নিরস্ত থাকিবে না, শেষে না হয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।"

"প্রবর্ত্তক"-এ এইরূপ প্রচার হওয়ার পর, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার-প্রবর্ত্তনে জাতীয় নেতৃগণের সহিত বৃটিশ পার্ল্যামেণ্টের যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহাতেও "প্রবর্ত্তক"-এর অভিমত স্থান পাইয়াছিল। এই টাউনহল-সভার পর দেশবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ "প্রবর্ত্তক"-এর ফাইল আমার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি এবং নূতন শাসন-সংস্কার-বিধির প্রবর্ত্তনে "প্রবর্ত্তক"-এর এই নীরব-সেবার বিষয় অখ্যাতই রহিয়া গিয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্টে ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষকে রাজনীতিক অধিকার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আগেই যুদ্ধজয়ী ইংরাজের নিকট হইতে ভারতের নেতৃবর্গ নূতন শাসনসংস্কারলাভের আশা করিতেছিলেন। অন্তদিকে তখন রাউলাট বিল লইয়া মহাত্মাজীর আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দিল্লী প্রবেশ গভর্ণমেণ্টের আইনে বন্ধ হওয়ায়, তিনি জাতির নিকট অগ্নিময়ী ভাষায় বিদায়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাঞ্জাবের জালিওয়ানাবাগের দুঃসংবাদে জাতির প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সংগঠনের প্রেরণায় নূতন কর্ম্মক্ষেত্র-রচনার পূর্ব্বে দেখিতে চাহিয়াছিলাম বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি—এইজন্যই "প্রবর্ত্তক"-এ নানা রাষ্ট্রীয়-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে হইয়াছিল। বাংলার ধীরপন্থী নেতারা মণ্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার যথেষ্ট বলিয়া হাত বাড়াইতেছিলেন। চরমপন্থীদের উষ্মা ইহাতে বাড়িয়াই উঠিতেছিল। এই রাজনীতিক মতবাদ-সংঘর্ষের আবর্ত্তে রাজবন্দীদের মুক্তি-প্রসঙ্গ সমুদ্যত করিয়া রাখার জন্য সে যুগে "প্রবর্ত্তক" সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল। রাজবন্দী শচীন্দ্রের ("সদার") করুণ আত্মহত্যার কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে "প্রবর্ত্তক" নিঃশঙ্ক চিত্তে চাহিতেছিল সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতসম্রাট্ ঘোষণা করিলেন 'রয়েল ক্লেমেন্সী।' তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "...My Royal Clemency to political offenders in the fullest measure which in his (Viceroy's) judgment may be compatible with public safety—" ইহার পর আমরা সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলাম এবং একে-একে আমার পুরাতন বিপ্লবপন্থী বন্ধুগণ মুক্তি পাইতে লাগিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ সংগঠনকল্পে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে অবহিত চিত্তে অগ্রসর হইল।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেব নূতন শাসন-সংস্কারের আশাবাণী উচ্চারণ করেন। বাংলার বিপ্লবপন্থীদের দলে এই আশাবাণী নানাপ্রকার মতবাদের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বিদায়-সভায় লর্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছিলেন—ভারতে স্বাধিকার-লাভের দিন যে

কত দূরগত, তাহা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। ভারতের ভাগ্যবিধাতাদের মুখে তৎকালে এইরূপ নৈরাশ্যের কথাই বাহির হইত। অকস্মাৎ ভারতসচিবের আশাবাণী বাংলার ক্ষুণ্ণপ্রাণে কিঞ্চিৎ শান্তির প্রলেপ দিয়াছিল। তারপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর রয়েল ক্লেমেন্সির ঘোষণায় নূতন প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে জাতীয়-সাধনার নব যুগপর্ব্বের নিঃশব্দ পদসঞ্চার আমরা অনুভব করিয়াছিলাম। এইজন্যই আমি বাংলার বিপ্লবীদের অতীতের ক্ষোভ ও ক্ষুণ্ণতা মুছিয়া নূতন ক্ষেত্রে জাতীয় সাধনার যজ্ঞকুণ্ড জ্বালিয়া, নূতন মন্ত্রে আত্মাহুতি দিবার আহ্বান তুলিয়াছিলাম। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাসমূহ অতীতের বিচ্ছিন্ন প্রাণের হাউই বাজির ন্যায় ক্ষণিক বিকাশ মাত্র। বাংলার জাতীয় সাধনায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে, তাহা বহুজনগ্রাহ্য হইতে বিলম্ব হইবে, ইহা জানিয়াই কয়েকজন সর্ব্বত্যাগী দেশব্রতীকে লইয়া আমি জাতিগঠন-কর্ম্মে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করি। ভারত-রক্ষা আইনে আমার সহিত যে কয়জন চন্দননগরে বন্দী ছিল, তাহাদের উপর ভর করিয়াই আত্মরক্ষার দায়ে যে কয়টী অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার উপর নির্ভর করিয়া, এই বৃহৎ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। জাতিগঠন দূরের কথা, ইহার ভিত্তিনির্ম্মাণের জন্য যে শ্রম ও সম্পদের প্রয়োজন, তাহার হিসাব করিলে থৈ পাওয়া যায় না। তবুও শ্রমকে মূলধন করিয়াই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু হৃদয়ের তারে মীড়ে-মীড়ে যে প্রেরণা পাইতাম, তাহাতে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত। শ্রীঅরবিন্দের জীবনযাত্রার অর্থসঞ্চয়ের পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার এই প্রত্যয় দৃঢ় হইয়াছিল যে, কোন ধনকুবের আমার স্বপ্ন সফল করার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন না। আমি অর্থসংগ্রহের এক নূতন পথ অবলম্বন করিলাম—ইহা সম্পদ্ কি বিপদ্, তাহা আজিও স্থির করিতে পারি নাই। তবে এই প্রত্যয় লাভ করিয়াছিলাম যে, পরাধীন জাতির জীবনগতি কোনদিন নিরাপদ্ হইবে না। শুধু রাষ্ট্রবিপ্লবের পথেই সংঘর্ষ নাই, সংগঠনের পথেও গুরুতর সংঘাত থাকিবে, ইহা জানিয়াই আমি এক গুরুতর দায়িত্ব লইয়া অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। দেশের কাজের জন্য

শতকরা ৯৲ সুদ হিসাবে ১ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়া বসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল—যে কয়টী কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, আরও কয়েকটী ঐরূপ মূলধনের সাহায্যে গড়িয়া তুলিব এবং এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রের আয় হইতে সুদ ও আসল ঋণ-পরিশোধের সঙ্গে দেশের শিক্ষা ও সাধনার বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিব।

আমি কোনদিন দাতার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে পারি নাই। প্রথম কারণ—এই বিষয়ে ধৈর্য্য সহায় হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ—আমার এই প্রত্যয় বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কোন শুভকর্ম্মে দাতা যদি তদনুকূল মনোবৃত্তি-পরায়ণ না হইয়া অর্থদান করে, সেই অর্থে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে, তাহা দাতার প্রতিকূল মনের বৈগুণ্যে শ্রেয়ঃ লাভ করিবে না। অলক্ষিত বিঘ্ন ও অন্তরায়ে প্রতিষ্ঠান কালে প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। ইহা ব্যতীত আর একটি কারণে ঋণ করিয়া দেশকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। যে অর্থ দান-লভ্য, যে অর্থের হিসাব বা জবাবদিহি করিতে হয় না, সে অর্থব্যয়ে দায়িত্ব না থাকায়, উহাতে চরিত্রবলের পরীক্ষা হয় না এবং ব্যয় করার বিচারবুদ্ধিও থাকে না; উহা একপ্রকার বিলাসের ন্যায় নিরর্থক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। স্বদেশী যুগের পর বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠানের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই ঋণগ্রহণ সঙ্ঘের জীবনে যেমন একটী চিরস্মরণীয় কর্ম্ম, সেইরূপ চন্দননগরের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সঙ্ঘের অভিযানও চিরদিন স্মরণে থাকিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফরাসী ভারতের রাষ্ট্রপ্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ফলই ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের কারণ বলা যাইতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের নিয়োজিত করিয়াছিল।

চন্দননগরের জনসমাজে আমরা বৃটিশরাজের সংশয়ভাজন বলিয়া ঠাঁই পাইতাম না। দেশহিতৈষীদের মধ্যে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলেও, পুলিসের ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভয় পাইতেন। এমন হইয়াছে যে, আমাদের পল্লীতে এক বৎসর চড়কের উৎসবে পুলিসের ভয়েই জন-সমাগম হয় নাই; উৎসবকর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার জন্য আমাদের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার নব যুগ-সূর্য্যের অরুণরাগে আমাদের ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। নূতন কর্ম্মপ্রবাহ-সৃষ্টির জন্য হিসাবের অঙ্ক

না করিয়াই যেমন ঋণ করিতে বাধে নাই, সেইরূপ জনপ্রতিনিধির পদে সভ্য-সভ্যদের প্রার্থী করিয়া নির্ব্বাচনে অবতরণ করিয়াছিলাম। ভগবান্ আমাদের এই দুই দিকই সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। ঋণলাভও সম্পূর্ণ হইয়াছিল; আর "প্রবর্ত্তক"-এ আমার ছদ্মবেশী সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ নায়েক এবং পরলোকগত স্বামী চিদানন্দ ওরফে নির্ম্মলচন্দ্র বক্সী একজন কঁসেইএ-জেনারেল ও অন্যজন লোকাল-কাউন্সিলের সভ্যপদে বহু সংখ্যক ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হন।

নির্ব্বাচনে জয় হইল। ঋণকৃত অর্থও শূন্য থলি পূর্ণ করিল। কর্ম্মের দায়িত্ব অতিমাত্রায় বাড়িল। দিবারাত্রি শ্রমের অপেক্ষা চিন্তাস্রোতে অধিক মাত্রায় হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম।

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, এই সময়ে আমি বোধ হয় রাজস-অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কোঠায় পা ফেলিয়াছি। কর্ম্মপ্রেরণায় অন্তর-বাহির উদ্বুদ্ধ সৃষ্টিশক্তির অফুরন্ত স্বপ্নানুভব প্রাণের ক্ষেত্রে আমায় যেন মাতাল করিয়া রাখে। বাংলার নবযুগের আমিই যেন ভগীরথ, আমার হাতেই যেন ভগবান্ জাগরণের জয়-শঙ্খ তুলিয়া দিয়াছেন। শত বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করিয়া, বুকে অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠে। এরূপ না হইলে, দেশযজ্ঞ আরম্ভ করার জন্য নিজের উপর দায়িত্ব লইয়া ঋণ করার ভরসা হয় কেমন করিয়া? আমি জানি কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-পরিবার দুই-চারি হাজার টাকার ঋণভারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়; আর আমি লক্ষমুদ্রা ঋণ করিলাম—শূন্য হস্তে, অধ্যাত্মযোগের প্রেরণায়, দেশমাতৃকার সেবার জন্য। ঋণ পাইলামও। ইহা কর্ম্মফল অথবা শক্তির যোগাযোগ—সে বিচার কে করিবে।

বাহিরের জগতে যে ছন্দে দেশের সেবা চলিয়াছে, তাহাব সহিত আমার প্রভেদ ও স্বাতন্ত্র্য "প্রবর্ত্তক"-এর পাতায়-পাতায় ঘোষিত হয়। দেশের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন যে সকল ধর্ম্মপ্রেরণা-প্রবাহ ছুটিয়াছে, সেইগুলির সহিতও আমার ধর্ম্মজীবনের ঐক্য আর খুঁজিয়া পাই না। দেশ-সেবায় সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়াও যেমন স্বকর্ম্মসাধন করিয়া চলি, সেইরূপ দেশের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিয়াই "প্রবর্ত্তক"-এর নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করি। অবকাশহীন জীবন। কাহারও সহিত বিরোধ-বিসম্বাদ করার সময় নাই। সেরূপ কর্ম্মে শক্তিরও প্রেরণা নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে যোগশক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া, নূতন অর্থনৈতিক-ক্ষেত্র-গঠনই আমার লক্ষ্য। যোগপ্রতিষ্ঠ জীবনের ভিত্তির উপর একটি নবজাতির সৌধরচনাই আমার জীবন-মন্ত্র। বাহিরের প্রচলিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমার পথে বিশেষ অন্তরায় নয়; তাই এই ক্ষেত্রে কোন গুরুতর সংঘর্ষই আমায় স্পর্শ করে নাই।

অর্থ আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে সংগৃহীত হইল। কিন্তু ইহা বন্টিত হইল যে প্রকারে তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনই অভিনব। অর্থ ঋণকৃত হউক অথবা উপার্জ্জিত হউক, সকল অর্থেরই মূল কুবেরের অফুরন্ত ভাণ্ডার, উহার প্রাপ্তির ছন্দঃ যেমনই হউক না, তাহার দায়িত্ব-বিচারের অধিকার আমার কি আছে? অর্থ আসিয়াছে এবং উহা পুনঃ প্রত্যর্পণ করার চুক্তিও ঋণদাতার সহিত করা হইয়াছে। অর্থপ্রাপ্তির এই ভঙ্গী ঈশ্বরেচ্ছাপ্রসূত। আত্মসমর্পণ-যোগীর ইহা ব্যতীত অন্যরূপ চিন্তার অধিকার নাই। এই অর্থ যোগপ্রতিষ্ঠ জীবনের উপর দিয়া বহিলে, উহাতে গুণান্বিত হইয়া অর্থশক্তির বিপুল রূপও প্রকাশ পাইবে, উহা জাতিকেই প্রবৃদ্ধ করিবে। ঋণগ্রহণ ও ঋণকৃত অর্থের ব্যবহারে আমি এই নীতিই আশ্রয় করিয়াছিলাম। ঋণগ্রহণ ও ঋণকৃত অর্থের বন্টন, এই দুয়েরই মধ্যে কিন্তু আমি সামঞ্জস্য রাখিতে পারি নাই। অহঙ্কার থাকিতে পূর্ণাঙ্গ দিব্য কর্ম্ম যে সম্ভবপর হয় না, অর্থসাধনা করার পথে দুঃখের অভিজ্ঞতায় তাহা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিলাম। অহঙ্কার রাজসিক অথবা সাত্ত্বিক হউক, উভয় ক্ষেত্রেই অন্ধকার থাকিয়া যায়। অহঙ্কার হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া কর্ম্মসৃষ্টি হয়, এ বিশ্বাস আমার নাই। কর্ম্মবাদী ভারত কর্ম্মের ভিতর দিয়াই অহঙ্কার-মুক্ত হওয়ার সাধনা করে; এই বিশ্বাসেই আমিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাঁহারা ঋণ দিলেন, তাঁহাদের সে ঋণ পরিশোধ করার ভার আমার উপর। কিন্তু আমি যাহাদের হস্তে এই অর্থ ব্যবসাদির জন্য বন্টন করিয়া দিলাম, তাহাদের উপর কোনও সর্ত্তের দায়িত্ব নির্ভর করি নাই; উৎকট আত্মবিশ্বাসেই এইরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার সহিত তাহাদের যোগ সিদ্ধ হইলে, আমার অগ্নিবিশ্বাস হয়তো তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি আনিত; কিন্তু এইসকল ক্ষেত্রে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। অহঙ্কার আমার দৃষ্টি অন্ধ করিয়াছিল। আমি ইহার জন্য দুঃখ পাইয়াছি অনেক। তিন বৎসরের মধ্যেই ঋণকৃত সমস্ত অর্থ

কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহার নিরাকরণ হইল না; অর্থনাশের সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম্মীরাও একে-একে অন্তর্দ্ধান করিল। ঋণ রহিল, পরিশোধের উপায় রহিল না। সে দুঃখের কথা বলিয়া লাভ নাই। অহঙ্কার থাকিতে দেবকর্ম্মে যে দুঃখ, তাহা তনু-মনকেই ক্লিষ্ট করে; নিরহঙ্কার চৈতন্যে কর্ম্মের অভিব্যক্তি তপস্তা; উহাতে সত্তার আনন্দ আছে। কর্ম্মক্লান্ত তনু-মন তাহাতে পুনঃ-পুনঃ অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সঞ্জীবিত হয়। কিন্তু এই পথে দুঃখ-ক্লেশের সাধন আমার জীবনে অপরিহার্য্য হইয়াছিল।

সঙ্ঘের ইতিহাসে আমার এই ঋণপর্ব্বের গুরুত্ব কম নহে; কেনু-না, পরবর্ত্তী যুগে ঋণপরিশোধের কর্ত্তব্যবুদ্ধিই সঙ্ঘসভ্যদের অক্লান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছে। ঋণ আমার; যাহারা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া ভাগবৎ ধর্ম্মে, ঈশ্বরকর্ম্মে দীক্ষা লইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা এই দায়ভার বহিল না, তাহারা আমার কেহ নহে। আর যাহারা আমার কর্ত্তব্যবোধ নিজেদের বলিয়া এই বোঝা সমবেত ভাবে মাথায় চাপাইয়া লইল, তাহাদের সহিত বস্তুগত একাত্মানুভূতির উপরই সঙ্ঘ অটলপ্রতিষ্ঠ হইল। এ সকল কথা এখন থাক।

চন্দননগরের রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে জয়ী হইলাম; কিন্তু রাজবন্দী মণীন্দ্রনাথ প্রজাপ্রতিনিধিরূপে পণ্ডিচারী কাউন্সিলে যোগ দিবে কি প্রকারে, ইহাও একটী সমস্যায় পরিণত হইল। ভোটদাতৃগণ আমরা কি করি, ইহাই দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। কেহ মনে করিলেন—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যখন প্রতিনিধি-পদে সভ্য নিয়োগ করিয়াছে, তখন কর্ত্তব্যের অপলাপ হইবে না। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট মণীন্দ্রনাথ বাহির হইলে কি করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে তাহারই আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ ভাবিলেন—প্রতিনিধিপদে মণীন্দ্রনাথকে নির্ব্বাচিত করিয়া ভোটদাতৃগণ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। মণীন্দ্রনাথ কাউন্সিলে যোগ দিবার পূর্ব্বেই বৃটিশ পুলিস তাঁহাকে ধৃত করিবে অথবা মণীন্দ্রনাথ আদৌ বাহির হইবেন না।

সহরে এরূপ আলোচনা-আন্দোলন যখন চলিয়াছে, তখন আমি শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে পত্র পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। মণীন্দ্রনাথকে ভোটযুদ্ধে নামাইয়া আমি শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ চাহিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি জানাইলেন—চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের নিকট হইতে

নিরাপত্তার পত্র লইয়া বাহির হইলে, ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রজাপ্রতিনিধিরূপে মণীন্দ্রনাথ কোন বাধাই পাইবেন না। আমিও দুর্ভাবনামুক্ত হইলাম।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৯ রাজাদেশ প্রচারিত হইলেও, উহা কার্যে পরিণত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল এবং এক কালে সকল রাজবন্দী মুক্তি পান নাই। পণ্ডিচারী হইতে আমার প্রিয় বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ নাগ যুদ্ধারম্ভে বাহির হওয়ায়, ভারতরক্ষার আইনে বন্দী হন। তিনি তখনও মুক্তি পান নাই। কিন্তু মণীন্দ্রনাথের পণ্ডিচারী যাওয়ার দিন স্থির হইলে, তাহার পূর্ব্বদিন স্থানীয় বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজন কর্ম্মচারী আসিয়া আমায় জানাইলেন—রাজানুগ্রহে আমার সহিত সকল সঙ্ঘ-সভ্যই চন্দননগরের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি পাইয়াছে। হঠাৎ মুক্তি সংবাদে মনে-মনে আনন্দ কম হইল না। ঈশ্বরেচ্ছার পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলাম ভাবিয়া আত্মসাধনার প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা বাড়িল। ঋণসংগ্রহ ও ফরাসী রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনে যোগদান মুক্তিসংবাদ পাওয়ার পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই সংবাদ ঈশ্বরের দান বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। আমরা মুক্তি পাইলাম। এই সঙ্গে আর একজনের মুক্তিকামনা আমায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্বদেশীযুগের এক সহতীর্থ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বাংলাদেশে ভারতরক্ষা আইনে সর্ব্বপ্রথম বন্দী হন। স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীকে আমি ইহার কথা জানাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপনি শ্রীশবাবুরও মুক্তি চান।" এই সময়ে আরও অনেকের কথাই আমার মনে পড়িল। তাঁহারা রাজবন্দী নহেন। দেশসেবার দায়ে গৃহ-সংসার হইতে বিদায় লইয়া, আত্ম-গোপন করিয়া বন্য পশুর ন্যায় আশ্রয়হীন, তাঁহাদেরও মুক্তিপ্রার্থী আমি। কিন্তু সেই কর্ম্মচারীকে কিছু বলিলাম না। ২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময়ে শ্রীশচন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া শনিবার প্রাতঃকালে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ ৫ বৎসর পর তাঁহার মুক্তি। তিনি বন্দী অবস্থাতেই মুমূর্ষু মাতাকে দেখার দুই ঘণ্টা মাত্র সময় পাইয়াছিলেন; তারপর প্রজ্জলিত-চুল্লীর উপর শ্মশানে মাতৃদর্শন করিয়া শ্রীশচন্দ্রের চঞ্চলচিত্ত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। সোমবার সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। মঙ্গলবার আমরা তাঁহার ক্ষিপ্ত-মূর্ত্তি দেখিলাম। শ্রীশচন্দ্রের কথা সম্ভবত

ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শ্রীশচন্দ্র পরে সুস্থ হইয়া সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার সর্ব্বপ্রথম আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই আমার ছাত্র-বন্ধুরা একে-একে গৃহত্যাগ করিয়া আমার ক্ষুদ্র সংসার-ভুক্ত হয়। এই সকল কথার এখানে সামান্য উল্লেখ করিয়া রাখিলাম মাত্র।

সঙ্ঘ-রচনার আদিপর্ব্বে অন্তরবিপ্লবের সহিত বাহিরেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সৃষ্টি হইয়াছিল। অরুণচন্দ্র বিধবার জীবিত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান। জননীর সমস্ত ভবিষ্যতের আশা নির্ম্মূল করিয়া সে সঙ্ঘের ভিত্তিরচনায় আত্মদান করিল। সমাজে প্রলয়-ঝড় উঠিল, আমার মাথার উপর দিয়াই সে ভীম ঝটিকাবর্ত্ত বহিয়া গেল। নলিনচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন, মাতামহীর নয়নমণি—সেও অতীতের সম্বন্ধ ঘুচাইয়া সঙ্ঘে আত্মদান করিল। নির্ম্মলচন্দ্র বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন, সেও সঙ্ঘমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া পূর্ব্বগোত্র পরিত্যাগ করিল। একে-একে এমনই স্থানীয় পল্লীসমাজের বরণীয় সন্তানগণ সঙ্ঘের কাছে আত্মনিবেদন করিয়া, অতীতকে বিসর্জ্জন দিল। বিপ্লবী হওয়ায় সমাজপুরুষেরা এতদিন পুলিসের ভয়েই আমায় দূরে রাখিয়াছিলেন, উপরোক্ত ঘটনায় সমাজজীবনে হাহাকার উঠিল। অসংখ্য পিতামাতার কঠোর অভিশাপে ও কটু তিরস্কারে আমি জর্জ্জরীভূত হইলাম। কিন্তু চিত্ত বিচলিত হইল না; ঈশ্বরেচ্ছাই সঙ্ঘকেন্দ্র রচনা করিতেছিল আমায় কেন্দ্র করিয়া। আমি নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগে স্বকার্য্যসাধনে অধিক মাত্রায় উদ্বুদ্ধ হইলাম।

এই অবস্থায় জীবনসঙ্গিনীর সংবাদ রাখিবে কে? যে প্রাণ অগ্নিবেগে কোন এক বিশেষ লক্ষ্যে ধাবিত হইতেছে, তাহার আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে কি? জীবনসঙ্গিনী লিখিতে বসিয়া সংক্ষেপে আত্মচরিতই লিখিতেছি। পাঠকদের এইরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে, এই সন্দর্ভের নাম জীবনসঙ্গিনী না দিলেই ভাল হইত। কথাটা এক দিক্ দিয়া খুবই সত্য। কিন্তু ইহার একটা অন্য দিক্‌ও আছে; তাহা হইতেছে আমার জীবন-প্রবাহ ছুটিয়াছে যে ছন্দে, তাহারই রূপ ফুটাইতে তুলি চলিয়াছে রঙে-রেখায়। ভাবি—এই সঙ্গেই কি সহকারিণী শক্তি অলক্ষ্যে আমার সহিত সংযুক্তা নহেন? বাহিরের অসংখ্য প্রকার কর্ম্মে অবসন্নচিত্তে ম্লান মুখে যখনই ঘরের দিকে চাহিয়াছি, উৎফুল্ল নয়নের সুধাধারায় সকল অবসাদ

যে দূর হইয়া গিয়াছে, তাহা কি গৃহলক্ষ্মীর অপার্থিব প্রেমের মহিমায় নয়? যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে অভিশাপ, তিরস্কার, নিন্দা, অখ্যাতি কর্ণ বধির করিয়াছে, কঠোর কর্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হওয়ার দৌর্ব্বল্যে হৃদয় নিপীড়িত হইয়াছে, তখন কে সেই ক্লিষ্ট চিত্তে, ভগ্ন হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের বাণী দিয়া পুনঃ পুনঃ অমৃত সেচন করিয়াছে? কুললক্ষ্মীর জীবনকাহিনী বিচিত্র ঘটনাবহুলা নহে। সে একটানা ফল্গু-প্রবাহ বন্ধুর অনুর্ব্বর পুরুষ-হৃদয়ের তলে-তলে বহিয়া পতিকে সাহস দিয়াছে, সঞ্জীবিত রাখিয়াছে—তাই আত্মজীবন-রঙ্গের বিচিত্র ঘটনারাজির মধ্যেই গৃহলক্ষ্মীর মহিমস্তুতি মীড়ে-মীড়ে ঝঙ্কার দিয়া চলে। হিন্দুর স্বামী-স্ত্রী—একজন কায়া আর একজন তার অনুসরণ করে ছায়ার ন্যায়। কায়া বিগ্রহ, এই চিরসঙ্গিনীর নিত্য আশ্রয়। তাই জীবনের ঘটনা ব্যক্ত করিতে গিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন-সঙ্গিনীর সুধাময় স্পর্শ অনুভূত হয়। তাঁহাকে বাদ দিয়া কোন কর্ম্মই সুসিদ্ধ হয় নাই। যেখানে তিনি অবজ্ঞাতা হইয়াছেন, সেইখানেই পরাজয়ের আশঙ্কায় চিত্ত অভিভূত হইয়াছে। যে কর্ম্মে তাঁর সমর্থন সম্মতিসূচক হাসির রেখায় ওষ্ঠপুটে বিকশিত হইয়াছে, সেইখানেই জয়ের পর জয় আমায় প্রাণ দিয়াছে, গতি দিয়াছে। সহস্র কর্ম্মের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় তিনি আমার সঙ্গেই থাকিবেন। মুখে কথা নাই, দেহের আসঙ্গ নাই; হাস্য-পরিহাস কিছুই নাই। আমি যেন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে চাই—তিনি বীর-সজ্জায় যেখানে যেমনটী হইলে মানায়, অবহিতা হইয়া তেমন করিয়াই আমায় সাজাইয়া দিতেছেন। কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে ধূলি-কাদা মাখিয়া আমি যতবার অপরিচ্ছন্ন হইয়া যাই, তত বার তাঁর স্নেহশীতল করস্পর্শে আবার শুচিশুভ্র রূপ পরিগ্রহ করি। তাঁর পাবনী মূর্ত্তি আমার জীবন-ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে অলক্ষ্যে। তিনি তো নিজে কোথাও ব্যক্ত হইতে চাহেন নাই। তিনি সতত প্রকাশ হইতে চাহিয়াছেন আমাতে। আমি সরল, ঋজু, পুষ্পপত্রহীন, রুক্ষ শালতরু; তিনি পত্রপুষ্প-ভারাবনতা বল্লরী। পতির জীবন লইয়া সতীর মহিমস্তুতি যদি কোথাও অনাহত রাগিণী তুলিয়া থাকে, সে আমার গৃহদেবীর চরিত্রেই সুস্পষ্ট দেখিয়াছি। তিনি শুধু আমার সেবায় অক্লান্তহস্তা হন নাই, আমার কর্ম্মকে, আমার সংহতিকে আমার চেয়ে তিনিই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন।

তাই এত কর্ম্ম করিয়াছি, ক্লান্তি অনুভব করি নাই। আত্মবিস্মৃত, অপার্থিব সংহতি-চক্রের সৃষ্টি হইয়াছে—কত বাধা, কত বিঘ্ন, কিন্তু নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই। তাহার জন্য দায়ী ছিলেন গৃহদেবীই। পুরুষ কর্ম্ম। নারী শক্তি। পতি-পত্নীর এই সম্বন্ধ আমার প্রত্যক্ষ বলিয়াই আত্মকাহিনীর মধ্যেই তাঁর অনিন্দ্য চরিত্র বিকশিত হইতেছে, এই আমার ধারণা।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মিলনের এই দৃঢ় গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া পড়িল। পণ্ডিচারীর প্রেরণায় চলার গর্ব্বও সঙ্গে-সঙ্গে মলিন-মূর্ত্তি ধরিল।

আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করার ব্যথা কি নিষ্করুণ, তাহা আমার মত অন্যে বুঝিবে কিনা, সন্দেহ। শক্তির আরোপে যে সম্পৎ-সৃষ্টি, আত্মপরীক্ষার অগ্নিক্ষেত্রে তাহা যে কিরূপ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই দুর্দ্দিনে চির অবজ্ঞাতাকে অশ্রু-অর্ঘ্যে বরণ করিয়া সান্ত্বনা পাইতে না পাইতে যে অধিকতর কঠোর সত্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সেই অতি করুণ আখ্যানের সূচনাসঙ্গীত গাহিয়া রাখিব।

মণীন্দ্রনাথ ও নির্ম্মলচন্দ্র সদলবলে পণ্ডিচারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগে তাহারা নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল। আনন্দের অবধি রহিল না। পৃথিবীতে যেন আর কিছু নাই; শুধু অরবিন্দ আর আমি। যাহা কিছু করি, যাহা কিছু হয়—শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া নয়। শ্রীঅরবিন্দের বাণী আমার জীবন-বাণী। তাঁর কথিত বা অকথিত প্রেরণাই আমার জীবনী-শক্তি, আমার জীবন-গতি। তিনি যাহা বলেন, মৃত্যুপণে তাহা করি। কোথাও ইতস্ততঃ করি না। তিনি যাহা বলেন না, তাহাও তাঁহার অলক্ষ্য ইঙ্গিত বলিয়া ধরিয়া লইয়া সম্পূর্ণ করিয়া চলি। ১৯১০ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোনদিন তাঁহার মুখে কোনরূপ বিপরীত মত শুনি নাই। মণীন্দ্রনাথ ও নির্ম্মলচন্দ্রের মুখেও শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ-বাণী শুনিলাম। প্রাণ আরও উৎসাহে ও পুলকে গুণান্বিত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে বাংলার বড় সাধের দুলালেরা আন্দামান হইতে ঘরে ফিরিল। সেই আলিপুর বোমার মামলার বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ঘরে ফিরিয়াছেন, সংবাদ পাইলাম। আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে এই সুসংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। মনে হইল—পাখী হইয়া উড়িয়া যাই, বারীন্দ্রকুমারকে

লইয়া আসি। আমার যাহা কিছু, সবই শ্রীঅরবিন্দের। বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের অনুজ। তাঁহার স্থান আর কোথায় হইবে? এমনই ছিল আমার অন্তরের আকুতি। পৃথিবী যে বৈচিত্র্যের লীলাক্ষেত্র, শ্রীঅরবিন্দের অভিভবে সে জ্ঞান হারাইয়াছিলাম। অন্তরে-বাহিরে শ্রীঅরবিন্দের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাঁহার যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহা আমারই—এমনই প্রত্যয় বুকে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। বারীন্দ্রকুমারের সহিত যুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইলাম।

দুজনে সাক্ষাৎকার হইল। প্রথম শিষ্টাচার, 'আপনি' 'আজ্ঞে'; তারপর দুই-ভায়ের সম্বন্ধ; 'তোমাকে' 'আমাকে' সম্বোধনে আপ্যায়িত হইলাম। উপেনদাদাও জানাইলেন "দাদা, প্রাণে এমনই করিয়া গাঁথিয়া গিয়াছ, নূতন করিয়া কিছু করার নাই। প্রাণে সর্ব্বদা আছ, এ কথা বিশ্বাস করিও" ইত্যাদি। একটা নূতন প্রীতি-জগৎ সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। বৃহৎ কর্ম্মসাধনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। শ্রীঅরবিন্দের আপনার বলিতে যাঁহারা, তাঁহাদের সকলকে বুকে টানিয়া এক করায় আনন্দে হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইল। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র যে জটিল, সেই জটিলই রহিয়া গেল। কর্ম্মভেদ দেখা দিল, সাধ মিটিল না। নিরাশ হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের নিকট অভিযোগ তুলিলাম—বারীন্দ্রের আগমনের পর শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় যে বৃহৎ কর্ম্মচক্র-রচনার স্বপ্ন আমার ছিল, পরস্পর বিপরীত প্রেরণাসংঘর্ষে তাহা আর সম্ভবপর হইল না। বারীনদাদার মনে এইরূপ সংশয় যে না হইয়াছিল, এমন নহে। এই নূতন পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য-রক্ষার জন্য শ্রীঅরবিন্দও পথের সন্ধান করিতেছিলেন। বারীনের নিকট তাঁহার দীর্ঘ পত্র তাহার প্রমাণ। তিনি আমাকেও ঐ সময়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্মপ্রেরণা যেভাবে বহিতেছিল, তাহা অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন বাধা প্রাপ্ত হইল। আমি একটু বিচলিত হইয়াছিলাম। বারীন পণ্ডিচারী হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি 'নারায়ণ' পত্রিকার ভার লইলেন—নূতন কর্ম্মকেন্দ্র-স্থাপনে উদ্বুদ্ধ হইলেন। আমারও ডাক আসিল। চন্দননগরে এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে একটি দাঁড়ি টানিয়া আমি পণ্ডিচারীর দিকে ছুটিলাম। সেদিনের

বিদায়-দৃশ্য আমার চিরস্মরণীয় থাকিবে। অকস্মাৎ আমার সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া গৃহদেবীর সেই মলিন-বিষাদ-মূর্ত্তি আজিও হৃদয়ে আঁকিয়া আছে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণের করুণ-কাহিনীচিত্র আবার অঙ্কন করিব।

শ্রীঅরবিন্দ কিছু ইতস্তত: করিয়া এবার আমায় ডাক দিলেন। তাঁর জীবনের পট-পরিবর্ত্তন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি লিখিলেন : "I had thought to delay it (your visit) for a short time, untill I saw my way more clearly on certain important matters, but I now believe that is not necessary and it will be as well for you to come as soon as it may be." অর্থাৎ "আমি ভাবিয়াছিলাম কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের স্পষ্টতা না দেখা পর্য্যন্ত তোমার আসার কিছু বিলম্ব করিতে হইবে। কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস যে, তাহার প্রয়োজন নাই ; তোমার সুযোগমত যত শীঘ্র আসিতে পার।" সেদিন এই আহ্বানের পূর্ব্বে যেটুকু ইতস্তত: ভাব ছিল, তাহার স্থূল কারণ আমরা উভয়েই জানিতাম। কিন্তু তাহাও ছিল আপাত উপলক্ষ্য। মুখ্য কারণ উভয়ের অজ্ঞাতেই একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনের এই অধ্যায়টী আমারও কাছে বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। উহার প্রকাশে ভাষা আড়ষ্ট হয়, মনের জড়তা ছাড়াইয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু তবুও যথাসম্ভব উহা আমায় বলিতে হইবে ; জীবনের এই করুণ ইতিহাস একেবারে অলিখিত থাকিলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার বিযুক্তির কারণটাকে ভবিষ্যৎ হয়তো কল্পনার অনুরঞ্জনে বিকৃত মসীময় করিয়া তুলিবে। ইহাতে সত্য ক্ষুণ্ণই হইবে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনপরিবর্ত্তনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমায় ডাকিয়াছিলেন। তাঁর অন্তর্জ্জগতে শক্তির তরঙ্গ সেদিন উছলিয়া উঠিতেছিল। বাংলায় বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতি দেশকর্ম্মিগণের মুক্তি ও ইউরোপের মহাসংগ্রাম শেষ হওয়ায়, দেশের পরিস্থিতি অতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। বিশেষ করিয়া এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্ম-সঙ্কেতও যেন একটু ভিন্নমুখী হইয়া পড়িতেছিল। তিনি তাই স্পষ্টতার জন্য আমাকে এক দীর্ঘ পত্র দিয়াছিলেন। এই অপ্রকাশিত পত্রখানিতে কাজের নির্দ্দেশের যে সিদ্ধ-নীতি প্রকাশ

পাইয়াছিল, তাহা তাঁহার মনীষারই পরিচয়। বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সহিত আমার কর্ম্মের ভেদ প্রদর্শন করিয়া যাহাতে আমি আত্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলি, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ ইহাতে তিনি দিয়াছিলেন। সেই কর্ম্মনীতি আজও আমার অক্ষুণ্ণ আছে। তিনি দেশের প্রচলিত নানা কর্ম্মধারা ও বারীন্দ্রকুমারের কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যার পর আমায় লিখিয়াছিলেন :

"Our whole principle is different and you have to insist on our principle in all that you say or do. Moreover you have got a clear form for your work in association and that form as well as the spirit you must maintain, any lessening of it or compromise would mean confusion and an impairing of the force that is working in your Samgha."

অর্থাৎ "আমাদের মূল তত্ত্ব অন্য হইতে পৃথক্। তুমি যাহা বলিবে এবং করিবে, তাহা মূল তত্ত্ব বলবৎ রাখিয়াই তোমায় করিতে হইবে। অধিকন্তু তুমি ইহার জন্য সঙ্ঘরূপ স্বচ্ছ বিগ্রহ পাইয়াছ, এই সংস্থা ও এই তত্ত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। ইহা কোনরূপে যদি শিথিল হয় অথবা কিছুর সহিত আপোষ করিতে হয়, গোলযোগ বাধিবে ও যে শক্তি তোমার সঙ্ঘে লীলায়িত হইতেছে, তাহার ক্ষুণ্ণতা ঘটিবে।"

তিনি চন্দননগর সঙ্ঘকে কতখানি আপন করিয়া দেখিতেন, আর দুই-এক ছত্র লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব :

"The Samgha at Chandernagore is a thing that has grown up with my power behind and you at the centre and it has assumed a body and temperament, which is the result of this organisation."

"চন্দননগরের সঙ্ঘ তোমাকে কেন্দ্র করিয়া ও পিছনে আমার শক্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই সংহতির ফলে উহার একটি আকৃতি এবং প্রকৃতিও গড়িয়া উঠিয়াছে।"

তাঁহার এই দীর্ঘ পত্রখানির অধিক প্রকাশ করিয়া অতীতকে টানিয়া আনার প্রয়োজন নাই। তাঁহার দরদী হৃদয়ের অপার্থিব-স্পর্শানুভূতির যতটুকু প্রকাশ করিলে, আমার জীবনের এই অধ্যায়টী সুস্পষ্ট হইতে পারে,

আমি ততটুকুই প্রকাশ করিলাম। তিনি কি উৎসাহে ও আনন্দে, কি আকুলতার সহিত আমায় যে আহ্বান দিয়াছিলেন, তাহা পত্রখানির ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি চন্দননগরের কর্ম্মব্যস্ততার ভার যথারীতি অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পত্রের এই শেষ ছত্র দুইটি আমায় উন্মাদের ন্যায় ছুটাইল পণ্ডিচারীর পথে—"Meanwhile your visit may help to get things into preparatory line both in the motor-power and the outward determination."

"ইতিমধ্যে তোমার উপস্থিতি অন্তরের প্রেরণা-যন্ত্র ও বাহিরের সঙ্কল্প-নিরূপণ বিষয়গুলিকে উভয় ক্ষেত্রেই সকল বিষয়কে প্রস্তুতির পথে আনিতে সাহায্য করিতে পারে।" এই সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারও শ্রীঅরবিন্দের এক পত্র পাইয়াছিলেন। উহার যে অংশে আমার কথা ছিল, তিনি সেই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলি বাদ দিয়া "নারায়ণ" পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পরিত্যক্ত অংশটুকু উপেনদা স্বহস্তে উদ্ধৃত করিয়া অতি আনন্দের সহিত আমার নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। আমি ইহার জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। সেই অংশটুকু আমার খ্যাতিপত্র। উহা চিরদিন অপ্রকাশ থাকিবে। আমি শুধু "প্রবর্ত্তক"-এর প্রশংসার অংশটুকু গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ "প্রবর্ত্তক"-এর পৃষ্ঠায় উহা প্রকাশের সম্মতি দিয়াছিলেন। ১৩২৭ সালের প্রবর্ত্তক"-এর প্রচ্ছদপটে লেখা থাকিত "প্রবর্ত্তক আমাদেরই কাগজ। আমি স্বহস্তে লিখি বা না লিখি, আমারই through দিয়ে ভগবান্ মতিকে শক্তি দিয়ে লেখাচ্ছেন, spiritual হিসাবে আমারই লেখা।"

আমার সম্বন্ধে আন্দামান হইতে সদ্য: প্রত্যাগত বারীন্দ্রকুমারের ধারণাগত প্রশ্নের উত্তরেই তিনি এই পত্র দিয়াছিলেন। উপেনদার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুলিপি-পত্রে আমার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের যে প্রেমের পরিচয় ছিল, তাহা জগতের অজ্ঞাতে থাকাই শ্রেয়: হইয়াছে। বাহিরের জগতে স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, অন্তরজগতের চিরন্তন ঐক্যের সাক্ষ্যরূপেই স্মৃতি-মন্দিরে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। শক্তি-সাধকের ভাষায় সে প্রেমের অবদান :

"তুই দেখ আর আমি দেখি
অন্যে যেন নাহি দেখে।"

উক্ত পত্রে বারীনদাদাকে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার এই কয়টি কথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই অনুধাবনীয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের তাঁর সেই কথাগুলি বাঙ্গালী জীবনে সাধন করিতে পারিলে, দেশ নূতন-মূর্ত্তি ধরিত। যোগসিদ্ধির জন্য পণ্ডিচারীই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থল বলিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন। যোগের একাঙ্গ কর্ম্ম—উহার জন্য বঙ্গদেশ—ইহা শ্রীঅরবিন্দের কথা। শ্রীঅরবিন্দ ভারতের মায়াবাদকে প্রশ্রয় দেন নাই। অধ্যাত্মের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য পুরাতন যোগে সম্ভবপর হয় নাই। জগৎকে মায়া ও অনিত্য-লীলা বলিয়া তাই এ জাতি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি এই জন্যই ভারতের অবনতি ও জীবনীশক্তির হ্রাস হইয়াছে মনে করিতেন। ব্যক্তিগত-সিদ্ধি-সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া তিনি লিখিলেন: "কয়েক জন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক জন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোঘোরে ডুবে যাবে—এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি?" সেই পত্রে তাঁর নূতন সাধন সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল: "মনের ক্ষেত্রে খণ্ড-খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হবে। তারপরে উপরে উঠা।" এই উপর অর্থে তিনি বিজ্ঞানের কথাই বলিয়াছিলেন, "যেখানে আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন দ্বন্দ্বময় নয়।" এই অবস্থায় সাধক "জগৎকে আর মায়া বলিয়া দেখে না, জগৎ হয় ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার অভিব্যক্তি।"

সঙ্ঘ সম্বন্ধে বারীনদার হয়তো প্রশ্ন ছিল। তদুত্তরে সেদিন তিনি সঙ্ঘের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রাক্ষরের মত চিরদিন আমরা মনে রাখিব। তাঁরই কথা আবার উদ্ধৃত করিতেছি:

"আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার ঐক্যমূর্ত্তিই সঙ্ঘ।" সংশয়ীর উত্তরও তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই দিয়াছিলেন: "যাঁহারা বলিবেন—সঙ্ঘের দরকার কি? সব একাকার হবে, মুক্ত সর্ব্বঘটে থাকবে ইত্যাদি—সত্যের ইহা একটী দিক্ মাত্র। জগতের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে। মূর্ত্তি ভিন্ন জীবনের Effective গতি নাই। অরূপ মূর্ত্ত হয়। নাম-রূপ-গ্রহণ মায়ার খেয়াল নয়। রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে, তাই রূপ-গ্রহণ।" শ্রীঅরবিন্দ আরও বলিয়াছেন, "আমরা জগতের কোন কাজই বাদ দিতে

চাই না। রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকিবে, দিতে হবে এই সকলের নূতন আকার, নূতন প্রাণ।"

কর্ম্মবাদী ভারতের ধর্ম্মকে তিনি এক বিন্দু ক্ষুণ্ণ করেন নাই। জাতির ব্যাধির দিকে তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন: "ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, ভারতের চিন্তাশক্তি হ্রাস পাইয়াছে।" তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন "চিন্তা-ফোবিয়া"। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন "যে বেশী চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে, সে বিশ্বের সত্য শিখে, তার শক্তি বাড়ে।" বাংলা দেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা এইখানে; বাঙ্গালীর ক্ষিপ্রতা আছে, ভাবের capacity আছে, intuition আছে, কিন্তু চিন্তার গভীরতা নাই।" তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালী চায় চিন্তা না করে' জ্ঞান, পরিশ্রম না করে' ফল। বাঙ্গালী খেতে পায় না, পরবার কাপড় পায় না, চারিদিকে হাহাকার। ধন-দৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-চাষ সবই পরের হাতে যায়। শক্তি-সাধনা বাঙ্গালী ছেড়েছে। সে প্রেমের সাধনা করে। যেখানে জ্ঞান নাই, শক্তি নাই, সেখানে প্রেম নাই।" তিনি গভীর বেদনাভরেই লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গদেশে প্রেম কোথায়? ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, দলাদলি, এ দেশে যত, এমন আর কোন দেশে নাই।" তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য লাখ-লাখ শিষ্য চান নাই, আমিত্বশূন্য একশত পুরা মানুষ ভগবানের যন্ত্র চাহিয়াছিলেন এবং এখানেও কোন অহমিকা রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার স্পর্শে বা অপরের স্পর্শে কোথাও যদি সুপ্ত-দেবত্ব প্রকাশ হয়, মানুষ যদি ভাগবত জীবন লাভ করে, তাদের দ্বারাই দেশ উঠবে।"

এই অরবিন্দই বিগত ১২ বৎসর আমার ধ্যান-মূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার আহ্বানে ৭ বৎসরের গৃহবন্দী জীবন মুক্তি পাইয়া ছুটিল পিছনের সব টান ছিঁড়িয়া। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ছদ্মবেশে রাষ্ট্রষড়যন্ত্র মাথায় লইয়া ছুটিয়াছিলাম রাজস-অহঙ্কারের বোঝা নামাইয়া আসিতে, আজ মুক্তির সন্ধানে উদ্বুদ্ধ প্রাণ উর্দ্ধশ্বাসে নূতন পথের সন্ধানে কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিল।

একবার আমার গৃহদেবীর প্রতি ফিরিয়া তাকাইলাম। গত বার

অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য যাত্রাকালে তাঁর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, আজ দেখিলাম অন্য রূপ। সেদিন ছিল সঙ্কল্পদৃঢ় ওষ্ঠপুট, সুদূর চিন্তাভারে কুঞ্চিত ললাট। আজ প্রসন্নময়ী হাসিমুখেই আমায় বিদায় দিলেন। আজ জয়গর্ব্বে লাবণ্যময়ী প্রতিমার ন্যায় তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; আমি বলিলাম "আসি।" ঠিক এই সময়ে নির্ম্মল আকাশে অকস্মাৎ এক খণ্ড মেঘ ঘনাইয়া বর্ষণধারার ন্যায় তাঁহার চক্ষু ঝাপ্‌সা হইল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ছিল যে দৃষ্টিবিনিময়ের সুধা-সেচন, ছিল অক্লান্ত কর্ম্মপ্রেরণায় উভয়ের অন্তরযুক্তির যে সুবিমল আনন্দ, ছিল সব চেয়ে বড় আমার সেবায় দিবারাত্রি তাঁর তন্ময়তা; প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল, শয়নে, ভোজনে, জীবনের প্রতি ঘটনায় তাঁর সচেতন সাড়া অকস্মাৎ পড়িল সেই অপার্থিব যুক্ত জীবনস্রোতের মধ্যে বিচ্ছেদ-যবনিকার একটা সাময়িক আড়াল। এই অবস্থাটাকে তিনি অন্তরে-অন্তরে সামলাইয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু তবুও দীর্ঘ বিচ্ছেদের আরম্ভ-মুহূর্ত্তটিতে তিনি অধীরা হইয়া পড়িলেন। তাঁর নয়নকোণে বেদনার অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। কিন্তু আমায় এমন কত ব্যথার শিহরণ সহিয়া লক্ষ্যপথে আগাইতে হইবে। নীরবে তাঁহার বেদনার ভার হৃদয়ে লইয়া বিদায় হইলাম। তিনি প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। সতীর্থগণের সহিত উল্লাসে-আনন্দে ঘর ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া বহির্দ্বারে, তারপর তাঁর সজল চোখের কাতর চাহনি হৃদয়ে আঁকিয়া তীর্থ-যাত্রা করিলাম। ৭ বৎসর পরে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘদগ্ধ উদার ধরণীবিস্তারে দৃষ্টি পড়িল।

স্নায়ুগুলি সঙ্কীর্ণ স্থানে, পরিচিত জনের আবেষ্টনে যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ তাহার অন্যথা হওয়ায়, আমার সর্ব্ব শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। লোহার রেলপথ সমান্তরালে দূরে-দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে, জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্র-কিরণে প্রচণ্ড অগ্নিশিখার ন্যায় যেন আমার নয়ন ঝলসিয়া দেয়। বিপুল ট্রেণটা যেন মনে হইল—একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত আমাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। হাওড়ায় আসিয়া এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলাম। এত লোক, এত কোলাহল আমার সহ্য হইল না। মনে-মনে হাসিলাম; অবস্থাবিশেষে ভাব এমনই হয় বটে। আমার বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া এক বন্ধু অবস্থাটা অনুমান করিয়াছিলেন। আমাকে বিশ্রামাগারে লইয়া গিয়া এই শারীরিক

দৌর্ব্বল্যাপনোদনে তিনি সাহায্য করিলেন। একা চলিয়াছি। অতি আপন জনের দিবারাত্রির সাহচর্য্যপূর্ণ নিত্য কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া হৃদয় মন্দ-মন্দ মোচড় দিয়া উঠিতেছিল; এক বন্ধু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার সঙ্গী হইতে চাহিলেন, আমি অস্বীকার করিলাম। জানিতাম—স-মন দেহ-যন্ত্রটা আমার চির বিশ্বস্ত ভৃত্য, উহার এই সাময়িক দৌর্ব্বল্য শীঘ্রই দূর হইবে। হইলও তাহাই। ট্রেণ ছুটিয়াছে উল্কাবেগে। দুই পাশে সারি-সারি বনভূমি, কৃষিক্ষেত্র—পাক খাইতে-খাইতে যেন পশ্চাৎ অপসারিত হইতেছে। গাড়ীর চাকার সুস্পষ্ট শব্দে যেন শুনিতেছি—অরবিন্দ, অরবিন্দ। আর সূর্য্যাস্তের রক্তকিরণে দিগন্ত রক্তরঞ্জিত হইয়াছে। সান্ধ্য-সমীরণে দেহভৃত্য অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অনতিবিলম্বেই প্রস্তুত হইয়া উঠিল। দীর্ঘদিন প্রচ্ছন্ন জীবন-যাপনের ফলে জগৎটা আমার কাছে বড় ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছিল; পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর প্রথম মুক্তিপণ যেমন আড়ষ্টতাময় হয়, আমারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। বাংলা ছাড়িয়া উড়িষ্যায়, উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া মাদ্রাজ বিভাগে গাড়ী আসিয়া উপনীত হইল। লোকের বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতির দিকে চিত্তের আকর্ষণ আর সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে ভবিষ্যৎ কর্ম্মতন্ত্র সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়ার অনলাকাঙ্ক্ষায় আমার সবখানির পরিবর্ত্তন আনিল। শরীর-মন সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল। শ্রীঅরবিন্দ আমার হৃদয় ও চরিত্র ভালভাবেই জানিতেন। তিনি ছিলেন স্নেহের ক্ষেত্রে আমার পিতা, রঙ্গ-রহস্যে অকৃপণ-চিত্ত সুহৃৎ—পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, প্রভুত্বের সহিত ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠাও এইখানেই স্থির হইয়াছিল। একদিকে কোমল করপল্লবের স্নেহপ্রলেপে আমার মানসজগৎ যেমন পূর্ত্তি পাইত, অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের বরপ্রদ দক্ষিণ হস্তের সঙ্কেত আমায় অভিষিক্ত করিয়া দেবহিত আয়ুঃ দিতে প্রতীক্ষা করিত—পৃথিবীতে এত বড় সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হয় না। মর্ত্ত্য অমৃতের সন্ধান দেয়, কিন্তু অমৃতের তপস্যাই বুঝি মর্ত্ত্য ধর্ম্ম। অপার্থিব সুধাহরণের কর্ম্মভূমি জগৎ। ভারত তার সুনির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র। পথ তাই ফুরায় না। আমারও অক্লান্ত-গতি।

মাদ্রাজ ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিলাম—শ্রীঅরবিন্দের অনুগ্রহপ্রসাদ ধারণ করিয়া আমাদের বন্ধু, পণ্ডিচারীর জননায়ক মিঃ যোসেভ ডেভিড দণ্ডায়মান। চক্ষের অদৃশ্য অশ্রু কৃতজ্ঞতায় নহে, অপার্থিব সম্বন্ধের অনুভূতিতে বিগলিত

হইয়া যেন দুই কূল ভাসাইয়া দিতে চাহিল। শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড হৃদয়ানুরাগের পরিচয় এই প্রথম নহে। আমার তনু, মন, প্রাণ লুটাইয়া দিতে বাধিত না শুধু এইখানেই ; ইহা কথা নহে, জীবনের ঘটনায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে বহু বার।

মাননীয় বন্ধুর আতিথ্যের প্রাচুর্য্যে আমি অস্থির হইয়াছিলাম। কৃতজ্ঞতার সহিত সব কিছুই গ্রহণ করিতে হইল, বন্ধু তবুও তৃপ্তি পাইলেন না ; তাঁহার অবদান সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করার সামর্থ্য আমার ছিল না। যথাসময়ে বন্ধুর নিকট বিদায় লইলাম ; পণ্ডিচারীতে উপনীত হইলাম। নয়নানন্দ নলিনীকান্তের সৌম্যশান্ত দর্শন হৃদয়ে তৃপ্তি দিল ; আর ছিল অকৃত্রিম সুহৃৎ অমৃত। অবাঙ্গালী মাদ্রাজী হইলেও, হৃদয়ের ভেদ এইখানেও ছিল না ; আমরা সেদিন তখন সব এক হইয়া গিয়াছিলাম।

শ্রীঅরবিন্দের ভবনে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে দেখিলাম। আমাদের চির-পরিচিত সেই জীর্ণ টেবিলখানির একপার্শ্বে ভাঙ্গা-চোরা চেয়ারখানিতে কোঁচার খোঁট গায়ে দিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। দৃষ্টিবিনিময়ে দূরত্বের ব্যথা দূর হইল, হৃদয় পুলকনৃত্য যুড়িয়া দিল। তারপর দিন যায়, দিন আসে ; কত কথা, কত হাসি—অপ্রত্যক্ষে অন্তরের শোধন-সাধন চলিতে লাগিল।

দেখিলাম—শ্রীঅরবিন্দের তনুখানি এবার আরও শীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার বক্ষঃপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেদিকে তাঁহার আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া দীর্ঘ বারান্দায় দুই-চারি বার পদচারণা করেন, তারপর সেই পুরাতন টেবিলখানির একপাশে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করেন ; সকলের ন্যায় তিনিও এক কাপ চা, দুই টুকরা রুটি চিবাইয়া প্রাতরাশ সমাপন করেন। মধ্যাহ্নে নীচে নামিয়া রুক্ষ স্নানসমাপনের পর, দেওয়ালে ঝুলান একটা ক্ষুদ্র ভাঙ্গা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দাড়া-ভাঙ্গা চিরুণীতে মাথার লম্বা চুলগুলি একবার আঁচড়াইয়া লন ; তারপর ভোজনের পালা। তিনি সকলের শেষে ভোজন করিতে আসিতেন ; কাজেই চতুর্দ্দিকে ভুক্ত উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের রহিত ভোজনপাত্রগুলি পড়িয়া থাকিত, আর তাঁর জন্য বাড়া-ভাতে অবাধে একরাশ মাছি ছাঁকিয়া বসিয়া থাকিত। তিনি বাঁ হাত নাড়িয়া, সেগুলিকে উড়াইয়া দিয়া, দুই-দশ গ্রাস অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িতেন। অপরাহ্ণে চা পান ছাড়া ভোজনের ব্যবস্থা কিছুই ছিল

না। রাত্রেও মধ্যাহ্নের ন্যায় অন্নগ্রহণের ব্যবস্থা। দুঃখব্রতী শ্রীঅরবিন্দের দিন ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেও এই ভাবেই কাটিয়াছে। তাঁহার সেবার অভাব হইয়াছে, ইহা বুঝিয়াও আমাদের কিছু করার ছিল না; তিনি যেন কোন এক মূর্ত্তিমতী শক্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতা মৃণালিনীর মহাপ্রয়াণ হইয়াছে; তাঁহার হৃদয়ের সে মর্ম্মব্যথা বাহ্যতঃ বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। ঈশ্বরের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় তৃতীয়া শক্তির হস্তেই নিজের সবখানি সমর্পণ করিয়া তিনি যেন যন্ত্র-পুত্তলিকার ন্যায় কালস্রোতে ভাসিয়া চলিতেছিলেন। এই সময়ে একদিন দেবী মৃণালিনীর কথা তাঁহার নিকট পাড়িয়াছিলাম; তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সঙ্কেতে যাহা জানাইয়াছিলেন, সেদিন তাহা বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে চাহি নাই। সৌরীনের মুখে শুনিয়াছিলাম—দেবীর অন্তর্দ্ধান-সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে তাঁর একটী মাত্র অস্ফুট যন্ত্রণা-সূচক শব্দ বাহির হইয়াছিল। তাঁর বর্ত্তমান ভাবনার কথা ইতিপূর্ব্বে তাঁর পত্রের মধ্য দিয়াই অবগত ছিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন: "The work of the Arya has fallen into arrears and I have to spend just now the greater part of my energy in catching up and the rest of my time in the evening, is taken up by the daily visit of the Richards."

অর্থাৎ "আর্য্য" লেখা বাকী পড়ায় অধিকাংশ শক্তি তাহার জন্য যায়, অপরাহ্নের অবশিষ্ট সময় রিশার-দম্পতির প্রাত্যহিক সাক্ষাৎকারেই অতিবাহিত হয়।" আসিয়া তাহাই দেখিলাম।

সারাদিন ঠক্-ঠক্ করিয়া স্বয়ং টাইপ-রাইটিং যন্ত্রেই সরাসরি তিনি "আর্য্য" লিখেন, তাঁর শরীর আড়ষ্ট ও ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠে। ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি বাহিরের বারান্দায় অপরাহ্নে চা-পানের জন্য আসিয়া বসেন। এই সময়ে আমরাও টেবিলের চারিদিকে অর্দ্ধভগ্ন চেয়ারগুলি টানিয়া উপবেশন করি। কিছু পরে, মাদাম রিশার আসিয়া উপস্থিত হন; তারপর আসেন দীর্ঘকায়, লম্বিত-শ্মশ্রু, গৌরকান্তি মঁসিয়ে রিশার। আসর আমাদের বেশ জম্‌কাইয়া উঠে। ইহার মধ্যে আবার মঁসিয়ে রিশারের ফরাসী গ্রন্থ হইতে ইংরাজীর অনুবাদ চলিতে থাকে "আর্য্যের" জন্য। শ্রীঅরবিন্দের ক্লান্তি বর্ণনা করা যায় না।

আমি থাকিতে-থাকিতেই অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা দিল। "আর্য্য" লেখা তিনি শেষ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই সময় প্রতি রবিবার সান্ধ্যভোজনের জন্য তিনি মঁসিয়ে রিশারের ভবনে নিমন্ত্রিত হইতেন। আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। এই দম্পতির মধ্যে বসিয়া তিনি ভোজন করিতেন, নানা আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ভোজ-সমাপন হইত। শ্রীঅরবিন্দকে এই সময় কোন এক গভীর প্রশ্নের সমাধানে আত্মনিবিষ্ট দেখিয়াছি। আমি যত শীঘ্র নিজের সাধনার দিক্‌টা গুছাইয়া লওয়ার আশা করিয়াছিলাম, তাহা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, অবস্থারই অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এই জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম; কেন না তিনি এবার আমায় দীর্ঘ দিনের জন্যই ডাকিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কৃশ শরীর লইয়া মাদাম রিশারের সহিত আমার অনেক আলোচনা হইত। এই রিশার-দম্পতির নিকট শ্রীঅরবিন্দ আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই আমায় নিরতিশয় অনুরাগের সহিত দেখিতেন। মাদাম মীরার সহিত শ্রীঅরবিন্দ ও আমি এক সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন ধ্যান করিতাম। মাদাম মীরা এই ধ্যানফল ধ্যানশেষে ব্যক্ত করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের মুখ প্রফুল্ল-মূর্ত্তি ধরিত। আমিও এই বিদেশিনীর অতীন্দ্রিয়-দর্শনশক্তির অত্যদ্ভূত পরিচয়ে বিস্মিত হইতাম। তিনি দেখিতেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্লোকের অপার্থিব দৃশ্য। আমি দেখিতাম হিরণ্ময়-শ্মশ্রু জ্যোতির্ম্ময় শ্রীঅরবিন্দকে। মাদামের কথা শুনিতাম—বিস্মিত হইতাম, পুলকিত হইতাম।

সে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। আমি বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানে বসিতেন; কিন্তু নয়ন তাঁর নিমীলিত হইত না। আমরা দুই জনে নয়ন নিমীলিত করিয়া ধ্যান করিতাম। সেদিন অন্তরের মণিকোঠায় এক অপার্থিব আনন্দের অনুভূতি পাইয়া চক্ষুঃ উন্মীলিত করিলাম, দেখিলাম—মাদাম মীরা তখনও ধ্যাননিমগ্না। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি ঊর্দ্ধলোকে। বায়ুমণ্ডল যেন অতিশয় লঘু হইয়া গিয়াছে। একটা বৈদ্যুতিক শক্তি-তরঙ্গ অনুভূত হইতেছে। আমার নয়ন বিগলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে তিন জনই পরস্পরের প্রতি চাহিয়া অনিন্দ্য সুখ অনুভব করিতাম। বিস্মৃতির প্রলেপে অরবিন্দের সে অমৃত-বাণী আমি ভুলিতে পারিব না। তিনি করুণাস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "মতি, তুমি আমি আর এই"—সম্মুখে মাদাম

মীরার দিকে তাঁর হস্ত প্রসারিত হইল। এখনও সেই বাণীর মূর্চ্ছনা কাণে বাজিতেছে "আমরা তিন জনে সঙ্ঘ।" আমার মাথা শ্রদ্ধাবনত হইল। মীরা দেবী হাসিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আবার শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সেদিন অপরাহ্নের এই বাণী ও অনুভূতি আমার চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই দিন হইতে আমি মাদামের নিকট অভাবনীয়রূপে আপনার হইলাম, তাঁহার প্রতিও আমার শ্রদ্ধানুরাগ স্বতঃই হৃদয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করিল।

মাদামের সঙ্গে কথা হয়। মঁসিয়ে রিশার আসেন অপরাহ্নশেষে সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে। তাহার পূর্ব্বে আমাদের অনেক কথা শেষ হইয়া যায়। উচ্চ স্তরের অধ্যাত্মকথার অলোচনা হইতে সৌরীনের ব্যবসার কথাও উঠে। সৌরীন পণ্ডিচারীতে ব্যবসা সুরু করিয়াছিল। আমি মাদামের অনুরোধে এক দিন সৌরীনের ব্যবসাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পরে চাকুরী ছাড়িয়া, ছোট-বড় ব্যবসা অনেক করিয়াছি। ব্যবসার প্রধান বিষয় হিসাবের খাতা। যে খাতার প্রতিদিন কৈফিয়ৎ কাটা হয় না, বুঝিতে হইবে সেই ব্যবসার মূল্য নাই। সৌরীনের ব্যবসার পরিণাম সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল হইল না। আমার নির্ভুল অভিমত মীরা দেবীকে বলিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ জানিলেন। শ্রীঅরবিন্দের হৃদয়-মন মর্ত্ত্যের উপাদানে রচিত নহে; তিনি একবার যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহার অন্যথা সহজে সম্ভবপর হইত না। তিনি বলিলেন—"সৌরীন সব ঠিক করিয়া লইবে—চিন্তা নাই।" শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভা অসাধারণ, তাঁহার অন্তরও সুন্দর ও সরল। প্রত্যয়ের সীমাহীন বারিধি সহজে টলে না; সংশয়ের আবর্জ্জনা সেখানে সহজে স্থান পায় না। তিনি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। আমার মনে অন্য কোনরূপ সংশয় উদিত হয় নাই—যেমনটী হইলে ব্যবসার শ্রী থাকে, উন্নতি হয়, তেমনটি সৌরীনের ব্যবসায়ে ছিল না। আমি শ্রীঅরবিন্দকে জোর করিয়া বলিলাম "ব্যবসা ভাল করিয়া করিতে হইলে, ব্যবস্থান্তর করিতে হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্য এই সময়ে ভাঙ্গিতেছিল; মীরা দেবী ইহার জন্য বেশ চিন্তা করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর অন্তরের অসামান্য দরদ এক অতি সামান্য-কথায় আমায় মুগ্ধ করিয়াছিল। তখনই বুঝিয়াছিলাম—শ্রীঅরবিন্দের কায়ার তপস্যা শেষ হইয়াছে। যে মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব-

প্রতীক্ষায় তাঁহার এই কঠোর-তপস্যা, উহার সিদ্ধিকাল অতি আসন্ন। মীরা দেবী বলিলেন "শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্য দিন-দিন দ্রুত ভাঙ্গিতেছে, ইহার কারণ—শরীর-ধারণের উপযোগী আহার তিনি গ্রহণ করেন না। আমার আর এক সংশয় হয়, আপনি কিন্তু তাঁহাকে এ কথা বলিবেন না।"

আমি বলিলাম—"না। কি বলুন?" উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তিনি করুণার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "আমার ভয় হয়—ঐ যে গরুর দুধ তাঁহার জন্য লওয়া হয়, ঐ গরুর ক্ষয়রোগ থাকিতে পারে। গরুর পরিবর্ত্তন আপনারা করুন।" এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষান্তা হন নাই। পর দিন সকালে তিনি আমাদের বাড়ী আসিয়া, শ্রীঅরবিন্দের খাদ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। শ্রীঅরবিন্দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা আমাদের থাকিলেও, কার্য্যতঃ কিছু করা সাধ্যে কুলাইত না। যে কয়দিন পণ্ডিচারীতে ছিলাম, ভোজন-কক্ষে তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত বসিয়া-বসিয়া তাঁহার অন্নপাত্রের মাছি তাড়াইতাম মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যরক্ষায় মাদাম মীরা বিশেষ-ভাবেই মনোযোগিনী হইলেন। তাঁহার এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ আমায় চমৎকৃত করিল। তাঁহাকে শ্রীঅরবিন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্ত-সাধিকা বলিয়া মনে হইল। নিজে তলাইয়া গেলাম—সশ্রদ্ধায় সহতীর্থা ভাবিয়া সিষ্টার নিবেদিতার ন্যায় তাঁহাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিলাম। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ভগ্নী নয়, আমি মাতা হইতে চাহি।" কথাটা সেদিন তলাইয়া বুঝি নাই। কিন্তু এই কথায় আমার অন্তরের কিছু ভাবান্তর হইয়াছিল। আমিও পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের যেন নাগাল পাইতেছিলাম না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম! আমার সহতীর্থগণের মধ্যেও এ নূতন পরিবর্ত্তন-যুগ লইয়া নানা প্রকারের আলোচনা হইত। সে সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক। আমার লক্ষ্য—শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর সমস্ত হৃদয়ের স্পর্শানুভূতিপ্রকাশ ব্যবহারতঃ কিছু না থাকিলেও, আমার অধ্যাত্মজীবন তাঁহারই অনুরাগে অভিষিক্ত হইয়া থাকিত। আমি পুরুষ। মীরা দেবী নারী। তাঁর নিষ্ঠাভক্তির অন্তরঙ্গতা এই হেতু অধিকতররূপে প্রকাশ পাইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এমন কোন ব্যবধান যদি আসিয়া পড়ে, যাহার জন্য আমাকে দূরে পড়িয়া

থাকিতে হইবে, এই সুদূর-চিন্তায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। মনের জগতে যে বিপ্লব বাধিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিতাম না। কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া এইরূপ একটা ব্যবধানের প্রসঙ্গ হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দের মুখ দিয়া বাহির হওয়ায়, আমার বিক্ষুব্ধ চিত্ত অতি অল্পক্ষণের জন্য সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; সে কথা আজিও স্মরণে রাখিয়াছি। সেদিন শ্রীঅরবিন্দ যাহা সারিয়া লইয়াছিলেন, অনতিকাল মধ্যেই সে তালি খসিয়া পড়িল; যাহা ভবিতব্য, অকাট্য বিধানে তাহাই ঘটিল।

পণ্ডিচারীতে সে এক রাত্রির কথা। আষাঢ়ের নীল জলধর এ২ সুদূর দক্ষিণের শূন্য ছাইয়া কুহেলী সৃষ্টি করে না, অজস্র ধারাবর্ষণে চিত্তে ভাবাবেশ ঘনাইয়া তুলে না; বাংলার ন্যায় আকাশে ঘন-ঘন বিদ্যুতের ঝিলিক এখানে দেখা যায় না। তবে সে রাত্রিতে এমনই একটা প্রাবৃটের ঘনঘটা আমাদের মাথার উপর ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। সমুদ্রের বক্ষঃ হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঝটিকা বাতাসে প্রাণ উদাস করিয়া দিতেছিল। বুকের মধ্যে থম্‌থমে অন্ধকার অকারণে জমিয়া উঠিতেছিল, স্বস্তি পাইতেছিলাম না। ঠিক এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেদিন আকাশের দুর্য্যোগ-লক্ষণ দেখিয়া তিনি নিম্নতলের একখানি প্রশস্ত গৃহে ভাঙ্গা টেবিলটার এক পাশে আসন পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। আমাদের সাধনচক্র চিরদিনই দ্বিতলের খোলা বারান্দায় অনুষ্ঠিত হইত। আজ এই অমার্জ্জিত উপেক্ষিত নিম্নের ঘরখানিতে শ্রীঅরবিন্দকে এই প্রথম উপবেশন করিতে দেখা গেল। এই সময়ে প্রতি ঘটনার পশ্চাৎই আধ্যাত্মিক ভাবানুভবের সন্ধান করিতাম। অতি তুচ্ছ ঘটনাও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে দেখার স্বভাব আমার গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ, আমার সমস্ত জীবনটাই অসংখ্য প্রকারের সাধনার আবর্ত্ত ভেদ করিয়া চলায়, অতি সহজ সাধারণ ঘটনাঘটনও আমার চক্ষে অসাধারণ নিগূঢ় রহস্যময় বলিয়া প্রতীত হইত। আমার মনে হইল—শ্রীঅরবিন্দের অধিরোহণ-পর্ব্বের পর অবতরণের পালা সুরু হইয়াছে। নিম্নতলে সাধনচক্রের এই অনুষ্ঠান তাহারই লক্ষণ।

সন্ধ্যার পর এইখানে বসিয়া নানা আলোচনা চলিল। শ্রীঅরবিন্দ স্বপ্রতিভায় কত অতীত আত্মাকে ডাকিয়া আনিয়া কত অলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা যে করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনও তিনি রাজা রামমোহনের আত্মাকে ডাকিয়া আনিয়া, ভাবাবেশে রাজার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশদ করিতেন। "যৌগিক সাধন" ইংরাজীতে যাহা তিনি একদিন টাইপ করিয়া আমার হাতে দিয়াছিলেন, তাহাও নাকি রাজা রামমোহনের আত্মার প্রেরণায় লিখিত হইয়াছিল। রামমোহনের আত্মা ব্যতীত আর এক জন বিগত পুরুষের আত্মাকে তিনি বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র। বাংলার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে তিনিই "ঋষি বঙ্কিম" নামে প্রথম অভিহিত করেন। ভাবাবেশে বঙ্কিমের প্রেরণা তিনি বলিতেন, আমরা শুনিতাম। আবার কখনও-বা তিনি যেন অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে-করিতে নভোমণ্ডলের অপূর্ব্ব-রহস্য-কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেন। পরলোক-তত্ত্বের অজ্ঞাত কাহিনী এমন নিপুণ ভাষায় তিনি চিত্রিত করিতেন যে, শুনিতে-শুনিতে আমরাও সেই অশরীরী জগতে তাঁর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আমরা মর্ত্ত্য হইতে অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া অধ্যাত্মজগতের তোরণ-দ্বারে গিয়া যেন দাঁড়াইতাম; মাটির জগৎ হইতে আমাদের চৈতন্য ঊর্দ্ধে বিচরণ করিত। শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া এমনই শিক্ষায় ও আনন্দে আমাদের দিন অতিবাহিত হইত।

অসংখ্য প্রকারের আলোচনার পর রাত্রি তখন বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাদের নামের অধ্যাত্ম ব্যাখা দিতে সুরু করিলেন। নলিনীকান্ত, সুরেশচন্দ্র, অমৃতকে ছাড়িয়া, অতঃপর তিনি আমার দিকে চাহিলেন। আমার কথাটাই স্পষ্ট মনে রাখিয়াছি। অন্যের ব্যাখ্যা তেমন স্মরণে নাই, তাই উহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন "মতি—মতি—বিশুদ্ধতার—পিউরিটির প্রতীক। লাল সংগ্রামসূচক শব্দ। রায় অর্থাৎ লীডার—নেতা। অতএব বলা যায়—মতিলাল বিশুদ্ধ সংগ্রামের নেতা।" এমনই রঙ্গ-রহস্যও ছিল আমাদের আলাপ-আলোচনার বিষয়। বেদোপনিষদের চর্চ্চা হইতে যোগ-জীবনের পরিচয় দিতে তাঁহার চক্ষে অসামান্য প্রতিভার আগুন ঝিলিক দিয়া উঠিত, আবার হাস্যকৌতুকের রঙ্গে তাঁহার ওষ্ঠপুটে

অপরূপ সারল্য ও আনন্দের লহরী প্রকাশ পাইত। কথার যেন অন্ত ছিল না।

এইবার বিজ্ঞানের কথা উঠিল। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় কোষের উপর, বিজ্ঞানের চেতনায় উঠিয়া জাতির সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন আনার ব্যবস্থা যে আমাদের করিতে হইবে, সে কথা অতি উৎসাহের সহিত তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের কথাগুলি আমার চিত্তে অনন্ত-প্রেরণায় রেখা টানিয়াছিল। তিনি আত্মসমর্পণের কথা বুঝাইতে নিজের হাতখানি প্রসারিত করিয়া যেমন বলিতেন "এই কর্ম্মটিও আমার নহে, ভগবানের শক্তিই করিতেছে", তেমনিই দক্ষিণ হস্তটী মাথার উপর উঠাইয়া বলিলেন "এই উপর হইতেই কর্ম্মসৃষ্টি হইবে। এই মাথার উপরই বিজ্ঞানের সমুদ্র বহিতেছে। যোগ যেমন স্বীকার করিয়া লওয়ায় জীবনে উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বিজ্ঞান-লাভেরও এই একই পন্থায় চাই স্বীকৃতি ও বিশ্বাস, আর সর্ব্বদা স্মরণ।"

তাঁহার কথা শুনিতে-শুনিতে আমার অতীত জীবনের আনুষ্ঠানিক সাধনের ঘুমন্ত বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। সেই যে মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে গুল্‌ফের আঘাত দিয়া মূলাধার হইতে অধিষ্ঠান, তার পর মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধচক্র ভেদ করিয়া দ্বিদলে কুণ্ডলিনীকে স্থির রাখার চেষ্টা করিতাম, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেতে সেই সাধন-বোধ অভিনব সত্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দ্বিদলের উর্দ্ধে যে আত্ম-চৈতন্য, তাহাই ইন্দ্রিয়াতীত; শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন "এইখানেই তোমার আসল স্বরূপ। শরীর লইয়া যেটুকু তুমি, তাহা ছায়া, সত্য নয়। আসল মানুষ পিছনেও নয়, সম্মুখেও নয়, ভিতরেও নয়—একেবারে উপরে। এইখানেই সত্যের প্রতিষ্ঠা যদি হয়, তবেই অন্তরে হইবে প্রকাশ, বাহিরে হইবে তার খেলা। যোগের সিদ্ধি বিজ্ঞানে; এইখানেই কর্ম্ম, জ্ঞান সবই থরে-থরে সজ্জিত আছে। বিজ্ঞানে উঠিলে, আর চেষ্টা করিতে হইবে না। মহাকাল সব প্রকাশ করিয়া দিবেন।"

কথা শুনিতে-শুনিতে উৎসাহে অন্তর পুলকিত হইল। আত্মসমর্পণের সাধনায় সাধক যখন বিজ্ঞানের সিংহদ্বারে পৌঁছায়, তখনই ভগবান্‌কে না জানিয়া, না পাইয়া যে চলা, তার সমাপ্তি; আর এইখানেই ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় জাগরণ হয়। আত্মসমর্পণের সিদ্ধিই বিজ্ঞানের প্রকাশ।

শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞানের ঊর্দ্ধে সচ্চিদানন্দের কথা বলিতে-বলিতে নীরব হইলেন। আমরা এই অমৃত-বাণীর মর্ম্মাস্বাদ করিয়া ধন্য হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের চিঠি ও কথা আমায় পাগল করিয়াছিল, তাহার সামান্য পরিচয় দুই-এক কথায় দিলাম। শ্রীঅরবিন্দের সাধন ব্যক্ত করার বিধান আমার নহে, তাঁহারই। এ বিষয়ে আমি আর অধিক দূর আগাইব না।

এই সকল কথার পর এইবার তিনি হঠাৎ একটী মর্ম্মঘাতী বাক্য প্রকাশ করিলেন—বলিলেন "মতিলালের সাধন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, but he puts a wall between him and me" অর্থাৎ "সে আমার ও তার মধ্যে একটী প্রাচীর তুলিয়া রাখিতেছে।"

নেশা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। চক্ষে স্বর্গের দীপ্তি। কর্ণে অমৃতের অনুভূতি। শক্ত নীরেট পৃথিবীমণ্ডলটাই যেন দ্রবনীয় মনে হইতেছিল। অকস্মাৎ নিষ্ঠুর বজ্রনাদের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের এই কথাটা আমায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। প্রথম মনে হইল—কথাটা জানালার বাহিরে ঐ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, ঐখান হইতে বুঝি কোন অজ্ঞাত পথিকের পরুষ পরিহাস হইবে। আমি শ্রীঅরবিন্দের দিকে চাহিলাম। কিন্তু না, এই নিষ্ঠুর আঘাত শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠনির্গতই বটে! আমার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। শ্রীঅরবিন্দ আর আমি, ইহার মধ্যে অন্ধকার-সৃষ্টি স্বপ্নেও কোন-দিন দেখি নাই। আত্মসমর্পণের মন্ত্রধ্বনি শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতেরই আকাশে-বাতাসে যে অমৃত-বর্ষণ করিয়াছে, তাহাতে অভিষিক্ত হওয়ার সাধেই তন্ত্র-মন্ত্র-উপাসনাব রসে অভিভূত হইয়া কত পথ ঘুরিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে গড়াগড়ি দিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিলন-বার্ত্তার নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার কত প্রচেষ্টাই না করিয়াছি! শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার পাওয়ার পূর্ব্বেই উৎসর্গমন্ত্রের মহিমস্তুতি গাহিতে গিয়াই আমার সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি 'উদ্বোধন' নাটক। আত্মসমর্পণের আকুলতায় যাজ্ঞার করুণ কণ্ঠ বোধ হয় পার্থ-সারথির কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, এই জন্যই না শ্রীঅরবিন্দ তপস্বীর মূর্ত্তি ধরিয়া এ দীনের দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। একাদশ বর্ষ পরে, যখন শ্রীঅরবিন্দের প্রেমামৃতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া এখানে আসিয়াছি, সে অন্তরের নিগূঢ় সত্যকে এমন করিয়া নিষ্ঠুর আঘাত দিবার প্রেরণা কেমন করিয়া আসিল!

কোন্ দিক্ দিয়া এই অধ্যাত্মমিলনকে ব্যাহত করার রাক্ষসী শক্তি আসন্ন মহাযুগের পরিপন্থী হইল? শ্রীঅরবিন্দ স্থির ধীর কণ্ঠেই তাঁর মর্ম্মানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণীতে সতর্কতা। কথাগুলিও ছিল স্নেহবিজড়িত। কিন্তু আমার চিত্ত তাহাতে তীক্ষ্ণ শেলবিদ্ধ হইল। মনে হইল—এই ১১ বৎসর ধরিয়া নিয়ত শ্রম ও সাধনায় যে সৃষ্টি গড়িয়াছি, তাহার মূল্য একটি কপর্দ্দকও নহে। শ্রীঅরবিন্দের নিকট আমার আত্মনিবেদনের মূলে কোন কামনাই ছিল না। আকস্মিক ঘটনা-স্রোতে তাঁর আগমন। শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োজনে আমার এই ১১ বৎসরের জীবন নিঃশেষ করিতেও বাধে নাই। এই ১১ বৎসরের জীবন-গতিও স্বপ্ন বা কল্পনা নহে। তার একটা বস্তুতন্ত্র ইতিহাস দীর্ঘায়িত হইয়া আমার সহিত অনুস্যূত। তাঁরই আদেশে রাষ্ট্রে মৃত্যু আলিঙ্গন করিত গিয়া, আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। আসক্তির রসায়নে সংসার-সাধনায় ব্যর্থ হইয়া, তাঁরই আকর্ষণে যোগের মন্ত্রে নূতন ক্ষেত্র-রচনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছি। আমার বলিতে এই মুহূর্ত্তে কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই। শ্রীঅরবিন্দের মুখ দিয়া এমন দারুণ আঘাত কে আমায় করিল? এমন কথা কেন তিনি আমায় বলিলেন? আপনাকে দেখার কিছুই ছিল না। বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণী যেমন এক মুহূর্ত্তে আয়ুঃহীন হয়, আমার সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে আমিও যেন পুড়িয়া ছাই হওয়ার উপক্রম হইলাম। মরণের আর্ত্তনাদে ঘর হইতে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণ হইতে সমস্ত বায়ুমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, বিকৃত স্বরে কেবলই প্রশ্ন করিতে লাগিলাম—কেন, কেন, তিনি এমন কথা উচ্চারণ করিলেন? এমন প্রাণঘাতিনী ধারণা কেমন করিয়া তাঁর হইল? বিদ্যুদ্বেগে আমায় কে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিল, সান্ত্বনাবাণীর প্রতীক্ষা করিতে দিল না। টেবিলের উপর রুটী-কাটা একখানি ছুরিকা পড়িয়াছিল, তাহা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলাম; তারপর রুদ্র কণ্ঠে কত কি যে বলিয়াছি, তাহা আমার স্মরণে নাই। সে ঘটনা যদি ভবিষ্যতের সূচনাপর্ব্ব না হইত, আমার এই উন্মত্ততা ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তি বলিয়াই বাজে-খাতে খরচ লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু সেদিনের সেই দৈব সঙ্কেতে কঠোর বজ্রের ন্যায়ই আমার জীবনের অতি নিষ্ঠুর সত্যই ধরা দিয়াছে। আমি হইয়াছিলাম সেদিন প্রলাপমুখর-কণ্ঠ, উন্মত্তের ন্যায় অধীর, বিক্ষিপ্তচিত্ত, নিদারুণ ব্যথিত। সহতীর্থগণ ছিলেন নিরপেক্ষ দর্শক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের

নয়ন স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সুধাভিষেকে বজ্রাহত ব্যথিত হৃদয় ধীরে-ধীরে শান্ত-সমাহিত হইল। মাংসপেশী শিথিল, ধমনীর রক্তস্রোতঃ মন্থর, শিরা-উপশিরা আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নীথর স্তব্ধতে আমাদের অতিবাহিত হইল; তারপর নীরবেই আমরা সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম। সে দুর্য্যোগময়ী রাত্রির দুর্ঘটনার কাহিনী আমার হৃদয়ে চির-ক্ষত সৃষ্টি করিয়া রাখিল।

ইহার পর তিন দিন আর শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাক্যালাপ রহিল না। একটী অতি ক্ষুদ্র কথা হৃদয়-ভেদ সৃষ্টি করিল। আমি অনুভব করিতে লাগিলাম—শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া গিয়াছে। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন "তোমার যোগ তোমার জন্য নয়, নিখিল মানবজাতির জন্য। তোমার যোগে লয় নাই, মোক্ষ নাই, আছে অনন্ত ভাগবত জীবন।" তাঁর এমন অনেক কথাই হৃদয়ে চিরাঙ্কিত ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। তেমনি তাঁহারই মুখে সেদিন এই প্রাচীর তোলার কথাটিও আমার বুকে বিঁধিয়া, মর্ম্ম ভাঙ্গিয়া দিল। এই তিন দিনের আকুলতাময়ী প্রতীক্ষাও কার্য্যকরী হইল না। তিনি যথানিয়মে দৈনন্দিন কর্ম্ম করিয়া চলেন—সংবাদপত্র পাঠ করেন, স্নান, আহার, হাস্যপরিহাস করেন; আমি দূরে-দূরে ঘুরিয়া বেড়াই। একবার ডাকিলেই হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় হয়, কিন্তু সে পাত্র শ্রীঅরবিন্দ নহেন। তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনের ন্যায় রহিলেন। আমার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। হৃদয়ের আগুন মাথায় উঠিল। সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। শ্রীঅরবিন্দ আকাশ-পানে স্থিরদৃষ্টিতে একা তখন বসিয়াছিলেন। অভিমান-বিজড়িত কণ্ঠে গিয়া জানাইলাম—অসহ্য যন্ত্রণার কথা। রুদ্ধ স্নেহের উৎস আমায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "এত শীঘ্র মাথার যন্ত্রণা হইবে, তাহা মনে করি নাই; ভয় নাই, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।"

সন্ধ্যার পর শয্যায় আসিয়া বসিলাম। সে রাত্রে ভোজনের স্পৃহা ছিল না। আমি থাকিতাম শ্রীঅরবিন্দের বাসভবনের এক প্রান্তের একটী ক্ষুদ্র গৃহে। হৃদয় বলিয়া বস্তুর সন্ধান আমাদের মধ্যে পাওয়া যাইত না। যে কয়জন আমরা একত্র থাকিতাম, নিজ-নিজ তালেই চলা হইত। কেহ

কাহারও খবর লওয়ার বালাই ছিল না। আমি বিনিদ্র হইয়া কত রাত্রি পর্য্যন্ত যে এই ভাবে বসিয়াছিলাম, তাহা জানি না। হঠাৎ মনে হইল যে, আমি দেহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি; আর কি এক অপূর্ব্ব ভাবময় আত্মচৈতন্য আমার এই শরীরটার উর্দ্ধে একটা জ্যোতির্ম্মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। সে এক অনির্ব্বচনীয় অনুভব—ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার নয়। অতি প্রত্যূষে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া, আবার আমার সবখানিকে লইয়া, আমি পূর্ব্বের ন্যায় জাগিয়া উঠিলাম। স্বপ্নটীর কথা স্পষ্টই স্মরণে আছে। দেখিলাম —আমার শরীরের ভিতর হইতে এক অতি প্রাচীনা নারীমূর্ত্তি বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহার উভয় করে দড়ি-বাঁধা একটী প্রকাণ্ড কুম্ভীর আর একটী গর্দ্দভ তাহার অনুসরণ করিতেছে। স্বপ্নভঙ্গে শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। সমস্ত শরীর অস্বাভাবিক রকমের লঘু মনে হইল। মাথাটাও খালি হইয়া গিয়াছে, যন্ত্রণাও নাই। চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তিন দিন পরে শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া ঘটনা জানাইলাম। সাধনার কথা তিনি অতিশয় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া শুনিতেন। সব কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন "তোমার উপরের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাতন প্রকৃতি তার অন্ধতা ও ক্রূরতা লইয়া বিদায় হইয়া গিয়াছে। আরও অনেক কিছু হইবে।"

আমার আনন্দের সীমা রহিল না। শ্রীঅরবিন্দকে আবার অতি নিকটেই পাইলাম; অন্তরে অপ্রাকৃত-শক্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময় পণ্ডিচারীর কয়েকজন যুবককে লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে একটা যৌগিক আলোচনার ক্লাস খুলিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের ইহাতে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। মঁসিয়ে রিশারও এই ক্লাসে যোগদান করিতেন।

দিন অতি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। শ্রীঅরবিন্দ আর আমি। একদিন মধ্যাহ্নে নলিনীকান্ত সহাস্যে একখানি ডাকের চিঠি আমার হস্তে দিলেন, বলিলেন—"মতিদা, এ নিশ্চয় বৌদিদির পত্র।" সত্যই তাই। নলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌদিদি কি লিখিয়াছেন?" সুদূর প্রবাসে দীর্ঘদিনের পর স্ত্রীর পত্র যে রসানুভূতির সৃষ্টি করে, এই পত্রে তাহার কিছুই ছিল না। এই পত্রখানি অন্যের কাছে প্রকাশ করিতেও লজ্জা হয়।

পত্রে স্বামীর প্রতি কোন সম্বোধন নাই। একবিন্দু ভাবের রঙ লেখার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুখের কথা যেমন তাঁর প্রস্তর-কঠিন ওষ্ঠপুটে জমাট বাঁধিয়া থাকিত, ব্যক্ত হইত না, এই পত্রেও তেমনি তাঁহার লেখনী বোধহয় দুই-একটা আঁচড় কাটিয়াই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। পত্রে দুই ছত্র আঁকা-বাঁকা করিয়া লেখা—"আপনি কেমন আছেন জানাবেন। মন কেমন করে, অনেক দিন দেখি নাই।" পত্রে আর কিছু নাই। স্ত্রীর পত্র দেখাইবার মত নহে। আমার ভাব দেখিয়া নলিনী নিরাশ হইলেন। কিন্তু এই বড়-বড় দুই ছত্র লেখা আমার মানসপটে লেখিকার গুরুগম্ভীর মূর্ত্তিচিত্র ফুটাইয়া তুলিল। আমার অদর্শনে সে হিয়া যে দিন-দিন শুকাইয়া যাইতেছে, অতিশয় অতিষ্ঠ হইয়াই যে এই পত্রখানি হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সুবিস্তৃত হইয়া আমার অন্তর ছাইয়া ফেলিল। এ ডাকও যেন উপেক্ষার নহে। আমি বুঝিলাম—একুল-ওকুল, দুই কুল লইয়া জীবন চলে না। হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুদূর চন্দননগরের স্মৃতি পরিহার করিলাম।

তার পরদিনই দেখি—মীরা দেবী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই যে এক মাস পূর্ব্বে শয্যা পাতিয়াছি, তাহা আর তুলি নাই। যত সংবাদপত্র পাঠ করিয়াছি, তাহা জড় হইয়া শয্যাটী ঢাকিয়া দিয়াছে; স্নানান্তে সিক্ত বস্ত্রখানি মেঝের এক পাশে পড়িয়া কতক শুকাইয়াছে, কতক ভিজা আছে। গ্লাস, ডিস্, কুঁজা, ঘটি, বাল্‌তি ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। মীরা দেবীর দৃষ্টির ভঙ্গিতে আমাকেও বুঝিয়া লইতে হইল—এটা সুস্থ মানুষের ঘর নহে, একটা পাগলের। তিনি বলিলেন "বাল্যবিবাহের পরিচয় আপনার এই ঘরখানি। আপনার জন্য আপনার স্ত্রীকে যে কতখানি খাটিতে হয়, তাহা বুঝিলাম।"

আমার লজ্জার সীমা রহিল না। সেদিন হইতে স্বহস্তে নিজের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম যতদূর সম্ভবপর, পরিপাটী করার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কাপড় নিঙড়ান স্বভাবে নাই। কোনদিন গামছা নিঙড়াইয়া মাথা মুছি নাই। নিজের মাথাটা আঁচড়াইবারও শক্তিচর্চ্চা করি নাই। অতি শিশুকালে পরিচর্য্যা জননীর স্নেহে হইয়াছে। বাল্যে সহোদরাপ্রতিমা এক ধাত্রী সম্পন্ন করিয়াছেন। কৈশোরেও মহিলা বন্ধুর অভাব হয় নাই।

যৌবনের প্রথম প্রভাত হইতেই গৃহলক্ষ্মী প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রয়োজন মিটাইয়াছেন। আমি খাইতে-শুইতে এখানে অসহায়ের মতই দিন গণিয়াছি। কিন্তু এটুকু ক্লেশও আমায় আর সহিতে দিবে না বলিয়া চন্দননগর হইতেই সেবার অধিকার লইয়া আমার দুইজন শিষ্যবন্ধু আসিয়া পণ্ডিচারীতে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে অরুণচন্দ্র সোমের নাম আজিও উল্লেখযোগ্য। আমি দেখিলাম—আমার শয্যাধার আর মলিন ও বিশৃঙ্খল নহে। গৃহের আসবাবপত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত। আমি অতি সন্তর্পণেই রহিলাম। এই অবস্থায় মীরা দেবী যদি ঘরে আসেন, তিনি নিশ্চয় বুঝিবেন যে, আমি নিজের জীবন লইয়া কতটা পরমুখাপেক্ষী। আমি তো তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না যে, আমার এই আপেক্ষিকতার জন্য আমি দায়ী নহি, ইহাই আমার কল্পবিধৃত সত্য। আজও যে শয়ন, ভোজন, জীবনযাপনের প্রতি কর্ম্ম অন্যের বিনা আনুকূল্যে সম্পন্ন হয় না, সে দিনের শরীরিণী শক্তি আজ অশরীরিণী হইয়াও এই সত্যই রক্ষা করিতেছে, ইহা কেমন করিয়া বুঝাইব! আমি শক্তির পরিপূর্ণ অধীন, শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রে নহে, জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মে; এমন কি শরীরধারণের প্রতি ব্যাপারেও শক্তি আজও আমায় স্বাধীনতা দেন নাই।

ভাবের কথা ছাড়িয়া দিয়া কাজের কথা বলি। পণ্ডিচারীতে দীর্ঘদিন থাকা আমার ইচ্ছাধীন হইল না। চাকা ঘুরিয়া গেল। চন্দননগরের ডাক লইয়া যাহারা আসিল, তাহারা আমার অনুগত সখা, সুহৃৎ ও শিষ্য। কিন্তু ইহাদের আশ্রয় করিয়া অলক্ষ্যে যে শক্তি আমায় আকর্ষণ করিল, তাহা উপেক্ষা করা গেল না। শ্রীঅরবিন্দও শ্রেয়ঃকে কোনদিন অস্বীকার করেন নাই, সে পরিচয় পরে দিব। তিনি আমার স্ত্রীর ছায়াচিত্রখানি অতি মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন "আমি তোমার স্ত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এই ছবি তারই পরিণতি। ইনি তোমার অনিষ্ট করিবেন না—মাতৃমূর্ত্তি, দেবীমূর্ত্তি।" আনন্দে আমার হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। পতি-পত্নীর দৃঢ় সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইল। আমার ফেরার হাওয়া বহিল। সম্মুখে ১৫ই আগষ্টের আর একটি মাস বাকি। মঁসিয়ে রিশার বলিলেন "এবার ১৫ই আগষ্ট এইখানে করিতে হইবে।" আমি শ্রীঅরবিন্দের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি আমার চক্ষের দৃষ্টিতে অব্যক্ত

আবেদন অনুভব করিয়াই বলিলেন "না, ১৫ই আগষ্টের বিপুল আয়োজন চন্দননগরেই হইতেছে। মতিকে ফিরিতে হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দ আমার কর্ম্মকেই জয়যুক্ত করিলেন। পৃথিবীতে সে এক অপার্থিব সম্বন্ধ। জীবনের সমুচ্চে শ্রীঅরবিন্দের স্থান। কর্ম্মক্ষেত্র চন্দননগর। যোগজ হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া এই কর্ম্মব্যাপ্তি। ইহা আসক্তিমূলক কর্ম্ম নহে, পরন্তু ঈশ্বরবিধান। পণ্ডিচারী হইতে এবার বিদায় লইলাম।

অন্তরজগতের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছিল। বাহিরের কর্ম্মতালিকার আর প্রয়োজন হইল না। তাঁহার স্বপ্রকাশিত এই কথা কয়টাই আমার যথেষ্ট হইয়াছিল : "As you well know, I am identifying myself with only one kind of work or propaganda as regards India, the endeavour to reconstitute her cultural, social and economic life within larger and freer lines than the past on a spiritual basis."

অর্থাৎ "তুমি ভালরূপেই জান—ভারতে আমার একমাত্র কাজ, একমাত্র প্রচারানুষ্ঠানে আমি অখণ্ডভাবে আপনাকে ঢালিয়া চলিয়াছি—উহা অতীতের চেয়ে আরও উদার, আরও মুক্ত প্রকরণের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং আর্থিক জীবন পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং অধ্যাত্মভিত্তির উপরেই এই নূতন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে।"

আমার অন্তর-বাহির সুনির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। চিন্তার আবর্ত্তে আমার শক্তি কোনদিন স্তম্ভিত নহে। কাজ আমার নহে, ঈশ্বরের। পথ তাই চিরদিন মুক্ত অবাধ আমার সম্মুখে। কর্ম্ম-চাঞ্চল্য দেহের ও মনের। দেহ-মন কর্ম্ম করিলেই স্পন্দিত হইবে। আত্মা শান্ত সমাহিত, এ অনুভূতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ম্ম কোনদিনই আমার ভার হয় নাই। কর্ম্ম শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সাবলীল সহজ ছন্দে বহিয়াছে। কর্ম্মের বৃহত্তর ক্ষেত্র-রচনার প্রেরণায় আমি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। "প্রবর্ত্তক" বাংলায় কর্ম্মক্ষেত্র-সৃষ্টির উপযোগী হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় তাহা ভারতব্যাপী করার প্রবৃত্তি হইল। ইহার জন্য আমি একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির করার প্রস্তাব করিলাম। শ্রীঅরবিন্দ সম্মত হইলেন। গোল বাধিল নাম লইয়া। সুরেশ ও নলিনী নাম স্থির করিল "Path-finder"; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ বলিলেন : "প্রবর্ত্তক"-এর

অনুরূপ ইংরাজী "Standard Bearer"। এই নাম লইয়াই বিজয়ী বীরের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের পদ-বন্দনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইলাম। সেই বিস্তৃত অলিন্দে তখন শুধু তিনি আর আমি। তিনি প্রসারিত বাহুযুগলে আমায় হৃদয়ে লইয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন। এ স্পর্শ মর্ত্ত্যের নহে, অমৃতের। তাঁর গদগদ কণ্ঠস্বর আজিও কর্ণে মধুবর্ষণ করে। সে আশীর্ব্বাদ কোন্ দিক্ দিয়া সার্থক হয়, এ মর্ত্ত্য মনে তাহা অবধৃত হইবে না। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা ভাষা তেজোদৃপ্ত কিন্তু সংক্ষিপ্ত। শ্রুতিতে গাঁথিয়া রহিয়াছে তাঁহার অমর বাণী "মতি, তোমার কাজ আমার কাজ। আমার কাজ তোমার কাজ।"

মিষ্টার ও মাদাম রিশার সে সন্ধ্যায় তখনও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, আমায় বিদায়-সম্ভাষণ দিতে নিয়েই অপেক্ষা করিতেছিলেন। মঁসিয়ে রিশারের সহিত আলিঙ্গন করিয়া, মীরা দেবীর করপুট ধারণ করিয়া বিদায় লইলাম। তাঁহারা উভয়ই গৃহদ্বারে আসিয়া, আমায় সাদর বিদায়াভিনন্দন দিলেন। মীরা দেবীর সমস্যা মাথায় লইয়াই চন্দননগরে ফিরিলাম। আসিবার সময়ে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য কি, তৎসম্বন্ধে তাঁহার হস্তলিখিত নাতিক্ষুদ্র একখানি বিবৃতিপত্র সঙ্গে লইয়াছিলাম। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এই মহীয়সী বিদেশিনী মহিলার আত্মানুভূতি আজিও আমি স্মরণে রাখিয়াছি। উহা 'প্রবর্ত্তক'-এ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার অনুলিপি আমি এইখানে সংযুক্ত করিলাম:

"When and how did I become conscious of a mission which I was to fulfil on earth? And when and how I met A. G.?

"These two questions you have asked me and I promised a short reply.

"For the knowledge of the mission, it is difficult to say when it came to me. It is as though I was born with it, and following the growth of the mind and brain, the precision and completeness of this consciousness grew also.

"Between 11 and 13, a series of psychic and spiritual experiences revealed to me not only the existence of God but man's possibility of uniting with Him, of revealing Him integrally in consciousness and action, of manifesting Him

upon earth in a life divine. This, along with a practical discipline for its fulfilment, was given to me, during my body's sleep, by several teachers, some of whom I met afterwards on the physical plane. Later on, as the interior and exterior development proceeded, the spiritual and physical relation with one of these beings became more and more clear and pregnant, and although I knew little of the Indian philosophies and religions at that time, I was led to call him Krishna, and henceforth I was aware that it was with him (whom I knew I should meet on earth one day) that the divine work was to be done.

"In the year 1910, my husband came alone to Pondicherry where under very interesting and peculiar circumstances, he made the acquaintance of A. G. Since then we both strongly wished to return to India—the country which I had always cherished as my true mother-country and in 1914 this joy was granted to us.

"As soon as I saw A.G., I recognised in him as the well-known being whom I used to call Krishna.........and this is enough to explain why I am fully convinced that my place and my work are near him in India.

—Mira Richard."

ইহার মর্ম: "পৃথিবীতে আমি যে কাজ করিতে আসিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কবে ও কি ভাবে হইল? কখন ও কি ভাবে শ্রীঅরবিন্দের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়?

"এই দুইটী প্রশ্ন আপনি আমাকে করিয়াছেন; সংক্ষেপে উত্তর দিব, প্রতিশ্রুতি আমি দিয়াছি।

"কাজটী সম্বন্ধে জ্ঞান যে আমার কবে হয়, তাহা বলা কঠিন। এটী যেন মনে হয় জন্মেরই সাথে পাইয়াছি, এবং পরে মন ও মস্তিষ্কের পুষ্টির সঙ্গে এই চেতনাটিও স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে।

"এগার হইতে তের বৎসর বয়সের মধ্যে আমি সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক জগতের ধারাবাহিক কতকগুলি উপলব্ধি-পরম্পরার ফলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় পাই; আরও জানিতে পারি যে, মানুষ ভগবানের সাথে মিলিত হইতে পারে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে তাঁহাকে পূর্ণভাবে ধরিতে পারে, একটা দিব্যজীবনে তাঁহাকে এই পৃথিবীতেই প্রকট করিতে পারে। এই জিনিষটি

আর ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটী সাধনা আমার শরীরের সুপ্তিকালে কয়েকজন উপদেশকের কাছে আমি পাই—তাঁহাদের কয়েক-জনের সাথে পরে স্থূলজগতে আমার সাক্ষাৎকার হয়। তারপর বাহিরে ও ভিতরে যেমন বাড়িয়া উঠিয়াছি, ইঁহাদের একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সম্বন্ধও তেমনি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। তখন ভারতের দর্শন বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু ইঁহাকে আমি 'কৃষ্ণ' নাম দিবার প্রেরণা পাই এবং তখন হইতেই আমি জানিতে পারি যে, ইঁহার সাথে স্থূলজগতে আমার একদিন দেখা হইবে ও ইঁহার সাথে মিলিয়া ভগবানের কাজটি আমাকে করিতে হইবে।

"১৯১০ সালে আমার স্বামী একাকী পণ্ডিচারীতে আসিয়াছিলেন। তখন এক কৌতূহলকর ও অদ্ভুত ঘটনাচক্রে শ্রীঅরবিন্দের সাথে তাঁহার পরিচয় হয়, আর তখন হইতে আমরা স্বামী ও স্ত্রী দুই জনেই ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হই—আমি তো ভারতবর্ষকে চিরদিনই আমার প্রকৃত মাতৃভূমি বলিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি। ১৯১৪ সালে এই সৌভাগ্য আমাদের হয়।

"শ্রীঅরবিন্দকে যখনই আমি চাক্ষুষ দেখিলাম, তখনই চিনিতে পারিলাম যে, তিনিই হইতেছেন সেই সুপরিচিত ব্যক্তি, যাঁহাকে আমি 'কৃষ্ণ' নাম দিয়াছিলাম।...

"এইটুকুতেই আপনি বেশ বুঝিতে পারিবেন—কেন আমার দৃঢ় ধারণা যে, আমার স্থান ও কর্ম্ম তাঁহারই পাশে, ভারতবর্ষে। ইতি—মীরা রিশার।"

চন্দননগরে ফিরিলাম। আমার জীবন-পর্ব্বে প্রতি দ্বাদশ বর্ষে এক যুগান্তকরী ঘটনার সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছি। একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলেই, সমস্ত দ্বাদশ বর্ষটী কোন একটি বিশেষ সাধ্য লইয়া অতিবাহিত হইয়াছে। দ্বাদশ বর্ষে যুগ, এ কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ সমাপ্ত হইলে, শ্রীঅরবিন্দের বাংলাত্যাগের যুগান্ত হইবে; আমার ও শ্রীঅরবিন্দের যোগসম্বন্ধেরও দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দের গুরুত্ব আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে, তিনি বাংলায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন

করিবেন কি না? তিনি সম্মতিসূচক উত্তর দিয়াছিলেন এবং তিনি যে চন্দননগরেই আসন পাতিবেন, এ প্রত্যয় আমার দৃঢ় হইয়াছিল। ইহার প্রস্তুতির জন্য এবার চন্দননগরে ফিরিয়া আমার কর্ম্মপ্রবাহ প্লাবন সৃষ্টি করিল। তাহার কিছু পরিচয় পরে দিব।

বাড়ী ফিরিলাম। সেই বসিবার ঘর। সুপরিস্কৃত প্রাঙ্গণ, সুপরিস্কৃত দালান, সেই শয়ন-কক্ষ, রন্ধনশালা, সবই সুমার্জ্জিত পরিচ্ছন্ন রূপে আমায় সাদর অভিনন্দন জানাইল। এই সঙ্গে সহতীর্থগণের পুলকোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি, তাহাদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের সোৎসুক প্রশ্ন আর প্রাঙ্গণপ্রান্তে দরজার আড়ালে জীবন-সঙ্গিনীর অনিন্দ্যা রূপশ্রী আমায় যেন নূতন করিয়া বরণ করিয়া লইল। আমি যেন এই কয় মাসের মধ্যে একেবারে অভিনব হইয়া ফিরিয়াছি। প্রত্যেকের আচার-আচরণে সেই প্রত্যয়ের অনুভবই যেন ঘোষিত হইতেছিল।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পড়িয়াছিলাম 'পরকে আপন করিতে পারিলে, পিরীতি মিলয়ে তারে'; আজ এই পিরীতি-নগরে পিরীতি-পড়শীর মধ্যে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া গেল, এক অখণ্ড হৃদয়ানুভূতিতে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহিঃপ্রাঙ্গণে বসিয়া পরস্পর আলাপালোচনায় কাটাইয়া দিলাম। গৃহলক্ষ্মী আমায় তিনটি অপবাদ দিতেন—পথ পাইলে চলা, কালী-কলম-কাগজ পাইলে লেখা, আর লোক পাইলে কথা বলা। এ রোগের একমাত্র ঔষধ ছিল গৃহদেবীর অকস্মাৎ বাধা দেওয়া। এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। দীর্ঘ দিনের পর প্রবাস হইতে ফিরিয়া, সহকর্ম্মীদের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্ত্তা তিনি ধৈর্য্যের সহিত অনেক ক্ষণ সহিলেন—তার পর ডাকের পর ডাক দিয়া আমায় বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। তৃপ্তিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। আমার আগমনপ্রতীক্ষায় প্রতি গৃহ-সামগ্রীটির সহিত গৃহতলের প্রতি ধূলিকণাটিও যেন উদ্‌গ্রীব-উৎকণ্ঠিত ভাবে আমার পরশ চাহিতেছিল। গৃহ-পরিবেশের মধ্যে এই স্নিগ্ধ-শান্ত আবহাওয়া একটী সজীব প্রাণের অমৃত-স্পর্শেরই আকর্ষণ, ইহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। বহু দূর হইতে কোন এক ক্লান্ত অতিথি আসিয়া যেন অশেষ পরিতৃপ্তিজনক পরম আশ্রয় পাইল। আনন্দের আতিশয্যে আমি অপলক নয়নে তন্বীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। সজল নয়নের স্নিগ্ধ-দৃষ্টি পুলকে

উছলিয়া উঠিতেছিল—এ কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, বাক্যে তাহার প্রকাশ হয় না!

কনক-কান্তি অঙ্গে। নয়নে দীপ্তি; ওষ্ঠে, গণ্ডে রক্তোৎপল-শোভা। কিন্তু এ কি বেশ? পরিধানে ছিন্ন অর্দ্ধমলিন বস্ত্র। কেশপাশ রুক্ষ, গ্রন্থিল। সীমন্তে কিন্তু নবারুণ-রক্তিম সমুজ্জ্বল সিন্দুরের রেখা। নিদাঘের চাতক—প্রাবৃটের প্রথম বর্ষণে হিয়া তার শীতল হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলাম—আজও কি পরিধানের বস্ত্রাভাব ঘটিয়াছে? অনটনের মাত্রা কি এতই বাড়িয়াছে যে, মাথায় এক বিন্দু তৈল যুটে না? এ দৈন্যমূর্ত্তি কেন?

ওষ্ঠপুটে বিদ্যুৎ ঠিকারিয়া পড়িল। অভিমানবিজড়িত স্বরে সুগভীর প্রণয়স্পর্শে দাবীর কণ্ঠ চিত্তপ্রাণ শীতল করিল: "আমার দুঃখে দরদ তোমায় দেখাইতে হইবে না। ক্লান্তিও তো নাই তোমার, স্নানাহার সারিয়া একটু ঠাণ্ডা হইয়া কথা কহিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা! বাবা রে বাবা, কথা আর ফুরায় না!"

বহুদিন পরে সুকোমল করপল্লবে শরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। গায়ের চাদরখানা টান দিয়া তিনি খুলিয়া লইলেন, জামার বোতাম খুলিতে-খুলিতে বলিলেন "সেখানে তো আর বিনা মাহিনার দাসী নাই, বসিয়া খাওয়াইবে; এ কি হইয়া গিয়াছ? কণ্ঠার হাড় যে বাহির হইয়া গিয়াছে!"

আমি একবার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে চাহিয়া বলিলাম "কৈ না, বেশ তো গোলগাল নধর, আগের চেয়ে বরং ভালই হয়েছি মনে হয়!"

তিনি ঠোঁট দু'খানি ভেঙচি কাটার ন্যায় একটু বাঁকাইয়া, ফুলাইয়া বলিলেন "নিজের দিকে যদি তোমার সে দৃষ্টি থাকিবে, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? সকালে কি খেতে শুনি? তিন দিন গাড়ীতে কি খেয়েছ বল ত?"

লঘু প্রশ্নের লঘু উত্তর। হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ-পরিহাস, স্নানাহার, শয়নকাল পর্য্যন্ত সমানে চলিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের নিকট মৎস্য-মাংস-ভোজনের দমন-প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি পাইয়া সর্ব্বভুক্ হইয়াছিলাম; কাজেই ট্রেণের যাত্রী কেলনার, স্পেন্সার প্রভৃতি হোটেলওয়ালাদের অনুগ্রহে ভোজনাদি ব্যাপারে কোন কষ্টই পাই নাই; তবে শ্রীঅরবিন্দের ভবনে পূর্ব্বে ছিল রাবণের অশোক-কাননের চেড়ী 'ভাগ্যমের' হাতে আহারের

প্রচুর নির্য্যাতন। এবার এক মাদ্রাজী লেডী সৈন্নিত্রীর হাতে তাহা কিছুটা সংশোধিত হইলেও, ভোজনাদির দুর্দ্দশার যে তাহাতে বিন্দুমাত্র উপশম হয় নাই, এ কথা মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করিলাম। তিনি সকালে 'আপাম' খাওয়ার কথা শুনিয়া হাসিয়াই আকুল। তারপর মধ্যাহ্নে হাতাখানেক মটনকারীর সহিত কয়েক গ্রাস অন্নভোজনের কথা বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বৈকালে ?"

বলিলাম "খাওয়ার একচেটিয়া দাবী লইয়া শ্রীঅরবিন্দ-মন্দিরে তো উপস্থিত হই নাই!" রাত্রে খলিসাজাতীয় একপ্রকার সমুদ্রমৎস্যের ঝোল-ভাত খাওয়ার কথা বলিতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "রুটি-লুচি বুঝি হয় না ?"

আমি বলিলাম "হরের ঘরে সিদ্ধির ঝুলি আছে বটে, কিন্তু তাহা শূন্য হইয়াই বাতাসে উড়ে; অন্নপূর্ণার উদয় কিন্তু আসন্ন। এইবার যখন যাব, হয় তো তুমিও সঙ্গী হবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী সেদিন মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, ঘটনায় পরে তাহা সমর্থিত হওয়ার স্মৃতিটা আজও মুছে নাই।

মীরা দেবীর কথাই উঠিল। নারী—নারীর কথা যেমন খুঁটিয়া-খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করে, কোন পুরুষে তেমন পারে না। মীরা দেবীর ছবিখানি আমি সঙ্গে আনিয়াছিলাম; অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহা তিনি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "মেমেরা বেশ সুন্দরী হয়, না ?"

আমি বলিলাম "ছবি দেখিয়া তাহা বুঝা যায় কি ?"

তিনি বলিলেন "বয়স হইয়াছে, কিন্তু শ্রী আছে। প্রফুল্লতাময়ী মূর্ত্তি।"

আমি মীরা দেবীর আচার-আচরণ, আমার গৃহের বিশৃঙ্খলা দেখিয়া তাঁর অভিমত এবং প্রতি সপ্তাহে তাঁর নিমন্ত্রণের কথা যথাযথ বলিলাম।

তিনি হঠাৎ বলিলেন "আচ্ছা, তাঁহাকে এক যোড়া ফরাসডাঙ্গার শাড়ী পাঠাইলে হয় না ?"

সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন "সুন্দর দেখাইবে।"

ভবিষ্যতে তাঁহার এ কল্পনাও রূপ লইয়াছিল বলিয়াই কথাগুলি স্পষ্টই মানসপটে আঁকিয়া রহিয়াছে।

আবার তাঁর সুবিন্যস্ত কেশপাশ শ্লথ-কবরীতে মুখশ্রী বর্দ্ধিত করিল। মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরিচ্ছন্ন শাড়ী পরিধান করিলেন। কর্ণযুগলে আবার মুক্ত খচিত স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইল। মণিবন্ধে, কণ্ঠে কনক অলঙ্কার ঝলমল করিয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ে কমল-বনের শতদল-শোভায় যেন আমার গৃহমন্দির সমুজ্জ্বল হইল। জানিলাম—আমার প্রবাসকালে তিনি অঙ্গ হইতে স্বর্ণালঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সতত অর্দ্ধমলিন বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, কেশপাশ বিনা প্রসাধনে জট পাকাইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় সীঁথির সিন্দুর তিনি সযত্নে রক্ষা করিতেন। স্বামিসোহাগিনী সতীর ইহা যোগ্য চরিত্রেরই পরিচয়। আজও আমি মনে-মনে এই গানই গাহি—

"দেবি আমার, সাধনা আমার—
ধ্রুবজ্যোতিঃ তুমি জীবনে।"

সে একদিন—মধ্যাহ্নে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি—তিনি একাগ্র-চিত্তে আমার একখানি ফটো লইয়া সন্দর্শন করিতেছেন। আমি পশ্চাৎ গিয়া দাঁড়াইলাম ; তিনি যেন তন্ময় ধ্যানে নিমগ্না। ছবির সহিত কি নিবিড় পরিচয়! ছবিখানি বাঁধান নহে, একখানি কার্ডের উপর সংলগ্ন ছিল। দেখিলাম—চিত্র অস্পষ্ট না হইলেও, উহা এমনই ভাবে তৈলচর্চ্চিত হইয়া গিয়াছে যে, নিঙড়াইলে বোধ হয় দুই-এক বিন্দু তৈল নিষ্কাশিত হইবে। আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আমার অদর্শন-কালে এই ছবিই ছিল তাঁহার আশ্রয়। এই ছবিখানিকে তিনি হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া নিশি যাপন করিতেন। শরীরের ঘর্ম্মে, তৈলে ছবি অভিষিক্ত হইয়াও, তাঁহার নিকট প্রাণের সাড়া দিয়াছে ; তাহা না হইলে, উহা লইয়া এমন নিবিষ্টচিত্ত মানুষ কেমন করিয়া হইতে পারে? আমি ধীরে-ধীরে তাঁহার নয়নপল্লব উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু একি! নয়ন-নির্ঝরে আমার করপুট অভিষিক্ত হইল। আমার মুখে কথা সরিল না। তিনি তাড়াতাড়ি চক্ষুঃ মার্জ্জন করিয়া ছবিখানি গোপন করার চেষ্টা করিলেন ; আমি তাহাতে বাদ সাধিলাম। ফলে কাড়াকাড়ি, প্রণয়ের মল্লযুদ্ধ সুরু হইল। "নাম-পরশনে যার ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়!" কবির এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া ধন্য হইলাম। রক্ত-মাংসের ঊর্দ্ধে প্রণয়ের ডালি সাজাইয়া যে

তপস্বিনী স্বামীর নিত্যরূপের উপাসিকা, তাঁকে বুকে ধরিয়া যে অনুভবস্পর্শ, সে কথা প্রকাশের ভাষা চিরদিন মূক হইয়া থাকিবে।

নারী ও পুরুষ সমাজের ভিত্তি। নারী ও পুরুষের অনাবিল সম্বন্ধই সমাজের শ্রী ও ঐশ্বর্য্য। স্ত্রী—স্বামীর শুধুই শয্যাসঙ্গিনী নয়, ধর্ম্মপত্নী। প্রথম উভয়ের মধ্যে সম্ভোগলালসা দূর করার সূচনাকালে ভেদের ব্যবধান হয় তো বাড়িয়া যাইবে, এই আতঙ্ক বড় হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ হইতে যতই আমরা মুক্তি পাইতেছিলাম, ততই হৃদয়-গ্রন্থি দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। আনন্দ ও আলোর রাজ্যে দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া অতি উল্লাসেই আমাদের দিন কাটিতেছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দটি ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল; আমার আকুলতার সীমা রহিল না। শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্মক্ষেত্র-রচনায় আমিই একমাত্র দায়ী, এইরূপ মনে করিতাম। শ্রীঅরবিন্দও বলিতেন "মতির শ্রমের অন্ত নাই।" এ কথা তাঁর মর্ম্মের—বর্ণে-বর্ণে সত্য। শ্রমই আমার সাধনার অঙ্গ চিরদিন।

অন্তরের মণিকোটায় ছিল অনির্ব্বাণ-দীপশিখা। অন্তরের দৈন্য প্রতি মুহূর্ত্তে দূর করিয়া, হৃদয়ের উৎসাহানলে নিয়ত ইন্ধন যোগাইতেন আমার ধর্ম্মপত্নী। কর্ম্মক্লান্তি অবসন্নতার কারণ হইত না।

সম্মুখে ১৫ই আগষ্ট। এবার উৎসব শ্রাবণের ঘনান্ধকারে চুপে-চুপে নিষ্পন্ন হইবে না, সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বারীন-দা উৎসবে যোগদান করিবেন। সহরেও উৎসবঘোষণার প্রচার হইল। সহরের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা এই উৎসবে যোগ দিবেন। সে মহাড়ম্বরে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহায় আমার গৃহদেবী। আমাদের আনন্দের পিছনে সব-কিছু অনুষ্ঠানের ভার তাঁহারই। লোকজনের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব তাঁহারই উপর নির্ভর করে। তাঁর চির-সহকারিণী মেজ-বৌ আসিয়া কোমর বাঁধিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কেবল আমাদের প্রাণকেই উদ্বুদ্ধ করে নাই, সারা সহরে নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল।

২৯শে শ্রাবণের বারীন-দার পত্রাংশ হইতেই বুঝা যাইবে—এই উৎসবের তোড়যোড়ে তাঁর প্রাণেও কতখানি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন: "কাল···কাছে গিয়াছিলাম, তাদের বাড়ীর সব অসুখ, তবুও দুই-তিন জন মেয়ে, ছয়-সাত জন পুরুষ যাবেন। দিদি (সরোজিনী) ও অবি'র

(অবিনাশের) বোন হুনী যাবে। মেজ-দাদার এক মেয়ে যেতে পারে। হেমন্ত, সমরেন্দ্র, কীর্ত্তি যাবে। তার স্বামীও যেতে পারে। ইতালী থেকে একদল অনুকূল ঠাকুরের পার্টি যাবার জন্যে ধরেছে। ঠাকুর দয়ানন্দের দলও ছাড়বে না। কয়েকখানা গাড়ী ৬টার ট্রেণের জন্য রেখো, আর একজন পথপ্রদর্শক। আমি বেজায় হিসাব-ভোলা, পথ চিনতে পারব না" ইত্যাদি।

১৫ই আগষ্টের প্রথম প্রহর বেলার মধ্যেই উৎসব-প্রাঙ্গণ লোকপূর্ণ হইয়া উঠিল। বারীন-দা বন্দীজীবন হইতে মুক্তি পাইয়া রুদ্ধ প্রাণের আগুন ছড়াইয়া দিতেছিলেন। বাংলার যত ধর্ম্ম ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ছিল, বারীন-দার পরিদর্শন কোথাও বাদ যায় নাই। তিনি যেন দুই হাতে সমস্ত বাংলাটাকে টানিয়া এই উৎসবে জড় করিয়াছিলেন। অলিন্দে, ছাদে, প্রাঙ্গণে সোৎসুক নারীপুরুষের চঞ্চল চক্ষুঃ নবযুগপ্রভাতের জ্যোতির্ম্ময় কিরণদর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। উৎসব-ক্ষেত্রটি উৎসাহ ও আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দিনই 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার'-এর প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। সভাক্ষেত্রে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার' বিতরণের ধুম পড়িয়া গেল। বাংলার সকল ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বারীন-দা সেদিন যে বিরাট্ ঐক্যপ্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরদিন স্মরণে থাকিবে।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার"-এ (Standard Bearer) আদর্শ সম্বন্ধে উহার প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে (১৫ই আগষ্ট ১৯২০ খৃঃ) "Ourselves" শিরোনামায় শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন: "Our ideal is not the spirituality that withdraws from life but the conquest of life by the power of the spirit. It is to accept the world as an effort of manifestation of the Divine but also to transform humanity by a greater effort of manifestation than has yet been accomplished..."

অর্থাৎ "জীবনবিমুখ হওয়া আমাদের আধ্যাত্মিকতার আদর্শ নয়, আমরা অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা জীবনজয়ী হইতে চাহি। জগৎকে আমরা ঈশ্বরপ্রকাশের প্রয়াসরূপে শুধু স্বীকার করিব না, পরন্তু মানবতাকে রূপান্তরিত করিব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দিব্য-প্রকাশের তপস্যায়।" এই প্রথম প্রবন্ধটী শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং লিখিয়াছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন—জীব ও ভগবানের

মধ্যে ব্যবধান দূর করিতে। তিনি দিব্য মানবজীবনের জন্য পৃথিবীতে সত্যে ও আলোয় এবং আত্মার শক্তিতে সিদ্ধ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছিলেন—"Our first object shall be to declare this ideal ; insist on the spiritual change as the first necessity and group together all who accept it and are ready to strive sincerely to fulfil it. Our second shall be to build up not only an individual but a communal life on this principle."

অর্থাৎ "আমাদের প্রথম কর্ম্ম হইবে—এই আদর্শের ঘোষণা করা। অধ্যাত্ম-পরিবর্ত্তনের উপর জোর দিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে এবং যাহারা অকপটে ইহা স্বীকার করিবে এবং ইহার জন্য তপস্যা করিবে, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ম্ম—এই নীতির উপর শুধু ব্যষ্টিজীবন গড়িয়া তোলা নয়, একটা সঙ্ঘজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

তিনি ইহার জন্য অধ্যাত্মসাধনার সহিত সমাজ, শিক্ষাসংস্কৃতি এবং অর্থনীতির উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই জীবনগতির ক্রম ব্যক্তি ও সংহতি, প্রদেশ ও জাতি এবং পরিশেষে নিখিল মানবকে আশ্রয় করিবে, এ কথা তিনি সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তা মানবতার জন্যই। প্রবন্ধের উপসংহারে তাই তিনি বলিয়াছিলেন—"It is with a confident trust in the spirit that inspires us that we take our place among the standard-bearers of the new humanity that is struggling to be born amidst the chaos of a world in dissolution and of the future India, the greater India of the rebirth, that is to rejuvenate the mighty outworn body of the ancient Mother."

"যে ভাব আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাহার উপরেই সুদৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করিয়া আমরা সেই নূতন মানবজাতির পতাকাবাহকদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতেছি, যে জাতি একটা বিলীয়মান জগতের ধ্বংস-কোলাহলের মধ্যে জন্মগ্রহণের তপস্যা করিতেছে ; আর সেই ভবিষ্য ভারত, যে বৃহত্তর ভারতের নবজন্মে আমাদের এই প্রাচীন দেশমাতৃকার জীর্ণদেহ নব মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহারই প্রবর্ত্তকদের মধ্যে আমাদের স্থান হইবে।"

লক্ষ্য সিদ্ধ হয় বাঁধাধরা কল্পিত পথে নয়। কবি রজনীকান্ত সত্যই বলিয়াছিলেন :

"করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া
এনেছ তোমারি দুয়ারে।"

দিব্যশক্তি এমনই এক অকল্পিত পথে আমায় ছুটাইতেছিলেন। অনেকেই আমার জীবনপ্রবাহ লঘু ভাবপ্রবণ বলিয়া অভিযোগের সুর তুলিয়াছিলেন। আমার মধ্যে এই গুরুতর কর্ম্মবহনের অশক্তিও হয়ত তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজ ভাবি—এই বিশ বৎসর পরে তাঁহাদের অনেকেই পথহারা। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ কিন্তু আজিও সেই দুর্গম পথেরই যাত্রী। 'প্রবর্ত্তক'-এর বুকে শ্রীঅরবিন্দ তাই বাণী দিয়াছিলেন "প্রবর্ত্তক আমাদেরই কাগজ"; আর 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার'-এর প্রচ্ছদপটেও 'Under the inspiration of Sri Aurobindo Ghose' লেখা থাকিত—'শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণা-চালিত।'

শ্রীঅরবিন্দ আসিবেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে—তিনি একথা ভাসা ভাসা-ভাবেই বলিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা আমি বেদের ন্যায় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইজন্য গঙ্গাতীরে প্রশস্ত ভূমিখণ্ড সংগ্রহ করারও তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার অস্থিরতার সীমা রহিল না। শ্রীঅরবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া সব কাজ এক সঙ্গে করার বিপুল প্রাণশক্তি যেন জাগিয়া উঠিল। আত্মার উৎসর্গে শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিক ক্ষেত্ররচনায় তাঁর প্রেরণা আমায় উন্মাদ করিয়াছিল। আমি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারি নাই। স্থির থাকা যায় না বলিয়াই অস্থির হইতাম—ইহাতে অনেকে আমায় ধৈর্য্যহীন বলিত। ফলে বাহিরে এমন এক বিরুদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা শ্রীঅরবিন্দকেও সাময়িক-ভাবে বিচলিত করিত। আমি নিরুপায়, এ কথা সেদিনও তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারি নাই। তিনি আমার প্রতি স্নেহবশতঃ বার-বার জানাইলেন "You are going too fast" —'তুমি অতি দ্রুত চলিতেছ।' কিন্তু আমি যে অসহায়! শ্রীঅরবিন্দই যখন তাহা বুঝেন নাই, আর কাহাকে বুঝাইব!" জীবনসঙ্গিনীও

শ্রীঅরবিন্দের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেন "তিনি তো ঠিকই বলিতেছেন—একটা সম্পূর্ণ কর, তার পর অন্য কাজ। এমন অস্থির হও কেন?" আমি বেশ বুঝিতেছিলাম—এইবার লোকে আমায় উন্মাদ বলিবে। আমার মস্তিষ্ক হইতে প্রতি স্নায়ু, রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত এমন এক শক্তির হাতে গিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে আমার পক্ষে স্থির থাকা তখন সম্ভবপর নহে। শুনিয়াছি—দীর্ঘ দিন অনিদ্র থাকিলে মানুষ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়; আর উন্মাদ প্রচুর শক্তিপ্রকাশ করে। আমারও নিদ্রাত্যাগ হইয়াছিল। দিবারাত্রি শ্রমেও শরীরের ক্লান্তি ছিল না। জীবনের ছন্দঃ তবুও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার কারণ ঈশ্বরপ্রসাদরূপিণী সহ-ধর্ম্মিণীর সানুরাগ-দৃষ্টি আমার নিত্য সহায় ছিল। আমি খাওয়া ভুলিতাম, তিনি খাওয়াইতে ছাড়িতেন না। আমার দিবারাত্রি এক হইয়া যাইত; তিনি কাছে ডাকিয়া বিশ্রাম করাইতেন। সারা রাত্রি গৃহময় পায়চারী করিতাম; তিনি স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বিনিদ্রা থাকিতেন। চক্ষের অদর্শনে কোথায় হয়তো উপুড় হইয়া চেতনা হারাইব, এই আতঙ্কে অলক্ষ্যে তিনি আমার সঙ্গে-সঙ্গে বিচরণ করিতেন। নিকটে থাকিলে তিনি সুখী হইতেন। দৃষ্টির বাহিরে যাইলে, তিনি হাতে কাজ করিতেন, মন আমার সঙ্গেই ছুটিত। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে, পরে বলিব।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার" বাহির করার পর আবার এক নূতন প্রেরণা পাইলাম। আমার কোন প্রেরণাই কল্পনা নয়, কেন-না কোনটী নিষ্ফল হয় নাই। ঘটনার পর ঘটনায় এই বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হইয়াছি। এই পথে এক্ষণে আর কোন সুহৃদের বিচার বা ভাল-মন্দ দিগ্দর্শন আমায় নিরস্ত করিতে পারে না। ঈশ্বর-কর্ম্ম ভাল-মন্দের হিসাব রাখে না। উহা হইবেই। সুখ, প্রশংসা, ঐশ্বর্য্য অথবা দুঃখ, দৈন্য, শ্রান্তি কর্ম্মভেদে যাহাই ঘটুক, ঈশ্বরের কিছুতেই আপত্তি নাই। যাঁহারা বলেন—কর্ম্ম সহজ ও অবলীলা-ক্রমে সুখের তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হয়, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। বরং শরীর ও মনের তৃপ্তিজনক যে কর্ম্ম, তাহা প্রকৃত কর্ম্মই নহে, বিকর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীর-মন যাহা চাহে, তাহা অনেক সময়ে ঈশ্বরেচ্ছা নহে—আমার জীবনে এমন কর্ম্ম প্রায় ঘটে নাই। শরীর-মনের কৃচ্ছ্রতা দুঃখ-দৈন্যের কারণ যদি হয়, তাহা আমি চিরদিন উপেক্ষা

করিয়াছি। আমার শরীর-মন ইহাতে ধন্যই হইয়াছে। যাঁহার কর্ম, তিনিই শরীর-মন আশ্রয় করিয়া চলেন—এই দুইটীর উপর কোন দিনই তাঁর দরদ নাই; বরং এইরূপ কর্মের তপস্যায় শরীর-মন বিশুদ্ধ ও শক্তিশালীই হইয়া উঠে।

শ্রীঅরবিন্দ আদেশের কথা বলিতেন। তিনি আদেশ পাইয়াছিলেন—চন্দননগরে যাওয়ার। এই আদেশ অমান্য করার অধিকার তাঁহার শরীর-মনোবুদ্ধির ছিল না। তিনি আবার আদেশ পাইয়াছিলেন—পণ্ডিচারী যাওয়ার। কল্পনা নহে, উহাও অনিবার্য্য হইয়া ঘটিয়াছিল। তিনি ইহার জন্য কম দুঃখ পান নাই—সে ইতিহাস আমি জানি। যে কর্ম শ্রেয়ঃ, তাহাই ঈশ্বর-কর্ম। শরীর-মনের একটা প্রকৃতিগত ধর্ম আছে। উহারা তাই প্রকৃতির অধীন হইয়াই প্রেমের বশবর্ত্তী হয়। কিন্তু তাহাতে উহারা রক্ষা পায় না, তবুও ঈশ্বরের হাতে নিজেদের ছাড়িতে চাহে না। ইহাই জীবত্বের বদ্ধ সংস্কার।

প্রেরণাও এক প্রকার আদেশেরই নামান্তর। অনেকে আদেশ পান—বাণীরূপে। আমি অপ্রাকৃত আদেশ বা বাণী শুনি নাই, কিন্তু মস্তিষ্ক-যন্ত্র হইতে হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত এক প্রকার অনুভূতির সাড়া পাই। সেই সাড়ার অর্থ বোধ করে আমার বুদ্ধিবৃত্তি। ব্যবহারিক জীবনক্ষেত্রের পক্ষে সব সময়ে অনুকূল আদেশই যে আসে, তাহা নহে; যাহা অবধারিত হইবে, তাহাই অনুভূত হয়। অনেক দুর্ঘটনার ইঙ্গিত আমি এই ভাবেই পাইয়াছি। আত্মসমর্পণ-যোগীর জীবনে এমন কাজ হয় না, যাহা প্রেরণামূলক নহে। পণ্ডিচারী হইতে ফিরিয়া এই দিক্‌টা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দুর্গম পথেও এই প্রেরণাবশেই চলিয়াছি। পূর্ব্বেও এইরূপ হইত; কিন্তু তাহা আমার অজ্ঞাত ক্ষেত্র হইতে আমায় পরিচালিত করিত। এই সময় হইতে স্বেচ্ছায়, শরীর-প্রাণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অন্তর-প্রেরণার সঙ্কেতে নির্ব্বিচারে সকল কর্ম্মই করিয়া চলিতাম। কর্ম্মসঙ্কেতের সহিত বস্তুতন্ত্র-রূপে ঘটনারও আবির্ভাব হইত। কখনও-বা সঙ্কেত-লাভের পূর্ব্বে উহা ঘটিত, কখনও-বা কোন এক সিদ্ধান্তের সঙ্কেত পূর্ব্বে পাইতাম, ঘটনা পরে আসিত।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার" বাহির হওয়ার পর, এমনই এক সামাজিক

অনুষ্ঠানের সম্মুখে আমায় উপস্থিত হইতে হইল। সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; শ্রীঅরবিন্দকে তাহা জানাইলাম।

আমাকে ঘিরিয়া অতর্কিতে যে সংহতি-চক্র গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা কি মূর্ত্তি ধরিবে, সে বিষয়ে আমার কোন কল্পনাই ছিল না। একে-একে সঙ্ঘের মানুষ যারা, তারা একই অন্নক্ষেত্র স্থাপন করিয়া একটা দিব্য পরিবার গড়িয়া তুলিতেছিল। গভর্ণমেণ্টের কড়া শাসনে যেদিন আমাদের অনেকেরই চন্দননগর হইতে বাহির হওয়ার অসুবিধায় কাঠের কারবারটীর পরিচালন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল, সেদিন সঙ্ঘের অন্যতম কর্ম্মী শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ বসুর হস্তে এই কর্ম্মভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম।

পৃথিবীতে কাম ও কাঞ্চনের আসক্তি দিব্য জীবনের পথে ঘোরতর অন্তরায় বলিয়া দক্ষিণেশ্বরে বাণীমন্ত্র ঘোষিত হয়; ধর্ম্মপ্রাণ জাগ্রৎ করার আকাঙ্ক্ষায় দক্ষিণেশ্বরের ধূলি স্পর্শ করিয়া জীবন আমার সেই মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তারপর নানা সাধনার আবর্ত্তে শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে জীবনবাদী হইয়া "প্রবর্ত্তক"-এ নূতন মন্ত্র প্রচার করিতেছিলাম। ধর্ম্মের লক্ষ্য লয় বা মোক্ষ নয়, পরন্তু দিব্য-জীবন। কাম-কাঞ্চন তাই ত্যাগের বস্তু না হইয়া শোধনের হেতু হইল। আসক্তিই বন্ধন। অনাসক্ত নিষ্কাম কর্ম্মে নিজেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, বন্ধুদেরও এই পথেই লইয়া চলিতেছিলাম। নিজের পত্নীর প্রতি আসক্তি ত্যাগের আকাঙ্ক্ষায় সম্ভোগপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু পত্নীত্যাগ করিতে পারি নাই। অর্থ-সম্পদ লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, অর্থের প্রতি আসক্তি ও অর্থভোগের ইচ্ছায় নয়, অর্থের শোধনই ছিল আমার লক্ষ্য। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে কাম ও কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি বর্জ্জনের কথা লইয়া আলোচিত হইত, কাম-কাঞ্চন-বর্জ্জনের প্রসঙ্গ উঠিত না—কামের শোধনে নারীর দিব্য মাতৃত্ব, কাঞ্চনের শোধনে পুরুষের দিব্য ঐশ্বর্য্য জীবনে নামিবে, এই ছিল তপস্যার লক্ষ্য। এই আদর্শে আমি নিজের স্ত্রীকেই শুধু ব্রহ্মচর্য্য-সাধনায় দীক্ষা দিই নাই, এই সময়ে যে সকল কুলমহিলা আমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও এই তপস্যার মধ্য দিয়া আত্মশোধনের ব্যবস্থা করিতেছিলাম। এই পথে মেজ-বৌ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দীর্ঘ আট বৎসর এই সাধনায় জীবন অবহিত করিয়া, তিনি পরলোকগমন করেন।

এইরূপ দার্শনিক মনোভাব আমার সহতীর্থ বন্ধুদের নূতন চরিত্রগঠনের সহায় হইয়াছিল। শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে ধনসম্পদ্ হাতে পাইয়াছিল, সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জীবনে নারীগ্রহণস্পৃহাও জাগিয়া উঠিল। কাম ও কাঞ্চন যখন ত্যাগের বস্তু নহে, শোধনের, তখন সে ভরসা করিয়া আমার এক পরিচিতা ভগ্নীস্থানীয়ার কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ আমায় জ্ঞাপন করিল।

দার্শনিকতার সীমা পৃথিবী ছাড়াইয়া গগনচুম্বী হইলেও, আপত্তির কারণ হয় না; কিন্তু উহা যখন প্রকরণচ্ছন্দে অভিব্যক্ত হইতে চাহে, পরিবেষ্টনীর মধ্যে তখন বেশ একটু অস্বস্তি ও গোলযোগের আভাস পরিলক্ষিত হয়। খগেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব সঙ্ঘের মানুষদের মধ্যে প্রতিবাদের সাড়া তুলিল। নব সমাজগঠনের প্রেরণা অন্তরে বহিতেছিল; কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার বিপরীত প্রভাব অতিক্রম করার পথ পাইতেছিলাম না। এই প্রসঙ্গ লইয়া সঙ্ঘে আলোচনা ও আন্দোলনের ঝড় উঠিল। গৃহদেবীর অভিমত জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "ভাবনার বিষয় কি আছে? ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত যখন কিছু হয় না, তখন এ বিষয়েও তুমি নিশ্চিন্ত হও, তবে—"

"তবে কি?" তাঁহার মুখপানে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিলাম।

তিনি বলিলেন "তোমার মত সবাই সাধু নয়। নারী-পুরুষ দুই জনেরই যৌবন; তোমার এই সৃষ্টির মধ্যে উহাদের স্থান হইবে কি?"

এই দিকটা তলাইয়া বুঝি নাই। একবার মনে হইল—বিবাহের পর খগেন্দ্রনাথ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে অথবা অন্যত্র থাকিবে; অতএব আপত্তির কি আছে? কিন্তু অন্তর সায় দিল না। কাম-কাঞ্চনের টানে যদি কেহ ভাসিয়া যায়, তবে তাহারা একদিন স্বজন-স্বগৃহ ছাড়িয়া আমার নিকট আসিল কেন? এ সমস্যার সমাধান হইল খগেন্দ্রের কথায়। সে বলিল "সম্ভোগ-লালসায় আমার পরিণয় নহে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-স্থাপনই এই পরিণয়ের লক্ষ্য।"

জীবনের তিনটী অধ্যাত্ম-সম্পদ্ স্বীকার করিয়াছি—ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও সাহস। হিমালয়ের মত বাধায় তাই কোনদিন ধৈর্য্যহীন হই নাই। প্রতি পদে করাল মৃত্যুর বিভীষিকা, অমানুষিক নির্য্যাতনের রুদ্ররূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও সাহস হারাই নাই; আর ঈশ্বরবিশ্বাসের অগ্নিশিখা বুকে

জানাইয়া নিজের উপর যেমন দৃঢ় প্রত্যয়, তেমনি আপনার বলিয়া যাহাদের দেখি, তাহাদের প্রতিও বিশ্বাস রক্ষা করি প্রাণপণে। খগেন্দ্রের কথায়ও বিশ্বাস করিলাম—শ্রীঅরবিন্দকেও সকল কথাই জানাইলাম। তাঁর উত্তর কয়েক ছত্র লেখা উদ্ধৃত করিতেছি। আমার এই নব-সমাজসংগঠনের নব পর্ব্ব কিরূপে সুরু হইল, তাহার পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। আর গৃহদেবীর তপোমূর্ত্তি এই নিরতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতে কতখানি সহায় হইয়াছিল, তাহাও আমার চিরস্মৃতি হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅরবিন্দ জানাইলেন "What you say about the commune and the married couple is quite right as our ideal or rather as one side of our ideal, but there is here a question of time and tactics."

অর্থাৎ "সঙ্ঘ ও নবদম্পতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, আমাদের আদর্শ হিসাবে উহা ঠিকই, কিন্তু এখানে প্রশ্ন আছে—সময় ও কর্ম্মকৌশলের দিক্ দিয়া।" ইহার পর তিনি আরও লিখিয়াছিলেন "বিশেষতঃ আমাদের কাজের এখনও আরম্ভ মাত্র, অভিজ্ঞতার্জ্জনেরই অবস্থা। শুধুই অধ্যাত্ম-তপস্যা নহে, আমাদের সাবধানতা ও সুব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রশ্ন—ইহার কি প্রয়োজনীয়তা অথবা বুদ্ধিমত্তার দিক্ দিয়া ইহা কতখানি পরামর্শ-সিদ্ধ তাহাই বিবেচ্য। কেন-না, আমাদের এই অবস্থায় সমাজের মধ্যে এইরূপ সংগ্রাম—একপক্ষে ইহা প্রাণ-প্রকাশ হইলেও অন্যদিকে কিন্তু আমাদের নিকট ইহা অপ্রধান।" তিনি এইরূপ কার্য্যে দুইটি স্তরের উল্লেখ করিয়াছিলেন "Our first business is to establish our communal system on a firm spiritual, secondly on a firm economical foundation and to spread it wide, but the complete social change can only come as a result of the other two. It must come first in spirit, afterwards in form."

অর্থাৎ "প্রথম আমাদের সঙ্ঘবিধান অধ্যাত্মশক্তি উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে হইবে, তারপর অর্থনীতির বনিয়াদ দৃঢ় করিতে হইবে এবং উহার মহতী ব্যাপ্তি আনিতে হইবে। সমাজের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঐ দুইটির ফলস্বরূপ আসিবে। প্রথম ভাব, তারপর আকৃতি।" এই সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত পত্র উদ্ধৃত করিলে গ্রন্থ দীর্ঘ হইবে। তাঁর অভিমত—সমাজজীবন-গঠনের প্রচেষ্টা

ফলবতী হইলে, সে গঠন যেন স্বতন্ত্র হইয়া না পড়ে—সঙ্ঘের অঙ্গহিসাবেই যেন গড়িয়া উঠে।

এই বিবাহ অসবর্ণ নহে বলিয়া শ্রীঅরবিন্দ কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই কর্ম্মে উপস্থিত এক প্রকার বিরত থাকিতেই আমায় বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ অথবা দয়ানন্দের পথে আমি যাহাতে না চলি, তাহার জন্ম তিনি আমায় সতর্কও করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্ম্মে সঙ্ঘের গতি-পথ অকারণ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে, এ আশঙ্কাও তাঁর ছিল। তিনি এই সম্বন্ধে তাঁর যে দীর্ঘ অভিমত দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম—সঙ্ঘ-সৃষ্টির সূচনাপর্ব্বেই যদি এইরূপ নূতন ধরণের পরিণয়প্রথার প্রবর্ত্তন করি, তাহা হইলে আমাকে যে বাধার সম্মুখবর্ত্তী হইতে হইবে, তাহাতে আমাদের আসল কর্ম্ম পিছাইয়া পড়িতে পারে। এইজন্ম তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন " I should myself prefer to have it after I reached the proper stage in my yoga and after I return to Bengal." অর্থাৎ "আমার যোগের যোগ্য ক্ষেত্রে পৌঁছিলে এবং বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইহা হওয়াই আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।"

তাঁহার পত্র পাইলাম ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। নবসমাজ প্রতিষ্ঠার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই দীর্ঘ পত্রখানি আমি জপমালা করিয়া রাখিলাম। তাই ঘটনার দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াই অন্যান্য কার্য্যে মনোযোগী হইলাম।

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার' লইয়াও ক্রমে বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। শ্রীঅরবিন্দ এই সময় হইতেই আমার কর্ম্মের তাল খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। বারীন-দাও কেমন একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিলেন "আমি ভগবানের প্রেরণার কীট, বুঝি তোমার আনন্দের সাথী হইতে পারিলাম না!" বেশ অনুভব করিতেছিলাম, আমি যেমন আমারও নহি, তেমনি কাহারও হইতে পারিতেছি না। গৃহদেবীও যেন আমায় সামলাইতে পারেন না। এক প্রকার ক্ষিপ্তের ন্যায় যখন যাহা মাথায় আসে, তখনই তাহা করি, নিরঙ্কুশ মাতঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া চলি। সুপথ-কুপথ কিছুই জ্ঞান নাই। এই সঙ্গে আবার একখানা সাপ্তাহিক 'নবসঙ্ঘ' পত্রিকা বাহির করিলাম।[১] একদিকে

১। ১লা নভেম্বর ১৯২১ খৃঃ, ১৫ই কার্ত্তিক ১৩২৭ বঃ।

ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদপত্র; অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দের সতর্কবাণী, বারীন-দার কর্ম্মস্রোতের সহিতও এক হইতে পারি না; একটা বিশৃঙ্খল কর্ম্মের আবর্ত্তে লাট খাইতে লাগিলাম। পূজা আসিল। প্রতি বৎসরের ন্যায় পণ্ডিচারী হইতে অমৃতেরও পত্র পাইলাম। বারীন-দাও স্নেহ করিয়া লিখিলেন "দাদা, মীরার জন্য কাপড় পাঠিও, বেচারীর বড় কষ্ট, সে আর দেশী পোষাক ছাড়া কিছু পরে না...। ভাল দেশী ও ভাল পাড়ের দামী কাপড় পাঠান ভাল। সে আমাদের যে জিনিষ, সাজাতে ইচ্ছা করে।"

বারীন-দার পত্রের শেষে আরও যে দুই-একটী ছত্র ছিল, তাহা আনন্দের সহিত চিন্তাভারই বৃদ্ধি করিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার সব ওলট-পালট হয়ে গেল। কত দূরে ঘাট কিছু জানি-নে; বোধ হয় না জানাই এ ঘাটের পরম জানা। তোমার সৃষ্টির মুখ চেয়ে অরো বসে' আছে, দেখো দাদা, সৃষ্টি যেন নিখুঁত হয়। তোমার উপর প্রকাণ্ড ভার।"

অগ্নিপ্রেরণায় আমি অস্থির উন্মাদ, শ্রীঅরবিন্দের আকুতির অনুভূতি, বারীন-দাকে আপনার করারও বড় সাধ; আর চন্দননগরে তরুণমণ্ডলীর মধ্যে যোগের বীজ-বপন; তার উপর অর্থসৃষ্টির চিন্তা। নবসৃষ্টির সহস্রধারা মাথা পাতিয়া ধরার দুর্জ্জয় সাধন—সে যে কি অবস্থা, তাহা অনুমেয়।

নলিনী, সুরেশ, সৌরীন প্রভৃতি পরিহাস করিয়া কত বিবস্ত্র চিত্র আঁকিয়া আমায় বুঝাইত—"শীঘ্রই বস্ত্র পাঠাইতে হইবে, নতুবা অবস্থার নিদর্শন পত্রেই বুঝিয়া লইবেন।" এত আপনার জন আত্মীয়স্বজন হয় নাই। পূজার কাপড় যথারীতি পাঠাইলাম। ফরাসডাঙ্গার লাল-বাগানের ধুতি-চাদর শ্রীঅরবিন্দের জন্য বরাদ্দ ছিল। মীরা দেবীকেও লালবাগানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাড়ী পাঠাইলাম—আমার স্ত্রীই ইহা পছন্দ করিয়াছিলেন।

দেখিতে-দেখিতে বৎসর শেষ হইয়া আসিল। অন্তরে কি এক অব্যক্ত আবেগ, শান্তি পাইতেছিলাম না। আত্মসমর্পণ-মন্ত্র সিদ্ধ হওয়ার পথে শুধু দেখিয়া চলিতাম—আত্মপূর্ত্তি অথবা আত্মদান, কোন্ পথ প্রশস্ত হইতেছে? অন্তরদৃষ্টি চিরদিন সুনির্ম্মল ছিল। বুদ্ধির দুয়ার মুক্ত হওয়ায়, জ্ঞানঘন শুভ্র জ্যোতিস্তরঙ্গ মাথার উপর ঘনাইয়া উঠিত। বৈরাগ্যের তিলকই ললাটে ফুটিত। কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া আমায় নূতন দেশে লইয়া যাইতে চাহিত। আত্মসমর্পণের সূত্র ধরিয়া ধর্ম্মসাধনার নানা প্রকরণ আমার মনে

নূতন-চিন্তান্দোলনের তরঙ্গ তুলিত, সঙ্গে-সঙ্গে মহালক্ষ্মীর চরণসঙ্কেত শুনিয়া চমকিয়া দেখিতাম—গৃহপ্রাঙ্গণে শতদল-শোভা বিস্তার করিয়া গৃহলক্ষ্মী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

ঠিক এই সময়ে পরম সুহৃৎ দেশপ্রেমিক কুমার কৃষ্ণ মিত্রের রিখিয়ায় নিমন্ত্রণ পাইলাম। কর্ম্মচক্র হইতে দূরে অনাবর্ত্ত জীবনক্ষেত্রে গিয়া, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সুবিশাল তীর্থরচনার পূর্ব্বে গৃহদেবীকে লইয়া কয়েকদিন প্রবাসে থাকাই শ্রেয়ঃ করিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমার চিরদিন যেমন, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যত্যয় হইল না। বিশ্রামের আশা দুরাশা হইল। বুঝিলাম—কর্ম্মময় জীবন যার অমোঘ বিধান, তাহা এক দিনও রুদ্ধ থাকিবে কেন? রিখিয়ায় গিয়াই সংবাদ পাই—"মঁসিয়ে পল রিশার পণ্ডিচারী হইতে চন্দননগরে আসিয়াছেন, শীঘ্র আসুন।" পত্নী যার ছায়া, কায়ার অনুগমনে তাহার বাধে না; যেমন হাসিমুখে তিনি আসিয়াছিলেন রিখিয়ায়, তেমনি হাসিমুখেই ফিরিলেন স্বধামে।

রিখিয়া হইতে ফিরিয়া দেখিলাম—মঁসিয়ে রিশার সশরীরে সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি চিরদিনের জন্ত পণ্ডিচারী ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁর পত্নী মীরা দেবী শ্রীঅরবিন্দের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। মঁসিয়ে রিশার শূন্যহৃদয় লইয়া কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমার ভবনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

গৃহদেবীর কাজ বাড়িল। সাহেবের প্রয়োজন-পূরণের উৎকণ্ঠায় তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মঁসিয়ে রিশার নির্ব্বিকার চিত্তেই আমাদের আচার-ব্যবহারের সহিত একাত্ম হইয়া, অতি সহজ-ভাবেই দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য নূতন কিছু ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইল না। ঘণ্টার তালে-তালে জলযোগ, মধ্যাহ্নভোজন, নৈশাহার, সবই নির্ব্বিবাদে চলিল। দুই-চারি দিন পরেই ২২শে পৌষের উৎসব। মঁসিয়ে রিশারকে লইয়া এই বারের উৎসব-আয়োজনের আড়ম্বর কিছু বাড়িল। তাঁহার সঙ্গে দুইজন মিসেস বেসাণ্টের শিষ্যও আসিয়াছিলেন। পণ্ডিচারী হইতে নলিনীকান্ত গুপ্ত ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫ই আগষ্টের ন্যায় ২২শে পৌষের উৎসব এবার বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল। চন্দননগরের বিশিষ্ট কয়েকজন ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সভায় আমি সঙ্ঘের মধ্যে নব-সমাজ-প্রবর্ত্তনের সূচনা-স্বরূপ শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ বসুর সহিত শ্রীমতী অমিয়বালার বিবাহ-প্রস্তাব ঘোষণা করি। এই নব দম্পতির মধ্যে সম্ভোগ-স্পৃহা না রাখার জন্য দ্বাদশ বৎসর উভয়কে ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা করিতে বলি। এই প্রেরণা আমার নিজেরই; ইহার বহন-সামর্থ্য নব দম্পতির কতখানি আছে, সে বিচার করার অবকাশ সেদিন আমার ছিল না। রক্ত-মাংসের ক্ষুধার চেয়ে অন্তরের প্রেম ও ঐক্য আমার কাছে তখন স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমার সংসর্গে যে কেহই আসিত, রক্ত-মাংসের উর্দ্ধেই তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে উপদেশ দিতাম,

সাহস দিতাম, সকল প্রকার সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। এবার ২২শে পৌষের উৎসব-পর্ব্ব এই ঘোষণায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছিল।

বাংলায় স্বদেশী যুগের পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এক নব-যুগ পর্ব্ব দেখা দিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর শক্তি ও প্রভাব নিখিল ভারত-জাতিকে নূতন মুক্তিস্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতে স্বরাজান্দোলনের অগ্নিপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাংলার দেশপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মার রাষ্ট্রনীতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইলেন। অসহযোগ আন্দোলনের এই অগ্রপুরোহিতের পাঞ্চজন্য-ফুৎকারে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নবপ্রাণ অনুভব করিল। অসংখ্য ব্যবহারজীবী, কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিলেন। তারপর তাঁর কণ্ঠে তরুণদের লক্ষ্য করিয়া ভৈরব-বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠিল। সে আহ্বান তরুণ ছাত্র-জীবনে ঝটিকাবর্ত্তে সমুদ্রবক্ষের ন্যায় বিপুল আলোড়ন তুলিল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বাধীনতা লক্ষ্যে রাখিয়া দলে-দলে ছাত্রগণ পথে আসিয়া দাঁড়াইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন অপেক্ষা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতার এই ভীম আবর্ত্ত অধিকতর ব্যাপক হইয়া উঠিল। বাংলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের এই অপূর্ব্ব জাগরণের সাড়া পাইয়া উন্মাদ হইলেন; জাতির এই মহাশক্তিকে যথারীতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তাঁর সেই প্রাণপণ পরিশ্রমের কথা আমরা ভুলিতে পারি না।

দেশের জাতীয় জীবনের এই ভীম প্রবাহ আমাদের চিত্তও আকর্ষণ করিল। কিন্তু কেন্দ্র-লক্ষ্য এমনই সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, সে স্থান হইতে একটী মুহূর্ত্তের জন্য আমরা বিচলিত হইলাম না। শ্রীঅরবিন্দ যে নব বিধানের জন্য আমাকে কেন্দ্র করিয়া একটী সংহতি-সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করিতেছিলেন, তাহাতে জাতীয়তামূলক নব-নব আন্দোলন আমাদের কর্ম্ম-সাফল্যের সুযোগই দিত, তাহার মধ্যে নিজেদের সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করিতাম না। এই সকল ঘটনার সম্মুখে তর্জ্জনী সঙ্কেত করিয়া তিনি বলিতেন :

"It is a chaos and not a new order and it is essential that we should throw our spirit and idea upon this fermentation and draw what is best among its personalities and

forces to the side and service of our ideal, so as to get a hold and a greater means of effectuation for it in the near future."

অর্থাৎ "ইহা নব বিধান নহে, একটী গণ্ডগোল। প্রয়োজন আমাদের ভাব ও আদর্শ এই আবর্ত্তের উপর প্রয়োগ করা এবং ইহার মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ও শক্তি আছে, তাহার উত্তমাংশকে আমাদের আদর্শবাদের অনুকূলে টানিয়া আনা, যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায় এবং ইহাকে কার্য্যকরী করার জন্য আমরা অধিকতর সহায়তা লাভ করি।" শ্রীঅরবিন্দের সঙ্কেত সেদিন মৃত্তিকাগর্ভে বীজের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াই থাকিত; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য স্বভাবতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়িত। প্রতিজ্ঞাকে সম্মুখে রাখিয়া তদনুযায়ী দৃষ্টান্ত-সৃষ্টির জন্য মানুষের যে কসরৎ, তাহা আমাদের ছিল না। তিনি যাহা বলিবেন, তাহা শাশ্বত-বাণী এবং উৎসর্গমন্ত্র সিদ্ধ হইলে, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু হইতেই পারে না—এই বিশ্বাসেই আমার সমস্ত কর্ম্ম শক্তিপূত হইত। এই অন্তর-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই মহাত্মা গান্ধীর চরকা ও খাদি আন্দোলনের বহু পূর্ব্বেই আমি স্বদেশী-বস্ত্র-বয়নের সাধনা নিজেদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। "মৃণালিনী বস্ত্রবয়ন কার্য্যালয়" তাহারই নিদর্শন। এবার দেশব্যাপী এই ছাত্রান্দোলনের জাতীয়-প্রেরণা আমায় এক অভিনব পথে আকর্ষণ করিল। বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সামর্থ্য হিসাব করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে অগ্রসর হন, তাঁহাদের ভাব প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার ভাগ্যলেখা বিধাতার বিধানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। সন্তরণ শিখিয়া জলে নামার নিয়ম সর্ব্বজন-হিতকর; আমি কিন্তু সন্তরণপটু না হইয়াও, ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভর করিয়াই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। জীবন-মরণ তৃতীয়-শক্তির হস্তেই নির্ভর করিয়াছে চিরদিন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ছাত্রান্দোলন সহায়সম্পদহীন হইয়াও ঘরে ডাকিয়া আনিলাম বিনা সঙ্কোচে। সে কথা পরে বলিতেছি।

মঁসিয়ে রিশার আমার নিকট আগমন করিলে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বিষয়ে জানিবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মঁসিয়ে রিশারের অন্তরের কথা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ আমিও কিছু ব্যগ্র হইয়াছিলাম; কিন্তু কোন কথাই তিনি ব্যক্ত করিতেন না। তিনি কেবলই বলিতেন—

"শ্রীঅরবিন্দকে আমি অতি-মানবের ক্ষেত্রে স্থান দিয়া প্রতারণা করিয়াছি, এই সত্য আমি আর রক্ষা করিতে পারি না, ইহাই দুঃখ; আমার এই দৃষ্টিভ্রান্তি নিজের জীবনকে বিষাক্ত করিয়াছে। আমি যাহা ছাড়িয়া চলিয়াছি, তাহার দিকে আর চাহিব না, ফিরিব না—ইহাই আমার সঙ্কল্প।"

অতিশয় ব্যথিত ও আর্ত্তের ন্যায় মঁসিয়ে রিশার তপ্ত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে গঙ্গাতীরে সারা রাত্রি বসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতাম—তাঁহার মর্ম্মব্যথার মূল কারণটী খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। মনের অন্তরালে সে কারণের আভাস যে না ভাসিত, তাহা নহে; কিন্তু তাহা আমলে আনিতে বাধিত। মঁসিয়ে রিশারের মুখ হইতে তাই তাঁর ব্যথার সূত্রটী বাহির করার চেষ্টা করিতাম। এই ফরাসী পুরুষের মহত্বের কথা না বলিলে, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহার মুখে কোনদিন তাঁহার নিদারুণ মর্ম্মক্লেশের সত্য ইতিহাস আমি শুনি নাই। বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় বক্ষঃ চাপিয়া আর্ত্তকণ্ঠে তিনি বলিতেন "আমি রক্ত নহি, মাংস নহি, নশ্বর হৃৎপিণ্ড নহি। আমি আত্মা, শাশ্বত সনাতন"—বলিতে-বলিতে এক শুভ্র-চেতনালোকে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ হৃদয়-ভার লঘু করিতেন।

মঁসিয়ে রিশারের প্রসঙ্গ লইয়া গৃহদেবীর সহিত নানা প্রসঙ্গে বহু তর্ক করিয়াছি। এই বিদেশীর অব্যক্ত-বেদনার পরশ যেন তিনিও বুকে লইয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেন "ঐ ব্যক্তির দুঃখের কথা তোমরা বুঝিবে না; আমি কিন্তু বলিতে পারি, ঐ বিষণ্ণ-মূর্ত্তির মর্ম্মে-মর্ম্মে ব্যথার রাগিণীর অর্থ কি!"

আমি এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের বিশদ চিত্র আঁকিব না। তবে মানুষ কোন গুরুতর অপ্রিয় সত্য সহিষ্ণুতা, আত্মমর্য্যাদা ও মহত্বের প্রেরণায় চাপিয়া চলার চেষ্টা করিলেও, জীবনের কোন-না-কোন ঘটনায় তাহার অভিব্যক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। মঁসিয়ে রিশার দিনের পর দিন উদয়াস্ত হাসি-কথায়, অধ্যয়নে, অধ্যাপনায় জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যমূর্ত্তি অম্লান রাখার যতই চেষ্টা করুন না কেন, থাকিয়া-থাকিয়া কালবৈশাখীর ঝড়ে কোথা হইতে মেঘ আসিয়া তাঁহার সবখানির উপর কালী ঢালিয়া দিত, শত সতর্কতা সত্বেও তাঁহার সে ভীষণ মূর্ত্তি মাঝে-মাঝে আমাদের সন্ত্রস্ত করিত। একদিন ইহার চরম

হইল ; সেই ঘটনাতেই মঁসিয়ে রিশারের বর্মাবৃত হৃদয়ের দুঃখ গলিত লৌহের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

এক সন্ধ্যাকালে শ্রীঅরবিন্দের সাধনপ্রসঙ্গ লইয়া আমাদের আলোচনা চলিতেছিল। কথায়-কথায় মনে হইল—মঁসিয়ে রিশার শ্রীঅরবিন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের গভীরতা মাপিয়া দেখার চেষ্টা করিতেছেন। সেদিন তাঁহার কথা তাই আমার কানে যেন বেসুরা বাজিতেছিল। আত্মসমর্পণের সাধনা ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া হয় কি না, এইরূপ তর্ক-প্রসঙ্গে মঁসিয়ে রিশার সমর্পণের কেন্দ্র অপৌরুষেয় অনন্ত-তত্ত্বই হইতে পারেন, এই কথাই প্রতিপাদন করিতেছিলেন। প্রাণভৃৎ দেহীর আত্মসমর্পণ অব্যক্তকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধ হয় না, ইহাই আমার প্রতিপাদ্য। কথায়-কথায় কণ্ঠস্বর আমাদের উচ্চগ্রামে উঠিয়াছিল। ব্যক্ত পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ শ্রেয়ঃ, ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি মাদাম রিশারের কথা সরাসরি উত্থাপন না করিয়া, তাঁহার লিখিত অভিমত প্রমাণ-স্বরূপ দেখাইবার জন্য "প্রবর্ত্তক-"এর যে সংখ্যায় মীরা দেবীর ছবি সহ আত্মকথা বাহির হইয়াছিল, সেই সংখ্যাটি তাঁহার নিকট ধরিলাম। তিনি অতি দ্রুত "প্রবর্ত্তক-"এর পাতাগুলি উল্টাইয়া, মীরা দেবীর ইংরাজী উক্তিটী পড়িয়া লইলেন ; তারপর যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন তাঁহার চক্ষে ও মুখে প্রকাশিত হইল, ভাষায় তাহার প্রকাশ হয়না।

লেখাটি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেতসপত্রের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, তারপর "প্রবর্ত্তক"টী দৃঢ়মুষ্টিতে উঠাইয়া আমার উপরে তিনি তাহা সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষ বজ্রমুষ্টি উদ্যত করিয়া আমার দিকে ধাবিত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার এই ভীমমূর্ত্তি আমায় বিচলিত করিল। তাঁহার ঘূর্ণায়মান রক্ত-চক্ষুঃ দেখিয়া মনে হইল—তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। গৃহমধ্যে একা তাঁহার নিকট অবস্থান করা নিরাপদ মনে হইল না ; ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্যের সাহায্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ব্যবস্থার জন্য আমার বন্ধুদের অন্বেষণ করিলাম। তাহাদের দুই-চারি জনকে লইয়া যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম—মঁসিয়ে রিশার নাই, ঘরে তাঁর যে সামান্য আসবাব-পত্র ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেগুলি লইয়াই তিনি প্রস্থান করিয়াছেন। নানাস্থানে খোঁজ করিয়া যখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না, তখন নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। গৃহলক্ষ্মী

জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকটি গেলেন কোথায়? আত্মহত্যা করিবেন না তো!"

অবস্থাটি তখনও তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই। ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন "তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নাই! পুরুষ-মানুষ যাহা সহিতে পারে না, সেইখানে আঘাত দিয়া তুমি ভাল কর নাই।"

এই ঘটনায় নানা দ্বন্দ্ব-সংশয়ে আমার হৃদয়ে ঝড় বহিতে লাগিল। স্ত্রীর সহিত এই প্রসঙ্গ লইয়া অনেক আলোচনা চলিল। মঁসিয়ে রিশারের আচরণ যতই বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি প্রমাণ করিতে চাহিলাম, ততই তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন "ইহা হয় না। নারীর আত্মসমর্পণ স্বামীর কাছেই; স্বামী যাহার নাই, তাহার কথা বলিতেছি না।" আমি বলিলাম "স্বামীর কাছেই যে নারীর আত্মসমর্পণ হইবে, এমন কথা বেদ-বাণী নহে।"

তিনি বলিলেন "তাহা না হইতে পারে, কিন্তু স্বামীর সম্মতি তাহাতে থাকা চাই।"

আমি বলিলাম "স্বামী যদি সম্মতি না দেন, নারীও মানুষ, সে কি তার সত্যকে এইজন্য অস্বীকার করিবে?"

তিনি বলিলেন "সত্য-মিথ্যার বিচার-বুদ্ধি আমার নাই। স্বামীও সত্য। এক সত্যকে অস্বীকার করিয়া আর এক সত্য মিলিতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি না। আমাদের ঘটে যে বুদ্ধিটুকু আছে, তাহা দিয়াই তোমায় বুঝাই—তোমাকে ছাড়িয়া আমি যদি মহত্তর সত্যে আশ্রয় লই, তোমার মন কি তাহাতে সান্ত্বনা পাইবে?"

বলিলাম বটে, কোন মহত্তর সত্য পাইলে, আমার আপত্তি তাহাতে কেন হইবে; কিন্তু বস্তুতঃ ঘটনা এইরূপ হইলে, কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা আমায় ভাবিতে হইয়াছিল।

সাংসারিক বা সামাজিক সম্বন্ধের সহিত অধ্যাত্মক্ষেত্রের সামঞ্জস্য লইয়া আমার মনে তীব্র আন্দোলন চলিয়াছিল; সংস্কার অথবা ভারতের ইতিহাস যে মনোবৃত্তি আমার গড়িয়া দিয়াছে, তাহাতে এই বিষয়টী স্বচ্ছন্দ ভাবে গ্রহণ করিতে আমার বাধিয়াছিল, এ কথা স্বীকার না করিলে মিথ্যা প্রশ্রয় পায়।

মানুষ সত্য হইতে সত্যের আশ্রয়ে চলিয়াছে অথবা মিথ্যা হইতে সত্যে আশ্রয় লইতেছে, এ কথার উত্তর কে দিবে? যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা গ্রহণ করিতে যদি বাধা দাঁড়ায় স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, যশঃ-খ্যাতি, তবে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াই চলিতে হইবে। মীরা দেবীর আজীবন-স্বপ্ন সফল হওয়ার শুভ সুযোগ যেখানে, সেখানে তাঁহার সমস্ত অতীতটাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই তো তাঁর সৎসাহস ও সত্যানুরাগের পরিচয়। মীরা দেবী যাহা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অধ্যাত্ম-ধর্ম্ম। মঁসিয়ে রিশার সে ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারেন নাই; কাজেই তাঁহাকে পত্নীত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ব্যথা তাঁহার সঙ্গী হওয়ায়, ভদ্রলোক শান্তিহীন; জীবন তাঁর মরুভূমি হইয়াছে। আত্মসমর্পণের কষ্টি-পাথরে আপন পর হয়, পর আপন হয়, এ রহস্য চিরাচরিত। এই ক্ষেত্রে মাতা পুত্রহারা হয়, পত্নী পতি হারাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে; সংসারে এমন ঘটনাঘটন বিরল নহে। যার যে আপন, সে তার নিত্যসঙ্গী। এই জীবন-মরণের সম্বন্ধ অধ্যাত্ম-জীবনসাধনায় মিলিতে পারে; জাগতিক সম্বন্ধও যদি নিত্য হয়, তবে তাহা শ্রেয়ঃকে ক্ষুণ্ণ করিবে না। বুঝিলাম—মঁসিয়ে রিশার আশ্রয় নয়, শ্রীঅরবিন্দই মীরা দেবীর আপন জন। এইখানে আত্মনিবেদন করিতে গিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব-পণ আত্মোৎসর্গেরই যোগ্য দক্ষিণাস্বরূপ। মঁসিয়ে রিশার বিপরীতধর্ম্মী, অতএব তাঁহাকে চিরবিদায় লইতে হইল। মঁসিয়ে রিশারের উদ্দেশ্যে অশ্রু তর্পণ করিয়া এই মর্ম্মান্তিক ব্যাপারটির যবনিকাপাত হইল।

শীতের জড়তা শেষ হইল। বসন্তের আভাসে প্রাণে পুলক জাগিল। জাতীয়তার সাধন-ক্ষেত্রে নব প্রাণের সাড়া উঠিয়াছিল; আমরাও সেই জাগরণের তরঙ্গে গা ভাসাইয়া নিজেদের অন্তর-বীণায় যে সুর-মূর্চ্ছনা উঠিতেছিল, তাহাই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলাম।

গৃহ নাই, সম্পদ্ নাই, আচার্য্য নাই, কিছুই নাই—'নবসঙ্ঘ'-এ নব বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার কথা প্রকাশ করিলাম। দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা করিলাম—"চাই প্রাণ, চাই অর্থ। কাহার প্রাণ আছে এস, সাহায্য কর—দেশসেবায় সমুৎসুক শত জন তরুণের শিক্ষাদীক্ষায় নবজীবনলাভের ব্যবস্থা করি। ভিক্ষার জন্য হাত পাতিব না; মাসিক বার আনা সুদে একশত টাকা ঋণ

দাও। সংগৃহীত অর্থে ব্যবসা করিয়া উহার লভ্য হইতে সুদ বাদে যে অর্থ থাকিবে, এই নব বিদ্যাপীঠের তাহা হইতেই ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে।"

এমন অদ্ভুত দায়ের বোঝা মাথায় লইয়া কর্ম্মসূচনা বাতুল না হইলে, অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে—ইহা সকলেই বলিবেন। সেদিন এই পথে অন্য কোন নিষেধই ছিল না, একমাত্র বাধা ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি বলিলেন "এক বৎসর ধরিয়া যত টাকা ঋণ হইয়াছে, তাহার আয়ের হিসাব কিছু করিয়াছ কি?"

হিসাবের দিন তখনও আসে নাই। আমি কেবল জীবনের খাতায় অঙ্কের সংখ্যাই বসাইয়া চলিয়াছি। হিসাবের তাগিদ কেহ দিলে, বিরক্তির সীমা থাকিত না। আমি তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলাম "ঈশ্বরের আদেশ—বিদ্যাপীঠ খুলিতে হইবে। তাহার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা পূরণ করার পথে তুমি প্রতি পদে বাধা দাও কেন?"

তিনি বলিলেন "ভগবানের আদেশের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সুব্যবস্থাও তো ভগবান দিবেন! ঋণেই তো দিন-দিন ডুবিতেছ; ইহার দিকে লক্ষ্য না দিলে, দাসীর কথা যেদিন মিষ্ট লাগিবে, সেদিন যে আর বাঁচার পথ থাকিবে না!"

একটু ভাবিলেই তাঁহার কথা যে সমীচীন, তাহা বুঝা যাইত; কিন্তু আমার প্রেরণাকে আমি অস্বীকার করিতে পারি না। বিদ্যাপীঠ হইবেই; কেন-না, ইহা ঈশ্বরেচ্ছা। ঋণও হইবে, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা; নতুবা ঋণ দেয় কে? ঋণের ধর্ম্ম—উহা পরিশোধনীয়, অতএব সে-ই তার স্বধর্ম্ম স্বয়ং রাখিবে। আমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নাই। এই বুদ্ধি আমার। দুঃখের আবর্ত্ত দেখিয়া অনেকে এই পথে আতঙ্কিত হইবেন; আমার সুখ-দুঃখ দুই-ই তুল্য। ঈশ্বর যাহা চাহেন, তাহাই আমার করণীয়। ঋণের পর ঋণ মিলিল। হিসাব করিয়া দেখিলে, সেদিনও দেখিতাম—১৯২০ খৃষ্টাব্দের ঋণকৃত সমস্ত অর্থই যাহাদের হস্তে ব্যবসার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা শনৈঃ-শনৈঃ তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে অথবা ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ প্রতি পদে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মূলধন নষ্ট করিতেছে। সেদিকে যিনি দৃষ্টি দিলে আমি সতর্ক হইতে পারি, তিনি যদি উদাসীন হন, আমার সেই ক্ষেত্রে কি করিবার আছে? জীবনের পথে স্বামীকে বিপন্মুক্ত করার জন্য সাধ্বীর সকল প্রয়াসই

এই ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছিল। ঋণকৃত অর্থেই "প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ" গড়িয়া উঠিল। এই বিদ্যাপীঠের সাফল্যে জীবনসঙ্গিনীর তপস্যা ও স্নেহের দানও যে কতখানি দায়ী, সে কথা এখানে বলিবার নহে।

শুভ ১লা ফাল্গুন শ্রীপঞ্চমীর দিনে "প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ"-এর উদ্বোধন হইল।[১] উদ্বোধনসভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। "হিতবাদী"র অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভা শেষ হইলে, সমবেত জনগণকে লইয়া বিদ্যাপীঠের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। বিদ্যাপীঠ অর্থে গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রায় তিন বিঘা জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমি। আম, কাঁঠাল বৃক্ষের শুষ্ক পত্রে সমস্ত স্থানটি তখন সমাকীর্ণ। বহু লোকের পদচাপে মর্ম্মরশব্দ উঠিল। শাখায়-শাখায় সন্ত্রস্ত পক্ষিকুল অব্যক্ত শব্দ করিতে-করিতে ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। কিন্তু জাতীয়তার স্বপ্ন সেদিন আমার চক্ষে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিল। অতি প্রাচীন চারিটী শিবমন্দিরের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র আটচালার ভগ্নস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আমি সকলের নিকট আমার সেই স্বপ্ন-কথা বলিলাম: "এই বিদ্যাপীঠ—এইখানে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা হইবে; ইতিহাস, তর্ক, দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতির অনুশীলন হইবে; জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, শরীর ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং উচ্চ গণিতের শিক্ষা দেওয়া হইবে। কৃষিকর্ম্ম ও বয়নবিদ্যা, কাঠের কাজ, কামার, কুমারের কাজ প্রভৃতি শ্রমশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে; ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানদারী, সংবাদপত্রপরিচালনার শিক্ষাদিও ছাত্রগণ এইখানে থাকিয়া লাভ করিবে।" আমার মনোপাখী তার বিচিত্র ডানা মেলিয়া কল্পনার আকাশে বিচিত্র ভঙ্গীতে উড়িতে-উড়িতে সমবেত বন্ধুদের চিত্ত আকৃষ্ট করিল। কাহারও কণ্ঠে সংশয়ের লেশমাত্র প্রকাশ পাইল না। সকলেই একবাক্যে বিদ্যাপীঠের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন স্বীকার করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। কোথায় ছাত্রাবাস? কোথায় অধ্যয়ন-অধ্যাপনার গৃহ? কোথায় গ্রন্থাগার, পাঠ্যপুস্তকাদির ব্যবস্থা? কোথায় বা অধ্যাপনার জন্য সুবিজ্ঞ অধ্যাপক? এমন অসম্ভব ব্যাপারও আমার সহতীর্থেরা সহজ ভাবেই

১। ১লা ফাল্গুন ১৩২৭ বঃ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১ খৃঃ।

স্বীকার করিয়া লইল। 'নবসঙ্ঘ'-এ বিদ্যাপীঠের বিবরণ বাহির হইল। চন্দননগরের বিদ্যাপীঠের সংবাদ অন্যান্য সংবাদপত্রাদিতেও বড়-বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রদের আগমন। একে-একে অর্দ্ধশত ছাত্র আসিয়া আমায় ঘিরিয়া ধরিল। এই সকল ছাত্রদের মধ্য হইতেই যাহারা এই সাধনায় আত্মদান করিল, তাহারাই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। অতএব বিদ্যাপীঠ-রচনার স্বপ্ন যে অলীক ছিল না, এ কথা না বলিলেও চলিবে।

ছাত্রদের আবাসগৃহ নাই, ভোজনাদির সুব্যবস্থা নাই, পাঠ্যপুস্তক নাই; কিন্তু বিদ্যাপীঠের নিয়ম যথারীতি পালন করার দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করিলাম। উষাসমাগমে বিদ্যাপীঠে গিয়া উপস্থিত হইতাম। ছাত্রদের লইয়া মধ্যাহ্নে ভোজনে বসিতাম। রাত্রি এক প্রহরের পর পরিশ্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিতাম। সেই অর্দ্ধশত ছাত্র প্রচলিত বিদ্যালাভের আশা ছাড়িয়া, কেবল আমাকে কেন্দ্র করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। এই সময় হইতেই দুইজন ছাত্রীও এই বিদ্যাপীঠে যোগ দিয়াছিল। আমি এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতেছিলাম—এ সংবাদ অন্তর্য্যামীই রাখিতেন, আর কেহ নহে।

বিদ্যাপীঠের জঙ্গল পরিষ্কার করা হইতে গৃহ-নির্ম্মাণ, তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ ও রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম—ছাত্ররাই করিত। "প্রবর্ত্তক বিদ্যাপীঠ"-এর কথা শুনিয়া ছাত্রদের ন্যায় কয়েকজন অধ্যাপকও আমায় সাহায্য করার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া অধ্যাপকেরা দেখিলেন—ইহা আমার দুঃস্বপ্ন ভিন্ন আর অন্য কিছু নহে; তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই দুঃস্বপ্নকে এক মহত্তর সত্যে পরিণত করার পথে আমার প্রাণপুরুষ কোন বাধাই স্বীকার করিল না। ছাত্রগণ এক বিল্ববৃক্ষতলে এক-একখানি ইষ্টকখণ্ড লইয়া আসন করিয়া বসিত, আর আমার কণ্ঠে বাজিত শিবের ডম্বরু; কোন এক অপৌরুষেয়-সত্তা বুঝি সেদিন এই পঙ্গুকে আশ্রয় করিয়া নববেদ উচ্চারণ করিতেন। আর নবযুগের ঋত্বিকেরা সে বাণী শ্রবণ করিতে-করিতে নব জীবনের অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া নব-সঙ্ঘ-রচনার সঙ্কল্পে দৃঢ়চিত্ত হইত।

শরীর ও মনের প্রতি শিরা-উপশিরার ক্লান্তি অপনোদন করার ভার

লইয়াছিলেন সত্যজননী। তাঁর জীবনের রাগিণী আমারই জীবনসঙ্গীত। তাই আত্মগীতি গাহিয়াই জীবনসঙ্গিনীর পূত চরিত্র অঙ্কন করার এই প্রকরণ আশ্রয় করিয়াছি। স্বামী কায়া বলিয়া যে জাতির স্বীকৃত, জায়া ছায়া বলিয়া যে জাতির সংস্কৃতি ও প্রত্যয়, সেই জাতির একজন হইয়া আমি নির্ব্বিবাদেই বলিতে পারি যে, এই কায়াকে আশ্রয় করিয়া যে কিছু ঘটনা, তাহার সবখানির জন্যই আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার সহধর্ম্মিণীও দায়ী; তাই তাঁর জীবনের স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। বিশেষ করিয়া এই সময়ে যে নিরলস কর্ম্মজীবনের আবর্ত্তে আমি চুবান খাইতেছিলাম, তাহাতে আমা ছাড়া তাঁর যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাহা খেয়াল কবার আমার তো সময়ই ছিল না! প্রতি মুহূর্ত্তে সেবার অর্ঘ্য হাতে তাঁহাকেই দেখিতাম শরীরে, অশরীরে। ভোরে উঠিয়া আলনা হইতে ধৌত বাস তিনি আমার অঙ্গে জড়াইয়া দিতেন —নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়া পাদুকাযুগল সম্মুখে ধরিতেন—দরজায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। বিদ্যাপীঠে আসিয়া বাণীপ্রবাহের শেষে কণ্ঠ যখন নীরব হইয়া আসিত, অবসাদে স্নায়ু-নিচয় নিস্তেজ হইয়া পড়িত, দেখিতাম—প্রাতরাশের থালি হাতে নির্দ্দিষ্টা সেবিকার আগমন—সঙ্গে করিয়া আনিত তাঁরই হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও করুণার স্পর্শ। মধ্যাহ্নের আহ্বান বিলম্বিত হইত না। তিনি নিজ হাতেই আমার অভ্যঙ্গ তৈলমর্দ্দিত করিতেন—মস্তকে সুগন্ধি সুশীতল তৈল মর্দ্দন করিতে-করিতে সুকরুণ কণ্ঠে বলিতেন "ইস্, ব্রহ্মতলাটা তপ্ত খোলার মত আগুন হয়ে উঠেছে!"—চক্ষের কোলে বুঝি অশ্রুবিন্দু উথলিয়া উঠিত! বুঝি তাঁর মনে হইত—রক্ত-মাংসের শরীরে এত শ্রম সহিবে না। অকারণ নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাঁর চিত্ত বেদনাতুর হইয়া উঠিত। তাই বিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলিতেন "কাজ তো সবাই করে, তুমি কেন এমন আপনহারা; নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি না রাখলে, আমি বড় অসহায় হয়ে পড়ি যে!"

আমি তাঁকে বক্ষে চাপিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিতাম "আমার কথা নয়, আমি কিছু নই, আমার কথার মূল্য কিছু নাই; কিন্তু তুমি, তোমার নিষ্ঠা ও ভক্তি আমায় বলায়, এ তোমারই কথা—আমি মরব না; তুমি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হও।" এই কথায় তিনি বড় ভরসা পাইতেন। তাঁহার বদনে

অনিন্দ্য-শ্রী ঝলসিয়া উঠিত। সীমন্তের সিন্দূর রক্ত উষার ন্যায় ঝিলিক দিত। হিন্দু ভারতের সে বিজয়িনী সতীমূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি; তাই হিন্দু পুরুষের কোথায় আশা, কোথায় শক্তি ও জয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার ধন নাই, বিদ্যা নাই, খ্যাতি নাই, ব্যক্তিত্ব নাই; কপর্দ্দকহীন ভিক্ষুক—আমার সর্ব্বসম্পদ্ গৃহলক্ষ্মীর প্রদীপ্ত নয়নের দীপ্তি, ওষ্ঠে তাঁর পতির সংরক্ষণী শক্তি, ললাটে সুদৃঢ় চরিত্রবলের অপরূপ লাবণ্য।

বিদ্যাপীঠের সূচনায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অমিশ্র সংগঠনের নবযুগ পর্ব্ব আমার চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইল। কিন্তু আমার পুরাতন বন্ধুদের কথা স্মৃতিপট হইতে মুছে নাই। বাংলার বিপ্লবযুগের ইতিহাসে যাঁহাদের নাম চিরাঙ্কিত থাকিবে, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের সহিত আমার যে সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধসূত্র ধরিয়া স্পষ্টতর ক্ষেত্রে তাঁহাদের জীবনও নূতন করিয়া লীলায়িত হউক, এই প্রেরণাও সেদিন আমায় অস্থির করিয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের করুণাবর্ষণে যে সকল রাজবন্দী মুক্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে নূতনভাবে জীবনযাত্রার সুবিধা পাইয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহারা বৈপ্লবিক কর্ম্মসূত্রে ছদ্মবেশে সঙ্গোপনে জীবন-যাত্রা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মুক্তিকামনায় আমি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন উপস্থাপন করিলাম। ইঁহাদের মধ্যে চন্দননগরেব অধিবাসী রাসবিহারী বসু, কলিকাতার অতুলচন্দ্র ঘোষ ও আন্দামানে নির্ব্বাসিত রাজাবাজার বোমার মামলায় অভিযুক্ত অমৃতলাল হাজরাও ছিলেন। তখন গোয়েন্দাবিভাগের বড় কর্ত্তা ছিলেন জি. ডব্লিউ. ডিক্‌সন্। তিনি আমার পত্রোত্তরে জানাইলেন—'রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছু করিবার নাই এবং সে ব্যক্তি ভারতবর্ষেও নাই। ইহার জন্য আমাকে সেণ্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরের নিকট লিখিতে হইবে। অমৃতলাল হাজরাও আন্দামানে। অতুলচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে কোন অভিসন্ধি না লইয়া তাঁহার সহিত ব্যবস্থানুযায়ী আমি দেখা করিতে পারি।'

রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে শত চেষ্টায়ও আমাকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। অমৃতলাল হাজরার মুক্তির পথ পরে প্রশস্ত হইয়াছিল। আর সে এক স্মরণীয় ঘটনা—চন্দননগরে যে গৃহ-প্রাঙ্গণ ভারতের নেতৃমণ্ডলীর শুভাগমনে পবিত্র, যাহা স্বদেশী যুগের দেশসাধকগণের দ্বারা অধ্যুষিত, সেই প্রাঙ্গণে বঙ্গীয়

গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দাবিভাগের কর্তৃপুরুষগণও উপস্থিত হইয়া আমার সহিত যথারীতি সদালাপের পর দেশসেবী অতুলচন্দ্র ঘোষের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। একদিন যে প্রাঙ্গণভূমি স্যার টেগার্টের সদম্ভ পদভরে কম্পিত হইয়াছিল, আজ সেই প্রাঙ্গণভূমির উপরেই ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারিগণ প্রসিদ্ধ বৈপ্লবিককে মুক্তির জয়পত্র দিয়া সহাস্যে বিদায় লইলেন। অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তির এমন লীলাচাতুর্য্য আমার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। অতুলচন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া উত্তম নাগরিক জীবন যাপন করিতেছেন। আমি ইহাতেই ক্ষান্ত হইলাম না। তখনও বাংলার আর কয়েকটী বরণীয় সন্তান —ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত কর, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মগোপন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইঁহাদের জন্য মুক্তি-প্রার্থনার উত্তরে মিষ্টার ডিক্‌সন আমায় লিখিলেন— "অতুল ঘোষের ন্যায় ডাক্তার যাদুগোপাল প্রভৃতিরও মুক্তি সম্ভাবনা আছে, যদি তাঁহারা বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইবেন, এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করেন।" ইহাতে অবশ্য কাহারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার কোন এক পরিচিত বন্ধু মিষ্টার ডিক্‌সনকে জানাইয়াছিলেন যে, ইঁহারা সকলেই চন্দননগরেই আছেন এবং অস্ত্র-শস্ত্র গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করিতে প্রস্তুত। এই সংবাদ সত্য ছিল না। অবশ্য মিষ্টার ডিক্‌সন লিখিয়াছিলেন: "No question will be asked regarding any weapons so surrendered." 'সমর্পিত অস্ত্র লইয়া তাঁহাদিগকে কোনই প্রশ্ন করা হইবে না'।

আমি এইরূপ দাবী পূরণ করিতে পারি নাই, যে-হেতু যাদুগোপাল প্রভৃতি আমার সান্নিধ্যে ছিলেন না। আমি সংবাদপত্রাদিতে বিজ্ঞাপন দিয়া তাঁহাদের ডাকাইয়া আনাইয়াছিলাম[১] এবং গভর্ণমেণ্টের ধারণানুযায়ী অস্ত্রাদি পাওয়ার যে সম্ভাবনা নাই, তাহার হিসাব দেখাইয়া মিষ্টার ডিক্‌সনের নিকট অকপটে জানাইয়াছিলাম। আমার উক্তির মধ্যে একবিন্দু মিথ্যা ছিল না। বঙ্গীয় রাজপুরুষগণও সম্ভবতঃ আমার কথা অবিশ্বাস করেন নাই; তাই উক্ত বন্ধুদের বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিয়া তাঁহারা আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল বিপ্লবী তরুণ আমার আত্মীয়স্বজন কেহই নহেন,

১। ১৯২০-২১ খৃঃ এর "ষ্টাণ্ডার্ড বেয়ারার" পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়ও উক্ত আহ্বান-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহারা আমার স্বদেশবাসী, দেশসেবী। আমি উপলক্ষ-স্বরূপ এই সকল মহৎ-জীবনের মুক্তির জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। তখনও বাকী রহিলেন আমার প্রিয় বন্ধু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তাঁহার মুক্তির ইতিহাস উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র, রোমাঞ্চকর। সে কথা পরে যথাস্থানে বলিব।

এই যে জীবনরঙ্গ, ইহার পশ্চাৎ যাঁহার উদ্যত হস্ত সহায় হইয়াছে, সাহস দিয়াছে, তাঁহাকেই বার-বার স্মরণে পড়ে। মিঃ ডিক্‌সন প্রমুখ রাজকর্ম্মচারিগণ যেদিন আমার বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেদিন আমার রন্ধনশালা যজ্ঞশালায় পরিণত হইয়াছিল। গৃহলক্ষ্মীর ছিল অন্নপূর্ণার মন্দির, স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী বিচার ছিল না—এখানে মিঃ পিয়ার্সন বা মৌলভী লিয়াকৎ হোসেনের ন্যায় ভিন্ন-ধর্ম্মী বন্ধুগণ আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সহিত একসঙ্গে তুল্যভাবে আতিথ্যের পরিচর্য্যায় পরম-প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কর্ম্মে প্রিয়াপ্রিয় ঘটনার সৃষ্টি হইলেও, হৃদয় ছিল নিষ্কলুষ গঙ্গোত্রীর মত শুভ্র। গৃহদেবী সেদিন এই নব অতিথিগণের জন্য বিবিধ প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেবরা সেদিন আমাদের অন্তরের পরিচয় জানিতেন না, হয়তো সেইজন্যই তাঁহারা খাদ্যাদি-গ্রহণে নিঃসঙ্কোচ হইতে পারেন নাই। তবুও তাঁহার পীড়াপীড়ির প্রভাব তাঁহারা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, প্রচুর খাদ্যাদি ছাঁদা-বাঁধার ন্যায় মোটরে করিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরে সেই অনাবিল আতিথ্যের অনাহত প্রবাহ আজিও রুদ্ধ হয় নাই।

এইবার বিয়োগান্ত নাটকের একাঙ্ক সমাপ্ত হওয়ার করুণ-কাহিনী বিবৃত করিব।

শ্রীঅরবিন্দ আর আমি—এই দুই যখন অখণ্ড ভাবমূর্ত্তি লইতে চলিয়াছে, বিদ্যাপীঠের সূচনার পরেই দেখা গেল যে, সে প্রেম ও ঐক্য মর্ত্ত্যে বুঝি প্রত্যক্ষ হইবার নহে। নব জীবনের মন্দাকিনীধারা ধরণীর বুকে অবতরণ করিলেও, দুই কূলের ব্যবধান যেন ঘুচিল না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসেও চন্দননগরের এই সৃষ্টির সহিত শ্রীঅরবিন্দের যে অভিন্ন পরিচয়, তাহা তাঁহার পত্রের কয়েক ছত্র উক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তিনি লিখিয়াছিলেন : "This, as I conceive it, has to be done in two lines. First, what has already been created by us and given a right spirit, basis and form, must be kept intact in spirit, intact in basis and intact in form and must strengthen and enlarge itself in its own strength and by its inherent power of self-development and the divine forces within it. This is the line of work on which you have to proceed."

অর্থাৎ "যেমন আমি বুঝি, তাহাতে দুইটি প্রণালীতে কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, আমাদের দ্বারা যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, সত্য ভাব, ভিত্তি এবং আকৃতি পাইয়াছে, তাহার সেই ভাব, ক্ষেত্র ও আকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে এবং ইহা নিজ শক্তিতেই আত্মপূর্ত্তির অন্তর্নিহিত গতিবেগে এবং দিব্যশক্তির প্রেরণায় শক্তিপূত ও বিস্তৃত হইবে। তোমাকে এই কর্ম্মগতি ধরিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।"

আমার প্রকৃতি অশরীরী ভাবকে আশ্রয় করিয়া যেমন উৎফুল্ল হইয়া চলে, বস্তুতন্ত্র বিধি তাহাকে তাদৃশী তৃপ্তি দেয় না। বারীন-দা প্রমুখ আমার পুরাতন বন্ধুরা আমার গতির তালে তাঁদের পরিচিত সঙ্কেত না পাইয়া আমার কার্য্য দিব্য নহে, এইরূপ একটা সোরগোল তুলিয়াছিলেন। বাহিরের জগতের সহিত আজ পর্য্যন্ত সম্বন্ধ না রাখিয়াই আমি চলিয়াছি আমার এক নিজস্ব জীবনচ্ছন্দে। অসত্যকে আশ্রয় দিই নাই। বাহিরের পরিচিত কর্ম্মকৌশল অর্থাৎ 'টেক্‌নিক্' আমার সাহিত্যেও নাই, কর্ম্মেও নাই ; তবুও যে ইহা ব্যর্থ হয় নাই, এই দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে ধরিলেও, প্রচলিত ছন্দে আমার জীবন-গতিকে টানিয়া আনার প্রযত্ন আমি তাঁহাদের অপপ্রচেষ্টা বলিয়াই দৃষ্টি দিতাম না। বাহ্যতঃ ইহা আমার অহঙ্কার বলিয়া ভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল—আমার জীবনধর্ম্মের কষ্টিপাথর শ্রীঅরবিন্দ। সেখানে ছিল আমার সর্ব্ব কর্ম্মের সমর্থন। আমি তাই অভীঃ হইয়াই চলিতেছিলাম।

অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে অবহিত আমার প্রকৃতিকে বাহিরের দিক্ হইতে কৌশল করিয়া চঞ্চল করার সর্পিল ছন্দঃ আমাদের নিজেদের মধ্যেই কোন কোন ক্ষেত্রে মাথা তুলিতে দেখা গেল। যেন চতুর্দ্দিকে ষড়যন্ত্রের অস্ফুট গুঞ্জন

শোনা গেল—শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণাশক্তিকে লুটিয়া লইয়া আমি নাকি নিজেকেই পুষ্ট করিতেছি! শ্রীঅরবিন্দের অগোচরে আমি তাঁহারই প্রচুর দানে নিজেই প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছি! এইরূপ অসদৃশ বিপরীত প্রচারে চিত্ত আমার মাঝে-মাঝে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিত, অথচ কাজের অন্ত ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত তিনখানি সংবাদপত্র-পরিচালনা, বিদ্যাপীঠের উৎসাহী তরুণদের লইয়া নবজীবনের আন্দোলন, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ আসিবেন বলিয়া তাহার জন্য বিপুল আয়োজন—আমার এইরূপ অসংখ্য-কর্ম্মপ্রেরণা—দিন যে কোথা দিয়া ফুরাইয়া যাইত, উহার হিসাব ছিল না। কিন্তু সহকর্ম্মীদের সহিত একত্র হইলে, পূর্ব্বে যে অনাবিল প্রেম ও ঐক্যের আস্বাদ মিলিত, তাহা যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেমন সকলে মিলিয়া অতি গুরুতর কর্ম্মও সুসিদ্ধ করিয়া তুলিতাম, এখন অতি সামান্য কার্য্য করিতে হইলেও, পরস্পর ঠেলাঠেলি চলিতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ যেন আমার সহিত নূতন করিয়া বুঝাপড়ার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেন। বারীন-দাকে যেমন আমি আপনার করিয়া লইবার আশায় হাত বাড়াইয়াছিলাম, সে আশা একেবারেই অমূলক মনে হইল এবং যাঁহাদের চন্দননগরের কর্ম্মে চিরদিন সহায়তা পাওয়ার আশা ছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মনোভাব দ্বন্দ্বময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমি অবস্থার স্পষ্টতার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া আমার অন্তরের অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্টতা আনিবার জন্য আমি অরুণচন্দ্রকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া দিলাম।

কর্ম্মের ধুম বাড়িয়াই চলিতেছিল। বিদ্যাপীঠে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতেছে, অথচ তাহাদের থাকিবার স্থান নাই। কেহ পর্ণকুটীর আশ্রয় করিল, কেহ আমার বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়া রাত্রিযাপন করিতে লাগিল। সে যেন সর্ব্বপ্রকারের অব্যবস্থার মধ্যেই তৃতীয়-শক্তির হস্তে ভবিষ্য-সৃষ্টির উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছিল। সেদিনের শিক্ষাপ্রার্থীরাই কিন্তু শক্ত মানুষ হইয়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে অবধারণ করার বীর্য্য লাভ করিয়াছে। শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র পণ্ডিচারী হইতে যে অবস্থা আমার নিকট বিজ্ঞাপিত করিল, তাহা আমার ধারণাতীত

এবং তখনও শ্রীঅরবিন্দ আমার প্রতি যে করুণা-মমতা বুকে রাখিয়া আমার শ্রেয়ঃ-কামনায় সর্ব্বদা প্রযত্ন করিতেছেন, তাহাও আমার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিল।

চণ্ডীদাসে পড়িয়াছিলাম—

"পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে।"

এই পড়া তত্ত্বটাকে জীবনে মূর্ত্ত করার জন্য যে তপস্যার আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছিলাম, আমার সচেতন মনোজগতে সেই সময়ে তাহা যদি ধরা পড়িত, এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম হইতে সম্ভবতঃ বিরত হইতাম। অতি বড় কঠিন কর্ম্ম অনেক সময়ে মানুষের অজ্ঞাতসারেই হয়; এইরূপ না হইলে, সঙ্কীর্ণ মনের ক্ষেত্রে ইহার জন্য যে কঠোর দুঃখের সমুদ্র উথলিয়া উঠে, তাহা হইতে মুক্তির জন্য বৃহত্তর আদর্শকেও মানুষ বিদায় দিয়া থাকে। অলক্ষিতে যাহা গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার জন্য দুঃখ ছিল না। আজ সলক্ষ্য চেতনাজগতে যেখানে দিনের পর দিন স্বপ্নকে রূপ দিতে প্রাণান্ত করিতে বিমুখ ছিলাম না, সেইখানে প্রলয়ঝঞ্ঝা নামিয়া আমার বৃহত্তর স্বপ্ন নিরর্থক করিয়া দিল; কিন্তু অচেতন মনের জগতে উপেক্ষিত সত্য অপূর্ব্ব বিগ্রহে পরিণত হইয়া আমার জয় দিল খুব অসহায় অবস্থা-পরিবেশের মধ্যেও। সাধনার সমাপ্তি-মন্ত্র এইখানেই অর্থপূর্ণ হইয়া উচ্চারিত হইল মুক্ত কণ্ঠে।

খ্যাতি ও যশের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র, বিপুল অভিজ্ঞতা ও গৌরবদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের সহিত পরিচয়ের ঘোষণা, সংস্কৃতি ও সাধনার উন্নততর সোপান-রাজি, চিত্ত-মন একাগ্র করিয়া যেখানে স্থির-দৃষ্টি রাখিতাম, সেই অপূর্ব্ব আদর্শ ও সৃষ্টি—কালের যবনিকায় সবই যেন ঢাকা পড়িল। চক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া দৃষ্টি যখন ফিরিয়া পাইলাম, আত্মসাধনায় তখন দেখিলাম—চির উপেক্ষিত অনাদৃত জন, কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে যাহাদের মূল্য একটি কপর্দ্দক বলিয়াও স্বীকার করি নাই, যাহাদের ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য অতি নগণ্য বোধে ক্লান্তির অপনোদন ও অবকাশের ক্রীড়নক বলিয়াই যাহারা গণ্য হইত, তাহারাই জীবনের সুমহান্ আদর্শের সহায়করূপে দেখা দিল এই দুর্দ্দিনে। একান্ত অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রেই জীবনের অভাবনীয় সাফল্য এমন করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে ভাবনার মধ্যেও ছিল না।

হিন্দুর অবিকৃত রক্তস্রোতে যে সংস্কৃতির বীর্য্য চির-নিহিত, তার প্রেরণা আমায় চিরদিনই পাগল করে। তাই প্রতি নব বর্ষের প্রভাতে সূর্য্য-সন্দর্শনের জন্য গঙ্গাতীরে ছুটিয়া যাইতাম, দেখিতাম—বালখিল্য চির-সহচর অবোধ ছাত্রগণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া নবযুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতেছে। আর পুষ্প-চন্দনের থালি হাতে নিরক্ষরা পল্লীবধূ মেজ-বৌ চরণ-বন্দনা করিয়া বলিতেছে "ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন, ভক্তি-বিশ্বাস যেন চিরস্থায়ী হয়।" নব বর্ষের প্রথম দিনের এই স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই; স্তরে-স্তরে এই সকল স্মৃতি-সংস্কারই আমার হৃদয় পূর্ণ করিতেছিল।

চৈত্র-সংক্রান্তির শুভ লক্ষণস্বরূপ ইক্ষুগুড়-সংযুক্ত গোধূম-চূর্ণ যখন সজ্ঘ-সংসারে অসঙ্কোচে বিতরিত হইত, সেদিন লক্ষ্যে পড়িত মাধুর্য্যময়ী সেই সাধ্বীর পবিত্র মূর্ত্তি—যাঁর সীমন্তের সিন্দুর, চরণের অলক্ত, শাড়ীর রক্তজবার মত রাঙ্গা রঙটুকু অন্তরে যে অনুভূতির মর্ম্মরবেদী গড়িয়া তুলিতেছিল, দৃষ্টির অন্তরালে হইলেও, ভবিষ্যৎ কল্পস্বপ্ন বুকে লইয়াই উহা অবাধেই অলক্ষ্যরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল।

আষাঢ়ের টিপি-টিপি বৃষ্টির দিনে, কোন দূর পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত পথের উপর দিয়া কত নারী-পুরুষ হাঁটিয়া চলিয়াছে, অনেক দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কাঁসর, ঘণ্টা আর মানুষের কণ্ঠে জয়ের কোলাহল! নবচূড় রথের রক্তপতাকা আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে। পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে পল্লীবধূদের লইয়া হৃদয়ানন্দদায়িনী পত্নী রথ দেখার করুণ আকুতি নিবেদন করিতেছেন—সহাস্যে আদেশবাক্য মাথায় লইয়া, তাঁর অঞ্চল দোলাইয়া রথোৎসব-দর্শনের যাত্রা। তাঁর প্রতি পদ-সঞ্চারে উৎসবের ঘোষণা মর্ম্মে মর্ম্মে যে ইতিহাস রচনা করিত, তাহার হিসাব সেদিন করিলেও, অঙ্কের বোঝা ভারী হইয়া উঠিত—কিন্তু তাহার ফল অবহেলা করা যায় না।

নির্ম্মল শারদ প্রভাতে শেফালির রাশি অঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িত। সুবাসে বাতাস প্রমত্ত বেগে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিত। শারদীয়া জননীর আগমন-বার্ত্তা ঘরে-ঘরে চারণ ঘোষণা করিয়া বেড়াইত; ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় ললাটে-ললাটে চুয়া-চন্দনের টীকা পরিয়া মাতৃমন্দিরে দলে-দলে সকলে উপস্থিত হইত—সপ্তমীর প্রভাত হইতে দশমীর বিজয়ালিঙ্গন পর্য্যন্ত আত্মচৈতন্যের উর্দ্ধে যে কল্পসৃষ্টি রচিয়া উঠিতেছিল, তাহার সন্ধান সেদিন করিতে চাহিলে, সৃষ্টির

মধুচক্র সম্ভবতঃ এমন বাস্তব-রূপে গড়িয়া উঠিত না, কল্পনার রামধনুই আঁকিয়া শেষ হইত। কালীপূজার রাত্রে ঘরে-ঘরে দীপালী-শোভা! তাড়া-তাড়া পাঁকাটির মশাল জ্বালিয়া ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি! আগুন লইয়া হুড়াহুড়ি! এমন বার মাসে তের পার্ব্বণে উৎসবের অনুষ্ঠানে, হাস্য-কৌতুকে অলক্ষ্যে এমন এক অপার্থিব সৃষ্টিচক্র গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার ধারণা আমি করিতে পারি নাই। কত জ্যোৎস্না-রাতে গঙ্গার বুকে সারি-সারি তরণী বাহিয়া হাসি, কথা, গানে চিত্ত ভরিয়া উঠিত—দুই কূল মুখরিত করিয়া সঙ্গীতের রেশ উঠিত —সেদিন সে সবই ছিল খোলা মনের সহজ প্রকাশ—ইহার মধ্যেই বিনাইয়া-বিনাইয়া ভাগ্যদেবী যে আমাদের মধ্যে এমন অমর জীবনচিত্র আঁকিয়া তুলিতেছিলেন, সেদিকে বিন্দুমাত্র আমার দৃষ্টি ছিল না।

কত দ্বিপ্রহর রাত্রে কথা কহিতে-কহিতে খোলা আকাশপথে কে যেন আবির্ভূত হইয়া, টানিয়া লইয়া যাইত নদীতটের অশ্বত্থ-বটকুঞ্জে। সেখানে আলো-ছায়ার মাঝে হৃদয়-বিনিময়ের উৎস মুক্ত হইত। তারপর নৌকা করিয়া নদীপথে কত দূর যাত্রা, কে তাহার হিসাব রাখে! কেহ যথাসময়ে অনুপস্থিত থাকায়, এই উৎসবে যোগ দিতে না পারিয়া, নদীতীরে হতাশ হইয়া আমাদের সন্ধানে ছুটাছুটি করিত। কেহ-বা সেই গভীর রজনীতে গৃহ-দেবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিত আমাদের সন্ধান। তিনি এই সংবাদে অজানা আশঙ্কায় বিচলিতচিত্তা হইয়া ঘর ছাড়িয়া, অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইতেন—পুনরাগমনের প্রতীক্ষায়। তারপর কলহাস্যে আমাদের পুনরাবির্ভাব। মুখে কাপড় দিয়া ভ্রূকুটীকটাক্ষে তাঁর তিরস্কার, তারপরে হাসির ফোয়ারা ছুটিত—এইরূপ লুকাচুরি খেলা-ধূলার মধ্য দিয়া আমাদের বহু হৃদয় এক সঙ্গে বাঁধা পড়িতেছিল। কল্প-সৃষ্টি হইতেছিল আমাদের অজ্ঞাতে। সে স্বতঃ-প্রেরণার রূপচিত্র আমি অস্বীকার করিলেও, ইহার প্রভাব অস্বীকারের ছিল না—তাহাই পুরাতন গৃহ-সংসার ডুবাইয়া একটা প্রলয় সৃষ্টি করিয়া আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিল। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সত্যদৃষ্টি-সম্পন্ন দিব্য-শিল্পী, কিন্তু আমারই প্রকৃতি হয় তো তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছিল —এই বিচার আজও আমার শেষ হয় না।

যেখানে শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সম্বন্ধচ্ছেদ, সেইখানেই জীবন-সঙ্গিনীর অধ্যাত্মপ্রকাশ এবং সঙ্ঘ-জীবনেরও আরম্ভ। কিন্তু সে কথা হয়তো

আমার কোনদিন বলা হইবে না। যেখানে জীবন-প্রবাহ অতল সমুদ্রগর্ভে আপতিত হইয়া, ধূলি-বালি-কর্দ্দমের স্তর-বিন্যাস করিয়া, অভিনব জীবনদীপ-রচনায় খরস্রোতে ছুটিয়াছিল, সে প্রয়াস যেখানে ব্যর্থ হইল, দেবতার বোধন-সঙ্গীত গাহিতে-না-গাহিতে উৎসর্গের মঙ্গল-ঘট যেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সেইখানেই আমার লেখনী নিশ্চলা হউক।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই আমার জন্য যাহাদের আসিবার কথা, তাহারা আসিয়াছিল। দূর পথের যাহারা, তাহারা পরে আসিবে বলিয়া আমার হৃদয়দ্বার চিরদিনই মুক্ত। আমি আজ কাহার নাম করিব? জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার দিনে এই অতি দীন জনকে আশ্রয় করিয়া আমার ওষ্ঠপুটে একটু হাসির রেখা ফুটাইবার জন্য যাহারা সর্ব্বত্যাগী হইল, তাহাদের অমর-স্মৃতি আমার হৃদয়-পথে চিরাঙ্কিত থাকিবে। কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আশা ও আদর্শের আকর্ষণ ইহাদের ছিল না—পরকে আপন করার কঠোর তপঃসাধন ছিল এই সব মানুষের লক্ষ্য। এই নর-নারীর মিলন আত্মিক, তাই তাহা শাশ্বত ও অমৃতময়। জন্ম-জন্মান্তরের সাথী লইয়াই সঙ্ঘ হয়—সঙ্ঘ-ঘোষণার তাই ইহারাই হইল প্রবর্ত্তক।

সঙ্ঘের প্রথম যাত্রী অরুণ। সে আসে নাই; আমায় সে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার স্বক্ষেত্রে। আমি ছিলাম কেবল আপনারই কাছে কবি, ভাবুক, দার্শনিক। আমার খ্যাতিপত্র দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট মিলিবে না, তাহা আমি জানিতাম; কিন্তু হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতির্ম্ময়ী শুভ-দৃষ্টির বিকিরণে আমার স্থান উচ্চ গ্রামে যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, নিজের অসাধারণত্বে আস্থাবান্ হইয়া জাতির নিকট বাণী প্রেরণ করিলাম—শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রকে তবুও যেন অতিক্রম করিতে ইচ্ছা হইত না। সুকুমার শিশুকাল হইতেই সে আমার সকল প্রেরণার পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইত—মানবাত্মার সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ দৃঢ়-ভিত্তি পাইলে, পর আপন হওয়ায় চিত্তের যে অবাধ অধিকার কখনও-কখনও নিষ্ঠুর আচরণরূপে প্রতীয়মাণ হয়, তাহা আমার এখানেই প্রকাশ পাইত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় বারীন্দ্রপ্রমুখ শ্রীঅরবিন্দের স্বজন ও অনুগত কর্ম্মিগণ মুক্তি পাইলেন। এই নূতন পরিস্থিতি-ফলে শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে যে অস্পষ্টতা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার নিরাকরণের জন্য শ্রীমান্ অরুণকে পণ্ডিচারী পাঠাইয়া

আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ঝড়ের আভাসেই অন্তরের যে অস্থিরতা জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইলাম। সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে আরব্ধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করার জন্য পুনঃ উদ্বুদ্ধ হইলাম।

কর্ম্মের ব্যাপ্তি অর্থক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল না। চতুর্দ্দিকে 'প্রবর্ত্তক'-এর ভাবপুষ্ট সংহতি-কেন্দ্রও গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রকৃত কর্ম্মী তখনও গড়িয়া উঠে নাই, সর্ব্বক্ষেত্র নিজেকেই দেখিতে হইত। অসাধারণ ভাব-শক্তির উৎস ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। সেই অমোঘ বিশ্বাসেই দেহ ও মনের ক্লান্তি অনুভব করিতাম না। নানা প্রকার ব্যবসা-সমস্যার সঙ্গে মানবচরিত্র লইয়াও অসংখ্য প্রকারের আবর্ত্ত-সৃষ্টি হইত। ইহার উপর গৃহদেবীকে কেন্দ্র করিয়া একটী নারীচক্রও গড়িয়া উঠিতেছিল। মানুষ গড়ার দাবী আমি করি না; কেন-না, অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি—গড়া মানুষই যথাকালে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে, নির্ম্মাতা গর্ব্ব করিয়া বলে—এ সৃষ্টি আমার। এ অন্ধতা আমার ছিল না।

এই সময়ে আমার অপর দুইটী শ্যালিকার পতিবিয়োগ হয়। আমার স্ত্রী ভগিনীগুলির বৈধব্যমূর্ত্তি দেখিয়া অতিশয় সন্ত্রস্তা হইয়া পড়েন। এই মূর্ত্তিকে তিনি অতিশয় ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতাম—বিধাতার এই কঠোর বিধান যদি তাঁর ভাগ্যেও থাকে, তাহা তিনি নিজের কঠোর-তপস্যায় নিশ্চয় অতিক্রম করিবেন। এই কথায় তিনি সান্ত্বনা পাইতেন না—প্রণাম করিয়া বলিতেন "আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কোলে মাথা রাখিয়া যেন মরি!" আমি তাঁর মস্তক চুম্বন করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাদ করিতাম। আমার বাণী তাঁর হৃদয় স্পর্শ করিত—তিনি অতি উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন। স্বামিহারার প্রতি তাঁর অসাধারণ সহানুভূতি-কারুণ্য ছিল, তার একটী দৃষ্টান্ত পরে দিব। তিনি বলিতেন "নারীর এত বড় দুর্ভাগ্য আর কিছুতে নাই!"

বৈধব্য সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। আমি বলিতাম ব্যবহারতঃ নারীর বৈধব্য দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু হিন্দু বিধবার এই তপঃপূতা মূর্ত্তি কি মানবাত্মার অমরত্বকেই ঘোষণা করে না? শরীর লইয়া স্বামী নয়; শরীর-নাশে পত্নী স্বামীর অবিনশ্বর আত্মার সাথী হইয়া থাকিবে। স্বামীর দেহ বিদ্যমানে স্ত্রীর এক মূর্ত্তি; অশরীরী স্বামীর পত্নী ভিন্নমূর্ত্তি ধরে।

হিন্দু-নারীর বৈধব্যবেশ জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়—পতির শরীর গিয়াছে, তাঁর অশরীরী আত্মা লইয়া সে তপস্বিনী।

কথা শুনিয়া তাঁর চক্ষে প্রদীপ্ত-বহ্নিশিখা জ্বলিত। তিনি বলিতেন "পত্নীর দেহটা বিরহের আগুনে দগ্ধ হয়, সে ব্যথা তুমি বুঝিতেছ না? স্বামীর দেহ হারাইয়া পত্নীর বৈধব্য তোমার কথায় গৌরবের বস্তু—কিন্তু এ তপস্যা নারীকে যেন করিতে না হয়।" সে যে কি মরমীর দরদ লইয়া কথা, তাহা ভাষায় বুঝান যাইবে না। তিনি নিজের ভগ্নীদের বড় আদর-যত্ন করিতেন। স্বামিহারা যদি বেশভূষা করিত, তাহা হইলে তিনি বড় বিরক্তা হইতেন, যদিও মুখে কিছু বলিতেন না। তিনি একবার যাহা অন্তরের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা আর কোন যুক্তিতর্কে নাকচ হইত না। স্বামিহারার বৈধব্য-বেশকেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। চির-ব্রহ্মচারিণী সাধ্বীও যেমন তিনি গড়িয়া গিয়াছেন, তেমনি চির-কুমারীও তাঁর আন্তরিক স্নেহাশ্রয় পাইয়াছেন; আবার পতিহারা বিধবাকেও তিনি যথাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। যাহার যে ভাব ও অবস্থা, তাহার ব্যত্যয় হইতে তিনি দিতেন না। ইহার অন্যথা হইলে, তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণা হইতেন। স্বামিহারা যদি সাজিয়া-গুজিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিত, তিনি মনে-মনে বলিতেন "কাহার তৃপ্তির জন্য এই সাজ-সজ্জা!" আমি বলিতাম "স্বামী না থাকিলেই কি মানুষকে সাজিতে-গুজিতে নাই? মন বলিয়াও তো বস্তু আছে!"

তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিতেন "মনের গলায় দড়ি! নিজের জন্য মানুষ সাজে না, ওদের মনে অন্য আছে। স্বামীকে ওরা পায় নি, ভালবাসে নি।"

এই পাওয়ার কথায় আমি তাঁর দিকে চাহিয়া ভাবিতাম—তুমি কি আমায় পাইয়াছ? একজন আর একজনকে যদি পাওয়ার মত পায়, সেই তো ধন্য হয়! এখানে যে পায় না একজনও মনের মানুষ, সে ভগবান্‌কে পাওয়ার আশা কেমন করিয়া করে? যে নারী পতি পায়, পতির আত্মাকে স্পর্শ করে, সে নারী পতি হারায় কেমন করিয়া? শারীর সম্বন্ধই তো একমাত্র সম্বন্ধ নয়। বিধবা তাই অমর পতির স্মৃতিময়ী দিব্যপ্রতিমা। বিপত্নীকেরও বিধুরাশ্রম এই হেতু হিন্দু-সংস্কৃতির গৌরবসূচক।

আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিতে হইলে, এই সমাজবিধানই মানবাত্মার

ঋতময় জীবনতন্ত্র। এইরূপে নব-সমাজ-প্রবর্ত্তনে তিনি বধূবরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছিলেন, চিরকুমারীকে সুপথ দেখাইয়া উৎসর্গ-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন—বিধবার হাত ধরিয়া তিনি পরম পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। শুধু অধ্যাত্ম-পুত্রদেরই প্রতি তাঁর করুণাপ্রসাদ বিতরিত হয় নাই, নারীকেও তিনি বক্ষে তুলিয়া যথাযোগ্য স্থান দিয়া গিয়াছেন—সে অন্তরঙ্গ রহস্যময় ইতিহাসের কতটুকু বর্ণনা করিতে পারি ? কেবল একটি বিধবা যুবতীর কথা উল্লেখ করিয়াই এই আলোচনা হইতে এখানে নিবৃত্ত হইব।

কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ষোড়শ-বর্ষীয়া যুবতী কন্যা পতিহীনা হইয়াই অচিরকাল মধ্যে আবার একমাত্র শিশুপুত্রটিকেও হারাইয়া সমস্ত সংসারটিতে গভীর বিষাদের ছায়াপাত করে। এই যুবতীর পিতামাতা কন্যাকে কোন মতে সান্ত্বনা দিতে না পারিয়া, আমাদের সহায়তা প্রার্থনা করেন। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া সদল-বলে তাঁহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হই। আমাদের আগমনে শোকাচ্ছন্ন পারিবারিক আবহাওয়া কিছুক্ষণের জন্যও উৎসবময় হইয়া উঠিল। উৎসবের মধ্য দিয়া এই শোকবিহ্বলা যুবতীও মনে কিছু সান্ত্বনা পাইল। ইঁহাদের অন্তরের অবস্থা অনুভব করিয়া সঙ্ঘজননী আমায় সঙ্কেতে জানাইলেন—এই মেয়েটি আমাদের আশ্রয়ে থাকিলে সুখী হইবে, ইহার পিতামাতারও ইহাই আকূতি, এ দায়িত্ব আমায় লইতে হইবে। তিনি এই ভাবেই কার্য্য করিতেন, নিজে কিছু করিতেন না, আমাকে আশ্রয় করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্ম্ম-সাধন ছিল তাঁর স্বভাব।

আমি এই যুবতীটিকে এই প্রস্তাব করা মাত্র, সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, সঙ্গে-সঙ্গে তার চক্ষে আশার আলো বিকশিত হইল।

এই শোকবিধুরা যুবতীকে সঙ্ঘজননী নিজের কাছেই রাখিলেন এবং অকৃত্রিম স্নেহ-মমতাপুটে দেখিতে-দেখিতে তাহাকে আপন করিয়া লইলেন। সে অতি শীঘ্র তাহার সমস্ত অতীতটাকে বিদায় দিল। একেবারে নূতন ভাবে সে নিজেকে গড়িয়া লইল। অল্পদিনের মধ্যেই তার শোকমলিন বিবর্ণমুখ সমুজ্জ্বল-কান্তি ধারণ করিল। শূন্য হৃদয় পূর্ণ করার অসাধারণ কৌশলে তিনি মেয়েটিকে চিরদিনের জন্য শোকমুক্ত করিলেন। আমার সেবার ভার ধীরে-ধীরে তার হাতেই ন্যস্ত করিয়া, তিনি তাহাকে এমন ভাবে আপনার করিয়া লইলেন যে, সে আর আমাদের পর মনে করিল না;

মেয়েটী নিজের দুহিতার মত নব ক্ষেত্রে নূতন জন্মলাভ করিল। সতীর আশীর্ব্বাদ পতিহারাকে সেবার অধিকার দিয়া তাহাকে ধন্যা করিল। আমার ধাত্রীরূপা নির্ম্মলা তাঁর স্নেহের দানরূপে আজিও এই নবজীবনের সাক্ষ্য দেয়।

তাঁর স্নেহে ও যত্নে সঙ্ঘের কন্যারা গরবিনী। তাহারাও পুরুষের ন্যায় সঙ্ঘের ভিত্তি রক্ষা করে। তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রমের তিনিও ছিলেন সমান অংশীদার। নানা ঘটনা সৃষ্টি করিয়া ইহার মধ্যেই তিনি তৃপ্তির নির্ঝর উৎসরিত করিতেন। কর্ম্মক্লান্তা মেয়েদের দেহশ্রীও তাই সতত লাবণ্যময়ী থাকিত। শ্রমই অমৃতের মত নারীমন্দিরকে শক্তি ও শ্রী দিয়াছে।

সঙ্ঘের পুত্র-কন্যা সকলেরই তিনি ছিলেন যুগপৎ ভয় ও অভয়ের স্থান। কোনরূপ চাপল্য ও চাঞ্চল্য তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ করার সাধ্য কাহারও হইত না। কিন্তু তাঁর গুরুগম্ভীর আচরণ ও কঠোর অধ্যাত্মশাসনকৌশলের মধ্যেও কি এক অপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহ বহিত, কি এক অপার্থিব আকর্ষণে তিনি সকলকে মুগ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, যাহার ফলে আমার প্রেরণার অনুকূলে সকলেই অবিরাম ছুটিত, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া কেহ স্বীকার করিত না। এই হিসাব সেদিন যদি করিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল আমার সেবিকা সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্নেহ-প্রীতি নয়, সেই সঙ্গে পূজার্ঘ্য দিয়াও সান্ত্বনা লাভ করিতাম। তিনি আমার অনুগতা শিষ্যার ন্যায় আমার জীবনধর্ম্মের অটল-ভিত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁর মহনীয় জীবনের মর্ম্মেতিহাস খুব অল্পদিনই সমুজ্জ্বলরূপে আমার কাছে প্রতিভাত হইয়াছিল—সে খুব অল্পদিন—সে কাহিনী আমার অন্তরেই গোপন থাকিবে।

হিন্দু-নারীর চরিত্র হিন্দু-নারীই বুঝিবে। নারীর দরদ নারী যেমন বুঝে, অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। নারীর লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। নারীর পবিত্রতা ও লজ্জাকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন। আর একটি বড় বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল। তিনি স্বামীকে বড় করিয়া দেখিতেন, কিন্তু স্বামীর ধর্ম্ম ততোধিক বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁর জীবনদৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। তিনি যে অতি অল্প বয়সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও স্বামীর ধর্ম্মেরই দায়। এই ধর্ম্মে যাহারা যত উদ্‌বুদ্ধ হইত, তাহারা তাঁর তত স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিত। তাঁর মানসকন্যাগণ কর্ম্মক্লান্তা হইয়া যখন ঘর্ম্মাক্তকলেবরা

হইয়াছে, স্বচক্ষে দেখিয়াছি—তিনি শত নিষেধ সত্ত্বেও তাহাদের ব্যঞ্জন করিতেছেন। তিনি সন্তানদের সুভোজ্যদানে তৃপ্ত করিতেন। তাঁর এইরূপ স্নেহামৃতে অনেকে ধন্য হইয়াছে।

আমার স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর কিরূপ সচেতন-দৃষ্টি ছিল, তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। খাওয়া-দাওয়ার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও, আমি মাঝে-মাঝে সর্দ্দি-জ্বরে বড় কষ্ট পাইতাম, তিনি ইহার কারণান্বেষণে মনোযোগিনী হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন এত সর্দ্দি-কাশি হয়?" আমি ঘরের বাতায়নপথে চাহিয়া, হাসিয়া বলিলাম "ঐ বিশাল ফল্সা গাছটা বাতাস বন্ধ করায় স্বাস্থ্যহানি হয়!" সেইদিনই মধ্যাহ্নে দৈনন্দিন কর্ম্মাদি সমাপন করিয়া ঘরে আসিয়া দেখিলাম—আলো ও হাওয়ায় ঘরখানি ভরিয়া উঠিয়াছে। বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখি—ফল্সা গাছটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হইয়াছে। তাঁর চক্ষে বিজয়দীপ্তি! কে শত্রু, কে মিত্র, তাঁর কাছে বলা দায় হইয়া উঠিল। নিরীহ বৃক্ষটীও তাঁর বিরাগ হইতে মুক্তি পাইল না। ঘটনা তুচ্ছ, কিন্তু এমনই ছিল তাঁর মনোবৃত্তি!

এই সময় হইতে তাঁর অন্তরে স্বচ্ছ উৎসর্গস্রোতঃ শতধা উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার জীবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল—এই সময়েই তিনি যেন আপনাকে প্রকাশ করার জন্য উদ্যতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে প্রাণধারা এতদিন অলক্ষ্যে আমায় দিন-দিন শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছিল, তাহা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া আমিও নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

চন্দননগরে এই সতীমূর্ত্তিকে ঘিরিয়া অকল্পিত এক মধুচক্র যখন গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সময়েই সঙ্ঘের অন্যতম সাধক শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র পণ্ডিচারীতে থাকিয়া শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে নানা কারণে যে অস্পষ্টতা ঘনাইয়া উঠিতেছিল, তাহা নিরাকৃত করার চেষ্টা করিতেছিল। অরুণচন্দ্র সুদূর প্রবাসে থাকিয়া তার সুনিপুণ মানস-তুলিকা-যোগে শ্রীঅরবিন্দের নিকট যতই সঙ্ঘকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছিল, চন্দননগরের সঙ্ঘ ততই শৃঙ্খলিত ও সুগঠিত হইয়া উঠিতেছিল। এই অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-রহস্যের কিছুটা বিবৃত করার জন্য পণ্ডিচারী হইতে অরুণচন্দ্রের লিখিত কয়েকখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

অরুণচন্দ্র লিখিল: "প্রথম সাক্ষাৎকারে 'অরো' জিজ্ঞাসা করিলেন—

মতিলালের কাছ থেকে কি মেসেজ এনেছ ?" কণ্ঠস্বর কারুণ্যপূর্ণ...বল্লুম শুধু, 'সে মতিবাবুই জানেন'—নিজেরই কণ্ঠে বাধছিল...অন্তরের বার্ত্তা সে যে অসীম কাহিনী !......মেসেজ আমার সত্তা......এই আমি ও আমরা— বুঝে নাও অন্তর্য্যামী—কথাটা অন্তরেই বল্লাম। অনেক প্রশ্নাদির পর 'অরো' জিজ্ঞাসা করিলেন 'মতিলাল সাধনার কথা তোমাদের কাছে বলে ?'

আমি—'বরাবর বলে' আসছেন। যারা ঠিক আমাদের, তাদের মধ্যে সাধনা বেশই চলছে।' যারা একটু ঘুরছে, তাদেরও নাম উল্লেখ করতে হল। তিনি বল্লেন—'না, মতিলালের নিজের সাধনার কথা। সে এখানে বিজ্ঞানে উঠেছিল, তারপর লিখেছিল সেখান থেকে নেমে কাজ করছে।'

অরুণের সহিত শ্রীঅরবিন্দের দীর্ঘ কথোপকথনের মর্ম্ম গভীরভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিবার বিষয় ছিল। কেন-না, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর দেশের নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমার সুনিবিড় সম্বন্ধ যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। মীরা দেবী ও বারীন্দ্রকুমারের আগমনের পর হইতে কি যেন একটা অলক্ষ্য ব্যবধান আমাদের উভয়ের মধ্যে ধীরে-ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া নানা জটিল সমস্যাজালের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল।

অরুণ এই সকল বিষয় লইয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত আলোচনা করিয়া যে আলো পাইয়াছিল, ভাষায় আঁকিয়া তাহাই আমার কাছে পাঠাইত। সেই তাৎপর্য্যপূর্ণ সঙ্কেতগুলি সম্বন্ধে অতঃপর কিছু আলোচনার প্রয়োজন হইবে, কারণ ইহার মধ্যে সাধনা ও সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বহু কথারই উল্লেখ ছিল।

অরুণের পত্র যথারীতি পাইতেছিলাম। সঙ্ঘের সহিত অখণ্ড সম্বন্ধের মানুষ বলিয়া যাহাদের উপর প্রত্যয় ছিল, আমার অজ্ঞাতে তাহাদের মধ্যে কয়েক জন শ্রীঅরবিন্দের সহিত পত্র-ব্যবহারে চন্দননগর-সঙ্ঘের অনেক দোষ-ক্রটি দেখাইয়া, আমার সহিত শ্রীঅরবিন্দের অন্তর-বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছিল। অরুণের পত্রে এই সকল সংবাদ আমার মনকে পীড়িত করিতেছিল। আমার দুঃখের হেতু, এই সকল সহকর্ম্মীদের এইরূপ আচরণের

জন্য যত না হউক, শ্রীঅরবিন্দ ইহাদের অভিযোগগুলি কেন আমার কাছে গোপন রাখিতেছেন, ইহাই অধিক পীড়ার কারণ হইতেছিল। শ্রীঅরবিন্দ যে চন্দননগরের বিরুদ্ধ শক্তিকেন্দ্রগুলিকে সংহৃত করিয়া আমার পরিচ্ছন্ন প্রকাশের পথই খুঁজিতেছিলেন এবং এই সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া আমায় যে তিনি বিচলিত করিতে চাহেন নাই, এ কথা সেদিন উপলব্ধিগম্য হয় নাই। অরুণের পত্র খুঁটিয়া-খুঁটিয়া এই সকল সংবাদ যতই লইয়া আসিতেছিল, আমি ততই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু অরুণকে সম্মুখে রাখিয়া শ্রীঅরবিন্দ সেদিন আমায় যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কেবল আমার নহে, অধ্যাত্ম-সাধকমাত্রেরই স্মরণযোগ্য। এই হেতু আমি এই সকল কথা কিছু পাঠকদের উপহার দিব।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন—"চন্দননগরে কর্ম্ম ও ভক্তির বেশ বিকাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিতে হইবে।" অরুণের প্রশ্নোত্তরে তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন "জ্ঞানের অভাব অর্থে একটা বিশাল ব্যাপক বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে (universal consciousness) আস্থা-স্থাপন চাই। মতিলালের ওখানে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে (free) না হউক, প্রচুরভাবেই মুক্ত (free) শক্তির খেলা আর খুব ঘনীভূত (intense) ভাবের প্রকাশ আছে। সেই শক্তি আর ভাবের ধারা ধরে'ই উপরে উঠার গতি; ওখানে এইরূপ একটা মুক্ত ও নমনীয় (free and flexible) জ্ঞানের নিজস্ব খেলাও চাই। জ্ঞানের স্বভাব-শক্তি (native power of knowledge) হ'লে, বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ সহজ হয়ে উঠবে।" শ্রীমান্ অরুণ ইহার উত্তরে বলিয়াছিল "জ্ঞানের এই অলৌকিক শক্তির অভাব পুস্তকাদি পড়ে তো দূর হয় না, আমাদের আছে উৎসর্গ এবং সঙ্ঘ-চেতনা, এইখানে আমরা অটল ভিত্তি পেয়েছি। বাকিটুকু আপনাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে।"

শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরের সাধনার ত্রুটি কোথায়, তাহা দেখাইবার জন্য বলিয়াছিলেন "মতিলাল ছাড়া আর কাহারও মধ্যে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে বিশিষ্ট আত্মসত্তার প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই না (Individual formation in the universal consciousness)।" অরুণ ইহাতে ব্যক্তিবাদের কথা আসিয়া পড়ায়, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তিবাদের খারাপ দিক্‌টা বাদ দিয়া ভগবানের এক-একটা দেবত্বের প্রকাশের কথাই

বলিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কথার মর্ম্ম অরুণ সেদিন নিখুঁত ভাবেই আমার কাছে পত্রে জ্ঞাপন করিয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ সেদিন চন্দননগরের অধ্যাত্মসাধনার যে সকল ত্রুটি ধারণা করিয়াছিলেন, তাহার সবখানি তাঁহার আত্মদর্শনের ফল বলিয়া আমার প্রতীতি হইত না। শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদের যে ষড়যন্ত্র এখানে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম, তাহার প্রভাব উহার মধ্যে ছিল বলিয়া আমি অনুভব করিতাম। এই হেতু আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পরিবর্ত্তন করার প্রচেষ্টা করিতে গিয়া অনেক সময়ে নিজেকে তাঁহার নিকট অকারণ লঘু করিয়াই ফেলিতাম। ইহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত পরে দিব। শ্রীঅরবিন্দের মহনীয় উপদেশ কিন্তু সতত স্মরণে থাকিত ও তাহা পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ থাকিতাম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন "তোমরা যে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করছ, পুস্তকের স্তূপে ছেলেদের না চাপা দেওয়া হয়, এই দিকে দৃষ্টি রেখো। পুস্তক প্রথমে একেবারেই না থাকা দরকার। নানা প্রকার পর্য্যবেক্ষণ ও নানা বিষয়ের কৌতূহল (observation and interest) জাগানই ভাল। শিক্ষাক্ষেত্র যতটা সম্ভবপর আনন্দ-ক্ষেত্র করে' তুলতে হবে। ছেলেদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মৌলিক মনোবৃত্তিবিকাশের মুক্ত প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে (free growth of original faculties)। তারপর, যখন প্রত্যক্ষ সঞ্চালনার ফলে মনোবৃত্তিগুলি স্ফূর্ত্তি পাবে, তখন যার যে দিকে রুচি, তদনুযায়ী পুস্তক নির্ব্বাচন শ্রেয়ঃ। গভর্ণমেণ্টের মত একটা বিশেষ প্যাটার্ণ—যেমন কোন উদ্দেশ্যমূলক নাগরিক জীবন গড়া—এইরূপ কোন কিছু আমাদের শিক্ষায় থাকবে না। যার কাছে ভগবান্ যা' চান, তার ভিতর সেইটাই ফুটে' উঠুক। নৈতিক শিক্ষার জন্য বাঁধা-ধরা বই একেবারেই না থাকা ভাল। সত্যানুরাগ, প্রেম, ঔদার্য্য, শক্তি—প্রকৃতপক্ষে এই সকল হৃদয়বৃত্তি জাগাবার আছে। জীবনের আবহাওয়ার মধ্যেই তাহা বিকশিত হবে।" এই সময়ে 'প্রবর্ত্তক'-এর কথায় তিনি বলেন "প্রবর্ত্তক যোগের বিশেষ ধারা গ্রহণ করে'ই চলেছে।" 'প্রবর্ত্তক'-পরিচালনায় ইহাতে বিশেষ উৎসাহলাভ করিতাম। কর্ম্ম-পন্থার নির্দ্দেশও তিনি কম দিতেন না—শ্রীমান্ অরুণের পত্র হইতে এই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত কথঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন "চন্দননগরে যেমন সঙ্ঘ (commune)

গড়ে' উঠেছে, এই রকম চারিদিকে সঙ্ঘ গড়ে' তুলতে হবে। কাজ আমি শুধু নেশনের জন্য করছি না, নেশনকে চাই—কিন্তু সমস্ত নেশনকে spiritual growth-এর out-flowering-স্বরূপ free communehood দেওয়া সম্ভবপর হবে না।" তিনি সংহতি-শক্তি সম্বন্ধে আরও বলেন: "সংহতি-শক্তি প্রবল হলে, সেই সংহতি-শক্তি দিয়ে জাতির জীবনতন্ত্র একেবারে দখল করে' বসতে হবে। অতঃপর জাতিকে স্বাধীনতা-দান ও উহাকে যন্ত্রস্বরূপ করে' মানবজাতিকে নূতন সভ্যতা দিতে হবে। গান্ধীর রাষ্ট্রনীতির পিছনে সত্য আছে। কিন্তু যে ভাবে তা' চলেছে, তা' দুর্ব্বোধ্য। ইহার পরিণামে—দমননীতি (repression) অথবা রক্তপাত (violence) ও পরিশেষে অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। আদি সিনফিনেরা রাজনীতি একেবারে বাদ দিয়ে কেবল জাতির মন-পরিবর্ত্তনের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিল। বর্ত্তমান পৃথিবীতে মানুষের নূতন চিন্তার ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। আমাদের দেশের তো কথাই নাই, অন্যান্য দেশেও তাই। নূতন মানুষ, নূতন চিন্তা চাই। দুই দুইটী দেশে নূতন চিন্তা, নূতন সৃষ্টির প্রেরণা খেলছে দেখা যায়—আয়র্লণ্ড ও রুশিয়া। ভারতে যাঁরা রাজনীতি চর্চ্চা করেন, তাঁদের কাজ যেন অনেকখানি ছেলেমানুষী। কিছু ফল যে না হয় তা' নয়; কিন্তু কি রকম মেজাজে যে চলেছে, সবই দুর্ব্বোধ্য। গান্ধী একটা মানুষ, আর সব যেন মালগাড়ী। তাদের তিনি টেনে নিয়ে চলেছেন!" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন —"But politics should be put last, rather than first." অর্থাৎ রাজনীতি চাই সর্ব্বশেষে।

শ্রীঅরবিন্দের এই সকল চিন্তাধারা সেদিন আমাদের সম্মুখে নূতন আলোকপাত করিত। সঙ্ঘের মাতৃহৃদয়ের নীরব প্রভাবও এই সময় হইতেই এখানে কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা অরুণের পত্রের শেষাংশ হইতে বুঝা যায়। অরুণ লিখিল "কাকিমার স্নেহভরা বুকখানি থেকে এক-একটা ঢেউ এসে এখানে সত্য সত্যই আমার ছোট বুকখানিতে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উথলিয়া উঠে।" আমি কিন্তু সেদিন আমার অজ্ঞাতে এই মৌনমূর্ত্তি মহীয়সী নারীর অন্তর-বীণার মীড়ে-মীড়ে সঙ্ঘ-রচনার এমন সুমধুর সঙ্গীতের অনাহত-রাগিণী ঝঙ্কার তুলিতেছে, তাহা যেন আমলেই আনিতাম না।

এই সময়ে আমি চন্দননগরে ছিলাম বটে, কিন্তু আমার সমস্ত প্রাণটা

পড়িয়াছিল পণ্ডিচারীতে। প্রতিদিন অরুণের পত্রের প্রতীক্ষা করিতাম; কেন-না, এই পত্রের মধ্য দিয়াই শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাস্রোতঃ কোন্ মুখে, তাহা বুঝিয়া তদনুযায়ী চলার সুযোগ পাইতাম। শ্রীঅরবিন্দ ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় তাঁর পুনরাগমনব্যাপার তাঁহার পণ্ডিচারী-যাত্রায় সহায়তার মত আমারই উপর নির্ভর করে, এই প্রত্যয় আমার বদ্ধমূল হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ আমার এই গৌরব ভাবে ও ভাষায় তখন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাহার জন্য এক শ্রেণীর নিকট-বন্ধুদের কাছে সপ্রেম ঈর্ষ্যার আস্বাদ অনুভব করিতাম। অরুণকে তিনি এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? চন্দননগরে না কলিকাতায়?" উপেন-দাদা ছিলেন ব্যঙ্গ-কৌতুকের রাজা, তিনি নাকি কলিকাতার নাম শুনিয়া উচ্চ প্রশংসাত্মক খেউর গাহিয়াছিলেন! শ্রীঅরবিন্দ খুব হাসিতে-হাসিতে উপেন-দার কলিকাতা-বর্ণনা উপভোগ করিয়াছিলেন। উপেন-দা আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি, দায়িত্ব-বণ্টন (delegation of responsibilities), লোক-নির্ব্বাচন প্রভৃতি প্রসঙ্গ লইয়া চন্দননগরের খুব সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সব জানিয়া অত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেন। তিনি চন্দননগরে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা তুলিয়া বলিতেন "মতিলালের সেই বাড়ীটির চেহারা আমার বেশ মনে আছে এবং ফ্রেঞ্চ-টেরিটরী বলিয়া সুবিধাও অনেক আছে।" এই সকল আলাপের কথা যত আমার নিকট পৌঁছিত, ততই উৎসাহিত হইয়া আমি শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্য জীবনের স্বপ্নচিত্রকে আঁকিয়া যে তৃপ্তি পাইতাম, তাহা বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। আমি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ে এমনই নিঃসংশয় হইয়াছিলাম যে, তাঁহার জন্য চন্দননগর আশ্রমে স্থাননির্দ্দেশ ও তাঁর আবাস-ভবনের জন্য অর্থসঞ্চয়েও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম।

অন্তর-প্রেরণা কার্য্যে পরিণত করার আকুলতা যেমন আমায় উন্মাদ করিত, শ্রীঅরবিন্দের এক-একটী বাণী সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমি ততোধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। অনেক অন্তরপ্রেরণা হয় তো অন্তরেই লয় পাইয়াছে; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বাণী কোনমতে ব্যর্থ হইতে দিই নাই। এই দৃঢ় ধারণা কর্ম্ম-দৃষ্টান্তে হৃদয়ে এমন শিকড় গাড়িয়াছে, যাহা আর

উপাড়িয়া ফেলা সহজ নহে। আমার তাৎকালীন অবস্থা দেখিয়া সঙ্ঘ-জননী বহুবার বলিতেন "কোন বিষয়ে সবখানি ভাবনা-চিন্তা না করিয়াই তুমি যেরূপ বাড়াবাড়ি কর, তাহাতে মনে হয় তোমার অনেক শ্রম এবং শক্তি বৃথা হইয়া যায়। সব কাজই স্থির হইয়া যদি কর, আরও অনেক বড় কাজ হইতে পারে।"

কথাগুলি চিরদিনই সত্য ও সকলের পক্ষে প্রণিধানযোগ্য; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখার সুযোগ হইল না। আজিও শক্তি ও সময়ের অপচয়-নিবারণকল্পে বহু সুহৃদের হিতবাণীতে অনেক সময়ে কর্ণপাত করিতে পারি না। কিন্তু বুঝিতে পারি যে, কর্ম্মের তুলনায় শক্তি ও সময়ের অনেক ব্যয় হইয়া যায়—সত্যই ইহা অপচয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কিন্তু একটা পতিত জাতির মধ্যে মানুষের মত দাঁড়াইয়া থাকার জন্যও যে কত অধিক শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা আমি বুঝিয়াছি; আর এই ক্ষয় ও অপচয়ের হিসাব রাখিয়া কর্ম্ম করিলে হয় তো যে কোন কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মসৃষ্টির জন্য শক্তির অপচয়ে যে করুণ অভিজ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তাহার মূল্যও কম নহে। এই অবস্থায় অফুরন্ত-শক্তিরও বুঝি উৎসের সন্ধান ও পরিচয় মিলে। প্রকৃতির সে দানের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না; তবে এ কথা বুঝাইবার নহে। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে তাঁহার আদেশকে পুরোভাগে রাখিয়া কত যে দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা আজ বলিবার নহে। কেবল তাঁহার পত্র-ব্যবহারের সঙ্গোপন-নীতি-রক্ষার জন্যও যে উৎকণ্ঠা, ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়াই যে সময়-ক্ষয় হইয়াছে, তাহার মূল্য আমার নিকট অল্প নহে। শ্রীঅরবিন্দের অভাবপূরণের জন্য সামান্য অর্থসংগ্রহেও শক্তি ও সময়ের অপচয় যতটা হইয়াছে, তদনুযায়ী ফল মিলে নাই। কিন্তু এই ক্ষয় ও অপচয় শক্তির অবাধ উৎসকেই আবিষ্কার করিয়াছে। এইজন্যই কর্ম্ম আমার চক্ষে আজও বড় বলিয়া বোধ হয় না, কাজের পিছনে অন্তরানুভূতিই আয়ুঃ ও আনন্দের হেতু হয়। কর্ম্ম যতই ক্ষুদ্র হউক—শক্তির আত্মপ্রকাশ ইহার মধ্যেই সিদ্ধ হয়। এই শক্তি শরীরিণী নহে, আমি অশরীরিণী শক্তির কথাই বলিতেছি। এই হেতু ক্ষয় ও অপচয়ের *হিসাব আমার চিত্তে ব্যর্থতার রেখাপাত করে না।*

ক্লান্তি আসিত শরীরের, শক্তির নয়; কিন্তু তাহাও সেবার দাবী লইয়া

উপস্থিত হইত। সেবার অর্ঘ্য হাতে তখনই সাক্ষাৎকার পাইতাম গৃহলক্ষ্মীর—হৃদয় আবার ভরিয়া উঠিত স্বস্তি ও তৃপ্তিতে; আবার ছুটিতাম কর্ম্মলক্ষ্যে শক্তির দ্যোতনায়। নিষেধ মানিতাম না কাহারও; কিন্তু এই অবাধ্যকে তাহার জন্য কেহ তিরস্কার করে নাই, উপেক্ষা করে নাই। বরং সহানুভূতির অনুলেপে হৃদয় আমার সকলে অভিষিক্ত করিয়াছে। এইখানেই পরস্পর পরিচয় ঘনিমাময় হইয়া দূরকে অতি নিকটে আনিয়া দিত, গৃহদেবীকেও এইখানে পাইতাম অতি সন্নিকটে। কর্ম্মক্ষেত্রেও আমি থাকিতাম তাঁর চক্ষে-চক্ষে—কর্ম্মে তৃপ্তি শক্তি-বিগ্রহ এমনি সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইত বলিয়া।

ঈশ্বরপ্রসাদ শক্তির মূর্ত্তি ধরিয়া প্রতি প্রভাতে শয্যাত্যাগের সঙ্গে আমায় অভিষিক্ত করিত—নব-নব প্রেরণায় সেবার উপকরণ ছিল উপলক্ষ্য। সেই যে মুখ-প্রক্ষালনের জলপাত্রটি ধরিয়া নতমুখে দেবী আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাঁর বদনে যে শুভশ্রী, নয়নে যে দীপ্তি, তাহা আমার চক্ষে চিন্ময়ী মহাদেবীর অনুবাদ বলিয়া মনে হইত। প্রাতরাশের নৈবেদ্য সাজাইয়া যখন তিনি আমার নিকট চারু হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইতেন, মধ্যাহ্নে আবার অন্নথালী সাজাইয়া, অঞ্চল দোলাইয়া, স্নেহ-প্রেম-সঞ্চালিত ব্যজননিরত করপল্লব সঞ্চার—এই অনন্ত পথযাত্রীর প্রয়োজনের চেয়ে প্রতিদানের মাত্রাই অধিক মনে হইত। পরিচ্ছন্ন শয্যাধার ধূলিচিহ্নশূন্য দেখিয়া পবিত্রতার দেবীই স্মৃতিপটে বিকশিতা হইতেন। সুনিদ্রার প্রতীক্ষায় শিয়রে বসিয়া তিনি যখন মাথার চুলগুলি লইয়া কোমল করসঞ্চালন করিতেন, তাঁর স্নেহশীতল অবদান শ্বাসে-প্রশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে, প্রতি নিমিষে আমায় শক্তির অজস্র বর্ষণসিক্ত করিত—আমি জীবনের ক্ষয়-অপচয়ের হিসাব হারাইতাম—সীমাহারা শক্তিই আমার আশ্রয়, এই অনুভবই দৃঢ়তর হইত। আমি তাই জীবনে হিসাবের অঙ্ক কষিয়া যাত্রা সুরু করি নাই। শ্রম ও সময়ের মূল্য-নিরূপণে আমি পূর্ত্তি পাই না। সেই যে প্রথম যৌবনে প্রার্থনার কণ্ঠ স্বতঃই ফুকারিয়া উঠিত "মা, জ্ঞান, শক্তি, প্রেম দে"—জ্ঞানদৃপ্তমূর্ত্তি কত উর্দ্ধে ছিল, তাহার সন্ধান রাখিতাম না, ভক্তি ও প্রেমের হিন্দোলে জীবন দুলিয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞান আসিয়া এইখানেই ধরা দিবে—এ বাণী শুনিতাম, সে ঋক্‌ও ব্যর্থ হয় নাই আমার কাছে। ভাবের কথায় বহুদূর ভাসিব না, সেদিনের জীবনপ্রসঙ্গই বলিব। আমার কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল যেন মহাশূন্য

হইতে। নিরতিশয় রিক্তও শক্তিপূর্ণ হয়, এই দৃষ্টান্তই আমার জীবন—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কি অর্থ, কি অভিজাত্য, কি বিদ্যা, কি অধ্যাত্মজ্ঞান সব হইতে বঞ্চিত সর্ব্বহারাকে মহাশক্তিই পূর্ণ করিতেছিল। দুই নয়নের মধ্য-বিন্দু ললাট-কেন্দ্রে যোগশক্তির তরঙ্গহিল্লোল যেমন উচ্ছ্বসিত হইত, অন্তরেও তেমনই উজান বহিত প্রেমের তুফান—পর ও আপন বলিয়া বিচার ছিল না। কত আঘাত আসিয়াছে, কত ক্ষয় হইয়াছে অন্তর-বাহির উভয় সম্পদের—প্রাণের বিদ্যুৎ তাহাতে নিষ্প্রভ হয় নাই। যেখানে বড় আশা, সেইখানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিরাশ হইয়াছি। সহকর্ম্মীর সংখ্যা অঙ্গুলীগণনায় শেষ হইত না; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বার-বার একা হইয়া পড়িয়াছি—দরদী, মরমী কয়-জন মিলে? কিন্তু তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করার জন্যই ছিল নানা কর্ম্মসৃষ্টির ছলনা। একাই ছুটাছুটি করিতাম একবার প্রেসে, পুনরায় বুক-পাব্লিশিংএ, তারপর তাঁতশালায়, ইটখোলায়, আবার কাঠের কারখানায়। প্রয়োজন ছিল না এত কিছুর; কিন্তু শক্তি নিজের পদচিহ্ন এইভাবেই আঁকিয়া চলিতেছিল। ইহারই ফাঁকে আবার "প্রবর্ত্তক"-এর ৬৪ পৃষ্ঠায় কালি ছড়াইয়া, "নবসঙ্ঘ"-এরও বুকে আঁচড় কাটিতে অকাতর ছিলাম। ইহার উপর ঘাড়ে চাপিয়াছিল "ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার"। তাই শ্রীঅরবিন্দ দরদের সহিত বলিতেন "মতিলাল শ্রম দেয় উন্মত্ত ষাঁড়ের মত।" সেদিন শ্রমজল মুছাইবার মূর্ত্তিমতী মমতাময়ী সঙ্গিনী ছিলেন, আর ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। আর সেদিনের সহিত আজিকার এই প্রচণ্ড কর্ম্মের তুলনা হয় না। আজিও এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধির অক্লান্ত শ্রম সমানে চলিয়াছে, কিন্তু সেখানে স্নেহপ্রলেপের সান্ত্বনা দিতে কোথায় সে প্রেমময়ী নারীবিগ্রহ! কোথায় শ্রীঅরবিন্দ! আমার বরণীয়া শক্তির রূপান্তর লক্ষ্যে রাখিয়াই যেমন চলিয়াছি নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব—তেমনই কি শ্রীঅরবিন্দও আমার নিকট অমূর্ত্ত রূপ ধরিয়া আজ আমার পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছেন! শক্তির এই অপ্রাকৃত লীলামাহাত্ম্য বুঝাইব কাহাকে?

সেদিন শক্তি ও প্রেম ছিল আমার কর্ম্ম-জীবনের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। আর জ্ঞানঘন-মূর্ত্তি ছিলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের বাণীই ছিল আমার বেদস্বরূপ। সে যুগের বাণী বলিয়া এ যুগেও তাহা আমার নিকট নাকচ হয় নাই; বরং ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থাশ্রয়ে সে বাণীর মূল্য সমধিক প্রতীত

হইয়াছে। এ যুগের মানুষের কাছে সে যুগের অরবিন্দের কিছু পরিচয় দেওয়ার লোভ সংবরণ করা তাই সম্ভবপর হইল না। অধ্যাত্মযোগী শ্রীঅরবিন্দের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ভারতের সাধনরাজ্যে নবালোক প্রদান করিবে।

মনের নানা স্তর দেখাইয়া শ্রীঅরবিন্দ অবশেষে যে পর্য্যায়ের কথা বলিতেন, ভারতের ভাষায় তাহাই বিজ্ঞান (Supermind)। সেইখানে, সেই অধ্যাত্মরাজ্যে দেবরূপ গঠন করার কথা তিনি পুনঃ-পুনঃ বলিতেন। বেদের সত্যে জাতির চিত্ত যাহাতে উদ্ভাসিত হয়, সেই নির্দ্দেশ তিনি দিতেন। অরুণের পত্র তাঁর এই সকল কথাই আমাদের নিকট বহন করিত: "বৈদিক ঋষি যেমন নিজ চিৎ-লোকে দেবতার জন্মদান করিতেন, এইটাই হইবে আমাদের গূঢ়তর কাজ—চেতনায় দেবসৃষ্টি। সাধারণতঃ আমরা যে অবস্থায় থাকি, সেটা অজ্ঞান-মন (mind of ignorance)—ইহা প্রাণক্ষেত্র ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। এখানে আমরা কিছুই জানি না। জানিবার ক্ষীণ ধারাবাহিক চেষ্টা মাত্র এই ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়। আছে আর এক মন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় তাহা আত্মবিস্মৃত মন (mind of self-forgetful knowledge)—যেখানে সত্য ও জ্ঞান পাওয়া যায় আভাসে-আভাসে। যেন হারানো নিধি, ভোলা জিনিষ সব বাহিরের আঘাতে অথবা ভিতরের উদ্দীপনায় পর্দ্দায়-পর্দ্দায় জাগিয়া উঠিতেছে—স্মরণপথে আসিয়া ধরা দিতেছে। প্লেটোর থিওরী ছিল—সব জ্ঞানই বিস্মৃত বিষয়ের স্মৃতি (all knowledge is but a remembrance of forgotten things)। সাধকের প্রথম পরিচয় এই আত্মবিস্মৃত মনের সঙ্গে। বিবেকানন্দের ছিল সুপরিপুষ্ট প্রেরণাসিদ্ধ মন (highly developed intuitive mind)। এই মনেরই উচ্চ পর্দ্দায় দাঁড়াইয়া, তিনি ধাক্কা মারিয়াছেন তার উপরের স্তরে জ্ঞানঘন মনে—যাহা ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছিল। এখানে জ্ঞানের জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে বাস—ইহাই দীপ্ত জ্ঞানরাজ্য (mind of knowledge)। ইহারও ঊর্দ্ধে উপস্থিত হইলে, ঠাকুর আর কথা বলিতে পারিতেন না—বলিতেন 'আর বলা যায় না।' মা সে যুগে ঐখানেই তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন।"

আমার মনে হইত—শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছিলেন ঠাকুর যেখানে উপনীত

হইলে আর কথা বলিতে পারিতেন না, জ্যোতিঃপুঞ্জে ডুবিয়া যাইতেন, সেই বিজ্ঞানঘন চেতনায় আরোহণ করিয়া দিব্যজীবনের সন্ধান। তিনি বলিতেন —এই উপরে উঠার একটা কৌশল আছে (art of opening up) ; সেই বিজ্ঞানের দুয়ার খোলার যে নিগূঢ় কৌশলপ্রয়োগ, এইটাই সবচেয়ে শক্ত কাজ। ইহা ধরিতে পারিলে, আর সব তর্-তর্ করিয়া ফুটিয়া উঠে। অধ্যাত্ম-রাজ্যের রুদ্ধ দুয়ার খোলার তিনি প্রথম সন্ধান পাইয়াছিলেন মহারাষ্ট্রীয় সাধক লেলের কাছে, এ কথা তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করিতেন। তবে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বলিতেন—এই উর্দ্ধের বিজ্ঞানময়-চেতনার আবিষ্কারে তাঁর নিজের প্রবল ইচ্ছাই অধিক দায়ী।

তিনি অপ্রাকৃত দর্শনের অভিজ্ঞতার কথাও আমাদের শুনাইতেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই ইহা বুজরুকী বলিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা-নির্দ্ধারণ সহজ ব্যাপার নহে। শ্রীঅরবিন্দ এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে আমায় সাহায্য করিতেন ; তাঁহার সমর্থনও আমি পাইতাম। শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র আমার এইরূপ অধ্যাত্মদর্শনের কথা শ্রীঅরবিন্দের নিকট উত্থাপন করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "প্রথম-প্রথম অনেক ভুলভ্রান্তি আসিতে পারে, কিন্তু ধীরে-ধীরে এইরূপ দর্শন পরিশুদ্ধ হইয়া পর-মনেরই সন্ধান দেয়। মতিলাল মাথার উপরে কিছু গড়ার সন্ধান পাইয়াছে। সেইখানেই সকল জ্ঞান, চিন্তা, ইন্দ্রিয় কার্য্য করে ; কিন্তু এইখানে চৈতন্যকে তুলিয়া রাখিলেই চলিবে না ; কেন-না, এই উপরে উঠিয়া যতক্ষণ থাকা যায়, ততক্ষণই সব থাকে, প্রাচীনেরা এইজন্য সমাধির উপর জোর দিতেন, কিন্তু ঐ উর্দ্ধের অধ্যাত্মশক্তি প্রথমে মানসক্ষেত্রে (psychic plane-এ) ধীরে-ধীরে নামাইয়া আনিতে হয়, সেখানে নূতন যন্ত্র ও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়াবলীর সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের সাহায্য না লইয়াও দর্শন-স্পর্শনাদি করে।" তিনি এই সময়ে মীরা দেবীর সাধনার কথাও বলিতেন। মীরা দেবী নাকি এই নব চেতনার স্তরে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি দিয়া দেখা-শুনা, যাবতীয় কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন, বাহিরের চোখ দিয়া প্রায় দেখেনই না!

যোগশাস্ত্রে প্রাকাম্য-সিদ্ধির কথা আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিতেন "ইহা ততক্ষণ পূর্ণাঙ্গ হয় না, যতক্ষণ না সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি মুক্ত হইয়া কার্য্য করে।"

শ্রীঅরবিন্দ নিজের উপলব্ধির কথাও ব্যক্ত করিতেন। তিনি বলিতেন— তিনি একটা অখণ্ড সত্তার মধ্যে বাস করেন, আত্মস্বাতন্ত্র্য একেবারেই খুঁজিয়া পান না। তিনি শরীরের রূপান্তরের কথাও বলিতেন। ইহা আকৃতির পরিবর্ত্তন নহে। তবে দেহযন্ত্রগুলির পরিবর্ত্তন হইবে, শরীর অমৃতময় হইবে, জরা, ব্যাধি থাকিবে না—এইরূপ উপদেশ তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইত।

শ্রীঅরবিন্দ নিজের অনুভবসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দিয়াও এই সকল কথা আমাদের সাধনায় উৎসাহ দিবার জন্য ব্যক্ত করিতেন। অরুণও তাহা সবই লিখিয়া পাঠাইত। সেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলির রূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—চক্ষুঃ পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় প্রত্যক্ষ করে না। একটা অখণ্ডের অসংখ্য রূপ, গুণ ও ক্রিয়া তাঁহার নয়নে প্রতিভাত হয়। কর্ণ যে শব্দই শ্রবণ করুক, তাহার মধ্যে শব্দের সাকল্যের সুর কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলে (totality of sound)। শব্দ-স্পর্শাদির মধ্যে এই সাকল্য, এই অখণ্ডত্ব ও পূর্ণত্ব যখন প্রতি ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে, তখন একটা গোলাপ ফুলেরও রূপ ও সৌরভ শুধু নয়, ইহার প্রতি দলে অনন্তের যে গুণ, যে উজ্জ্বল চেতনা ও উল্লাস, তাহারই উপর ভোগাধিকার জন্মে। শ্রীঅরবিন্দ সোল্লাসে বলিতেন "ইহাই ভাগবত ভোগ। প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে অনন্তের সবখানি শক্তি, চৈতন্য ও আনন্দ প্রবাহিত আছে—এই দৃষ্টি লইয়াই যে কর্ম্ম, তাহাই আসল নিছক ভাগবত কর্ম্ম।"

শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রের পত্রের ছত্রে-ছত্রে শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ-বাণী চন্দননগরে আসিয়া পৌঁছিত; আর আমি উহা লইয়া সকলকে পরিবেশন করিয়া দিতাম। মুগ্ধচিত্ত হইয়া কত সময় যে এইভাবে অতিবাহিত হইত, তাহার নিরাকরণ থাকিত না; কিন্তু আমাদের এই রসবোধের বড় বাধা ছিল দৈনন্দিন কঠোর কর্ম্ম। আর এই কর্ম্মের দায়িত্ব পরিশেষে যাঁহার উপর গিয়া ন্যস্ত হইত, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের এই অধ্যাত্মভাব-লোকের ছন্দো-ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইতেন। একটা দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—স্বতঃপ্রবাহিত কর্ম্মস্রোতে আমায় ভাসিতে হইয়াছিল। কর্ম্মের পশ্চাৎ কোন চিন্তিত ছক অন্তরজগতে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। প্রেরণার অজস্র বর্ষণের মধ্যে যে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হইত, সেই স্রোতে গা ভাসান দিয়া চলা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। বিচিত্র এই—আমার জীবন-প্রবাহে নিজের দাবীর অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক জীবনের স্রোতোবেগে আমি ফুলিয়া-ফুলিয়া মহাপ্লাবন সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইতাম। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাবী ছিল শ্রীঅরবিন্দের। সে বিশাল দাবী পূরণ করার যোগ্যতা আমার ছিল না; তাঁর যে কত বৃহত্তর দাবী, সে বিচার-শক্তি আমলেই আনিতাম না। তিনি ওজন করিয়া যে দাবীটুকু আমার ঘাড়ে চাপাইতেন, তাহার বহনসামর্থ্য আমার আছে, ইহা বুঝিলেই আত্মশক্তি উছলিয়া উঠিত। আমার সাধ্যের পরিমাণ ছিল না, সাধ্যাতীত কর্ম্মে অগ্রসর হওয়াই ছিল আমার স্বভাব। ইহাই আমার সত্য, আমার স্ব-ধর্ম্ম। শ্রীঅরবিন্দের উচ্চ গ্রামের সাধনতত্ত্ব মর্ম্ম দিয়া অনুভব করিতাম, অমৃতেরও আস্বাদ পাইতাম; কিন্তু আমায় কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে হইত প্রতি স্নায়ু-পেশী, প্রতি ধমনীর রক্তবিন্দুর সাহায্যে—কি অধ্যাত্মসাধনায়, কি বস্তুতন্ত্র জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কোথাও এই নীতির ব্যত্যয় হয় নাই।

বিদ্যাপীঠ খুলিলাম। বিদ্যাপীঠের ভবনে যে সকল ছাত্র আসিল, প্রথম-প্রথম তাহাদের অনেকেই নিজ-নিজ বাড়ী হইতে খরচ পাইত। বিদ্যাপীঠে যেরূপ শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা করা হইয়াছিল, অর্থহীন হওয়ায় তাহার দিক্ দিয়াও যাওয়া হইল না। বড় আশা লইয়া যে কয়জন অধ্যাপক যুটিয়াছিলেন, তাঁহারা পাগলের খেয়াল দেখিয়া একে-একে বিদায় লইলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রহিলাম আমি, আর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায়ী জন ৫০ ছাত্র। প্রাতঃকাল হইতে শয়নকাল পর্য্যন্ত ইহাদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকিয়া মর্ম্ম চিরিয়া কথা আর অবকাশে ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটা—বিদ্যাঙ্গনের এই ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এই অবস্থা দেখিয়া ছাত্রদের অভিভাবকেরা টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেন; তাহাতে কিন্তু নব বিদ্যাপীঠ বন্ধ হইল না। এই সকল বিদ্যার্থীর শিক্ষার মধ্যে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য করিবার আছে—একটী আমার মুখের বাণী, যাহা তাহাদের অন্তরকে আশায় ও সৃষ্টিপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ রাখিত; আর একটী প্রতিদিনের

জীবন-যাপনে অসাধারণ শ্রম-তপস্যা, যাহা তাহাদের ভবিষ্যতে স্বাবলম্বনের সাধনায় সিদ্ধি দিয়াছিল।

আমরা বেদ, উপনিষদাদি ও রামপ্রসাদ, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের পরিবেশিত তত্ত্বালোচনায় ভাবজগতে প্রচুর রস সঞ্চয় করিতাম। কিন্তু যে ভূমি পদাগ্রে অধিকৃত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পুনরাবর্ত্তন করিতে না হয়, তাহার জন্য ছিল কঠোর বস্তুতন্ত্র জীবন-সংগ্রাম। ইহার জন্য সহায় ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে স্থির-দৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতি, শরীরের স্বাস্থ্য, অন্তরের অধ্যবসায়, সর্ব্বাবস্থা বরণ করার মত তিতিক্ষা। যখন দেখিলাম—ছাত্রাবাস নাই, অধ্যাপনার গৃহ নাই, ছাত্রগণের অভিভাবকদের নিকট হইতে দৈনন্দিন খরচের টাকাও আসে না, তখনও আমরা কেহ নিরাশ হইলাম না। শ্রম ও অধ্যবসায় ছিল আমাদের অন্তরের উৎসাহ। আর নিজের মাথার উপর ঋণভার বাড়াইয়াই সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিলাম। সেদিন শতকরা ১২৲ টাকা সুদে এক টাকা করিয়া হাজার টাকার উপর ঋণ করিয়াছিলাম। উহা যে ঋণ এবং সুদ সহ পরিশোধনীয়, তাহা জানিতাম। তবুও বিদ্যাপীঠকে ব্যর্থ হইতে দিলাম না। যে কয়টী ব্যবসা চলিতেছিল, তাহার উপর অতিরিক্ত দাবী করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলাম না। অতি বড় দুঃসময়ে কি জানি কোন্ শক্তির প্রভাবে ছাত্রেরা অটল চিত্তে এই অভাবনীয় জীবনযাত্রার পথে দিনের পর দিন চলিতে লাগিল।

বাহিরে দুর্দ্দিনের প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে অন্তরে শান্তির নির্ঝর রুদ্ধ হয় নাই; তাহা না হইলে, এই সকল ছাত্রেরা কিসের আনন্দে শয়ন-ভোজনের অসংখ্য প্রকার দুরবস্থার মধ্যেও আমায় পরিত্যাগ করিল না! এমন দিন গিয়াছে, মৃৎপাত্রে ভোজন করিয়া, উহা পুনঃ ধৌত করিয়া, তাহারা দিনের পর দিন ভোজন সমাধা করিয়াছে।

তাহাদের চরম দুঃখের দিক্ তো আমার লক্ষ্যে ছিল না; আমি ছিলাম নিষ্ঠুর সেনানায়কের ন্যায় মৃত্যু-সংগ্রামে সৈনিকদের আগাইয়া দিতেই পটু ও দক্ষ। জাতির ভবিষ্যৎ ইহার মধ্য দিয়াই পাইতে পারে শক্ত দেহ ও মন, এ পরিচয় আজ প্রত্যক্ষ। কিন্তু ইহাদের পশ্চাৎ ছিল স্নেহশীতল নয়নের দৃষ্টি, নতুবা কেন মাঝে-মাঝে দেখিতাম—অনটনক্লিষ্ট ইহাদের রন্ধনগৃহে মাতৃশক্তির

সমুজ্জ্বল আবির্ভাব? কেন দেখিতাম—স্নেহের অবদান লইয়া ইহাদের ভোজনাগারে অন্নপূর্ণার করুণাস্পর্শ? কখনও দেখিতাম—সঙ্ঘজননীর আদেশে আশ্রমকন্যারা ইহাদের রন্ধনশালা পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিতেছে, কখনও-বা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিয়াছে; কখনও-বা দেখিতাম তিনি স্বয়ং তাঁর ছাত্র-সন্তানদের নিমন্ত্রণে তাঁর অধ্যাত্মতনয়াদের সহিত পরিবেশনতৎপর সন্তানদের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিয়া, ভোজনে উপবিষ্টা হইয়াছেন। তাঁর শুভাবির্ভাবে আমার হাতে তপঃক্লিষ্ট দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বিদ্যাপীঠ উচ্ছ্বসিত পুলকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু এমন করিয়া সন্তানদের দুঃখ-নিবারণের ব্যবস্থায় তিনি দীর্ঘদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। যেদিন শুনিলেন—বুভুক্ষু নবযুগপ্রবর্ত্তকেরা রন্ধনশালায় গিয়া প্রস্তুত অন্নপাত্রটী খুঁজিয়া পাইতেছে না, আর শুনিলেন সেই অন্নপাত্রটী লইয়া বনাকীর্ণ স্থানে শৃগালের দল ভোজনানন্দে তুমুল কোলাহল করিতেছে, সেইদিন হইতেই তিনি বিদ্যাপীঠের রন্ধনশালাটী তুলিয়া দিয়া স্বগৃহে নিজ হস্তে সন্তানপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। অব্যক্ত আনন্দে আমার বুক দুলিয়া উঠিল। আমি নিঃশব্দে দেখিলাম—অন্নপূর্ণার বিজয়িনী মূর্ত্তি। এইখানেই জীবনসঙ্গিনীর সহিত আমার অভেদসূত্র আরও দৃঢ়তর হইল।

বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও সেই সঙ্গে মৃণালিনী বস্ত্রবয়নের কর্ম্মে নিয়োজিত একদল তরুণ কর্ম্মী—এই সকলকে লইয়া গৃহদেবী এক বৃহৎ সংসার পাতিয়া বসিলেন। শ্রমের সীমা রহিল না। নিত্য যজ্ঞশালায় অতিথি-সমাগমও অধিক হইতে লাগিল। শান্তিনিকেতনের বিদেশী অতিথিগণ এই সময় হইতেই চন্দননগর ঘুরিয়া যাইতেন। বিশেষ করিয়া পরলোকগত মিষ্টার পিয়ার্সন ও মিষ্টার এল্‌মহার্ষ্ট বহুবার চন্দননগর আশ্রমে আসিয়া আমাদের সহিত বহু বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। এই সকল সম্মানার্হ অতিথিদের জন্য আমার কোন চিন্তা ছিল না। সম্পূর্ণরূপে অন্তঃপুরচারিণী হইয়াও গৃহদেবীই এই সকল বিদেশী অতিথিগণের তত্ত্বাবধান করিতেন। কোথা হইতে কাঁটা, চামচ, ছুরি, ডিস্ সংগ্রহ করিতেন, তাহা তিনিই জানিতেন। তাঁহাদের যথাযোগ্য পানভোজনাদির সহিত বাসস্থানের ব্যবস্থা-ভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হইত। আমি তাঁর অতিথিসৎকারে প্রীত হইয়া অন্তরে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। মিঃ পিয়ার্সন প্রমুখ বিদেশী বন্ধুরাও

আশ্রমের আতিথ্যে বিশেষ পরিতুষ্ট হইতেন। আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পত্নীর হস্ত চুম্বন করিয়া বলিতাম "সত্যই তুমি লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি। আমার এই দরিদ্র সংসারে অতিথি-সৎকারের এমন রাজোচিত আয়োজন তোমারই মহিমা!"

তিনি কুণ্ঠিত হইয়া বলিতেন "সংসার করিতে আনিয়াছিলে, সে সংসার এমন মূর্ত্তি ধরিবে, তাহা জানিতাম না।"

আমার পরিতৃপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বিনিময়ে তাঁর নয়নের কোলে-কোলে কিন্তু অশ্রুবিন্দু জমিয়া উঠিত, সে ব্যথা দূর করার উপায় ছিল না। তিনি মনে করিতেন—আমি জানিয়া-শুনিয়াই তাঁকে ক্রমে-ক্রমে এই বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছি, অথচ তাঁকে ইহার জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলি নাই। সুযোগ পাইলেই এই অভিমান বড় করুণ দুঃখের সহিত তিনি প্রকাশ করিতেন। আমি কথা চাপা দিয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিতাম; কিন্তু তিনি কর্ম্মানুরূপা আপনার পূর্ণতার অভাব যেন মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেন, তাই সময় পাইলেই খোঁটা দিয়া বলিতেন "এই সব কাজের জন্যই যদি আমায় ঘরে আনিয়াছিলে, তাহার জন্য আমায় প্রস্তুত করিয়া তুলিলে না কেন?"

যাহাকে ভালবাসি, যে আমার কর্ম্মের সত্যসঙ্গী, তাহাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, এই চিন্তা কোনদিন করি নাই। যাহার যে কাজ, তাহার উপযোগী চরিত্র লইয়াই তাহার জন্ম হয়। আমার পত্নী যদি উচ্চশিক্ষিতা হইতেন, তাহা হইলেই যে তিনি আজিকার এই সৃষ্টির বনিয়াদ-রচনায় অধিকতর শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারিতেন, এই ধারণা আজও আমার নাই। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব তাঁহাকে সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ করিত। তিনি স্বামীর কাজকে খুব বড় করিয়াই দেখিতেন; তাহার জন্য যেরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা হইতে ইচ্ছা করিয়াই আমি তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছি—এইরূপ একটা ধারণায় তিনি প্রায় ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িতেন। কিন্তু এমন কোন কাজ নাই, যাহা তাঁহার সুনিপুণ হস্তে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। তাঁহার জীবদ্দশায় ভারতীয় ও অভারতীয় বহু বরেণ্য পুরুষ আসিয়া আশ্রমের অতিথিসৎকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রবর্ত্তক শ্রীমন্দিরের, আশ্রমের, নারীমন্দিরের, নিখিল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার যুগে তিনি যে সেবা-নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা

অমর হইয়া থাকিবে—ইহা কি তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় নয়? তবুও তাঁর চক্ষে ব্যথার যে অশ্রুকণা দেখিয়াছি, তাহার অর্থ আমি ধীরে-ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি; সে অর্থ যতই আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে, ততই আমার কর্ত্তব্যের দিক্ হইতে তাহা আমার সমস্ত হৃদয় আকুল করিয়া তুলে। সে অশ্রুর প্রতি বিন্দুটি বাঙ্গালী নারীর মর্ম্মব্যথার আকৃতি ভিন্ন তো আর কিছু নহে! প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের নারীমন্দির-রচনার স্বপ্ন যতটুকু মূর্ত্তি লয়, উহা কি সেই অশ্রুরই দাবীপূর্ত্তি নহে? কিন্তু সে উচ্ছ্বাস-প্রকাশের ক্ষেত্র ইহা নহে, আমি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জীবন-কথাই ব্যক্ত করিতেছি।

জীবনের অতি গভীর স্তরে ফল্গুধারা বহিতেছিল খরপ্রবাহে। উপরে তাহার অভিব্যক্তি ছিল না। বিশেষ ঘটনা-যোগ ভিন্ন এই অন্তঃ-প্রবাহিণী ধারার পরিচয় মিলিত না; অধিকাংশ সময়েই আমি থাকিতাম উপরের কর্ম্মসমস্যার সমাধানক্ষেত্রে। কাজ, কাজ আর কাজ, আর শ্রীঅরবিন্দের সহিত পরিপূর্ণ যুক্তির সমস্যায় আমার একাগ্রচিত্ত এই নিত্য-সঙ্গিনীর খোঁজ বড় রাখিত না। যাহা অপরিত্যজ্য, তাহা ঔদাসীন্যের সুবিস্তৃত মরু লঙ্ঘন করিয়াও জীবন যে যুড়িয়া বসে, সে পরিচয় আমার জীবনে ভাল করিয়াই মিলিয়াছে। বার-বার যাহাকে ছাড়িতে চাহিয়াছি, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় বহু-বার যাহার নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে, এক-দিন সহসা চাহিয়া দেখিয়াছি—সেই চিরসঙ্গিনী আমার উপেক্ষায় এক পাও পিছাইয়া পড়ে নাই। স্ব-মহিমায় আরও নিকটতর হইয়া আমার সবখানিকে সে অধিকার করিয়া লইয়াছে।

জীবনসঙ্গিনী লিখিতে বসিয়া আমি তাঁর কথা কতটুকু বলিতে পারিতেছি? যে অবস্থার কথা লিখিতেছি, সে অবস্থায় কতটুকু আমার প্রস্ফুটচিত্তে তাঁর স্থান করিয়া লওয়া সম্ভবপর ছিল? ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ, এই দ্বাদশ বর্ষ আমি শ্রীঅরবিন্দময় হইতে চাহিয়াছি। এই সময়েও আমার সত্তার সহিত ছায়ালীনা হইয়াই তিনি বিরাজ করিতেন; তাই এই সময়ের জীবনকথায় তাঁহার প্রচ্ছন্ন জীবনই অনুস্যূত আছে। সে জীবন সত্যই অদৃশ্য ফল্গুপ্রবাহ; তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনার ব্যর্থ চেষ্টা আমার নাই।

শ্রীঅরবিন্দের সহিত যুক্তিপ্রচেষ্টার মর্ম্ম শুধু একক জীবনের হইলে, সাধনা অন্য প্রকারের হইত। আমরা ছিলাম এক বৃন্তে যুগল ফুলের ন্যায় সমপ্রাণ। একটি ছিঁড়িলে আর একটির অস্তিত্বই থাকে না; ইহার নিষ্ঠুর প্রমাণ জীবনের দৃষ্টান্তেই মিলিবে, কথার প্রয়োজন কি?

কর্ম্মময় জীবনকে উদ্যত করার তপস্যায় অরুণের লোভনীয় পত্রগুলির প্রতীক্ষার সঙ্গে উৎকণ্ঠাও বাড়িতেছিল; কেন-না যে সময়ে আমি এখানে এক দল তরুণকে লইয়া সঙ্ঘচক্রের পরিধিবিস্তারে উদ্বুদ্ধ, সেই সময়েই কয়েক-জন সঙ্ঘদ্রোহী মানুষ শ্রীঅরবিন্দের নিকট আমার বিষয় লইয়া অতিশয় অপ্রিয় অসত্য আলোচনা সুরু করিয়াছিল—এই সকল সংবাদ অরুণের পত্র যতই বহন করিয়া আনিতেছিল, আমি ততই আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছিলাম। যাহাদের সহিত একত্র শয়নভোজন, অত্যন্ত আপনার জন জ্ঞানে দিবারাত্রি আলাপনে কাটিয়াছে, তাহাদের এই কপট আচরণ আমার বড় অসহ্য হইতেছিল। যাহারা শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের নিকট প্রতিদিন চন্দননগরের বিষয় লইয়া নানা প্রকার মিথ্যাবাণী প্রচার করিত, তাহাদের পত্রাদির বিবরণ যে আমি সবই জানিতে পারিতেছি, একথা তাহারা জানিত না। আমার সহিত তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় মৌখিক আচরণ বিসদৃশ মনে হইত। উপরে আপনার জন, ভিতরে সতত ইহার অন্যথাচরণ, এরূপ গৃহশত্রু লইয়া কোন বৃহত্তর কর্ম্ম করা কিরূপ দুঃসহ যন্ত্রণাময়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিবেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথম-প্রথম এইরূপ ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ প্রশ্রয় দিতেন না। একজন চন্দননগর হইতে পণ্ডিচারী যাইতে চাহিলে, তিনি তাহাকে মাদ্রাজ হইতেও ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। বারীন্দ্রকুমারকেও তিনি স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছিলেন "......মতিদের কথা। মতিলাল যাহা আমার কাছে পেয়েছে, সে আমার যোগের প্রথম প্রতিষ্ঠা, ভিত্তি—আত্মসমর্পণ, সমতা ইত্যাদি। তাহারই অনুশীলন করে' আসছে। সম্পূর্ণ হয় নি। এই যোগের একটি বিশিষ্টতা এই যে, সিদ্ধি একটু উপরে না উঠলে, ভিত্তিও পাকা হয় না। এখন মতিলাল আরও উঁচুতে উঠতে চায়। তার আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটি খসেছে, কয়েকটি এখনও আছে। আগে ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার—অরবিন্দ-মঠ করতে চেয়েছিল (মতিলালের চিঠি আজ পেয়েছি, সে বলছে সে সঙ্কল্প তার কখনও ছিল না,

ভুল বোঝা হয়েছে)—এখন বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, প্রাণে কিন্তু সেই পুরাতনের ছাপ, এখনও একেবারে মুছে' যায় নি, সেজন্য সে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হতে বলে। কামনাত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছে, কামনা-ত্যাগ ও আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে করতে পারেনি। আর আমার যোগটা সে নিয়েছিল—যেমন বাঙ্গালীর সাধারণ স্বভাব—তেমন জ্ঞানের দিক্ থেকে নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্ম্মের দিকে। জ্ঞান কতকটা ফুটেছে, অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়াশা dissipated হয়নি; তবে যেমন নিবিড় ছিল, তেমন আর নাই। সাত্ত্বিকতার গণ্ডী পুরোমাত্রায় কাটাতে পারে নি; সাত্ত্বিক অহং এখনও আছে। এক কথায় তার development দ্রুত চলছে, পূর্ণ হয় নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নেই; আমি তাকে নিজের স্বভাবানুসারে develop করতে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে চাই না। আসল জিনিষটা সকলের মধ্যে এক হবে, তবে নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর থেকে grow করছে, বাহির থেকে গঠন করতে চাই না। মতিলাল মূলটী ধরেছে ও পেয়েছে, আর সব আসবেই।

"তুমি বল্‌ছ মতিলাল বেশ পুঁটলী বাঁধছে, তার explanation আমি দিচ্ছি। প্রথম কথা, তার চারিদিকে কয়েকজন লোক যুটেছে, যারা তাকে ও আমাকে জানে। সে যা' পেয়েছে আমার কাছে, তারাও পাচ্ছে। তারপর আমি প্রবর্ত্তক-এ 'সমাজ-কথা' বলে' একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তার মধ্যে সঙ্ঘের কথা বলেছিলাম—ভেদ-প্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি সঙ্ঘ চাই। এই idea-কেই মতিলাল নিয়ে দেবসঙ্ঘ নাম বার করেছে। আমি বলেছিলাম ইংরাজীতে "Divine life"-এর কথা। নলিনী তার অনুবাদ করে দেব-জীবন। যারা দেব-জীবন চায়, তারাই দেব-সঙ্ঘ। মতিলাল সেইরূপ সঙ্ঘের বীজস্বরূপ চন্দননগরে স্থাপন করে' দেশময় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহং-এর ছায়া যদি পড়ে ত সঙ্ঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে-সঙ্ঘ শেষে দেখা দেবে এটিই তাই, সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাহিরে, তারা ভিতরকার লোক নয়, হ'লেও তারা ভ্রান্ত—ঠিক আমাদের যে বর্ত্তমান ভাব, তার সঙ্গে মিলে না বলে'।

মতিলালের এই ভুল যদি থাকে—কতকটা থাকবার কথা, তবে আছে কিনা আমি জানি না—বিশেষ ক্ষতি নাই। সে ভুল টিকিবে না। তার দ্বারা আর তার ক্ষুদ্র মণ্ডলীর দ্বারা আমাদের অনেক কাজ হয়েছে আর হচ্ছে, যা আর কেউ এ পর্য্যন্ত করতে পারছে না। মতির মধ্যে ভাগবত শক্তির খেলা চলছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

"মতিলালের চিঠি পেয়েছি, তাতে আর কয়েকটী circumstances বুঝলাম। তার আর······দের মধ্যে যে misunderstanding-এর ছায়া পড়ছে, সে মনোমালিন্যে পরিণত হতে পারে। আমাদের মধ্যে এরূপ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। মতিলালকে এ সম্বন্ধে লিখবো। তুমি······কে বলো যেন সাবধান হয়, যেন এরূপ breach বা rift-এর লেশ মাত্র কারণ না থাকে। কে মতিলালকে বলেছে যে,···লোককে জানাচ্ছে, impression দিচ্ছে যে, প্রবর্ত্তকের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের কোনই সম্পর্ক নাই। এরূপ কথা নিশ্চয়···বলে নি; কারণ প্রবর্ত্তক আমাদেরই কাগজ, আমি স্বহস্তে লিখি বা না লিখি, আমারই ভিতর দিয়ে ভগবান্ মতিলালকে শক্তি দিয়ে লেখাচ্ছেন। Spiritual হিসাবে আমারই লেখা। মতিলাল তার মনের রং দেয় মাত্র। হয়······বলছে—প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধগুলো তার নিজের লেখা নয়। তাও বলার দরকার নাই, তাতেও লোকের মনে wrong impression হতে পারে।"

এই পত্রাংশ প্রসিদ্ধ মুদ্রিত পণ্ডিচারী-পত্রের অমুদ্রিতাংশ। এই লেখাটুকুর কথা বারীন্দ্রকুমার আমায় জানান নাই; শ্রদ্ধেয় উপেনদাদা স্বহস্তে টুকিয়া আমায় পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের এই পত্রাংশে তাঁহার সহিত আমার বিচ্ছেদ-সৃষ্টির গূঢ় ষড়যন্ত্রের আভাস আছে। সেদিন একদিকে শ্রীঅরবিন্দের অপরিসীম স্নেহ, সুদূরপ্রসারিণী দৃষ্টি, অন্যদিকে তাঁর প্রতি আমারও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নতি চক্রান্তকারীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে পারে নাই। নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্য আমায় বরণ করিতে হইয়াছে। যোগ—সঙ্গী; ভগবান্ সম্মুখে।

চন্দননগরে যে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছিল, আমি খুব আশা করিয়াছিলাম যে, বারীন্দ্রকুমার এই সঙ্ঘকে শ্রীঅরবিন্দেরই ন্যায় আপন করিয়া লইবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা সত্য হয় নাই। বারীন্দ্র এবং আমার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দও ঐক্যপ্রতিষ্ঠার যথেষ্ট প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরের যোগ থাকা সত্ত্বেও, পরস্পরের জীবন-নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। নানা দিক্ হইতে এইজন্য আমাকে বেগ পাইতে হইত। আমি চাহিতাম ঐক্য; বিনিময়ে আমার বিরুদ্ধে নানা ভিত্তিহীন অভিযোগ পৌঁছিত। এমন কি বারীন্দ্রকুমার কর্ত্তৃক পরিচালিত "বিজলী" পত্রিকায় চন্দননগরের প্রতি বিদ্রূপাত্মক লেখাও বাহির হইয়াছিল। আমার অভিমান এই সকল কারণে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত, আমি নিজেই ইহাতে আহত হইতাম। এই সময়ে একটা কথায় আমি বড় বিচলিত হইয়াছিলাম—সর্ব্বত্র প্রচার হইত যে, আমি শ্রীঅরবিন্দের নাম ভাঙ্গাইয়া আপনাকে বড় করিয়া তুলিতেছি। কথাটা এত কটু বলিয়া মনে হইত যে, মধ্যে-মধ্যে মনে করিতাম—শ্রীঅরবিন্দ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াই কর্ম্ম করিব। এই ইচ্ছার মূলে ইন্ধন যোগাইবার নানা হেতুও উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ হইতে আমি যাহাতে স্বতন্ত্র হই, জাতির এক শ্রেণীর বুদ্ধি এই ক্ষেত্রে সহায়রূপে দেখা দিত। উপেনদাদা আমার অবস্থা দেখিয়া দরদের সহিত বলিতেন "মতি-দা, অরবিন্দ-অরবিন্দ করিয়া তোমার চারিদিকে যখন এত ফেউ লাগিয়াছে, তখন অরবিন্দকে ছাড়িয়াই তুমি দাঁড়াও; এরূপ হইলে, তোমার কর্ম্ম যে যোগ-প্রকাশ, তাহাই প্রমাণিত হইবে।" এই সকল কথায় আমার অহমিকা পুষ্টি পাইত। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে দূরে রাখিয়া আমার কি কর্ম্ম থাকিতে পারে, সে সময়ে তাহা কল্পনাও করিতে পারিতাম না। বৈষ্ণব কবির গান মনে করিয়া সান্ত্বনা লইতাম—

ওরে কাজ কি তোদের শ্যামের কথা কহিয়ে—
আমি আপনি করেছি প্রেম আপনি বুঝিয়ে।
আমি যদি করি মান
শ্যাম আমার রাখে মান—
হই হব অপমান শ্যামের লাগিয়ে!

এই ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তি লইয়া সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়াই সঙ্ঘ-চক্র বর্দ্ধিত করিতেছিলাম। কিন্তু অভিমান যে কত বড় শত্রু, তাহা প্রত্যেক সাধকেরও যেমন বুঝা উচিত, তেমনি অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিদেরও এইদিকে সতর্ক থাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের কথা বহু দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। মীরা দেবী তাঁহার ভ্রাতাকে এই কথা জানাইয়াছিলেন। তিনি একজন উচ্চ ফরাসী কর্ম্মচারী। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত সঙ্ঘের সাফল্য কামনা করিয়াছিলেন; তবে আমাদের অর্থনীতিক ব্যাপ্তির দিক্‌টা দেখিয়া এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, capitalistic society-র (ধনিক সম্প্রদায়ের) ভিতর এই সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে, এই হেতু ভয়ের কথাও আছে। শ্রীঅরবিন্দ সে কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন "সত্যই এখানে ভয়ের কথা আছে, তবে উপায় নাই। আমাদের এখন বাহিরের capitalistic market ব্যবহার করিতে হইবে।" আমরা বলিতাম—সঙ্ঘের মধ্যে ধনিকের প্রভাব নাই। এই কথা শুনিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন—"capitalistic spirit অর্থাৎ ধনতন্ত্রবাদীর ভাব নাই; তবে যখন টাকার কারবার করিতে হইতেছে, আর টাকা বাহির হইতে লওয়া হইতেছে, তখন ভয় আছে বৈকি!" আমরা এই সময়ে ঋণ করিয়া কর্ম্মের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ তখন আমাদের আর্থিক ভিত্তি গড়ার জন্য এই সব করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন। রুশিয়ার বলশেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ড তাঁর মতে, হাজার গুছাইয়া-গাছাইয়া চলিলেও, সেই একই কুণ্ডে পড়িতে চলিয়াছে; তবে পৃথিবীর অর্থনীতি এখন কোথাও চরম পরিণতি পায় নাই। সঙ্ঘের অর্থনীতিক আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন "সঙ্ঘ হইবে

self-contained unit—স্বয়ং-পূর্ণ সমষ্টিচক্র। সঙ্ঘের সমস্ত প্রয়োজন নিজ শিল্পকর্ম্মে পূরণ করিয়া লইতে হইবে। উৎপন্ন পণ্যের বাজারও সঙ্ঘ নিজেই হইবে। এইরূপ এক সঙ্ঘের সহিত অপর সঙ্ঘ পরস্পর প্রয়োজনপূরণ ও আদান-প্রদান করিবে। তবে এখন সম্পূর্ণরূপে এই হওয়ার বিঘ্ন (difficulty) আছে। সঙ্ঘ তাহার সকল অভাব উপস্থিত নিজে-নিজে পূরণ করিতে পারিবে না।”

তাঁর এই অর্থনীতিক স্বপ্ন কর্ম্মক্ষেত্রে দূরগত আদর্শরূপে লক্ষ্য রাখিয়া, বাণিজ্য অর্থাৎ বাহিরের সহিত কেনা-বেচার পথেই এখন আমরা চলিব—এই কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন “উহা ন্যাশন্যাল স্কেলের কথা। যেমন ভারতবর্ষ। এ দেশের এমন ঐশ্বর্য্যশক্তি আছে, যাহাতে জাতি নিজের মধ্যেই আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারে এবং তাহার পর ভারতবাসী বাহিরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া জাতীয় অর্থাগমের পথ আরও প্রশস্ত করিতে পারে।” আসলে, স্বাবলম্বনের সাধনায় সঙ্ঘের অর্থনীতিক ভিত্তি দৃঢ় করার প্রয়োজনের দিকেই আমার লক্ষ্য ছিল। আর আত্মসমর্পণের ছন্দেই এই নীতির আবির্ভাব হইয়াছিল—এই বিষয়ে আমার মধ্যে কোন দ্বন্দ্বই ছিল না। আমি জানিতাম এবং এখনও আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, কোন আদর্শবাদ সম্মুখে রাখিয়া চলা আমার ধর্ম্ম নহে। ঈশ্বর যাহা করেন, তাহাই আমার ধর্ম্ম। ভাল-মন্দ বিচার ঈশ্বরপ্রেরণার পথ বন্ধ করে। সঙ্ঘের অর্থনীতিক সাধনার প্রথম পর্ব্বে সুযুক্তি-কুযুক্তির অন্ত ছিল না; আজও ইহার উপসংহার হয় নাই। সেদিন শুনিতাম—সঙ্ঘ পুঁজি সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যসৃষ্টি করিলে, শ্রমিকের উপর ব্যষ্টি-ধনিকের ন্যায় সমষ্টি-ধনিকেরই উদ্ভব হইবে। আজও শুনি, সঙ্ঘ ধনিকের স্থান অধিকার করিয়া ধন-সমস্যা জটিলতর করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘের অর্থনীতিক নবপ্রয়াস সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কোন ধারণা করার সুযোগ পান নাই এবং তিনি নানা বিরুদ্ধবাদই শুনিতে পাইতেন—তবুও তিনি এই সম্বন্ধে আমায় অতিশয় উৎসাহ দিতেন। তিনি অর্থ-সম্বন্ধীয় আদর্শবাদের কথা যখন উল্লেখ করিতেন, তখন বরং আমি একটু বিচলিত হইতাম; কিন্তু আমি জানিতাম বস্তুতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইলে যাহা করিতে হয়, ভগবান্ আমায় লইয়া তাহাই করিতেছেন। বিশ্ব-চৈতন্যের উপর দাঁড়াইয়া ধনিক ও শ্রমিক, মহাজন ও

অধমর্ণ, জমিদার ও প্রজা, এই সকলের মধ্যে যে বিরোধ ও সমস্যা, কেমন করিয়া তাহার মীমাংসা হইবে, কর্ম্মেই তাহার সন্ধান মিলিবে। ভাগবত কর্ম্মের পরিণাম কখন অশুভ হইবে না। আত্মসমর্পণযোগে আমি পাইয়াছিলাম আত্মচৈতন্যের অমৃত; আর উহাই ছিল কর্ম্মের আশ্রয়। সমস্যার সমাধান আমার কর্ম্ম নয়, জীবনের অভিব্যক্তিই কর্ম্ম। নিরলস বস্তুতন্ত্র শ্রম ও কর্ম্মই অর্থে পরিণত হয়। এই কর্ম্মবিজ্ঞান অজ্ঞাত রাখিয়া ধন-সাম্যের আদর্শ কালে ব্যর্থ হইবে। শুধু কর্ম্ম জীবনকে জড় করে—জীবন ভারগ্রস্ত হয়। আবার শুধু আত্মজ্ঞানের জীবন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থার মধ্য দিয়া লয়ের পথেই মানুষকে লইয়া চলে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য-রক্ষা হইতে পারে অকপট আত্মসমর্পণে। কর্ম্মাকর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া নির্ণীত হয় না। আত্ম-সমর্পণে ঈশ্বরেচ্ছাই প্রকাশ পায় জীবনে। এই সাধন আমার জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে নাই। শ্রীঅরবিন্দ অমৃত পরিবেশন করিতেন অকৃপণ হইয়া। সে স্মৃতি আমি মুছিতে পারি না। তিনি বলিয়াছিলেন—"সমষ্টি-আত্মার (Group-soul) পরিবর্ত্তে সমষ্টিচৈতন্য (Group-consciousness) শব্দ এ যুগে সহজবোধ্য হইবে। এই সমষ্টি-চৈতন্য বহু বিশেষ ব্যক্তির চেতনার সমাহার মাত্র নয়। আমাদের মন উল্টা দিক্—বহুর দিক্, বাহিরের দিক্ হইতেই দেখিতে অভ্যস্ত। কিন্তু সত্য হইতেছে এক সমষ্টি-চিদ্-ভাব,যার স্বরূপ হইতেছে অধ্যাত্মচৈতন্য। যেমন একটা মানুষের পিছনে আছে মানব-চৈতন্য, একটা চিন্ময় জীব, তেমনি দেশের পিছনে আছে এইরূপ জাগ্রৎ চৈতন্যশক্তি। এই শক্তিই দেশ-মাতৃকা—জাতির মাতৃশক্তি। বঙ্কিম এই মাকে দেখিয়াছিলেন —তিনি তাঁহার যে ধ্যানরূপ ভাষায় আঁকিয়াছিলেন, তাহা কিছুমাত্র কল্পনা নহে…।" এই সকল কথা অন্তরের সহিত মিলাইয়া পাইতাম; আনন্দে হৃদয় মাতিয়া উঠিত। আমার কর্ম্মে ক্লান্তি ছিল না; অন্তরেও দ্বন্দ্ব ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে রাষ্ট্রচিন্তাও করিতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাবিয়াছিলেন—৩০ বৎসর পরে জাতি মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হয় নাই। দেশে যে তিনটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রকট ছিল, সেইগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "একটি হইতেছে—পাশ্চাত্ত্য কন্‌ষ্টিটিউশন (constitution)। এই আদর্শটির এক ছটাক

শিকড়ও এ দেশের জীবনে বসে নাই। দ্বিতীয়টি—হুবহু অতীতে ফিরিয়া যাওয়া। প্রথমটি ইউরোপের বুদ্ধি দিয়া ইউরোপকে জয় করার অপপ্রচেষ্টা। ঐরূপ বুদ্ধি আমাদের ধাতে নাই। পাশ্চাত্ত্য-জাতিগুলির মধ্যে শুধু বুদ্ধিই নহে, আছে প্রত্যেক জাতির ভিতরে একটা প্রবল vital intuition (প্রাণ-প্রেরণা)। যেমন ইংরাজের strong national intuition, ফরাসীর rational idealism—কিন্তু আমাদের তা' কৈ? আমাদের ভরসা অধ্যাত্মজাগরণ। ইহাই মুরারির তৃতীয় পন্থা।" তিনি এই পথেই মুক্তিপ্রেরণা সফল করার আশা রাখিতেন। ইহার জন্য গোটা মানুষটা, সমাজটা না জাগিলে কিছুই হইবে না। চিরদিন এই পথেই এ জাতি বাঁচিয়াছে, আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আজ সকলে বিপথগামী। প্রকৃতির পথেই সকলের যাত্রা। সব গোলমেলে গতি। কেহ জানে না—ঠিক কোথায় সে চলিয়াছে। রাষ্ট্র-স্বাধীনতা সকলেই চায়। কিন্তু সকলেই চায় অতি ক্ষিপ্র সাফল্য। ঋষির ধীর-মন্থর-নিশ্চিত পদক্ষেপ কেহই চায় না। তাঁর উপদেশ ছিল: "withdraw within and find the national soul" অর্থাৎ "অন্তর্মুখী হও, জাতীয় সত্তার সন্ধান লও।" শ্রীঅরবিন্দের এই কল্পদৃষ্ট কর্ম্ম সিদ্ধ করার প্রেরণাই আমার অন্তরে তীব্র সংবেগ সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ইহাতে উৎসাহের ইন্ধন দিতেন। বারীন-দাও প্রথম-প্রথম আমায় খুব উৎসাহ দিতেন। শ্রীঅরবিন্দের কর্ম্ম ক্ষিপ্রতার সহিত সিদ্ধ করার জন্যই মনে হইত—বারীন-দার সহিত পূর্ণ ঐক্যের প্রয়োজন। কিন্তু ইহার বিনিময়ে বারীন-দার নিকট হইতে দার্শনিক উপদেশ পাইতাম। তিনি বলিতেন "বিজ্ঞানে না উঠিলে, মিলন হইবে না। তুমি ও আমি, দুটাই শক্তির আধার। বিজ্ঞানের নীচের স্তরে মিলিলে দু'জনেরই শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে।"

এই সকল কথা লইয়া বারীন-দার সহিত আমার দীর্ঘ পত্রাদির আদান-প্রদান হইত। বারীন-দা এক পত্রে আমায় লিখেন: "ভায়া, শিবদৃষ্টি লাভ না করিলে, সত্য মিলন সম্ভবপর নয়।" অবশ্য ইহা শ্রীঅরবিন্দেরই কথার মর্ম্ম বলিয়া তিনি আমায় বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন "তোমার মধ্যে নৃত্যপরা কালীর নৃত্য চলিয়াছে। তোমার মধ্যে বাংলা চৈতন্যের পূর্ণযোগ পাচ্ছে; তুমিই বাংলার বার আনা।" আমার খুব অভিমান হইত। কথার চেয়ে ভাব, সাধনার

চেয়ে কর্ম্মের আশ্রয়ে মানুষের সহিত মানুষের মিলন অতি আসন্ন হয়, ইহার পরিচয় আমার প্রত্যক্ষ ছিল ; কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে সুযোগ পাই নাই। বারীন-দার প্রেমালিঙ্গনে আমার অভিমান ভাসিয়া যাইত ; কিন্তু অনুভূতির ক্ষেত্রে তাঁহাকে আমি খুঁজিয়া পাইতাম না। আমি সেদিন বারীন-দার সহিত মিলিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে কর্ম্ম করার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনীমুখে ব্যক্ত করিতে পারিব না। বারীন-দার সরল ভাষা বড় মিষ্ট লাগিত। তিনি বলিতেন "আমি এক সঙ্গে গুড়গুড়ে ক্ষুদেরাম। আবার যেন ফর্দ্দাফাঁই একটা কি! তোমার আশীর্ব্বাদ থাকে তো তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য হব। তুমি, মীরা আর ঐ মাথা-খেকো খোক্সটা আমার ভরসা" খোক্স বলিতে সাধকের সর্ব্বপাপ ও অবিদ্যাগ্রাসী শ্রীঅরবিন্দ। চন্দননগরের কর্ম্মীদের তিনি "বেঙ্কুড়" বলিতেন, আমার নাম দিয়াছিলেন "টু-ডে" (To-day)। আর ইহারা ছিল তাঁর চক্ষে "টু-মরো" (To-morrow)।

অতীতের এই মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের দৃষ্টি-চিত্র বিস্তৃত করিয়া ধরার প্রয়োজন নাই। মানুষের অন্তঃকরণের দাবী ঘটনার দায়ে বিচিত্র আকার ধরে। অন্তর্য্যামী অনুসরণ করেন অদৃষ্টের। এই জন্যই গীতার উপদেশ—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া। আত্মকর্ম্মই মানুষকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে স্ব-স্ব ধর্ম্মে, তাহাই পরবর্ত্তী ঘটনায় পরিস্ফুট হইবে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে আত্মদর্শনের ভাস্বর ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়াছিলেন আমার চিন্ময় সত্তাকে। তাঁর সানুরাগা দৃষ্টি ও অপার্থিব হৃদয়ের অমৃতাস্বাদ আমায় খুবই উদ্বুদ্ধ করিত। সে কত কথা ; কিন্তু তাহা আর বিবৃত করিব না। এইবার অতি সংক্ষেপে ও অতি শীঘ্র যোগজীবনের মহিমাদীপ্ত এই শ্রীঅরবিন্দ-পর্ব্ব সমাপ্ত করিব।

চৈত্র মাস শেষ হইয়া আসিল। পূর্ণাঙ্গ বসন্তের আবির্ভাবে প্রবর্ত্তক আশ্রম ফলে-পুষ্পে সুশোভিত হইল। মধুমাসের জ্যোৎস্না-প্লাবিত গঙ্গা-তটে বারীন-দার অভিহিত "বেঙ্কুড়"দের লইয়া মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা-ধূলায়, আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত হইত। যখন বাড়ী ফিরিতাম, গভীর

প্রসুপ্তির চকিত-ছায়ামূর্ত্তি আমায় ঘিরিয়া ধরিত। বাতায়ন-পথ দিয়া দেখিতাম —শয্যাধারে গভীর নিদ্রারতা পত্নীকে। তাঁহাকে জাগাইবার প্রবৃত্তি হইত না। প্রাঙ্গণে আসিয়া পাদচারণা করিতাম। একদিন গভীর নিশীথে আমি এইরূপ একা প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতেছিলাম। থাকিয়া-থাকিয়া কোকিল-পাপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল। আমার সঙ্গে বিচরণ করিতেছিল জ্যোৎস্নাবক্ষে আমারই প্রতিচ্ছায়া। মস্তিষ্কে বিধাতা লিখিয়া চলিয়াছেন পরদিনের কর্ম্মলিপি। এমন সকলের পক্ষে ঘটে কি না, জানি-না; আমি আজিও অনাগত দিনের কর্ম্ম-সূচি এইরূপেই পাইয়া থাকি। মনে পড়িল এমনই গভীর রাত্রে, গত বৎসর এমনই এক সময়ে শ্রীঅরবিন্দের সহিত একত্র আমরা পণ্ডিচারীর পথে বাহির হইয়াছি; সুদীর্ঘ জেটির প্রান্তভাগে তরঙ্গসঙ্কুল অসীম সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আমরা কয়জন শ্রীঅরবিন্দের চাওয়াকে মূর্ত্তি দিতে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সে ভাব ভঙ্গ করিয়া কত হাস্য-কৌতুকরত হইয়াছিলেন! সে রাত্রিতে তাঁর অনুরোধে আমাদের প্রত্যেককেই গান গাহিতে হইয়াছিল। জীবনের কেন্দ্রতীর্থস্বরূপ এই শ্রীমূর্ত্তিকে ঘিরিয়া আমরা কয়জন তরুণ সে রাত্রিতে শ্রীঅরবিন্দ-প্রেমে অভিভূত হইয়া অপার্থিব সম্বন্ধের মধুময় আস্বাদ লাভ করিয়াছিলাম।

মনে পড়িল অরুণের কথা। শ্রীঅরবিন্দের প্রেমস্পর্শে আমারই ন্যায় অভিভূত হইয়া কত কথাই সে লিখিতেছে। অরুণের পত্রের প্রতি ছত্রটি আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সে লিখিয়াছে "মহাসাগরকূলে আসিয়া বালুখণ্ডে কতই খুঁড়িব; আমায় একেবারে ডুবাইয়া দিন, অতলে ডুবিয়া যাই—ফিরিব সেই অতলের অখণ্ড রসাস্বাদ লইয়া। অন্য কথা কিছু নাই। অরবিন্দের কথাই বলি—সে কি মানুষ গো! আছেন একেবারে অখণ্ডে—indivisible oneness, চেতনার, প্রাণের, ইন্দ্রিয়ের পর্য্যন্ত সেই অখণ্ডে রূপান্তর হইয়া গিয়াছে। শেষ কালে বাহ্য তনুটিকে পর্য্যন্ত ভাগবতী-তনু করিয়া গড়িয়া তুলিতেই তিনি বুঝি ব্যস্ত! কি সুন্দর! এই মানুষকেই তো জগৎ খুঁজিতেছে! কিন্তু জগৎ আজও কি তাঁহাকে বুঝিবে? আমরাই তাঁহাকে ধরিয়াছি, চিনিয়াছি কতটুকু, কতটুকু? কূল-কিনারা যে পাই না!" আবার এক পত্রের কথা চিত্তে রেখাঙ্কিত করিল। এ পত্র শ্রীমান্ নলিনচন্দ্রকে[১]

১। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতি অধুনা পরলোকগত নলিনচন্দ্র দত্ত।

সম্বোধন করিয়া লেখা। অরুণ লিখিয়াছে "না লিখিয়া থাকিতে পারি না, তাই লিখি। শোনা জিনিষগুলা। শোনাবারও ইচ্ছা। নিজেরও স্পষ্টতর হয়, তাই লেখা। এই এখন প্রকাণ্ড ঘরে দোতলায় বিদ্যুতের তলায় আমি একেলা। পাশের ঘরে মীরা ও অরবিন্দ। কত কথাই না কহিতেছেন! আমি ভাবিতেছি কি, ভাবনা নয়, মনে-মনে জপিতেছি "Be passive and receive him"—এ যে আজ আমার প্রত্যক্ষ জপমন্ত্র। তোমরাও কেন বলিবে না—তোমরাও স্নেহাশীর্ব্বাদ দাও যেন নিথর হইয়া পরম জিনিষ লাভ করিতে পারি। তোমরা তো মায়ের সন্তান, তাঁর আশিষপুঞ্জ তোমাদেরও স্নেহ-মধুর বুকে যে লুকান আছে......সত্যই স্বর্গের আনন্দ ভোগ করি। আমার স্বর্গ কোথায়, তোমাদের বেশী করে' বোঝাতে যাওয়াই বাহুল্য। সে স্বর্গে আমরা সকলেই আছি, যারা তাঁর চরণে স্থান পেয়েছে।......"

অরুণের পত্র-মর্ম্ম আমার হৃদয় আকুল করিল। শ্রীঅরবিন্দ কয়েকদিন আগেই লিখিয়াছেন "অরুণ একটি পাতলা কাঁচের আলমারীতে বাস করিতেছে, টোকা মারিলেই বাহির হইয়া পড়িবে।" গর্ব্বে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল।

চাঁদটী আমাদের দ্বিতল অট্টালিকার আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছে। প্রাঙ্গণে আর জ্যোৎস্না নাই। অন্ধকারে, ঊর্দ্ধে কয়েকটা নিস্তব্ধ তারকার দিকে চাহিয়া মনে করিলাম—অরুণ পণ্ডিচারীতেই থাকুক। স্থির করিলাম—কালই তাহাকে এই আদেশ তারযোগে জানাইয়া দিব। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া এই সঙ্কল্প স্থির হইলে, বাতায়নপথে শব্দ শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—গৃহদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তিনি অনুচ্চ স্বরে বলিলেন "ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখ দেখি!" অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম—ঘড়ির বড় কাঁটাটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; রাত্রি ৩॥০টা। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘরে ডাকিলেন। আমি গিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

রাত্রিশেষে নিস্তব্ধভাব বড়ই মধুর ও প্রীতিকর। সারা রাত্রি দক্ষিণা বাতাস বহিয়াছে, শ্রান্তি দূর করার জন্য সে বাতাসও স্তব্ধ। গৃহদেবী মাথায় পাখা করিতে-করিতে বলিলেন "নিশাচরের ন্যায় প্রতি রাত্রি যদি এমন করিয়া কাটাও, শরীর আর কতদিন টিকিবে!" আমিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই কথার উত্তর দিবার কিছুই ছিল না। বাল্যে দেহের

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন জননী। কৈশোরে এক মহীয়সী ধাত্রীর করুণায় দেহের পুষ্টি হইয়াছে। যৌবনে দেহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছেন স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী। এই কথা শুনিলে তিনি স্ফুরিতোষ্ঠা হইয়া তীব্র কণ্ঠে বলিতেন "বড়-বড় কথা বৈঠকখানায় ছেলেদের কাছে ব'ল ; আমি কি কর্‌ব ? ছেলেমানুষ নও, ধরে'-বেঁধে রাখব ! সারা রাত্রি পথে-পথে ঘুরে' বেড়াবে ; একটা রোগ না হ'লে নিস্তার নাই !" কথার সঙ্গে ঘন-ঘন পাখার বাতাসে বুঝিতাম—তিনি অসন্তুষ্টা হইয়াছেন। সারা রাত্রির অবসাদে চক্ষের পাতা মুদিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বর্গের ঘুম নামিয়া আসিল। পরদিন প্রাতঃকালে অরুণকে ফিরিতে নিষেধ করিয়া তার করিলাম। অরুণের অভ্যুত্থান ও তার আত্মার পুনর্জ্জন্মই আমার লক্ষ্য ছিল। শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়ে অরুণ পূর্ণকাম হউক—এই কল্যাণ-প্রার্থনাই ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিলাম।

অরুণের পত্র আমায় নিরাশ করিল। সে লিখিল "টেলিগ্রাম পাইলাম—অরবিন্দকেও দেখাইলাম। আপনারা দু'জনেই পাগল। অরবিন্দ কি বুঝিলেন কে জানে……! অপার্থিব মাতৃহৃদয় একটা আত্মার পূর্ণ জাগৃতির জন্য নিবিড় স্নেহক্ষরণে নির্ণিমেষ জাগ্রৎ রহিয়াছে দেখিতেছি। কিন্তু কি fulfilment হইবে আমি জানি না ; আপনার ইচ্ছা হইলে জানিব। আমার ছোট বুকখানি সারাদিন ভরপূর হইয়া ছিল ; কূল মিলিল না। যুগ-যুগ ধরিয়া এ মাতৃ-হৃদয়ের কূল ও তল মিলিবে না, ইহা আমি ভাল করিয়াই জানিয়াছি। ইহার পরও যদি সাধনা করিতে হয়, নিজেকে বাতুল মনে করিতে হইবে। অসীম তৃপ্তি লইয়া নির্ণিমেষ চাহিয়া থাকা—কেবল কালী ও কৃষ্ণের আশিষ-লহরী জমিয়া-জমিয়া মাথার উপরে কি দেবতনু সৃষ্টি করিতেছে। সেই অমর সৃষ্টিরই একটা প্রতীক্ষা আছে ; পলে-পলে জমিতেছে, গড়িতেছে যাহা, তাহাই কল্যাণ-তনু। তাহা অন্তর-দানেরই একটা ডেলা, একটা সমষ্টি……।" অনেক কথার পর অরুণ লিখিয়াছে "মরিতেই সাধ যায়, সে মরণ নূতন রক্ত-মাংস লইয়া মানবের নব জন্ম। আমি ফিরিব ; এই সাধই আমায় উদ্বুদ্ধ করে……আমায় ডাকিবেন কি ?"

সবই ওলটপালট হইয়া গেল। সহধর্ম্মিণীর দিকে চাহিলাম, তাঁহার সবখানি নূতন মূর্ত্তি ধরিয়াছে আত্মনিবেদনের তপস্যায়। সেখানেও দেখিলাম এমন ফাঁক নাই যে, আর কিছু আশ্রয় পায়। অভাবপূর্ত্তির এক বিন্দু

আকাঙ্ক্ষা নাই। এই পূর্ণাঙ্গী নারীমূর্ত্তির মধ্যে পরিপূর্ণা চিচ্ছক্তি যেন আমার মধ্য দিয়া যে ইচ্ছার প্রকাশ হয়, তাহা পূরণ করার জন্যই উন্মুখী। নয়নে দীপ্তি, ওষ্ঠে হাসি, সর্ব্বাঙ্গে ঐক্য ও প্রেমের অমৃত হিল্লোলিত। অরুণের পত্র তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি হাসিলেন। অরুণের পুনরাগমনে মাতৃ-হৃদয়ের ইহা কি স্বভাব-তৃপ্তি? না, তাহা নহে; এ দৃষ্টি সাফল্যের অপ্রাকৃত আত্মপ্রকাশ। সম্বন্ধের অমৃতরসায়ন অরুণকেও বুঝি পান করাইয়াছে পাত্র ভরিয়া এই মহানারী? তাঁহার চক্ষের আলোকেই আরও কয়জনের সাক্ষাৎকার পাইলাম। প্রেম ও ঐক্যের বন্ধনে ইহারা আমায় কেন্দ্র করিয়া নূতন সৃষ্টিরচনায় যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। হায় আমি! শ্রীঅরবিন্দ আমায় ফুরাইয়া দিতে পারিলে, এ দায় হইতে যে মুক্ত হই!

শ্রীঅরবিন্দ অজাগ্রৎ ছিলেন না। তখন তাঁহার অখণ্ড মহাহৃদয়ের অমৃতাস্বাদ আমায় অভিষিক্ত করিত। তিনি একাধারে ছিলেন কালী-কৃষ্ণেরই পূর্ণাঙ্গ বিগ্রহ। শ্রীঅরবিন্দেরও পত্র পাইলাম; তিনি লিখিলেন "অরুণ পৌঁছিলে দীর্ঘ দিনের জন্য সস্ত্রীক চলিয়া আসিবে।" আমি আকুল চিত্তে অরুণের আগমনপ্রতীক্ষায় রহিলাম।

অরুণ আসিয়া পৌঁছিল। পণ্ডিচারী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সস্ত্রীক যাইব। পূর্ব্বেও গিয়াছি, আত্মগোপন করিয়াও গিয়াছি; কিন্তু এইবার পণ্ডিচারী যাওয়া বেশ আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও, বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম না।

বালিকা-বধূকে ঘরে আনিয়াছিলাম, তাহার পর এই দীর্ঘদিন তিনিও আমার সঙ্গে বন্দিনী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহাকে লইয়া পণ্ডিচারী যাত্রা করিব। সে কত পথ, কত দূর দেশ! তিনি আনন্দে বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু আমার অন্তরের আনন্দপ্রদীপ যেন নিভিয়া আসিতেছিল।

অরুণের সহিত অনেক কথা হইল। কথায়-কথায় বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় করিয়া আমি যে আত্মসমর্পণের সাধনা করিয়াছি, কল্পনার জগতে তাহার সিদ্ধির পরিমাণের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে খুব অল্পই মিল

হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের বাণীমূর্ত্তির ধ্যান করিয়া তদনুযায়ী যে চরিত্র গড়িয়াছি, সে চরিত্র শ্রীঅরবিন্দের নিকট আমার ধারণানুযায়ী সুস্পষ্ট নহে। অরুণের সহিত কথা কহিয়া যে অঞ্জন চক্ষে লেপিয়া শ্রীঅরবিন্দকে দেখিতাম, চক্ষের জলেই তাহা যেন ধুইয়া যাইতে লাগিল। মনের ভাব গোপন করিয়া অরুণকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে স্পষ্টই বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দ আমার প্রতি অকারণে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। এই সংশয়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, আমার জীবনই ব্যর্থ হইবে। দীর্ঘদিনের উৎসর্গ-ব্রত যদি নিরর্থক হয়, সে অবস্থায় যোগ ও জীবন দুইয়েরই অন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার এইরূপ মনোভাবের কারণ যথেষ্ট ছিল। শ্রীঅরবিন্দকে আমি এমন আপন করিয়া লইয়াছিলাম যে, সেখানে আমার বিরুদ্ধবাদ কোনমতেই ঠাঁই পাইবে না, এরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের আশ্রয় মাত্র পাওয়ার প্রলোভনে আমার পরিচিত বন্ধুগণ অজস্র বিরুদ্ধ-প্রচারে তাঁর চিত্ত এমনই ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে, সেখানে আমাকে আর যেন স্পষ্ট করিয়া ধরা যায় না। শ্রীঅরবিন্দ এই সকল মিথ্যা প্রচার সর্ব্বাংশে প্রশ্রয় না দিলেও, কিয়দংশ যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এইখানেই পরস্পরের মধ্যে যে হৃদয়ভেদের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, তাহাতেই আমি অস্থির হইয়াছিলাম। কিন্তু তবুও আশা হইল—তিনি আমায় সস্ত্রীক দীর্ঘদিনের জন্য আহ্বান দিয়াছেন। অস্পষ্টতা যতই ঘনীভূত হউক, তাহা দূর করার যথেষ্ট অবসর পাইব। আমি অরুণ প্রভৃতির উপর সঙ্ঘের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া চন্দননগর পরিত্যাগ করিলাম। সঙ্গে লইলাম স্ত্রী ছাড়া আরও কয়েকজনকে, যাহাদের সহিত আমার শুধুই পথের সম্বন্ধ, আত্মার ঐক্য নাই। কিন্তু হৃদয়ের অন্ধ আবেগে সেদিন ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ আমার চক্ষে ধরা পড়ে নাই। অতিশয় ক্ষুণ্ণ চিত্তেই পণ্ডিচারীর পথে চলিতেছিলাম। কেবলই মনে হইতেছিল—জীবনের একটি অঙ্কপাত যেন আসন্ন।

বাংলার শ্যামল দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। প্রাতঃকালে চক্ষে পড়িল পম্পা-সরোবরের মনোহর দৃশ্য, নব সূর্য্যকরে নীল জল নৃত্য করিতেছে। সুশ্যাম দ্বীপপুঞ্জ বুকে ধরিয়া পম্পা দ্রুতগামী রেলযাত্রীকে বিদায় দিল চক্ষের নিমেষে। চক্ষের সম্মুখে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী। কত গিরি, নদী, কানন, কান্তার, গ্রাম, নগর অতিক্রম করিয়া মাদ্রাজে আসিয়া উপনীত হইলাম। মাদ্রাজের

প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা মিঃ গণেশ আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার গৃহে লইয়া চলিলেন। মোট-ঘাট নামাইতে গিয়া দেখিলাম—একটা থলিয়ার মধ্যে এক কাঁদি কাঁচকলা রহিয়াছে। আমি সবিস্ময়ে সঙ্গীদের দিকে চাহিলাম। তাহারা হাসিল। কিন্তু আমার স্ত্রী বলিলেন "এমন অকল্যাণ কে করিল? কাঁচকলা যে বড় অযাত্রা!" তাঁহার কথায়, একটা চক্রান্তের আভাস মনে ছায়া ফেলিয়া গেল।

অনেকদিন হইল রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব অস্বীকার করিয়াছি। পাঁজি দেখিয়া দিন-ক্ষণের বিচার ছাড়িয়াছি। সদাচার, কদাচার এক করিয়াছি। বাস্তুবিগ্রহ শিকায় উঠিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দই ধর্ম্মবিগ্রহ। কুসংস্কার অন্তর স্পর্শ করিল না; কিন্তু যে শ্রেণীর লোক আমার সঙ্গী, তাহাদের চিত্তবৃত্তির কথা ভাবিয়া আমার অন্তর অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইল। আমার গৃহলক্ষ্মী সেই মোটটী সেইখানেই রাখিয়া চলিলেন, আমিও তাহার কোন প্রতিবাদ করিলাম না। তার পরদিন প্রভাতে গাড়ী আসিয়া পণ্ডিচারী পৌঁছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে সৌম্যমূর্ত্তি নলিনী আর সদানন্দ সুহৃৎ অমৃত উপস্থিত ছিলেন। উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আমার অন্তরের গ্লানি দূর হইল। এই উভয় সহতীর্থের প্রফুল্ল-মুখশ্রী ও হৃদয়ের স্পর্শ আমায় অভিভূত করিল। কোথায় পার্থক্য? কোথায় ভেদ? কি অকৃত্রিম আকুতিভরে নলিনী আমাদের অভিনন্দিত করিল। তার সশ্রদ্ধ প্রণাম আমার অন্তরে অগ্রজের গর্ব্ব জাগরিত করিল। "বৌদিদি" বলিয়া আমার স্ত্রীর প্রতি তার কুশল প্রশ্ন আজও নলিনীর সহিত আমার অপার্থিব আত্মীয়তা-সম্বন্ধেরই মূর্চ্ছনা তুলে। কর্ম্মভেদ হয়, অমর স্মৃতি বুঝি ভবিষ্যতের জন্য চিরায়ুঃ হইয়া থাকে; নতুবা এই যুগের ইতিহাস আজিও অন্তরে অচ্ছিন্ন হইয়া জাগ্রৎ থাকে কেন?

পথের দৃশ্য আমার না হউক, আমার সহযাত্রীদের চক্ষে অপূর্ব্ব। মুক্তকচ্ছ পণ্ডিচারীবাসীদের বেশভূষা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। তাহাদের দুই হাতে স্বর্ণ শঙ্খ বা বলয়। কর্ণযুগলে পাথর-বসান সোনার টোপ। কৃষ্ণকায় জনগণের দিকে চাহিয়া আমার স্ত্রীর কৌতূহলের সীমা নাই। অনবগুণ্ঠনে কিশোরী, তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা পথে চলিয়াছে। বাঙ্গালী বধূর ন্যায় তাহারা অবগুণ্ঠনমুখী নহে। কৃষ্ণকায়া, কিন্তু তাহাদের দেহ সবল-সুস্থ বলিয়াই

মনে হয়। একেবারে নূতন দেশে আসিয়া একজন চির অন্তঃপুর মহিলার অন্তরের যে কি উল্লাস, তাহা সেদিন তাঁর চক্ষের দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

পরিশেষে আমার সেই সুপরিচিত শ্রীঅরবিন্দের ভবনদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেদিন সেখানে ছিলেন হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, বারীন্দ্রকুমার ও প্রিয়দর্শন সুরেশচন্দ্র। পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া দ্বিতলে গিয়া উপনীত হইলাম।

সেই টেবিল, সেই কাঠের আসন, পুরাতন চেয়ার। সেই কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া শ্রীঅরবিন্দ। সেই তাঁর ইন্দীবরতুল্য নয়নের দৃষ্টি। সেই স্ফুরিত অধরে স্নিগ্ধ মধুর হাসি। সেই হিরণ্ময়-শ্মশ্রু-কেশাদি-শোভিত সমুজ্জ্বল মুখচ্ছবি। দূরত্বের ব্যবধানে হৃদয়ে যে ভেদের গ্রন্থি কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, যে সংশয়ের কালো মেঘে চিরোজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল, তাহা যেন দুঃস্বপ্ন মনে হইল।

প্রণাম করিবে কে? ভাবপ্রবণ হৃদয় সূর্য্যকরোজ্জ্বল অভ্রভেদী তুষারশৃঙ্গ যেমন ধারা সৃষ্টি করে, তেমনি নয়ন ঝাঁপিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণে বক্ষঃ প্লাবিত করিল। শ্রীঅরবিন্দের পরিধানে আমারই নিবেদিত চন্দননগরের কালোপেড়ে ধুতি। পদযুগলে ঠন্‌ঠনিয়ার চটি। উন্নত-বক্ষঃ শ্রীঅরবিন্দের চরণে ভূনত হইবামাত্র, তিনি প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। সঙ্গী দুইজন প্রণাম করিল। তারপর আমার স্ত্রীও অরবিন্দ-চরণে প্রণতা হইলেন।

অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী পুরনারী—নগ্নপদ, যুগল হস্তে সোণার চুড়ি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—উপুড় হইয়া পড়িলেন শ্রীঅরবিন্দের চরণযুগলে। তাঁহারও চক্ষের জলে শ্রীঅরবিন্দের পদযুগল সিক্ত হইল। শ্রীঅরবিন্দ কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। আমি তাঁর সম্মুখের আসনে উপবেশন করিয়া আছি। মধ্যে ধূলিবিলুণ্ঠিতা প্রণতা পত্নী। এক মিনিট, দুই মিনিট ঘড়ির কাঁটা সরিয়া চলে—সংজ্ঞাহীনা নারী, শ্রীঅরবিন্দের পদচুম্বন করিয়া লতাবল্লরীর ন্যায় অর্দ্ধশায়িতা। কে যেন তাঁহার এ সুখতৃপ্তি ভঙ্গ করিতে চাহিল! শ্রীঅরবিন্দ বাম হস্তে আমার গৃহলক্ষ্মীর মস্তক স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহা নিষেধ করিলেন। আমি স্তব্ধ, বিমুগ্ধ। এই বিজয়িনী নারীশক্তিকে কোথাও এমন

নতি স্বীকার করিতে দেখি নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনেতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, পুরোহিত—হিন্দু-সংসারে নতি গ্রহণের লোকাভাব নাই; কিন্তু কোথাও তিনি এমন করিয়া মাথা নত করিয়াছেন মনে হইল না। পূজাপার্ব্বণে শুভদিনে তাঁহাকে আমারই চরণে ভূনতা হইতে দেখিয়াছি; আর কোথাও তিনি আপনাকে প্রণতা করেন নাই। তাঁহার ইহা দাম্ভিকতা বলিয়া নানা কথাও শুনিতে হইয়াছে; কিন্তু এই তেজস্বিনী নারীকে তাহার জন্য কোথাও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

মিনিটের পর মিনিট প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইরূপ নিশ্চল-নিস্পন্দ থাকিয়া, পরে ভাবভঙ্গে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় তিনি একবার শ্রীঅরবিন্দের দিকে, তারপর আমার দিকে চাহিয়া, মাথার কাপড় কিছু নামাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কি এক অপার্থিব অনিন্দ্য আনন্দ তাঁহার বদনমণ্ডলে জ্যোতির আলিপনা লেপিয়া দিয়াছিল, আমি মুগ্ধনেত্রে তাঁহার পানে চাহিলাম। তাঁহার এই অভাবনীয় আচরণের মর্ম্ম আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না। দীর্ঘদিন দুইজনে একত্র থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ের উপর আমার যে পূর্ণাধিকারের দাবী ছিল, শ্রীঅরবিন্দের চরণে তাঁহার এই অকৃত্রিম নতি-জ্ঞাপন যেন তাঁর অপূর্ণ আত্মনিবেদনের পূর্ণ তর্পণ বলিয়াই মনে হইল। ঘটনা কিছুই নহে; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি আমি যে ভাবে জানিয়াছিলাম, তাহাতে এই ঘটনায় বিস্মিত হইলেও, অন্তরে শান্তি পাইলাম এই ভাবিয়া যে, সহধর্ম্মিণীর হৃদয়ের সার্থকতাই পতির কাম্য। মনে-মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম—তাঁহার এই আত্মনিবেদন যেন তাঁহার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির কারণ হয়।

ঘটনাস্থলে এই সময়ে আর কেহই ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ ও আমার স্ত্রীর মধ্যে এই অধ্যাত্মমিলন-প্রবাহ যখন উভয়কে অবহিত রাখিয়াছিল, যেন মর্ত্ত্যলোক হইতে কোন ঊর্দ্ধতর লোকে উভয়ের আত্মা সম্বন্ধের অমৃত আস্বাদ করিতেছিল, সেই ফাঁকে দৃষ্টি পড়িল মীরা দেবী বঙ্গমহিলার ন্যায় শাড়ী পরিয়া, বারান্দার প্রান্তস্থিত এক কক্ষের কপাটের ফাঁকে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি সমুজ্জ্বল বিদ্যুতের ন্যায় আমাদের স্পর্শ করিতেছিল।

যত ব্যথা, সংশয়, যত অন্ধকার বুকে ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, সব নিরসিত

হইল। শ্রীঅরবিন্দ অমৃতকে ডাকিয়া বলিলেন "মতিলালের জন্য যে বাড়ী ভাড়া করিয়াছ, সেইখানে ইহাদের পাঠাইয়া দাও।"

তারপর হাসিয়া বলিলেন "এখানেও তোমায় নূতন সংসার পাতিতে হইবে। অপরাহ্ণে কথা কহিব।"

শ্রীঅরবিন্দ নিগূঢ় উদ্দেশ্য লইয়াই কথা বলিয়াছিলেন। আমি তখন প্রিয়দর্শনসুখে বিভোর ছিলাম। বিদায় লইয়া সিঁড়ির নিকট আসিতেই মনে হইল—শ্রীঅরবিন্দের এ গৃহ আর শ্রীহীন নহে। শ্রীঅরবিন্দ সকাশে আসিয়া যে ঘরে আমি বার-বার স্থান পাইয়াছি, সে ঘর মীরা দেবী অধিকার করিয়াছেন। আমাদের ভিন্ন বাড়ীতেই থাকিতে হইল। কাঁচা মনে কিছু আঘাত লাগিল। ইচ্ছা হইল—পূর্ব্বপরিচিত ঘরখানি একবার দেখিয়া যাই। আর মীরা দেবীকেও অভিনন্দন জানাইবার শিষ্টতা আছে।

দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। পশ্চাৎ উৎফুল্লা শ্রীমতী। সম্মুখে একখানি কোচে তখন মীরা দেবী বসিয়াছিলেন। এই মীরা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মীরা নহেন। তখন এই বিদেশিনী মহিলা বিদেশিনী বেশেই আমাদের আতিথ্য-প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পাশে বসিয়া কতদিন সান্ধ্যভোজন করিয়াছি। আজ তিনি শাড়ী পরিয়াছেন। পদযুগলও তিনি অলক্তরঞ্জিত করিয়াছেন। মনে হইল—যে মীরাকে ভগ্নী বলিয়া শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনে অগ্রসর হইয়াছিলাম, সে মীরা আজ নববেশে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্ঘলক্ষ্মীর আসন অধিকার করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দেরই মহিমা স্মরণ করিয়া এই মহিলার পদস্পর্শ করিলাম, মীরা স্মিত বচনে উৎসাহ-বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

পিছনে ফিরিলাম। কি গরীয়সী মূর্ত্তি! উন্নতগ্রীবা ঋজুমূর্ত্তি তন্বী অপলকে মীরার দিকে চাহিয়া আছেন। সীমন্তের সিন্দূর বালারুণশোভায় জ্বল-জ্বল করিতেছে। এই নীরব-নিস্পন্দ নারীবিগ্রহের দিকে মীরা দেবীও একবার কটাক্ষপাত করিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম—আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পত্নীও মীরার পদ-বন্দনা করিবেন। কিন্তু তাঁহাতে সে ভাবের আভাস না পাইয়া, একটু অপ্রস্তুত হইয়াই গৃহ হইতে বাহিরে আসিলাম। মীরা দেবী গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের প্রত্যভিবাদন করিলেন।

যে স্বতন্ত্র বাড়ীখানিতে আমরা আশ্রয় লইলাম, তাহাই পণ্ডিচারী আশ্রমের বিস্তৃতির প্রথম পদক্ষেপ বলিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে আর তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। আমার আগমনসংবাদে শ্রীঅরবিন্দ তাই নূতন বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। এখানে এই সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার ও দুইজন মাদ্রাজী বন্ধু পূর্ব্ব হইতেই আসন পাতিয়াছিলেন। আমরা চারিজন আসিয়া এইখানে একটি স্বতন্ত্র সংসার পাতিয়া বসিলাম। আমাকে শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাত্মসাধনা হইতে কর্ম্মক্ষেত্রেও অল্লাধিক অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেন। আজিকার মত সেদিনও কর্ম্মদক্ষ বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রত্যয়ে আমার হাতে এক তাড়া নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন "চন্দননগরের ন্যায় এখানেও তোমায় ঐ নূতন সংসারের সকল ভারই গ্রহণ করিতে হইবে।" তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। আমি নিশ্চয় জানিতাম—আমার জীবনসঙ্গিনী এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে অবলীলাক্রমে গুছাইয়া লইবেন। কিন্তু আমরা দুইজনই একদিক্ দিয়া খুবই কাঁচা ছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ এ কথা জানিতেন না; এখনও অনেকে জানেন না—আমরা পতি-পত্নী দুইজনেই সেবার অধিকার পাইয়াছিলাম, কিন্তু আর্থিক সম্পর্ক দুইজনেরই ছিল না। অর্থের হিসাব আমরা কোনদিনই রাখি নাই, অর্থ আমাদের স্পর্শ করিতে হয় নাই। আজ তিনি পরলোকে; আমার সেই একই অবস্থা এখনও। অতএব সেদিন শ্রীঅরবিন্দের এই নূতন সংসারের ভার লইলাম বটে, কিন্তু অর্থের হিসাব রাখা আমার পক্ষে দায় হইয়া উঠিল। তবে এক মাদ্রাজী পাচক ও ভৃত্য এই কার্য্য করার জন্য এ বাড়ীতে নিযুক্ত ছিল, সেই ব্যক্তিরই কিছু-দিন বৃহস্পতির দশা চলিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। সে বাজার-হাট করিয়া যাহা হিসাব দিত, তাহাই আমাদের গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইত। যাহাই হউক, চন্দননগরের ন্যায় পাকশালায় মাদ্রাজী পাচকের সাহায্যে আমার স্ত্রী দুই বেলা সারি-সারি এক ঘরে পাতা পাতিতেন; চন্দননগরের মত তিনিই পরিবেশন করিয়া আমাদের পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করাইতেন।

দিন এমন করিয়াই চলিতেছিল। আমরা প্রতিদিন প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দের

নিকট উপস্থিত হইতাম। শ্রীঅরবিন্দ বাহিরের বারান্দায় সেই সুপরিচিত টেবিলের একপাশে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া বসিতেন, আর আমরা পতি-পত্নী দুইজনে সেই টেবিলের অন্য পাশে দুইখানি চেয়ারে বসিতাম। তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা চলিত। কোন-কোনদিন ধ্যানও জমিয়া উঠিত। সেখানে আমরা তিনজন ব্যতীত এই সময়ে অন্য কেহ থাকিত না।

অপরাহ্ণেও এই একই কর্ম্ম ছিল। তবে এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরিয়া মীরা দেবী ও তাঁহার সহকারিণী মিস্ হড্সন্ ব্যতীত তৎকালীন পণ্ডিচারী আশ্রমের সকল অধিবাসী সমবেত হইতেন। হাসি ও কথার অন্ত থাকিত না। মহিলা সভ্যাদের মধ্যে আমার স্ত্রী ও নলিনীকান্তের নববধূ ইন্দু গুপ্তাও এই অধিবেশনে যোগদান করিতেন। এই দুই সময় ব্যতীত, অন্য কাহারও সহিত একত্র হওয়ার আমার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার অপর দুই-জন সঙ্গী আলাপ-আলোচনা করার প্রচুর সুযোগ পাইত।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা দুইজনে বিদায় লইয়া পথে বাহির হইতাম। কোনদিন পণ্ডিচারীর বড়বাজারের দিকে নানাবিধ বিপণিশ্রেণী ও পণ্ডিচারী-বাসীদিগের চালচলন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা দুইজনেই কৌতুক অনুভব করিতাম; কোনদিন বা "পীয়ারে" অর্থাৎ সমুদ্রতীরের জেটিতে গিয়া বসিতাম; সম্মুখে তরঙ্গায়িত অসীম বারিধির পক্ষে দুইজনেই অনিমেষে চাহিয়া থাকিতাম। কখনও-কখনও দেখিতাম—নলিনী সরকার ও নলিনী গুপ্তের সহিত শ্রীমতী ইন্দুবালাকে। সেই প্রবাসে আমার পত্নীকে দেখিলেই 'দিদি' বলিয়া তাঁহার পাশে ইন্দু আসিয়া উপবেশন করিত। কত কথাই যে কহিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীমতী ইন্দুবালা আমাদের দুইজনেরই অকপট স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দ ও আমার আবাসবাটীর মধ্যে যে দূরত্ব, তাহা দূর করিত আমাদের পরম স্নেহের এই ইন্দুবালা। সে আমাদের খুঁটিয়া-খুঁটিয়া ও-বাড়ীর সংবাদ সরবরাহ করিত। এ বিষয়ে আমার কোনই কৌতূহল ছিল না। কিন্তু নারী-হৃদয়ের স্বভাবৌৎসুক্যবশতঃ আমার স্ত্রী ও-বাড়ীর সকল সংবাদই তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন এবং স্বভাবতঃ সকল কথাই আমার কানে তুলিয়া দিতেন। এই সকল কথার মধ্যে শ্রেয়ঃ-বিষয় বিশেষ থাকিত না। আমাদের লইয়া ও-বাড়ীতে যে সকল আলোচনা হয়, সেই

সকল কথাই বেশী থাকিত। শ্রীঅরবিন্দের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক ছিল না। আমারই সহযাত্রী একজন এই সকল আলোচনার সর্ব্বপ্রধান অগ্রণী মুখপাত্র হইয়াছিল।

একদিনের সংবাদ—শ্রীঅরবিন্দের নীচের ঘরে ফ্রয়েড প্রসঙ্গ লইয়া নাকি অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমার স্ত্রী সেই যে প্রথম দিনে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎমাত্র বহুক্ষণ চেতনাহারা হইয়াছিলেন, সেই সূত্র ধরিয়া আমার এই সহযাত্রী বন্ধু এই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, মতিবাবুর স্ত্রী ফ্রয়েডের থিওরী অনুসারে উচ্চতর পুরুষের নিকট আত্মনিবেদনের প্রেরণা পাইয়াছেন। কথাটির মধ্যে কোনই দোষ ছিল বলিয়া মনে হয় নাই; কিন্তু ইহার সঙ্গে আমার স্ত্রী যে সদম্ভে শ্রীঅরবিন্দের সংসর্গই চাহেন, মীরা দেবীর সম্পর্কে আসিতে ইচ্ছুক নহেন, এই অপ্রিয় মন্তব্যই গুরুতর বলিয়া অনুভূত হইল। আমার স্ত্রীও এই কথায় একটু অস্বস্তি অনুভব করিলেন। এই বিদেশে তাঁহার মনে কোনরূপ দ্বন্দ্ব থাকিলে, শ্রীঅরবিন্দের অযাচিত দান-গ্রহণে তিনি সমর্থা হইবেন না, ইহা ভাবিয়া তাঁহার সহিত এই সকল বিষয় লইয়া কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার অন্তরের অভিব্যক্তি আমার অন্তরে আনন্দের সঙ্গে এক অজানা আশঙ্কারও সঞ্চার করিল।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁহার কথা যে, তিনি যখন তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিলেন এক অনিন্দ্য দেববিগ্রহ। যখন আমি অবনত শিরে তাঁহার চরণে ভূনত হইলাম, তখন তিনি যেন আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ-মন অবনত হইয়া পড়িল। আপনার পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হইল—আমার সঙ্গে একীভূত হইয়া তিনি শ্রীঅরবিন্দের চরণে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তিনি নিজের অথবা আমার কোন অস্তিত্বই অনুভব করিতে পারেন নাই। যেন একটা নতির প্রবাহই তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। এই কথা তিনি যে ভাষায় সেদিন ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহাতে আমার অন্তরে এই অনুভবই দৃঢ় হইয়াছিল যে, আমার হৃদয়ের সহিত তাঁহার অভিন্নতার অনুভূতিই আমার আত্মনিবেদনের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার হৃদয়কেও যুগপৎ আনত করিয়াছিল। তিনি যেভাবে আমার সহিত একান্ত হওয়ার দুশ্চর-তপস্যারতা ছিলেন,

তাহাতে শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া এমন অখণ্ড রসানুভূতি তাঁর স্বভাবতঃই প্রকাশ পাইয়াছিল। মীরা দেবী সম্বন্ধে তাঁর মর্ম্মানুভূতি অন্য প্রকারের হইয়াছিল; উহা আমার নিকট বড় করুণ মর্ম্মন্তুদ মনে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই অভিব্যক্তির জন্য হিন্দু নারীর চিরাচরিত সংস্কারই দায়ী বলিব। সেদিন তাঁহার কথায় আমি প্রীত হইতে পারি নাই। বাল্য-বিবাহের ফলে পতি-পত্নীর মধ্যে বর্ত্তমান যুগের মর্য্যাদা বা গৌরবরক্ষার দায় আমার ছিল না। আমি সেদিন কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া এই পরিণতবয়স্কা পত্নীকে সামান্য আঘাত করিয়াছিলাম। তাঁহার সেই সজল-নয়ন, আরক্তিম মুখমণ্ডল, উন্নত গ্রীবা, গৌরবদীপ্তা মূর্ত্তি আজিও স্মরণে পড়ে। সেদিন সীঁথির সিন্দূর দেখাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমি তোমার জন্য সব করিতে পারি, বিধাতার এই গর্ব্বটুকুকে কোথাও ম্লান করিতে পারি না।"

এই দিনই বুঝিয়াছিলাম—আমার সাধন-প্রবাহ কোথায় আসিয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিল; আমি বুঝিয়াছিলাম—এ-কূল ও-কূল দু-কূল রাখার দায়ে পড়িয়াছি। সেইদিন হইতে আমি হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে চাপিয়া উদাসীনের ন্যায় দিনের পর দিন যাপন করিতেছিলাম। এইদিন হইতে আমার মনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা যেন আর লুকাইতে পারিতেছিলাম না। এই সময়ে পর-পর কয়েকটি তুচ্ছ ঘটনাপাতে আমার আনন্দের হাটে আগুন ধরিল। কি জানি কোথায় কি হইতেছিল, বুকে যেন আমার ঢেঁকির পাড় পড়িতেছিল, অস্বস্তিতে দিনরাত কাটিত। দুঃখে অশ্রু কতদিন চক্ষে উথলিয়া উঠিয়াছে। কি নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে তাঁহাকে সেই প্রবাসে ব্যথা দিয়াছি। আর আশ্চর্য্য, ব্যথাহারী শ্রীঅরবিন্দ আমার এই অজ্ঞাত হৃদয়ের ক্ষতে করুণার প্রলেপ মাখাইয়া, এই দুরতিক্রমণীয় পরীক্ষা হইতে আমায় উত্তীর্ণ করাইবার যত্ন করিয়াছেন। সে করুণার অপার্থিব দান ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।

শ্রীঅরবিন্দের উপর আমার যেন একটা দাবী ছিল। সেই দাবী গুণান্বিত হইয়া আমার ধর্ম্মপত্নীকেও অভিভূত করিল। তিনি একদিন জিদ্ ধরিয়া বলিলেন "১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দকে আমি নির্ভয়ে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতে পারি নাই। সেদিন ছিল সঙ্কোচের দিন, সতর্কতার দিন। সেদিনের সেই ক্ষুণ্ণতার আজ নিরসন করার জন্য শ্রীঅরবিন্দকে আমি নিমন্ত্রণ

করিব। প্রায় ১১ বৎসরকাল এই সাধ আমার আছে; আমার ব্রত পূর্ণ হউক।"

নারী হৃদয়ের এই অতুলনীয় অমৃতের উৎস অবস্থা-বিশেষে ফল্গু-প্রবাহের মতই বহে। শ্রীঅরবিন্দের অপরিতৃপ্ত ভোজনাদি ব্যাপার তাঁহার অন্তরে এই দীর্ঘদিন এমন করিয়া ক্ষোভের প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমার জানা ছিল না। ব্যাপারটী খুব গুরুতর বলিয়াও মনে হইল না। আমি শ্রীঅরবিন্দকে আমার স্ত্রীর অনুযোগের কথা জানাইলাম। অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমতী আমার পাশে নিরতিশয় উৎকণ্ঠাভরে শ্রীঅরবিন্দের সম্মতির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বুঝি সেদিন সুবিমল গঙ্গোত্রীধারা অথবা বিগলিত তরল সুবর্ণের ন্যায় দ্রবণীয় ছিলেন। ভক্তির খাত কাটিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছা আকর্ষণ করা শক্ত ছিল না। ছাঁচে ফেলিয়া মনের মত আভরণ নির্ম্মাণ করিয়া অঙ্গে ধারণ করার সৌভাগ্যও সুগম ছিল। শ্রীঅরবিন্দ প্রফুল্ল-জ্যোৎস্নার ন্যায় হাস্যসুধা বিকীরণ করিয়া, আমার পত্নীর অবনত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হবে, হবে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" অরবিন্দ চিরদিনই কল্পতরু। তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আমার স্ত্রী বলিলেন "কবে হবে বলুন?"

শ্রীঅরবিন্দ আনন্দে তাঁহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ললাট কুঞ্চিত করিয়া, কণ্ঠ ও গ্রীবাদেশ দুলাইতে-দুলাইতে বলিলেন "হবে, হবে, কালই হবে।"

শ্রীঅরবিন্দের এইরূপ সম্মতি সেদিন আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। এই অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষাপূরণের শুভ সুযোগ পাইয়া সোৎসাহে আমার স্ত্রী শ্রীঅরবিন্দের পদবন্দনা করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীঅরবিন্দ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে পর, তাঁর অন্তরে অপূর্ব্ব উৎসবের সাড়া উঠিল।

তিনি সেইদিন সন্ধ্যাকাল হইতে শ্রীঅরবিন্দের ভোজনাদির ব্যবস্থা লইয়া উদ্যোগায়োজনে ব্যাপৃতা হইয়া পড়িলেন। শ্রীঅরবিন্দ আসিবেন, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার সকল অনুগত ভক্তেরাও আগমন করিবেন। পণ্ডিচারীর তাৎকালীন ক্ষুদ্র আশ্রমে আনন্দের সহিত বিস্ময়ের ঢেউ উঠিল। ইন্দুবালারও উৎসাহের সীমা ছিল না। কিন্তু পরদিন প্রভাতেই সদ্যঃপ্রজ্জ্বলিত উর্দ্ধমুখী হোমশিখার উপর প্রচুর বারিসেচনের ন্যায় আমার স্ত্রীর নিদারুণ মনোভঙ্গ হইল। তিনি বার্ত্তা পাইলেন—শ্রীঅরবিন্দের আগমন সম্ভবপর হইবে না। তিনি যেন এই কর্ম্ম হইতে নিরস্তা হন।

আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার বদনে জ্যোতিশ্ছটা উদ্ভাসিত হইয়াছিল; এই সংবাদে তিনি মলিন মুখে আমার দিকে হতাশ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সহকারিণীরূপে শ্রীমতী ইন্দু গুপ্তা শ্রীঅরবিন্দের এই নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্বন্ধে যাহা বলিল, তাহা আমি শুনিয়াও শুনিলাম না; কিন্তু আমার স্ত্রীর জিদ্ আরও তাহাতে বাড়িয়া গেল। বাঙ্গালী ঘরের অন্তঃপুরচারিণী মহিলা শ্রীঅরবিন্দকে যেমন করিয়া অতি আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সেইভাবেই তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া চন্দননগরে যে সকল আলোচনা হইত, তাহাতে তাঁহার এইরূপ মনোভাব অসঙ্গত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ হইতে আমরা নিজেদের পৃথক্ করিয়া দেখিতাম না। তিনি ছিলেন আমাদের নেতা ও উপদেষ্টা। আমার ছিলেন তিনি পরম আত্মীয় ইষ্টস্বরূপ অধ্যাত্ম-পিতা ও অভিভাবক। তিনি ছিলেন আমার অব্যভিচারী শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার আশ্রয়; আমি ছিলাম তাঁহার একান্ত আশ্রিত ও অনুগত সন্তান। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমার সহকর্ম্মীরা পণ্ডিচারী আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য্যে যে অপার্থিব আত্মীয়তার অনুভূতি লাভ করিয়াছিল, তাহা হইতে' তাহারা নিঃসঙ্কোচে চন্দননগরে গিয়া প্রচার করিয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ তাহাদের অধ্যাত্ম-পিতামহের ন্যায় একান্ত আপন জন—নিবিড়তম আত্মীয়; তাঁহার সেইরূপ স্নেহে ও আদরেই তাহারা ধন্য হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন আমাদের মাথার মণি, হৃদয়ের মণিকোটায় জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য। তাঁহাকে দূরে রাখিয়া আমরা স্বস্তি ও সুখ পাইতাম না। তাঁহাকে অতি নিকটে আনিয়া পরমাত্মীয়ের মতই তাঁহার সহিত আচরণ করিতাম। বাংলার সম্বন্ধ-সাধনার সুদৃঢ় সংস্কার জ্ঞানতঃ-অজ্ঞানতঃ অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমাদের অন্তরে-বাহিরে অনাহত রাগিণী বাজাইত:

আমারে ঈশ্বর বলি আপনারে হীন।
তার প্রেমে আমি কভু না হই অধীন॥

এই ভাব তখন চন্দননগর সঙ্ঘের মনে দৃঢ় হইয়াছিল। আমার স্ত্রীও সঙ্ঘের বাহিরে ছিলেন না। কাজেই শ্রীঅরবিন্দকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাখিয়া তিনি এইরূপ সম্বন্ধের অমৃতে আপনাকে অভিষিক্তা করিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যাখ্যান তাঁর ভক্তিপূত চিত্তে বেশ গুরুতর আঘাত দিয়াছিল। তিনি

প্রতিদিনের ন্যায় সেদিন প্রাতঃকালেও শ্রীঅরবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া নীরব মৌন-মূর্ত্তির মধ্য দিয়াই আকারে-ইঙ্গিতে নিবেদন জানাইলেন—"কেন আপনি আমার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন?"

শ্রীঅরবিন্দ একটু বিচলিত হইয়াই বলিলেন "হঠাৎ তোমার কথা স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু আমার এই অবস্থায় নিমন্ত্রণগ্রহণের কিছু গোল আছে। আজ না হয়, দু'দিন পরে হবে।" শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠস্বর যেন অপরাধীর ন্যায় করুণ ও কম্পিত। কিন্তু কি স্নেহবিগলিত সুধাধারায় তাহা সিক্ত ছিল, তাহা স্মরণ করিলে আজিও সেদিনের শ্রীঅরবিন্দের সহিত আমাদের অভিন্ন হৃদয়ের অমৃতানুভূতি জাগিয়া উঠে। এই অপার্থিব অলক্ষ্য সম্বন্ধের গ্রন্থি মর্ত্ত্যের বাধায় বুঝি শিথিল হইবার নহে। আমার স্ত্রী সান্ত্বনা পাইলেন।

ইহার পর একদিন, দুইদিন করিয়া মে মাস শেষ হইল; জুন মাসেরও অর্দ্ধেক দিন অতিবাহিত হইল। সে একদিন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পথে বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিয়াছে। জনাকীর্ণ পথে কিছু খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিয়া বাসায় ফিরিতেছি। সম্মুখের একটী বিজলি বাতির আলোকচ্ছটায় পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলাম। বর্ণকান্তি অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছে। মাথার অবগুণ্ঠন তিনি অপসারিত করিয়াছেন। মুখশ্রী যেন পূর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণা মনে হইল। পণ্ডিচারীর স্বাস্থ্য বাংলার চেয়ে উৎকৃষ্ট। তাঁহাকে আমি অধিকতর স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেখিব মনে করিয়াছিলাম। এমন করিয়া অনেকদিন তাঁহার প্রতি চাহি নাই; পথ চলিতে-চলিতেই তিনি বলিলেন "ফিরে-ফিরে কি দেখছ আমার মুখের দিকে?"

চলিতে-চলিতেই বলিলাম "আমার প্রথম বিস্ময়—তুমি আজ অনবগুণ্ঠিতা; আমার দ্বিতীয় বিস্ময়—তোমার মুখখানি বড় সুন্দর ও পরিষ্কার দেখাইতেছে, কিন্তু তোমার মুখের ঘের পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে হইতেছে, যেন কিছু ক্ষীণ হইয়াছে।"

তিনি একটু হাসিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় পথ চলিতে-চলিতে বলিলেন "'এ দেশের মেয়েরা মাথার কাপড় খুলে' থাকে, এ যে কত আরাম, বাংলার ঘোমটা-দেওয়া মেয়েরা তা' বুঝে না। মাথায় মিষ্টি হাওয়া লাগছে, যেন সর্ব্ব শরীর জুড়িয়ে যায়।"

প্রশস্ত রাজপথ। সোজাসুজি সফেন তরঙ্গে সমুদ্র-নৃত্য, সাগরবারি-সম্পৃক্ত

মুক্ত বাতাস বহিতেছে ধীরে-মন্থরে। সত্যই আরামের বিমলাভায় তাঁর অনবগুণ্ঠিত মুখখানি বড় পবিত্র ও সুন্দর দেখাইতেছিল। এমন করিয়া দুইজনে বাংলাদেশে পথে বাহির হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এখানে মুক্ত-বিহঙ্গিনীর মত আমার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অবাধ বিচরণ বড় সুখের হইয়াছিল। কথায়-কথায় তাঁর বিশীর্ণ মুখখানির কথা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না। বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

তিনি রেকাবীতে খাদ্যদ্রব্যগুলি যথারীতি সুসজ্জিত করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। আজ অসঙ্কোচে দুইজনে এক সঙ্গে ভোজনের প্রবৃত্তি আমায় পাইয়া বসিল। এমন সুযোগ চন্দননগরে ঘটে না। বলিলাম "এস খাই।"

তিনি আমার মুখের দিকে ভ্রুকুটির কটাক্ষ করিয়া হাসিলেন। তারপর বলিলেন "এতদিন এ সাধ তো জাগেনি? আজ হঠাৎ এ আবার কি ভাব?"

প্রায় দেড় মাস পণ্ডিচারী আসিয়াছি; প্রতি সন্ধ্যায় পরিতৃপ্তিসহকারে এমন করিয়াই আমার উদরপূর্ত্তি হয়; কিন্তু সত্যই তাঁহাকে কোনদিন জলযোগ করিতে তো দেখি নাই। আর দেখিবই বা কি প্রকারে? তাঁহার জন্য কোন ব্যবস্থাই তো করি নাই। নিজেকে বড স্বার্থপর মনে হইল। পণ্ডিচারী চন্দননগর নহে। এই প্রবাসে তিনি সর্ব্ব বিষয়েই আমার মুখ চাহিয়াই থাকেন। অথচ আমি তাঁহার খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। খাওয়ার ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের মেয়েদের উপযোগী নহে। সকালে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কোনদিন "আপাম" অর্থাৎ আস্কে পিঠে খরিদ করা হয়, কোনদিন বা শুক্‌না পাঁউরুটির টুকরা দুধে বা চায়ে ভিজাইয়া খাওয়া হয়, আর মধ্যাহ্নে হয়—ফাউল বা মটনকারীর সঙ্গে ভাত। রাত্রেও তথৈবচ। আজ মনে হইল—সত্যই তো লোকটা খায় কি? বাংলার ডাঁটা চিবাইয়া এক থালা ভাত খাওয়ার অসুবিধা হইতেছে; এইজন্যই তিনি বোধ হয় কিছু ক্ষীণা হইয়াছেন। মাথায় ব্যাপারটী প্রবেশ করিবামাত্র সান্ধ্য-ভোজনের জিদাজিদি সুরু হইল; আর কাল হইতে মাছের ঝোল, সুক্তুনি, ডাঁটা-চচ্চড়ির ব্যবস্থা করিতে হইবে, স্থির করিলাম। তিনি আমার খাদ্য-প্রসঙ্গ শুনিয়া মনে-মনে আমোদ অনুভব করিলেন, আবার শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও ভুলিলেন না। তিনি বলিলেন "দেড় মাস পরে হুঁস হ'ল বুঝি!"

আমার অশেষ পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি সে সন্ধ্যায় কিছু মুখে দিলেন না, উপরন্তু কথায় কথায় তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হওয়ায়, আমি তাঁহার অন্তর-বাণীর সহিত সায় দিলাম। শ্রীঅরবিন্দের মিলন-প্রত্যাখ্যানে শুধু জীবন-ধারণের প্রয়োজনানুযায়ী পরিমিত অন্নই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন ভাল-মন্দ জিনিষ তিনি মুখে দিবেন না।

কে জানিত—আমার এই হৃদয়ভেদ একদিন প্রমাদ আনিবে? এমন করিয়া দুই কূল রাখা চলিবে না। পরদিন প্রভাতে পত্নীর হৃদয়াবেগে আচ্ছন্ন হইয়া শ্রীঅরবিন্দকে জিদ্ ধরিয়া বলিলাম "আপনি একবার ও-বাড়ীতে যাইবেন কিনা বলুন?"

তিনি দাবীকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার উপর কিছুর জিদ্ করিলে, তিনি ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তি অনুভব করিতেন। নিজের জন্য নয়, অনুগত ভক্তের হিতকামনায় তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাঁহার উৎসর্গেরই দাবী ছিল; কিন্তু অন্য পক্ষের দাবী রাখিয়া ইহা হইলে, সে উৎসর্গের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি খুব সংশয় পোষণ করিতেন। আমার কথা শুনিয়া তিনি কিছু ইতস্তত: করিলেন, তারপর বলিলেন "আমি একদিন যাব, তোমাদের সাধন আরও জমিয়া উঠুক, তারপর যাব।"

তাঁহার সব কথাই এইরূপ সংক্ষিপ্ত ছিল। আমার স্ত্রী এই কথার উত্তরে আমার মধ্য দিয়াই জানাইলেন "সে একদিন আপনার যখন ইচ্ছা হবে যাবেন। কিন্তু আপনাকে নিজের হাতে কিছু ভাল-মন্দ খাবার প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে সাধ হইয়াছে, অনুমতি করিলে আজই কিছু খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিব।"

শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় সহজ ও সরল মানুষ আমার চক্ষে পড়ে নাই। নিমন্ত্রণে যাওয়াটাও যেমন সহজভাবে 'হাঁ' বলিয়া তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন, আমার স্ত্রীর এই অনুরোধও তেমনি সহজভাবে তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি সেদিন অতি আনন্দের সহিত সারাদিন ধরিয়া বিবিধ খাদ্য-দ্রব্য রচনা করিলেন, সোৎসাহে সহকারিণী হইল শ্রীমতী ইন্দু গুপ্তা। সেদিন রন্ধনশালায় দুইজনের হাস্যমুখর কণ্ঠে আমাদের আবাসভবনটী পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীমতী ইন্দু গুপ্তা ও আমার স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া অতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে শ্রীঅরবিন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার অন্তরের এই অকপট নৈবেদ্য কিন্তু নিদারুণ প্রত্যাখ্যানে আবার তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করিল। আমার স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দুর মুখে যখন শুনিলেন—তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি শ্রীঅরবিন্দকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই, সব ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় উদ্দীপিত অথচ রুদ্ধ কণ্ঠে কেবল একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

তদুত্তরে তিনি যাহা শুনিলেন, তাহা প্রত্যয়গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হইল না। একান্ত অসহায়ার ন্যায় তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার মুখচ্ছবি বড় বিষণ্ণ ও বিবর্ণ দেখাইতেছিল। ইন্দুবালার কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, হয় শ্রীঅরবিন্দের সত্যদৃষ্টি অস্বীকার করিতে হয়, নয় তাঁহার এতদিনের গৃহলক্ষ্মীর সাধনাই ব্যর্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। নারীমহিমার মর্য্যাদাজ্ঞান আত্মানুভূতির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই তিনি তাহা সশ্রদ্ধায় রক্ষা করিতেন; ইন্দুবালার কথায় সেইখানেই নিষ্ঠুর আঘাত পড়িয়াছিল। আমার প্রবোধ-বাক্য কোন কাজেরই হইল না। তিনি শ্রীঅরবিন্দের নিকট এই বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। যথাসময়ে শ্রীঅরবিন্দের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াও উত্তর মিলিল না। তিনি অসহায়ার ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিলেন। আমার মনে হইল—যে নিঃসংশয় সরল ব্যবহারে শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বাঁধিয়াছিলেন, তাহা যেন কোন এক অজ্ঞাত হস্তের পরশে শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমি সকল অবস্থাই বরণ করিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। সাধনার পথে সংশয় ও আঘাত ইষ্টের সহিত যুক্তির পরীক্ষা বলিয়াই গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী এই ঘটনা কিছু নহে বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না।

বাংলার পলিমাটিতে যে হৃদয়-বৃত্তি গড়িয়া উঠে, তাহা তরল ও নমনীয় বটে। মুখের ফল মিষ্ট হইলে বাঙ্গালী উহা উচ্ছিষ্ট মনে করে না; প্রিয়তমের মুখে তুলিয়া দেয়। শ্রীঅরবিন্দের এই আচরণ আমার কাছে পরীক্ষার ন্যায় মনে হইল। কিন্তু আমার স্ত্রীর স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়ের উপর ইহা সংশয়ের কশাঘাত করিল। আমার চক্ষুঃ ঝাপসা হইয়া উঠিল এই

মনে করিয়া যে, শ্রীঅরবিন্দ আমায় আজ অজ্ঞাত আগন্তুকের স্থানে রাখিয়া উৎসর্গের পরীক্ষা করিতেছেন। আমার স্ত্রীর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল—তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য অস্পৃশ্য বোধেই শ্রীঅরবিন্দের নিকট পরিত্যক্ত হইয়াছে, এই হেতু।

দুইজনে দুই দিক্ হইতে আঘাত পাওয়ায়, আমাদের মিলিত চক্ষের জলে শ্রীঅরবিন্দকেও বিব্রত করিল। তিনি এক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমার স্ত্রীর প্রকৃতি আমি জানিতাম। তিনি সহজ ও সরল অন্তঃকরণে যে পথ ধরিতেন, সে পথ হইতে কোনদিন বিমুখ হইতেন না। যদি কোন অভাবনীয় বাধায় সে পথ হইতে বিমুখ হইতেন, তবে সে পথে আর কখনও তাঁহাকে পা বাড়াইতে দেখি নাই। যাহা সত্য বলিয়া তিনি বুঝিতেন, তাহা অনপেক্ষ হইলে তাঁহার গতি নিরাপদ্ হইত। কিন্তু যে সত্য অপরের অপেক্ষা করিত, সেখানে আঘাত পাইলে তিনি চিরদিনের জন্য মুখ ফিরাইতেন। এখানে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে যেভাবে আপনার মনে করিয়া হৃদয় গড়িতেছিলেন, তাঁহার হস্ত-প্রস্তুত খাদ্যাদি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি মুষড়িয়া পড়িলেন। তিনি কাঁদিতেছিলেন আপনাকে সামলাইয়া লওয়ার জন্য। আমি কাঁদিতেছিলাম আমার ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে সুদূর ব্যবধান দেখিয়া। দুইজনে শ্রীঅরবিন্দের নিকট এইভাবে বসিয়া থাকা সঙ্গত মনে হইল না। সজল নয়নে দুইজনে উঠিলাম। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার স্ত্রী পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আমার চক্ষে কোনদিন হৃদয়হীন নহেন। তিনি আমাদের বেদনার অনুভূতি উপেক্ষা করিলেন না। আমি প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, শ্রীঅরবিন্দ প্রসারিত বাহু দুটী দিয়া আমাকে হৃদয়ে টানিয়া লইলেন। তাঁর করুণ নয়ন দুটী প্রসন্নতাময়, তিনি অজস্র চুম্বনে অন্তরব্যথা এক নিমিষে দূর করিয়া দিলেন। বাসায় আসিয়া অরুণকে লিখিলাম "আজ প্রাতঃকালে অপূর্ব্ব-লীলা, অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব; অপ্রকাশই রইল...কেবল চুম্বন আর চুম্বন! হায় অরো! এ কেবল তুমি আর আমি" —হৃদয়-মল তিরোহিত হইল।

মানুষ সম-প্রকৃতির নয়। প্রকৃতি-ভেদে তার প্রকাশ-ভেদও হয়; তাহার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ আবহাওয়ারও প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই

বিজ্ঞান জানিতেন, অন্তত: আমার ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ-বৈশিষ্ট্য আমি চিরদিন লক্ষ্য করিয়াছি। সেদিনের সেই অতি তুচ্ছ ব্যাপার আশ্রয় করিয়া শ্রীঅরবিন্দ যে অমৃত পরিবেশন করিলেন, তাহা আমায় উদ্বুদ্ধ করিল। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করার সুযোগ হইল না। যেখানে আঘাত গিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেখানে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ে নাই। নারীমহিমার লাঘব নারী সহজে স্বীকার করে না। আমার স্ত্রী এই ঘটনার পর হইতে কেমন উদাসীন হইয়া পড়িলেন, আমার পথও অলক্ষিতে জটিল হইয়া পড়িল। সে খেয়াল সেদিন হয় নাই। আমার পালে হাওয়া লাগিতেছিল, জীবন-তরীও উজানে ছুটিল। আমার উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া আমার স্ত্রী প্রফুল্লভাবেই দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সকল কাজেই তাঁহার সহায়তা পাইয়াছি ; কিন্তু আজ মনে পড়ে ইহার পর আর একদিনও তাঁহার মুখে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটী কথাও বাহির হয় নাই। তিনি আমার কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় নিঃসঙ্গ অনুসরণ করিতেছিলেন মাত্র।

চন্দননগরের কথাই এ সময়ে বড় হইয়া উঠিল। সঙ্ঘকে স্বাবলম্বী করার সাধনা সুরু করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে এই ক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা অরুণের পত্রে অবগত হইতেছিলাম। আমার স্ত্রীর ভাবান্তর লক্ষ্যে ছিল না। আমি শ্রীঅরবিন্দের সহিত যুক্ত হইয়া সমস্যা-সকলের নিরাকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হইলে দিব্যকর্ম্ম সুসিদ্ধ করে, সে অবস্থা আমাদের কেহ লাভ করে নাই ; অথচ দিব্যসৃষ্টিই ছিল আমার লক্ষ্য। প্রত্যুত এ কর্ম্মে আরও বড় বিঘ্ন ছিল এই যে, যাহারা অর্থক্ষেত্রে আগাইয়াছিল, তাহারা কেহই সঙ্ঘের নহে, সঙ্ঘের ভাব ও আদর্শ তো ভাল করিয়া বুঝেই নাই, প্রয়োজনের তাগিদে তাহারা সঙ্ঘের জন্য আমারই মূলধন খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ভিতরে ছিল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থের প্রেরণা ও প্রয়োজন। তাহাদের সে স্বার্থ ভবিষ্যতে সঙ্ঘগত হওয়ারও কোনই সম্ভাবনা ছিল না। আমার কিন্তু সে যুগে তাহাদেরই উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। এই অবস্থায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ারই কথা ; হইয়াছিলও তাহাই। আমার এক প্রস্থ কাজ এক প্রকার নাকে খৎ দিয়া শেষ করিতে হইয়াছিল।

মানুষের কর্ম্ম স্বভাবতঃ আপনাকে কেন্দ্র করিয়া হয়; আত্মস্বার্থের পুষ্টি না হইলে, মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারে না। আমি চাহিতেছিলাম নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্ম্ম। যে যাহা নয়, সে তাহা করিবে কি প্রকারে? আমার অভিনব আদর্শ ও কর্ম্মনীতি সকলের কাছেই দুর্ব্বোধ্য ও অসাধ্য মনে হইত। সব লইয়াই মানুষ আসিয়াছিল আমার কর্ম্মে, অথচ আমার উপদেশ ছিল—আমাদের কেহ থাকিবে না; পিতা নয়, মাতা নয়, আত্মীয়-স্বজন কেহ নয়। কর্ম্মীর প্রয়োজন হইবে—শুধু তার পরিধানের বস্ত্র আর জীবনধারণের দুই মুঠা অন্ন। এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই প্রকৃতির মানুষকে অসুরেরই ন্যায় শ্রম দিতে হইবে। অর্থের দায়িত্ব আমার, অভিজ্ঞতার্জ্জনের সুযোগ অন্যের। এই অবস্থায় যাহা হওয়া স্বাভাবিক, চন্দননগরে তাহাই ঘটিতেছিল। কাজেই আমার ঋণকৃত অর্থে অন্যে অবাধ অধিকার পাইয়া যতই কর্ম্ম করিতে থাকে, ক্ষয় ও অপচয়ের অঙ্ক ততই বাড়িয়া চলে। কর্ম্মক্ষেত্রের দুঃসংবাদ যতই আসিতেছিল, আমি বাহ্যতঃ চঞ্চল হইলেও, অন্তরে নৈরাশ্যের অন্ধকার জমিতে দিই নাই। আমার বিশ্বাস ছিল—আগুন জ্বালাইতে হইলে, ধূমের ভয় খাইলে চলিবে না। অনেক ক্ষয় ও অপচয়ের ভিতর দিয়াই সিদ্ধকর্ম্ম প্রকাশ পাইবে। ভগবানের মানুষ হওয়ার অধিকার দুস্তর তপঃ-সাধনের মধ্য দিয়াই অধিগত হয়। চলিবার পথে অনেক ত্রুটি ও গলদ প্রকাশ পায়। এই সব সহিবার শক্তি না রাখিয়া বৃহৎ কর্ম্ম করা যায় না। অন্তহীন ব্যর্থতার বিভীষিকা বিদীর্ণ করিয়া মানবাত্মার অফুরন্ত শক্তিপ্রকাশ হইবেই। আজিকার মানুষ ব্যর্থ হইতে পারে; কিন্তু কর্ম্ম তাহাতে ব্যর্থ হইবে না। অনধিকারী যাহারা, তাহারা স্বভাবতঃ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবে। অরুণকে তাই ভরসা দিয়া লিখিলাম "অর্থসমস্যার নিরাকরণের উপায় আজিকার হিসাবের অঙ্কে ক্ষয়ের পরিমাণ দেখিয়া নিরাকরণ করা যাইবে না। কর্ম্মপ্রবাহেই আত্মিক শক্তির জাগরণ হইবে। সৃষ্টি করিতে গিয়া আমাদের মধ্যে আজ ক্ষয়ের প্রভাব যতই বীভৎস বলিয়া মনে হউক, উজান পথেই চলিতে হইবে। ক্ষয় একদিন পশ্চাৎ পড়িবে, পূরণের অঙ্কই পুরোভাগে দাঁড়াইয়া নির্ম্মাণের জয় দিবে।" এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের জন্য এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিতেছিলেন। অন্ধ্র প্রদেশ ছাড়া মাদ্রাজ হইতে তিনি ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করার

প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন, কিন্তু জুন মাসের শেষেও ৩০ হাজার টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই টাকা তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য দান-স্বরূপই লইতেছিলেন; আর আমরা চাহিতেছিলাম শুধু জাতিগঠনের জন্য স্বার্থহারা সঙ্ঘসন্তানদের শ্রম ও শক্তির অনুবাদে বিপুল অর্থসৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দ এই স্বপ্ন কর্মে অনুবাদিত হইতেছে দেখিয়াই উৎসাহ দিতেন। তবে তিনি বলিতেন—"এখন সব ভেঙ্গে-চুরে যাচ্ছে; এই সময়ে এই রকম সৃষ্টি বড় সহজ নয়। আত্মরক্ষার জন্য যাহা দরকার, সেইটুকুও যদি এইভাবে করে' তুলতে পার, একটা বড় কাজ হ'ল ব'লে মেনে নিতে হবে।"

আমার সমস্ত দৃষ্টিটাই ছিল প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের মধ্য দিয়াই জাতিগঠনের জন্য প্রচুর অর্থসৃষ্টির দিকে। সেদিন চারিদিকেই ক্ষয়, অপচয়, অবিশ্বাস আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর সংগৃহীত অর্থের ব্যর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া সকলেই সংশয় করিতেন। গোড়া হইতেই অর্থের ব্যর্থ ব্যয় না হয়, সেদিকে ছিল আমার প্রখর দৃষ্টি; অন্তরে ছিল না এক বিন্দু স্বার্থের আকর্ষণ। কাজেই অন্তহীন ভরসাই সকল প্রকার পরাজয়ের দুর্ভাবনা হইতে আমায় দূরেই রাখিত।

শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে যাহা কিছু আলো ও আনন্দ, উৎসাহ ও শক্তি পাইতেছিলাম, তাহাই চন্দননগরের দিকে অকুণ্ঠে বিতরণ করিতাম। এক-এক সময়ে মনে হইত আমার শরীরটা বেতারবার্ত্তা ধরার একটা দণ্ডস্বরূপ পণ্ডিচারীতে খাড়া আছে মাত্র। আমার আত্মা চন্দননগর হইতে গুটাইয়া আনিতে পারি নাই। আমার মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ ইহা বুঝিতেছিলেন। তিনি আমায় নিঃসঙ্গ করিয়া তাঁহার মানুষরূপে গড়িতে চাহিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বৎসের ন্যায় দোহন করিয়া তাঁহার প্রেরণাই চন্দননগরের মধ্য দিয়া সিদ্ধ করার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের চাওয়া পূর্ণ করার আকুলতাই ছিল আমার একমাত্র কামনা; চন্দননগরের আকর্ষণ আমার এই অন্তরের সুরে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভিড়াইবার পথে যেন দ্বন্দ্ব সৃষ্টিই করিয়াছিল। এই সময়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব আমার তাৎকালীন পত্রের মধ্যে আজও সুস্পষ্ট হইয়া আছে। আমি তাহার কিছু-কিছু অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। অরুণকে লেখা এক পত্রের মধ্যে এইরূপ আছে: "তোমাদের কয়েক জনের জ্যোতির্ম্ময়

মূর্ত্তি আমার অন্তরে সর্ব্বদাই ভেসে উঠে। বার-বার তা' মুছে ফেলার চেষ্টা করি, বার-বার তারা আবির্ভূত হয়। পুনঃ-পুনঃ মুছি, পুনঃ-পুনঃ জাগে, এই সংগ্রামই চলেছে আমার মধ্যে। জানিনা এ সংগ্রাম শেষ হবে কি না ? কিন্তু যতদিন তা না হয়, আমি আর ফিরব না।"

শ্রীঅরবিন্দের সহিত একাত্ম হওয়ার পথে চন্দননগরের সৃষ্টি এইদিক্ দিয়া বাধাই সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহা অকপট চিত্তে দূর করার চেষ্টাও যে আমার মধ্যে ছিল, উপরোক্ত লেখাটুকু তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এই অধ্যবসায়ের তলে-তলে ফল্গুধারার ন্যায় আর একটী অভিনব প্রেরণা-প্রবাহ আজ ধরা পড়ে। চন্দননগরের দিব্য-সৃষ্টি আমার কল্পবিধৃত সত্য ; তাই উক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যেই প্রবর্ত্তক সঙ্ঘকে অজস্র প্রেরণাদান করিয়াছি— শ্রীঅরবিন্দের মন্দিরে বসিয়াই। তাহাদের ভরসা দিয়া লিখিয়াছি "অতীতের ক্ষুদ্র সংসার তোমরা আর বাঁধিতে পারিবে না। শ্রীঅরবিন্দের নিকট বসিয়া দেখিতেছি—তোমরা ছোট-ছোট সংসারের মানুষ নও। এক বৃহৎ সংসারের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতেছ। তাই বলিয়া ছোট সংসারগুলি এই বৃহৎ হইতে ভিন্ন নহে। বৃহৎ পারিবারিক জীবনসাধনার সিদ্ধিতেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সংসারের পরিতৃপ্তি নির্ভর করে, তাই বৃহৎ সৃষ্টির জন্য আমাদের নির্ম্মম হইতে হইবে। এই বৃহৎ সৃষ্টি সার্থক না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের চতুর্দ্দিকে জলিয়া উঠিবে অশান্তির আগুন। আর্থিক ক্ষয়ে ও অপচয়ে এমন কি দৈনিক জীবনযাপনের ভিত্তিও ভূ-কম্পনে কাঁপিয়া উঠিবে। প্রতি পদেই বাধার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে দিবা-রাত্রি প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া। আমাদের আজ যাহারা সহকর্ম্মী, আমারই দেশবাসী, সমাজ, ধর্ম্ম, এমন কি সমস্ত জগৎও আমাদের পথ আগুলিয়া ধরিবে। এই ঘনীভূত অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া দিব্য ঊষার আলোকচ্ছটা অচিরেই দেখা দিবে, এমনও মনে করিও না। আমি জানি না এই নব-জাতি-সৃষ্টির জন্য যে সংগ্রাম, তাহার জন্য কয়জন আমাদের সঙ্গে থাকিবে ! আমি তাই গোড়া হইতেই মহাশক্তিমান্ যোদ্ধাদেরই আহ্বান করিয়াছি।"

শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছিলেন—আমার এই সত্য-প্রেরণাকেও সম্পূর্ণরূপে আত্মগত করিয়া আমাকে মুক্ত করিতে, তাঁহার মধ্যে আমার জন্ম সফল করিতে। আমি এই সময়েই কোন এক অজ্ঞাতশক্তির প্রেরণায় অতি

অকপটেই তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নতি রাখিয়াই চাহিতেছিলাম আমার সহিত অভিন্ন চন্দননগরের উৎসর্গীকৃত সাধকদের নব জন্ম। চিন্তাশীল ব্যক্তিই আমার অবস্থার কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীঅরবিন্দ ও আমি, উভয়ের স্বরূপসত্তায় অন্তর্নিহিত ঋতময় জীবনপ্রেরণার ভিন্নতা নিগূঢ় কল্পলোকে আমাদের মধ্যে প্রতিদিন ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছিল—আমার জীবন-স্রোতঃ কোন এক অমোঘ অব্যর্থ লক্ষ্যে এই সময় হইতেই পরিচালিত হইতেছিল। আমার লেখনীমুখে চন্দননগরের প্রতি অজস্র অগ্নি-নির্দ্দেশ বাহির হইতেছিল। অরুণকে আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলাম: "একটা গম্‌গমে আবহাওয়ার মধ্যে আমরা বেশ থাকি। এইটা আমাদের পতনযুগের জাতীয় স্বভাব। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, এমন কি এই আত্মসমর্পণযোগের মধ্যেও এই স্বভাবেরই যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আজ আমাদের সতর্ক হইয়া এই স্বভাব থেকে দূরে দাঁড়াইয়া, নিজেদের তাজা আবহাওয়া যাহাতে সৃষ্টি করিতে পারি, সেই আয়োজন কর। উহা আর কিছু নহে—সত্যকে অতি নির্ম্মম হইয়াই ফুটাইয়া তোলা। এইখানে ক্ষতি-বৃদ্ধির হিসাব রাখিও না, সুনাম-কুনামের পাতলা কান লইয়া কোন ক্ষেত্রে মনোভঙ্গের প্রয়োজন নাই। এই সব পথের কণ্টক সরাইয়া-সরাইয়া আমাদের আগাইতে হইবে। যে মন লইয়া আমরা যাত্রা সুরু করিয়াছি, সে মনের আমূল পরিবর্ত্তন চাই, নতুবা ভাগবত-সৃষ্টির সম্ভব হইবে না। পুরাতন মনকে বাঁচাইয়া রাখিলে, এই মনের ধর্ম্ম নূতনের সবখানিকে ধরিতে দেয় না। সৃষ্টি অপূর্ণ হয়। তাই মনকে উপরে তোল। আত্মার প্রদীপ্ত পাবকে বিগলিত স্বর্ণের ন্যায় নূতন মন লইয়া তোমাদের যাত্রা সুরু হউক।"

কাম ও অর্থ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন সংস্কৃতি, সমাজ ও জাতির সংগঠন ছিল আমাদের লক্ষ্য। তাই কর্ম্ম যোগেরই অভিব্যক্তি-স্বরূপ যাহাতে হয়, সেই দিকেই আমি সঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতাম। আমার লিখিত পত্রাংশে আজও তাই দেখি "তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থসিদ্ধি লক্ষ্যে রাখিয়া নহে, উহা যোগের অভিব্যক্তি। যাহারা যোগী, তাহাদের হস্তেই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার দিতে হইবে। অন্যথা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। সাধনার সময়ে অপচয় অবশ্যম্ভাবী। অভিজ্ঞতার্জ্জনের

জন্যও শক্তি ও সময়ের অপব্যয় হয়; কিন্তু যোগের প্রতিষ্ঠা যত সুদৃঢ় হইবে, এ সবেরই তেমনি পূরণ হইয়া যাইবে। অযোগীর জীবনক্ষেত্রে এইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। যে তিনটী বস্তু যোগের অন্তরায়, আমাদের যোগ এই তিনের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থ, নারী আর কর্তৃত্ব আমরা ছাড়ি নাই। কিন্তু এই তিনই আমাদের সাধনায় দিব্যরূপ-প্রকাশের পথেই চলিয়াছে। যোগশক্তি ইহার কারণ। তালে-ঘোলে খিচুড়ি পাকাইয়া আমরা চলিতে চাহি নাই। ব্যবসার সঙ্গে স্বদেশী, স্বরাজ, সেবাধর্ম্ম জড়াইয়া থাকিলে ব্যবসার উন্নতি নাই; ব্যবসায় দেশের ধনশক্তি-বৃদ্ধি করারই অব্যর্থ-প্রণালী। যারা ব্যবসার ক্ষেত্রে আত্মদান করিয়াছে, কমলাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তোলাই তাদের সৃষ্টির সাফল্য..."—আমার এই কথার সমর্থন করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিতেন "অর্থের অনাবশ্যক ব্যয় কোনমতেই উচিত নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় খরচ নয়, সঞ্চয় করাই কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী অনেকদিন লক্ষ্মীছাড়া। বাঙ্গালীকে লক্ষ্মীমন্ত করিতে হইবে। তাই ব্যবসাক্ষেত্রে অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার প্রয়োজন আছে।"

সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তখন হইতেই এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম—"অর্থক্ষেত্রে হিসাব রাখিয়া না চলিলে, প্রচুর শক্তি থাকা সত্ত্বেও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়। সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠান সঙ্ঘের আত্মরক্ষার জন্য; যদি ইহার উপর সঞ্চয় হয়, তবে দেশের ব্যাপক কর্ম্মে তাহার নিয়োগে বাধা নাই। এখন যদি দেশের ব্যাপক কর্ম্মে হাত দিতে হয়, তার জন্য দেশের দানই মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। আমাদের শিক্ষা ও অর্থ-প্রতিষ্ঠান শুধু স্বরাজ-সাধনার জন্য নয়; তাই বলিয়া স্বরাজ চাই না, তাহাও নহে। মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্যই ভারতের স্বরাজ যেমন একটী উপায় মাত্র, সেইরূপ আমাদের শিক্ষা ও অর্থ-প্রতিষ্ঠান মানবজাতির শ্রেয়ঃ-সাধনেরই জন্য। সেইজন্যই আমাদের ক্লান্তিহীন, বিরামহীন অভিযান। এইজন্যই আমরা অমৃতের পুত্র; মৃত্যুকে বার-বার অতিক্রম করিয়াই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।"

আশ্চর্য্য, শ্রীঅরবিন্দের প্রসন্নমূর্ত্তি আমার প্রাণে জন্মগত প্রেরণার উপরই অজস্র আলোকবর্ষণ করিত। আমি উন্মাদ হইয়া কর্ম্মোদ্যত হইতাম। সকলে যখন আত্মশুদ্ধি ও মুক্তির জন্য শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তিতে অবগাহিত

হওয়ার আয়োজন করিতেছে, আমি তখন শ্রীঅরবিন্দের প্রসাদ সঞ্চয় করিয়া আত্মপ্রকাশের পথেই দ্রুত চলিতে চাহিতেছি। আমার এই দুর্জ্জয় গতিবেগ অহঙ্কারজনিত অথবা কর্ম্মপ্রবণ অশুদ্ধ প্রাণধর্ম্মের অভিব্যক্তি, এ বিচার সেদিন করিতে বসিলে আত্মবিশ্বাসের উপর অনাস্থার কালো মেঘ আমায় বিমূঢ় করিয়া তুলিত। আমি তাহা করি নাই। সে আজ ২০।২৫ বৎসরের কথা। আজও আমার সেই আত্মবিশ্বাসই অমলিন রহিয়াছে। আমার জীবনে সাধনার পথ-রেখা মনোবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়াই চিরদিন ছুটিয়াছে। আমাকে চিরদিন যেন কে পাইয়া আছে, অধিকার করিয়া আছে—তাহার নির্দ্দেশ অমান্য করার সাধ্য আমার ছিল না। সেই অন্তর্য্যামী পুরুষেরই প্রতীকস্বরূপ শ্রীঅরবিন্দকে পাইয়াছিলাম। প্রতীক—পুরুষের সবখানি নহে, উহা তাঁহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। এই সঙ্কেতও লক্ষ্যপথে চলার অনিবার্য্য সহায়। সেদিন এতখানি শাস্ত্র ও অনুভূতিগত জ্ঞানের উদয় হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দই ছিলেন আমার কাণ্ডারী, তাঁর সান্নিধ্যে আমার কর্ম্মপ্রেরণার গোমুখীধারা সহস্র স্রোতে ছুটিয়া চন্দননগর ভাসাইয়া দিতেছিল। মানুষের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম সর্ব্বজয়ী। শ্রীঅরবিন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া আমি হৃদয়বীণার তারে আঘাতের মূর্চ্ছনা তুলিয়া চন্দননগরকে সঞ্জীবিত করিতেছিলাম। সেদিন আমার লেখনীমুখে, পত্রের ছত্রে-ছত্রে যে বাণী উদ্গীত হইতেছিল, তাহার মধ্যে ছিল ভবিষ্যতেরই দিব্য ইঙ্গিত—তাই তাহা হইতে আর একটু অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি—"বাঙ্গালী জাতি উত্তেজনাপ্রিয়। তাহাদের খোরাক যোগাইতে-যোগাইতে কেবল অনেক মহাকর্ম্মী নয়, অনেক মহাপুরুষ দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন। আমাদের জাতি শুধু পরাভূত নহে, সম্মোহন-মুগ্ধ। এই জাতির মতামতের উপর নির্ভরতা রাখিলে চলিবে না। অতি অল্প করিয়াই ১০০ জন আত্মস্থ ভাগবতকর্ম্মীর মধ্যে সত্য, প্রেম ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা কর। কালের কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া ইহারাই জাতির জয় দিবে। এই জাতির অভ্যুত্থান আমি চাহিতেছি।

"যে জাতি আজ বাঁচিয়া আছে, তাহারা চাহে না পূর্ণাঙ্গ জীবন। সর্ব্বদাই এই জাতি খণ্ড আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, একটা নির্দ্দিষ্ট-রেখা ধরিয়া চলিতে চাহে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় জাতি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণচিত্ত হওয়ার ফলেই এইরূপ

হইয়াছে। এইরূপ কোন এক খণ্ড আদর্শের অনুগত করিয়া আমাদের জীবনকে সীমাবদ্ধ করিব না। দেশে স্বাধীনতার আদর্শই আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদর্শ। আর এইজন্যই জাতির সবখানি প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস চলিয়াছে। ইহাতে যোগের প্রয়োজন উড়িয়া যায়। আমাদের যে কাজ শুধুই ভারতের তাহা নয়, ভূমাই আমাদের লক্ষ্য। সৃষ্টির সূচনায় যতই আমরা ক্ষুদ্র হই, নিখুঁত বৃহতের সাধনাই আমাদের আশ্রয় হইবে। স্বরাজ এই বৃহতেরই অনুবর্ত্তী।"

শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রতিদিন প্রাতর্ধ্যানে বসিতাম। তিনি অনিমিষে চাহিয়া থাকিতেন আমাদের দিকে, এ ছিল তাঁর দেওয়ার খেলা। তাঁর এই দানের লক্ষ্য হয়তো ছিল অন্য কিছু; কিন্তু আমি পাইতাম জাতিগঠনেরই মৌলিক প্রেরণা। তাই বাঁশী আমার ফুকারিয়া উঠিত যে গানের মূর্চ্ছনায়, সে সঙ্গীতের ঘনিমায় চন্দননগরে গড়িয়া উঠিতেছিল এক শক্তিশালী সঙ্ঘজীবন। আমার কথা ছিল—"যতই বলি, যতই লিখি, দেশের লোক এই মহান্ আদর্শের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিবে না। এইজন্যই আমরা চাহিতেছি এক মুঠা মানুষ, যারা আত্মায় নবজন্ম লইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। যোগ ভিত্তি। সঙ্ঘ ইমারৎ। অসংখ্য লোকের মধ্যে যোগের বীজ যদি নিক্ষিপ্ত হয়, তবেই শতজন মানুষ অনন্তকাল যোগকেই মূর্ত্তি দিয়া যাইবে জীবনে। সঙ্ঘসৃষ্টির পর বিজ্ঞানের ক্ষুধা প্রবল হয়। কেননা, সঙ্ঘের গতিপথে পদে-পদে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব, সেখানে একমাত্র সান্ত্বনা বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা হইলেই মিলে। এই কথায় কেহ যেন মনে না করে—সঙ্ঘ না হইলে বিজ্ঞান মিলে না; তবে সঙ্ঘের এই অভাব অতিশয় তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায়, ইহা শীঘ্র আয়ত্তে আনার প্রবল আয়াস সঙ্ঘের পক্ষেই সম্ভবপর। ব্যষ্টিগত আত্মার অপেক্ষা সমষ্টিগত আত্মার শক্তিবেগের গুণাধিক্য কে অস্বীকার করিবে?"

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের অলক্ষ্যে ও দূরে থাকিয়াই চন্দননগরে যে সৃষ্টিচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা মনের সৃষ্টি হইলে, আমি মুক্তির পথ সহজেই বাহির করিতে পারিতাম। সমর্থন শ্রীঅরবিন্দের ছিল, কিন্তু আর কাহারও নিকট আমল পাইতাম না। প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে সঙ্ঘের প্রতি উপেক্ষাই আমার ভূষণ হইয়াছিল। কিন্তু আমার

চিত্ত তাহাতে বিচলিত হইত না। পণ্ডিচারীতে অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে আমার আত্মা বিজ্ঞানের আলোকে পুলকিত হইয়া উঠিত। সেই আলোকেই স্থষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছিলাম "সঙ্ঘটী চন্দননগরের কিছু অলৌকিক ধরণের হইয়াছে। সঙ্ঘস্থষ্টি হয় ব্যষ্টির পরিপুষ্টির ক্ষেত্রেই। কিন্তু চন্দননগরের ক্ষেত্রে সমষ্টি-আত্মাই প্রকাশিত হইতেছে ব্যষ্টিতে-ব্যষ্টিতে। ব্যষ্টি যেমন আপনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলার সাধনা করে, এখানে সেইরূপ সমষ্টি-আত্মাই ব্যষ্টির ন্যায় তপস্যা করিয়া চলিয়াছে আপনাকে নিখুঁত করিয়া জানার জন্য। আমাদের অবস্থা বুঝাইবার নহে ; অতি কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া ভগবান্ই এই অভিনব সত্যকে প্রকাশ করিতে চাহেন। পরীক্ষা যত কঠোর হইবে, সঙ্ঘের সত্যমূর্ত্তি খাঁটি সোনার ন্যায় ততই উজ্জ্বল হইবে। বৃহতের সম্ভাবনা এই সংস্থার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। আগুনের একটি ক্ষুদ্র কণিকাও প্রলয়স্থষ্টির শক্তি ধারণ করে।" স্থষ্টির স্বপ্ন আমায় বোধহয় নিবিড়ভাবেই ঘিরিয়া ধরিতেছিল। ইহার উপর আমার কোনই হাত ছিল না। যন্ত্রের ন্যায় চলার অভ্যাস দৃঢ় হওয়ায়, ঠিক নিয়মিতভাবে প্রতিদিন প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দের নিকট আসিয়া বসিতাম। কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া চক্ষুঃ মুদিত হইত ; আর অন্তরে ফুটিয়া উঠিত হিরণ্যগর্ভের স্থষ্টিস্বপ্ন। এইরূপ কিছুদিন অতিবাহিত হইল, মনে হইল—হয়ত আমার মধ্যে স্বপ্নস্থষ্টি তাঁহার অভীষ্ট-পূর্ত্তির বিঘ্ন করিতেছে। কিছুদিন পরেই অনুভূত হইল—তাঁহার আত্মিক সংযোগ আর কোন স্পর্শ দিতেছে না। চাহিয়া দেখিতাম—তিনি উদাসীন ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়াই তৎক্ষণাৎ এই সময়ে প্রতিহত হইয়াছি। এই সময়ে তিনি হঠাৎ বলিতেন "আজ বেশীক্ষণ বসিতে পারিব না, শরীর একটু ক্লান্ত আছে।" তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিতেন ; আমরাও দুইজনে তাঁহার ক্লান্তির মাত্রা বৃদ্ধি না করিয়া, প্রসন্ন মনেই বাড়ী ফিরিতাম।

শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে কোথায় ভেদ-স্থষ্টি হইল, সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করার জন্যই আমি আজ অতীতের পাঁজি-পুঁথি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। তিনি আমায় যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার জন্য দিয়াছিলেন সকল প্রকার সুযোগ। আমার পত্নীকে দূরে রাখিলে যদি আমার

চিত্ত চঞ্চল হয়, এইজন্য তিনি এবার আমায় সস্ত্রীক আসার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। আমার অর্থের প্রয়োজন ছিল না ; কিন্তু তবু তিনি আমার প্রয়োজনপূরণের জন্য আমার হাতে প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। কিন্তু জন্মগত প্রেরণার দাবী লঙ্ঘন করার উপায় আমার ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ আমার কিছুদিন পণ্ডিচারীবাসের পর ইহা যেন বুঝিতেছিলেন এবং তাহার জন্য যে দান দিলে আমি ধন্য হই, তাহারও সন্ধান করিতেছিলেন। দীর্ঘ দিনের পর্য্যবেক্ষণে আজ এই সকল বিষয় বোধগম্য হইতেছে। সেদিন ছিল যন্ত্রযোগের সাধনা। যন্ত্রীরূপে দেখিতাম শ্রীঅরবিন্দকে, তাই আমি নিশ্চিন্ত মনে যাহা আহৃত হইতেছিল, তাহা প্রত্যাখ্যান করি নাই। যাহা আমার অনাবশ্যক মনে হইত, সে বিষয়ে আমি উদাসীনই থাকিতাম। আমার সাধনা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। এই সাধনা আমার নিজস্ব বস্তু। আমি তখন ধীরে-ধীরে একরূপ আত্মস্থ হইয়া উঠিতেছি। আমার স্ত্রীও তখন বেশ সুস্থ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আমার সঙ্গে-সঙ্গে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু সহসা অতি তুচ্ছ উপলক্ষ্য আশ্রয় করিয়া শ্রীঅরবিন্দ ও আমার চাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাহা অভাবনীয় রূপে মূর্ত্ত হইয়া, বড় করুণ আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল ; উপলক্ষ্যস্বরূপ যাহা, তাহা যতই অপ্রিয় হউক, সত্যকেই সে মূর্ত্তি দান করে।

বাহিরের কার্য্য অপ্রিয় হইলে, মানুষ বাহিরকেই দায়ী করে। কিন্তু সর্ব্ব কার্য্য ও ঘটনার জন্য সে-ই যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী, এ বিষয়ে আমারও সেদিন তেমন প্রত্যয় হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ চাহিতেছিলেন যাহা, তাহার পরিপন্থী ছিল অনেক কিছু; তাহা যে একেবারে অলীক ছিল, তাহাও নহে। শ্রীঅরবিন্দের মুখেই অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। এই সকল গোপন হস্তের কর্ম্ম তিনি আমলে না আনিয়া যাহা চাহিতেছিলেন, সেইদিকেই ছিল আমার লক্ষ্য; বাধা ছিল আমার অন্তরেরই অবস্থার লক্ষণ। তিনি বলিতেন "যোগ অনেকে পাইয়াছে, কিন্তু সকলে supermind পায় না। আমি কাজ করব supermind নিয়ে। তুমি আমার সর্ব্বপ্রথম চিহ্নিত মানুষ। তোমায় নিখুঁত হতে হবে।" 'অরো'র এই আকৃতি আমার অন্তরে সৃষ্টির উৎসই উছলিয়া তুলিত। অকস্মাৎ এমন কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটিল; বাহ্যতঃ মনে হইল তাহা শ্রীঅরবিন্দের চাওয়া পূরণ করারই সুযোগ, কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ফল হইল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই—আমরা সকলে মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছি। মাদ্রাজী প্যারিয়ার পশ্চাৎ বঙ্গকুললক্ষ্মীর সুনিপুণ হস্ত রন্ধনাদির পারিপাট্য রক্ষা করিত; ভোজনাদি ব্যাপারে তাই চন্দননগর হইতে দূরে আছি বলিয়া মনে হইত না। আমার এক সহযাত্রীর ভোজনপাত্র নিমেষেই শেষ হইল। আমার পাত্রে প্রচুর অন্ন ছিল, আমি তাড়াতাড়ি কিছু অন্ন চিরাচরিত অভ্যাসবশতঃ তাহার পাতে তুলিয়া দিলাম। সহসা পথিকের সম্মুখে বিষধর সর্প ফণা তুলিয়া দাঁড়াইলে সে যেমন চকিত হয়, আমার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। সেইদিন আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিল, তাহা ভুলিবার নহে। এই ব্যক্তি আমার পাত্র হইতে তাহার পাত্রে উচ্ছিষ্ট অন্ন তুলিয়া দিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমি জানিতাম—আমার সমস্তখানি

হৃদয় দিয়া মায়ের মতই তাহাকে মানুষ করার শুভেচ্ছা চিরদিনই পোষণ করি। আমার পাতের অন্ন শুধু নহে, আমার স্ত্রীর প্রসাদ ভক্ষণ করাও সে এতদিন গর্ব্ব বলিয়াই মনে করিত। আমার আরও দুঃখ হইল, যখন সে আমার এই আচরণে অতিশয় ঘৃণার সহিত একপ্রকার অভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইল। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। অভিমানে-অপমানে আমার চক্ষুঃ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। হৃষীকেশ কাঞ্জিলালও এই সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "মতিদা, কাজটা ভাল কর নাই।"

আমার মুখে ভাষা নাই। আমি তো বুঝাইতে পারিব না, ইহার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার এই সহযাত্রী মানুষটিকে কি চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি! অতীতের ইতিহাস হৃষীদাদা তো জানিতেন না। এই অসম্ভব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল; আর একজন দূরে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে আমার ব্যথার ভার লাঘব করার জন্য করুণ নয়নে আমারই প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি বুঝিলাম—শ্রীঅরবিন্দের অপরিসীম স্নেহের অধিকারী হইয়া আমার অলক্ষ্যে এমন বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে আমার চির-সুহৃৎ সহযাত্রীদের সশ্রদ্ধ হৃদয় আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছে। আমি ক্ষুণ্ণ মনেই উঠিয়া পড়িলাম।

ইহার পরই অরুণের একখানি টেলিগ্রাম আসিল। তার প্রথম চারিটী শব্দ সুস্পষ্ট, পরের শব্দটী একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। পোষ্ট আফিসে সেই শব্দটির পাশে একটি তীর-চিহ্ন দেওয়া আছে—টেলিগ্রামটি এইখানে উদ্ধৃত করিলাম—"Won't Kakıma come strong samslutural* need." বুঝিলাম—চন্দননগর হয় আমায়, নয় তাদের কাকীমাকে চায়। ক্ষুণ্ণ মন অরুণের টেলিগ্রাম পাইয়া কিছু অস্থির হইল। তবু উত্তরে লিখিলাম "টেলিগ্রামের শেষ কথাটা বুঝিলাম না, চুপ করিয়াই রহিলাম। তবে আমার কথা, প্রয়োজন বলে' আর কিছু করা হবে না; এবার থেকে উপরের প্রয়োজন ধরে'ই চলতে হবে। ইহার উপর চাই তোমাদের দিক্ থেকে দিনের মত স্পষ্টতা। নিঃসঙ্কোচে হাঁ বা না, এই দুয়ের মাঝে যেন কোন সংশয় না থাকে। কাকীমা কেন, আমার যাওয়াও যদি ভিতর থেকে

অনুভব কর, আমি এক মুহূর্ত্তে চলে' যাব। আমি নিজের মুক্তি চাহি না; নিজের ব্যক্তিত্বও আমার কাছে তুচ্ছ। যদি তোমাদের প্রয়োজন হয়, আমি নিঃস্ব হয়েই দাঁড়াব। এখানে আমার জীবন নিয়ে যেন একটা 'এক্সপেরিমেণ্ট' হচ্ছে। আমার জীবনের যাচাই আমার অন্তরাত্মা সহ্য করতে চান না। জীবন যদি ঋতময় হয়, তবে সত্যকে আশ্রয় করে' কর্ম্মই আমার সুপথ।"

শ্রীঅরবিন্দের অপার্থিব স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ আমায় যেমন একদিকে প্রবুদ্ধ করিতেছিল, তেমনই অন্যদিকে আমারই সহযাত্রীদের শ্রদ্ধাহীন আচরণ আমায় পীড়িত করিতেছিল। আমি অরুণকে স্পষ্টই সেদিন লিখিয়াছিলাম —"আমার মধ্যে ভগবান্ যাহা চাহেন, তাহা কোন কারণে বিলম্বিত হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। আমি ফিরিতে চাই এবার উলঙ্গ হয়ে। 'অরো'র সহিত আমার যে উলঙ্গ সম্বন্ধ, তার ভিত্তিপরীক্ষার সংশয়দৃষ্টি আমায় পীড়ন করছে। তিনি নিঃসংশয় না হলে, আমি শান্তিহীন।

"কিন্তু আমি চাই 'অরো'র ছায়াশীতল আশ্রয় নয়: 'অরো'র সহিত আমার সত্য সম্বন্ধের পাকা ভিত্তি। ইহার জন্য পুরাতন সব কিছু ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হোক; সত্য সম্বন্ধের ভিত্তি তাহাতে অটল থাকবে। এ জীবনে অনেক অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে। আমার আত্মা আর তাহাতে রাজী নয়। আমার জীবনই সত্য সার্থক হোক, সে ইচ্ছা আমার নাই। আমার অন্তরবাণী হাঁকিতেছে—সঙ্ঘসৃষ্টির জন্য। সে সঙ্ঘ দু'জন হ'লেও হয়।"

শ্রীঅরবিন্দের সন্নিধানে বসিয়াই কল্পদেবতা নিপুণ হস্তে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তাই ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসেই লিখিয়াছি এই অন্তর-বাণী: "সঙ্ঘের যারা, তাদের মণ্ডল মধ্যে আসন যুড়ে' বসেছেন তোমাদের কাকীমা। এই দূরে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে আমি যাচাই হচ্ছি না, যাচাই হচ্ছে সঙ্ঘ। সেই সঙ্ঘকে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের কাকীমার ভিতরেই। অশেষ ক্ষুণ্ণতার মাঝে তাই দাঁড়িয়ে আছি হৃদয়ের তৃপ্তি নিয়ে। তোমাদের কাকীমার চাই আরও 'ডেভলপমেণ্ট'—আমি যেন ধীরে-ধীরে আমার নব জীবনের এই পুণ্যতীর্থে দাঁড়িয়ে সঙ্ঘাত্মার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি।"

এতদিন পরে শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে কোথায় ভেদ-প্রবাহ বহিতেছিল, তাহা বিচার করিয়া লক্ষ্য করিতেছি। মানুষ নিজের কাছেই

কত দুর্জ্ঞেয়—অন্তরে-অন্তরে তার কত রূপের ঢেউ, কে তাহার সন্ধান রাখে? পৃথিবীতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, এই দুইটি প্রধান প্রবৃত্তি। শ্রেয়ঃ আত্মার অভ্যুত্থান আনে, প্রেয়ঃ বন্ধন সৃষ্টি করে। বাল্যকাল হইতে এই সব তত্ত্ব আমি ভাল করিয়াই অধিগত করিয়াছি। প্রেয়ঃ দেয় আসন্ন সুখ, সহজ তৃপ্তি; শ্রেয়ঃ বুকে তপস্যার আগুন জ্বালে, চিত্তের স্বভাব-গতির পথ আগুলিয়া ধরে। তপস্যাই ছিল আমার জীবনের আশ্রয়। আমার নতির অর্ঘ্য কোনও পাওয়ার প্রত্যাশায় কোথাও প্রকাশ পাইত না। আমার চক্ষে প্রেম ও ঐক্যের বিগ্রহ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই অপার্থিব সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই আমার ছিল অকৃত্রিম প্রত্যয় ও প্রণতি। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু চাহিতেছিলেন আমার কর্ম্মসংস্কারকে নির্ব্বিশেষে দূর করিয়া অভিনব জীবনের ভিত্তিতে আমায় তুলিয়া লইতে। উভয়ের হৃদয়বিনিময় আলো-আঁধারে আবর্ত্তই সৃষ্টি করিতেছিল। আমি চাহিতেছিলাম শ্রীঅরবিন্দের নিঃসংশয়-স্বীকৃতি আমাদের চির সম্বন্ধের উপর। শ্রীঅরবিন্দ আমার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনাত্ম ক্ষণস্থায়ী মনে করিয়া আমাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া চাহিতেছিলেন আমার নূতন জন্ম। এই দুইটা প্রবল চাওয়ার সংঘর্ষে আমার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে নানা ঘটনারাজী দেখা দিতেছিল।

সে আর একদিনের ঘটনা। আকাশে ঘন মেঘ জমিয়াছে। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। পথ পিচ্ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে যেমন শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করিয়া বাসায় ফিরি, সেদিনও বাড়ী ফিরিয়াছি। হঠাৎ দেখি—পাদুকা রাখার স্থানে একখানি নূতন 'প্রবর্ত্তক'-এর উপর আমার এক সহযাত্রী বন্ধুর চর্ম্মপাদুকা দুইটি রাখা হইয়াছে, আর তাহারই পার্শ্বে অতি সযত্নে বারীনদার 'বিজলী' পত্রিকাখানি রক্ষিত হইয়াছে। ঘটনা কিছু নয়। সকল কর্ম্মের পশ্চাৎ একই নিয়ন্তা কর্ম্মরত। মানুষ সসীম; তাহার কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকৃত—বিশুদ্ধ নহে। তাই তার সব কাজই অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল। এই স্বভাবনিয়ত কর্ম্মে দোষ দিব কাহাকে? কিন্তু চেতনার স্তরে ভূমার জ্ঞান ঊর্দ্ধেই ঝিলিক দিয়া চিত্তে অন্ধকার ঘনাইয়া তুলিল। এই কর্ম্মে মানুষের অন্ধতাই প্রশ্রয় পাইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতির এইরূপ বিদ্রূপাত্মক কৌতুক আমি নীরবে মানিয়া লইলাম না। ইহা ব্যতীত 'প্রবর্ত্তক'কে আমি একখানি সাময়িক পত্র মাত্র বলিয়া মনে করিতাম না। ঈশ্বরের বাণী আমার ভিতর

দিয়া 'প্রবর্ত্তক' বহন করিত, ইহাই ছিল আমার বিশ্বাস। আমার এই অনুভূতি সমর্থিত হইয়াছিল শ্রীঅরবিন্দের কথায়। তিনি নিঃসংশয়ে জানাইয়াছিলেন —ঈশ্বরের বাণী আমার ভিতর দিয়া তিনি প্রকাশ করিতেছেন। এই পবিত্র 'প্রবর্ত্তক'-এর বুকে পাদুকারক্ষার অভিসন্ধি আমাকে ও আমার অনুভূতিকে হেয় করা ছাড়া আর কিছু নয়। তাহা বুঝিয়াই আমি সক্রোধে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। হৃষীদা আমায় প্রবোধ দিলেন—ইহা আমার সহযাত্রীর ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নহে, পরন্তু একটা আকস্মিক ব্যাপার, এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। এই ঘটনা লইয়া আমার ভাবপ্রবণতাকে দায়ী করিয়া আমার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের উচ্চ প্রত্যয় নির্ভুল নহে, এইরূপ একটা অভিসন্ধিমূলক আবহাওয়ার অনুভূতি আমায় অতিষ্ঠ করিল, আমার যেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। মানুষের অন্তরতম সত্য আহত হইলে, সে ক্ষেত্রে তাহার পাথরের ন্যায় সহনশীলতার প্রশংসা অনেকের নিকট গৌরবের বস্তু হইলেও, আমার প্রকৃতিতে এইরূপ সহিষ্ণুতা প্রশংসার বস্তু বলিয়া মনে হইত না, বরং কাপুরুষতা বলিয়া এইরূপ চারিত্র আমার নিকট ঘৃণ্য বলিয়াই উপেক্ষিত হইত। সত্ত্বগুণ শান্ত-স্তব্ধ-মৌনমূর্ত্তির মধ্যেই অভিব্যক্ত—এই ধারণা লোকের মনে দৃঢ়মূল থাকিতে পারে। আমি কিন্তু অনুভব করিতাম—রাজসিকতা যদি হয় অহঙ্কার-দীপ্ত অগ্নিশিখা, সত্ত্বগুণ ঈশ্বরেচ্ছার বিদ্যুৎপ্রবাহ; সহিষ্ণুতার নামে জড়ত্ব, ক্লীবত্ব এই পরাজিত জাতির ললাটে ঘোরতর তামসিকতার উপর সাত্ত্বিকতার আরোপ মাত্র। আমি এইরূপ হীনতার প্রতিকারকল্পে সেদিন আর অন্ন-জল গ্রহণ করিলাম না।

ঘটনা অনেক দূর গড়াইল। ইহা লইয়া শ্রীঅরবিন্দের নিকট নানা প্রকার আলোচনা সুরু হইল। তাঁর শান্ত সমাহিত জীবনে আমি যেন উপদ্রবের ন্যায় অনর্থসৃষ্টির হেতুস্বরূপ হইলাম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নিকট আমি ন্যায়বিচার পাইলাম। সকলেই বলিলেন যে, আমি এই ঘটনাকে যেরূপ গুরুতর করিয়া লইয়াছি, প্রকৃতপক্ষে উহা সেরূপ নহে। একটা আকস্মিক ব্যাপার লইয়া আমার মত লোকের এতটা ধৈর্য্যহীন হওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপ মতবাদের প্রতিপক্ষে আমার ক্ষীণকণ্ঠ আদৌ কার্য্যকরী হইত না, যদি শ্রীঅরবিন্দ আমার পক্ষ সমর্থন না করিতেন। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে

স্থিরকণ্ঠে ধীরে-ধীরে বলিলেন—"ব্যাপার আকস্মিক বটে ; কিন্তু ইহা যে একটী ঘটনা, তাহা অস্বীকার করা যায় না—It is an accident, তবুও ইহার মূলে একটি incident আছে বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে।"

শ্রীঅরবিন্দের অন্তহীন কারুণ্য এবারও আমার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে শীতল প্রলেপ মাখাইয়া দিল। তিনি আমায় একান্তে ডাকিয়া লইয়া আমার স্কন্ধের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া বলিলেন "তুমি তোমার ঐ দুইটি সহযাত্রীকে চন্দননগর পাঠাইয়া দাও।" তাঁহার মুখে এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলাম। তিনি যে এই ঘটনা এতখানি দরদের সহিত গ্রহণ করিবেন, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম "ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে ? আমিই বা তাহাদিগকে এমন নিষ্ঠুর কথা কি করিয়া বলিব ?" শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন "সে ভাবনা তোমার নয়, আমিই এ কথা তাহাদের বলিব।" তিনি ঠিক তাহাই করিলেন। তিনি আমার এই সহযাত্রী দুইটিকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা চন্দননগরে ফিরিয়া যাও। তোমরা যে supermind চাও, সে চন্দননগরেও হবে। কেননা, আমি এমন লোক দেখেছি, যে কখনও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি, সে এখানে এতদিন যারা আছে, তাদের চেয়ে ঢের এগিয়ে গেছে। চাই absolute and sincere desire, surrender of ego and patience—এই তিনটী condition রেখে চল, সব হবে। বরং সেখানে গিয়ে অরুণকে সাহায্য কর।" সেদিন ছিল ৮ই জুলাই। একজন ১৫ই জুলাই প্রত্যাবর্ত্তনের দিন স্থির করিল, আর একজন সেই মুহূর্ত্তেই প্রস্থানোদ্যত হইল। ইহার মধ্যে আবার কথা উঠিল, এই সঙ্গে আমার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেওয়ার। বারীনদার মুখে শুনিলাম—তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) নাকি আমাকে এখনও তিন মাস রাখিবেন। কথাটা বেশ পাকা রকমেই আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিল। আমার স্ত্রীও ইহা শুনিলেন। আমারও মনে হইল—শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, এখানে আমার নিঃসঙ্গাবস্থাই শ্রেয়ঃ। আমিও তাঁহাকে ইহাদের সহিত যাইতে বলিলাম। কিন্তু তাঁহার যাওয়ার কথা পাড়িতেই হৃদয় মুষড়িয়া আমার চক্ষে জল আসিল। তিনিও কাঁদিয়া সারা হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব মনোবিকার ; উভয়ের মধ্যে আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনায় আমরা এক রাত্রি

কাঁদিয়াই কাটাইলাম। কিন্তু তৎপর দিন শ্রীঅরবিন্দের নিকট গিয়া আমাদের ভুল ভাঙ্গিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার বন্ধুরা ১৫ই জুলাই চন্দননগর যাইতেছে, আমার স্ত্রীকে কি ঐ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব?" তিনি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ কথা তোমায় কে বলিল?" আমি যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম "চারিদিক্ হইতে শুনিতেছি, ইনি সঙ্গে থাকায় আমার সাধনার বড় ক্ষতি হইতেছে, তাই—"

তিনি আর আমায় কথা বলিতে দিলেন না, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার যোগের সহায় যদি কেউ থাকে, সে তোমার স্ত্রী। উনি তোমার যোগের বাধা নহেন, পরন্তু তোমার সিদ্ধি আসন্ন করিতেছেন।"

আমাদের উঠিবার সময় হইয়াছিল, শ্রীঅরবিন্দ এক প্রকার অভিনবভাবে দন্তে দন্ত দিয়া ওষ্ঠপুট কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার চন্দ্রজ্যোতিঃ উছলিয়া উঠিতেছিল। তিনি ধীর পদবিক্ষেপে শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমরা দুইজনেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। মনে হইল—প্রচণ্ড প্রাণপুরুষ আমার মধ্যে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ যেন এই প্রাণপুরুষকে নিয়ত কশাঘাত করিতেছেন। বাহিরে তাহার তাণ্ডবনৃত্য কারণে-অকারণে নানাপ্রকারে দেখা দিতেছে মাত্র। তিনি তাঁর শয়নকক্ষের সম্মুখে একটা ক্ষুদ্র গৃহ-বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। আমার মনে হইল—যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি আমায় সতত কর্ম্মোন্মত্ত করে, সে যেন তাঁহার ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শে দ্রবণীয় ধারারূপে আমায় অভিষিক্ত করিতেছে। আমি যেন নিদাঘ-দগ্ধ-কলেবর লইয়া সুশীতল ভাগীরথীজলে অবগাহিত হইতেছি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অভিমানবিজড়িত কণ্ঠে বলিলাম "আপনার ইচ্ছা ষোল আনা পূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষায় আমি উন্মাদ হয়ে আছি; কিন্তু এবার আপনি আমায় এই বাড়ীর আবহাওয়ায় রাখেন নি, সাধন তাই পদে-পদে বাধা পাচ্ছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "তুমি ভুল বুঝেছ। এ বাড়ীর 'atmosphere' খুব খারাপ যাচ্ছে। খুব fight করছি, দেখি কি হয়? তোমার না হলে এবার আর ছাড়ব না।"

জুলাই মাস শেষ হইল। শ্রীঅরবিন্দ আমার অন্তরে-বাহিরে শান্তি-স্থাপন

করিয়া সাধনার সুবিধা করিয়া দিলেন। পণ্ডিচারীতে এই সময়ে ধ্যানের যুগ চলিয়াছে। পাশের ঘরে সুধীদা কাপড় আড়াল দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া সারাদিনই বসিয়া থাকেন। অবকাশ পাইলে, সাধন-প্রসঙ্গ লইয়া বেশ আলোচনা চলে। বাল্যকাল হইতে নানাপ্রকার সাধনভজনের ভিতর দিয়া অনেক বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, এই সকল আমার কাছে নূতন ছিল না। এই সকলের ভিতর দিয়া মানুষ একপ্রকার অসাধারণ চরিত্র লাভ করিতে পারে, পরন্তু আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুগত জীবন-যন্ত্র নিয়মিত করার সুপথ এই সবে সর্ব্বত্র মিলে না ; এইজন্য শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-যোগই আমি শ্রেয়ঃ করিয়াছিলাম। হঠযোগের নেতি-ধৌতি হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘক্ষণ কুম্ভকে থাকা পূর্ব্বেই আমার আয়ত্তে আসিয়াছিল। ত্রাটক-সাধনায় স্থির লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্তের বিচিত্র বর্ণ আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। রক্ত, পীত প্রভৃতি বর্ণ অতিক্রম করিয়া আমার চক্ষুঃ নীল-নীরদ-কান্তির মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল প্রকাশিত হইত। আবাল্য প্রতিমাপূজা হইতে হঠযোগাদি তন্ত্র, সহজিয়া, আউল, বাউল, এমন কি সতীমা সম্প্রদায়ের সাধনার সমাপ্তির পর শ্রীঅরবিন্দের আগমন হয় আমার সাধন-মন্দিরে। কুলগুরু দিয়াছিলেন 'শ্রী'-সাধনার অমোঘ মন্ত্রবীর্য্য, ভোগ ও অধিকার ছিল আমার সিদ্ধ বস্তু। শ্রীঅরবিন্দ অযাচিত দানরূপে দিয়াছিলেন জ্ঞান-শক্তি-প্রেমের মন্ত্র। অতীত বলিতে আমার কিছুই ছিল না—সাধনও নয়, সম্ভোগও নয় ; কায়ার সহিত ছায়ার ন্যায় পত্নী ছিলেন শুধু অপরিত্যজ্যা-সঙ্গিনীরূপে। পণ্ডিচারী আসিয়া, 'মৎকর্ম্মকৃৎ'—গীতার এই বাণী সফল করার জন্য হৃদয় হাহাকার করিলেও, স্ত্রী ত্যাগ করিতেও আমার কুণ্ঠা ছিল না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাহাও করিতে দেন নাই। আমার সাধনার কিছু গর্ব্ব ছিল। সেই গর্ব্বের অনুরঞ্জন-লিপ্ত দৃষ্টি দিয়া এখানকার সাধনকে আমি অভিনব বলিয়া মনে করিতাম না। ইষ্ট ছিলেন আমার শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর ভিতর দিয়া আমার মধ্যে যে সকল চেতনা বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল, তাহারই সমর্থন পাওয়ার প্রতীক্ষায় তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকাই আমার ছিল পণ্ডিচারীর সাধনা। আমার অধ্যাত্ম-দর্শনাদির কথা ব্যক্ত করিতে গিয়া অন্য সকলের নিকট বহুবার

হাস্যাস্পদ হইয়াছি, তাই সেই সকল কথা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতাম না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে সব কথা বলিতাম, তিনি সব শুনিতেন ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এই অবস্থায় আগষ্ট মাসের ৩রা তারিখ আসিয়া হাজির হইল। ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের উৎসব। প্রকৃতির অভাবনীয় প্রতারণা। অন্তর-প্রেরণা জাগিল—এবার ১৫ই আগষ্টের উৎসব সম্পন্ন করার ভার আমিই গ্রহণ করিব। চন্দননগরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই উৎসব আমার ভিতর দিয়া শ্রীভগবান্ সুরু করিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী একত্র একচিত্তে উৎসবের পরিকল্পনা স্থির করিয়া লইলাম। শ্রীঅরবিন্দ অতি আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। এই কর্ম্মে কিছু অর্থব্যয় হইবে, এই হেতু 'Standard Bearer'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য মাদ্রাজের গণেশ পাবলিশিং-এর নিকট অনেক টাকা পাওনা ছিল। মিষ্টার গণেশকে পত্র লিখিতেই তিনি তাহা পাঠাইয়া দিলেন। উৎসবের আনন্দে উদ্বুদ্ধ প্রাণ আবার এক আকস্মিক ঘটনাপাতে স্তম্ভিত হইল। আমার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল।

আগষ্ট মাসের ছয় কি সাত তারিখে সান্ধ্য-ভোজনের পর আমরা দুইজনে উৎসব-পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করিতেছি। কথায়-কথায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া শয়নের ব্যবস্থা করিব, এমন সময়ে শ্রীঅরবিন্দের বাড়ী হইতে একজন সংবাদ লইয়া আসিল—কোন এক সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সহ আমার অন্বেষণ করিতেছেন। আমরা শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম।

সত্যই এক জটাজুটধারী, উন্নতকায় গৈরিকবসনপরিহিত সন্ন্যাসীর সহিত কয়েকজন মাদ্রাজী তরুণ শ্রীঅরবিন্দের বাড়ীতে বসিয়া আছেন; সন্ন্যাসী আমাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন শিষ্য আমায় বলিলেন "ইনি হিমালয় হইতে কিছুদিন হইল আমাদের নিকট আসিয়াছেন। আপনি পণ্ডিচারী আসিয়াছেন শুনিয়া ইনি আপনার সহিত সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমরা সকলে মিলিয়া আসিয়াছি।"

আমি সন্ন্যাসীর দিকে সবিস্ময়ে চাহিতেই জটাজুটমণ্ডিত, শ্মশ্রুগুম্ফ-পরিবেষ্টিত সন্ন্যাসী ঠাকুরকে চিনিয়া ফেলিলাম। বন্ধুকে এমন বেশে এইরূপ ক্ষেত্রে দেখিব, তাহা ধারণায় ছিল না; চক্ষের ইঙ্গিতে দুইজনের পরিচয় হইয়া গেল। দীর্ঘ দিনের পর সুহৃৎ-সম্মিলনে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া

উঠিল। আমার পরিধানে ফরাসডাঙ্গার কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, সিল্কের চাদর, পায়ে দামী ঝক্‌ঝকে এলবার্ট শূ, অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয়, গলায় সোণার বোতাম, হাতে সোণার রিষ্ট্‌ ওয়াচ, আর সম্মুখে সন্ন্যাসী জটাজুটধারী, ললাট ভস্মাচ্ছাদিত, রুক্ষ শ্মশ্রুগুম্ফ। তাঁহার শিষ্যেরা মনে করিয়াছিলেন—এই মহাপুরুষের চরণে আমি প্রণত হইয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব। কিন্তু আমি স্থান-কাল-বিচার হারাইয়া সন্ন্যাসীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং তাহাকে হিড়্‌-হিড়্‌ করিয়া টানিয়া দ্বিতলে শ্রীঅরবিন্দের নিকট লইয়া চলিলাম। শিষ্যগণও আমাদের অনুসরণ করার উদ্যোগ করিতেছিল। আমার এই আচরণ দেখিয়া তাহাদের আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাদের নিষেধ করায়, তাহারা সেইখানেই বসিয়া রহিল। ঘটনা এক নিমেষে হইয়া গেল। নীচের তলায় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নিজ-নিজ গৃহে গভীর ধ্যানমগ্ন। আমি উপরে উঠিয়া দেখিলাম—অপরাহ্নের হাস্যমুখরিত সুপ্রশস্ত বারান্দাটী স্বপ্নপুরীর ন্যায় শান্ত, স্তব্ধ। রাজপথের বিদ্যুদালোক আঁকিয়া-বাঁকিয়া দেওয়ালে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নীলাকাশে স্তব্ধ নক্ষত্ররাজি আমার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের অনিয়মিত উচ্ছ্বাসে আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় যেন স্তব্ধ, বিমূঢ়। আমি একেবারে শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আমার স্ত্রীও আসিয়াছিলেন। দ্বার রুদ্ধ। আমি ধীরে-ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলাম। উল্লাস-মদিরামত্ত ধৈর্য্যহীন হৃদয় বর্ত্তমান পরিস্থিতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আমায় শ্রীঅরবিন্দের দরজায় আঘাতের পর আঘাত দিতে উত্তেজিত করিল। রুদ্ধ কপাট ধীরে উন্মোচিত হইল।

নিদ্রালস নয়নে শ্রীঅরবিন্দের প্রশান্ত-মূর্ত্তি সম্মুখে আবির্ভূত হইল। আমার প্রগল্‌ভ আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহার ললাটে ত্রিবলী-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার চরণধূলি লইলেন। আমি একান্ত অপরাধীর ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের অনুসরণ করিয়া বারান্দায় আসিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। এতক্ষণ আমি যে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সে ঘোর যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আমার উদ্বেগপূর্ণ মনের অন্তরে-অন্তরে মুণ্ডপাত করিয়া, শ্রীঅরবিন্দের গম্ভীর ও বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে-ভয়ে বলিলাম "হঠাৎ গেব্রিয়েলকে দেখিয়া আপনার

সহিত ইঁহার সাক্ষাৎকারের জন্ম আমি এই শান্তিপূর্ণ ধ্যানপূর্ণ আবহাওয়া নষ্ট করিয়াছি।" শ্রীঅরবিন্দের মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল। তিনি গেব্রিয়েলের অপূর্ব্ব বেশ দেখিয়া এইবার স্বভাবোদার হাস্যে বলিলেন—"অদ্ভুত সেজেছ!"

এই গেব্রিয়েল আমাদের চিরপ্রিয় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অমরেন্দ্রনাথ আমার চির সুহৃৎ, শ্রীঅরবিন্দের অনুগত, সে যুগের এক প্রধান কর্ম্মী। শ্রীঅরবিন্দকে গোপনে পণ্ডিচারী পাঠাইবার সময়ে উত্তরপাড়া হইতে অমরেন্দ্রনাথ এই কার্য্যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ফেরারী সংশয়ভাজন রাজনীতিকদের মুক্তির ভার আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। গোয়েন্দা-পুলিসের সংবাদে গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন—আমি ইঁহাদের লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; গভর্ণমেণ্ট সুবিধা দেওয়ায় তাহাদের একে-একে বাহির করিয়া দিতেছি। কথাটা কিন্তু সত্য ছিল না। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ইঁহারা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই দেশে-দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ইঁহাদিগকে সংগ্রহ করিতেছিলাম। অমরেন্দ্রনাথকে এই দূর প্রবাসে এমন বেশে দেখা পাইব, তাহা কল্পনাও করি নাই। অকস্মাৎ অমরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার পাইয়া আনন্দে আমার চিত্ত বিহ্বল হইয়াছিল। হৃদয়টার এইরূপ ভাবপ্রমত্ততার জন্ম আমি নিজেও অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতিভ হইয়াছি, অনেককে এইজন্ম বিব্রতও হইতে হইয়াছে। আজ তার চরম হইল।

শ্রীঅরবিন্দ স্থির, প্রশান্ত এবং অবিচলিত চিত্তে অমরেন্দ্রের সংবাদাদি লইয়া আমায় আদেশ করিলেন—এই অবস্থায় এখানে অমরেন্দ্রকে রাখা ঠিক হইবে না। আমি এই রাত্রির জন্ম ইঁহাকে আমার নিকট রাখিতে পারি কি-না, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন "একই কথা, এ কথা প্রকাশ হইলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইবে।" উপর হইতে নামিবার সময়ে অমরেন্দ্রনাথ আমায় বলিলেন "তুমি চিরদিন ছেলেমানুষই রইলে! আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে' চলে' যাব ভেবেছিলুম। হঠাৎ অরবিন্দকে বিরক্ত করা ঠিক হয়নি।"

আমি ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করি নাই। দরদীর মতই বলিলাম "আজ রাত্রে থাক্‌বে কোথায়?"

"কেন ছত্রম্ নেই? কাল সকালেই চলে' যাব। কাডালোরে আশ্রম বেঁধেছি যে!"

সে অনেক অবান্তর কথা—এই ক্ষেত্রে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। অমরেন্দ্রকে বিদায় দিলাম। কথা রহিল—চন্দননগরে ফিরিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিব। তারপর চন্দননগরে আসিলে তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা হইবে।

পরদিন পণ্ডিচারীর আবহাওয়া আমার প্রীতিকর মনে হইল না। গত রাত্রিকালের ঘটনা লইয়া স্পষ্টতঃ কাহারও মুখে কোন কথা শুনা গেল না বটে, কিন্তু অলক্ষিতে এই বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা হইল। একটা গেঁয়ো লোকের ন্যায় পূর্ব্ব-রাত্রির অমার্জ্জিত আচরণ সকলের নিকট বিসদৃশ হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে আমি অপ্রসন্ন দেখিলাম না। তিনি আমার বন্ধুবাৎসল্যের আতিশয্যে অসামঞ্জস্য চিত্তের পরিচয় মাত্র পাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই পরিচয়ই আমার জীবনের সবখানি নয়, তিনি যে আমায় নবজীবন দিতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে কি সম্পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত তিনি তাহা অবহেলা করিতে পারেন?

শ্রীঅরবিন্দের অমোঘ সঙ্কল্প জয়যুক্ত হইল না, এমন বলিলে ঋতময় ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধাভঙ্গ হয়। এই ভয়েই আমি যে বিষয়টা সাপটাইয়া লইতেছি, তাহা নহে; সত্য শুধু অনুমানের বস্তু নহে, তাহা জীবনের দৃষ্টান্তে পরিলক্ষিত হয়। কালই তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে, সে কথা আজ নয়।

ঈশ্বরের চাওয়া ব্যর্থ হয় না কোন কারণে, কোন ঘটনায়। ঈশ্বরের চাওয়া পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে যে ভাবে প্রকাশ পায়, তাহার অর্থবাদের এক অলক্ষ্য অভিধান আছে। বাহ্যতঃ শ্রীঅরবিন্দের প্রয়াস ব্যাহত করার বজ্রপাত হইল চন্দননগরের এক টেলিগ্রামে। হঠাৎ আগষ্টের ৯ই তারিখে শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র এক টেলিগ্রাম করিয়া বসিল "সম্মুখে ১৫ই আগষ্ট, শীঘ্র চলিয়া আসুন, আপনার সাফল্য এইখানেই।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া হাসিলাম। এ টেলিগ্রাম কি অরুণের? না, ইহার পশ্চাৎ ভাবী প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অনুপ্রেরণা আছে? আমার বিচারের প্রয়োজন ছিল না, যাহা হয়, তাহার জন্য ঈশ্বরবিধানই দায়ী; বিধাতৃপুরুষ এখানে জাগ্রৎ, মূর্ত্তিমান্। শ্রীঅরবিন্দকে টেলিগ্রামটী দেখাইলাম। টেলিগ্রামটী হাতে লইয়া তিনি দেখিতেছিলেন। এলোমেলো বাতাসে তাঁহার বিলোল

লঘু শ্মশ্রুগুলি ইতস্ততঃ উড়িতেছিল। তিনি মাথার সুবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ বাম হস্তে কর্ণের পার্শ্বদেশে ঠেলিয়া, দক্ষিণ হস্তে টেলিগ্রামটী আমার হাতে দিয়া বলিলেন "লিখে দাও একটা প্রকাণ্ড 'না'।"

অরুণকে টেলিগ্রামে জানাইলাম "অরোর নির্দ্দেশ—আমার যাওয়া হইবে না।"

মাথার উপর দিয়া কালো বাদুড়ের মত সারা রাত্রি অলক্ষ্য আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া উড়িয়া গেল। প্রভাতে শ্রীঅরবিন্দকে যথারীতি অভিনন্দন জানাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। অরুণের আবার টেলিগ্রাম। তীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় হৃদয় বিদ্ধ করিল; টেলিগ্রামের ভাষা—"ফিরিয়া আসুন, অন্যথা অনন্ত বিয়োগ। **Eternal separation.**"

ইংরাজী শব্দের প্রতিভাষা বাংলায় বুঝি ঠিক হয় না! এই 'সেপারেশন' অপনয়ন নহে। Elimination হইলে আমি বিন্দুমাত্র ব্যথিত নহি। এমন দুর্ঘটনার অনুভূতি জীবনের নিত্য সঙ্গী। অরুণ কি চাহিতেছে—আমার অপ্রত্যাগমনে আত্মবিনাশ? কি সাঙ্ঘাতিক! উদ্গত অশ্রু হৃদয় প্লাবিত করিল। যাহা নহে, তাহা লইয়া এমনই দুর্ভাবনা আমার চরিত্রগত একটী বিশেষ দোষ। আমি তাহা হইতে সেদিন মুক্তি পাই নাই। আমার কান্না দেখিয়া আমার স্ত্রী বলিলেন "তুমি ফিরে চল, অরুণের টেলিগ্রাম উপলক্ষ্য। আমি আসিয়া অবধি দেখিতেছি—শ্রীঅরবিন্দ তোমার আপনার জন, কিন্তু তোমার সাধনার এ স্থান নয়।"

আমি বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে বলিলাম "কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ যে চাহেন এইখানেই আমার সাধন ও সিদ্ধি! আর ১৫ই আগষ্টের ভার যে আমার উপর!" তিনি বলিলেন "শ্রীঅরবিন্দ দয়া করিয়া তোমায় আটকাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ভার বহন করিবেন মীরা, তুমি নহ।"

কি এক অজ্ঞাত পীড়নের দুঃখে মর্ম্ম নিঙড়াইয়া চক্ষে আমার অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠিতেছিল। এমন ক্রন্দনের অনুভূতি আমি কোনদিন পাই নাই। চক্ষে যত জল ঝরে, তিনি আঁচল দিয়া তত মুছাইয়া বলেন "আজ তোমার হ'ল কি? হয় চন্দননগর, নয় পণ্ডিচারী—এত কান্না কেন?"

আমার হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। সে মৃত্যুযন্ত্রণার হেতু ছিল গভীর অপ্রকাশের ক্ষেত্রে। ভিতরে-ভিতরে সর্ব্বনাশ কুণ্ডলী

পাকাইয়া আমায় অধীর করিতেছিল। আমি দুই কূল হারাইয়া কখনও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, কখনও রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাঁদিতেছিলাম। ১০ই আগষ্ট রাত্রি ঘনাইয়া আসিল; সে কালরাত্রিতে অশ্রুময় অক্ষর বিনাইয়া বিধাতা ললাটে লিখিয়া দিলেন "তুমি ফিরে যাও। তোমার সিদ্ধক্ষেত্র চন্দননগর।" ১১ই প্রাতে বজ্রকঠিন হৃদয় লইয়া, সাদা কাগজের বুক চিরিয়া, চক্ষের জলে শ্রীঅরবিন্দকে লিখিলাম "অরো, আমি চলিলাম।" সে ব্যথা প্রকাশের নহে। আমি তাই আর এক ছত্রও লিখিতে প্রস্তুত নহি। পত্রশেষে নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা কিন্তু আমার হাতকে যন্ত্রচালিতের ন্যায় লিখাইয়া দিল "আজ হইতে আপনার সঙ্গে হইল আমার Eternal separation।" এই নিষ্ঠুর বজ্র আমার হৃদয়-তন্ত্রীকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শ্রীঅরবিন্দকেও কত ব্যথা দিবে, তাহা বুঝিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িলাম।

জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যালোক তখন মসীময় মনে হইতেছিল।

অপরাহ্নে হৃদয়ের নিষেধ অমান্য করিয়া শ্রীঅরবিন্দ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দ জানাইলেন "আর প্রয়োজন নাই।" আর প্রয়োজন নাই! হৃদয়ে মত্ত কেশরী গর্জ্জন তুলিল। প্রয়োজন না থাকিতে পারে মর্ত্ত্যের চক্ষে। মর্ত্ত্যজীবনে এই অমৃত-সম্বন্ধের পরিচয় চির বিলুপ্ত হইতে পারে। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যে অনন্ত আকাশের ব্যবধান কল্পান্তকালস্থায়ী—তাই বলিয়া এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছে কে বলিবে? সেইরূপ আমাদের মধ্যে চিরজয়ী সম্বন্ধের অমৃত-নির্ঝর রুদ্ধ হইবে না। আমা হইতে শ্রীঅরবিন্দকে পৃথক্ করার শক্তি আমারও নাই, শ্রীঅরবিন্দেরও নাই। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আমি সস্ত্রীক উপরে উঠিয়া গেলাম। শ্রীঅরবিন্দ ও আমার মধ্যে তখন ভাগ্য-দেবতা কৃষ্ণ-যবনিকা টানিয়া দিতে উপক্রম করিতেছিলেন। আমার সাড়া পাইয়া শ্রীঅরবিন্দ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলেন। সাশ্রু নয়নে চরণে প্রণত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের ললাটে আগুন জ্বলিতেছিল—আমি বক্ষঃবিস্তার করিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া বলিলাম—"চলুন, আপনার ঘরে চলুন।"

তিনি স্থির কণ্ঠে বলিলেন "না, না।"

আমার হৃদয়ে শত-শত মত্ত-মাতঙ্গ লম্ফ দিতেছিল; তাঁহাকে বলিলাম "আসুন একবার ঘরে।"

রুদ্রের হিরণ্ময় শ্মশ্রু সক্রোধে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। অকস্মাৎ তাহা প্রসন্ন-শিবমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। তিনি তাঁহার শয্যাগৃহে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম "বিদায়······চির বিদায়!"

চারি চক্ষের প্রসন্নতা অমৃতবর্ষণ করিল। শ্রীঅরবিন্দ বুঝি অনন্ত যুগের জন্য মাথায় আশিস্-কর স্থাপন করিয়া বলিলেন "একনিষ্ঠ হও। তোমার মধ্যে সত্য ও আলো আবির্ভূত হোক।"

*

আমি অগ্রে, পশ্চাৎ মহামায়া তপঃশক্তি। পশ্চাৎই পণ্ডিচারী পড়িয়া রহিল। ভারতীর মন্দিরে বিজয়ঘণ্টা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলিল। শ্রীঅরবিন্দের করুণামূর্ত্তি পলকেও অন্তর্হিত হয় না; আনন্দে অশ্রু উথলিয়া উঠে নয়নে। শেষ বিদায়-ভাষণ নলিনী ও সুরেশ গ্রহণ করিয়া ফিরিল। আর আমি ফিরিলাম ব্রহ্মচারিণী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া শস্যশ্যামলা বাংলায়—চন্দননগরে।

তারপরে অনতিদীর্ঘ, জ্যোতির্ম্ময় আর এক জীবনপর্ব্ব—জীবনসঙ্গিনীকে কেন্দ্র করিয়া নব সৃষ্টি রচনার করুণ ইতিহাস। সে ইতিহাস—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেরই। সেখানে জীবনসঙ্গিনী কায়ার ছায়া নয়—আত্মার প্রতীক—স্বরূপের বিগ্রহমূর্ত্তি। জীবনসঙ্গিনী এখানে সঙ্ঘ-জননী—সঙ্ঘোৎসর্গের সিদ্ধি-লক্ষ্মীরূপে বিশ্ববিজয়িনী।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
শতবর্ষের বাংলা
বাণী ও রচনাবলী
জীবনের আলো
উপাসনা মন্দিরে
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ
বেদান্ত দর্শন (যন্ত্রস্থ)
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল
শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন